"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

১৯শ বর্ষ।

(১৩২৩ মাঘ হইতে ১৩২৪ পৌষ পর্য্যন্ত)
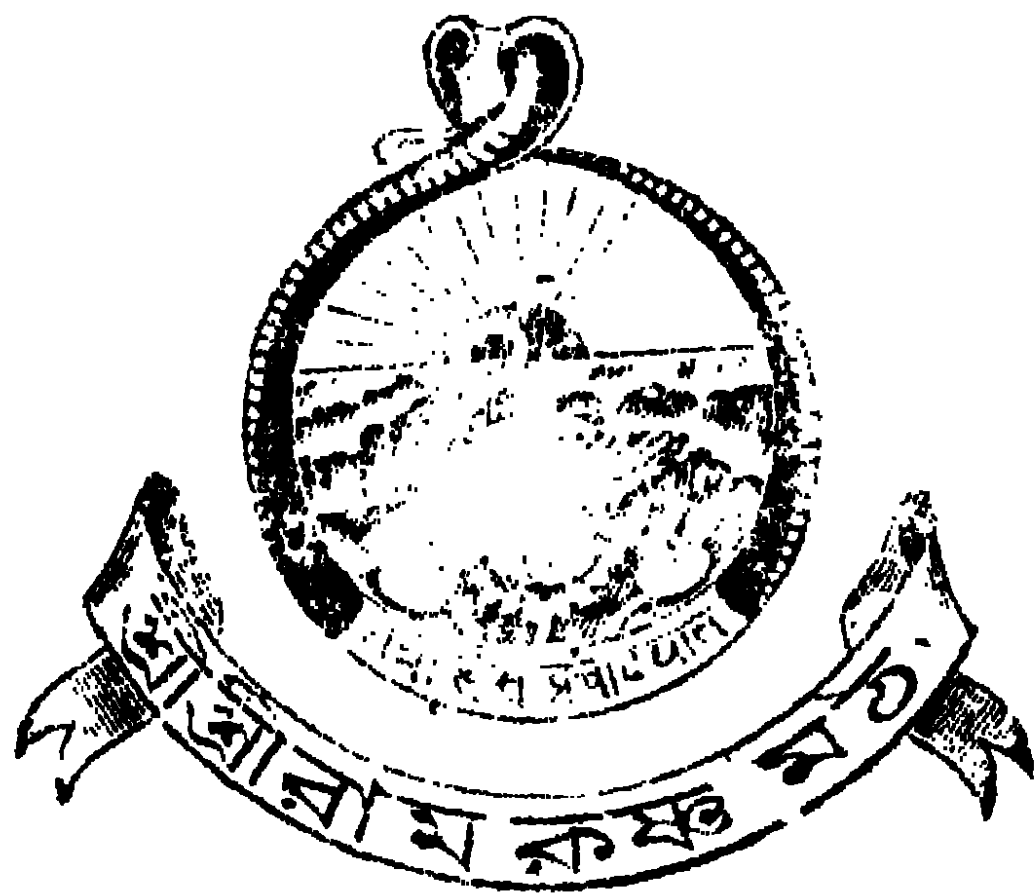
উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

১৯শ বর্ষ।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানবমনে যে বিবিধ অনুরাগ উৎপন্ন হয়, স্বামিজীর জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান। সম্ভবতঃ ভারতের এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক সত্যতা হেতুই তিনি উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সম্বন্ধেই আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত আছি, কারণ সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের শত্রু মিত্র উভয়ই ছিল!" তাঁহার নায়কের চরিত্রে যে পূর্ণ জ্ঞানবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বার বার তাহারই বর্ণনা করিতেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধ শুধু আর্য্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণ স্থির-মস্তিষ্ক ছিলেন। তিনি কেমন পূজা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন! কিন্তু কেহ কেহ যে বাস্তবিকই তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল সে বিষয়ে স্বামিজী কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটী উচ্চ অবস্থা। এস, সকলে উহা লাভ কর। এই লও উহার চাবি!"

সাধারণ লোকেরা আজগুবী ব্যাপার দেখিবার জন্য যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, বুদ্ধ উহাতে এত বীতস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি একটী যুবককে জনতার সমক্ষে একটা খোঁটার উপর হইতে বাক্যমাত্র দ্বারা

একটী মণিখচিত বাটী নামাইয়া, অন্যের জন্য নির্ম্মমভাবে সঙ্ঘ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।' তিনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের সহিত বুজরুকীর কোন সম্পর্ক নাই!

এই আনন্দময় পুরুষের কি অসাধারণ স্বাধীনতা ও দীন ভাব ছিল! তিনি বারনারী অম্বপালীর নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এক অন্ত্যজের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—উহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা জানিয়াও ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, হীনপদস্থ লোকদিগের সহিত মেলামেশার ব্যাপারই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য হউক। তৎপরে তিনি আবার, যাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে মহাপরিনির্ব্বাণের সহায়তা করার জন্য সৌজন্যপূর্ণবচনে ধন্যবাদ দিয়া পাঠান। কি প্রশান্ত! কি মহাপুরুষের ন্যায় আচরণ! সত সত্যই তিনি অশেষগুণাকর পুরুষর্ষভ ছিলেন!

আবার যেমন তাঁহাতে বিচারশক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল, তেমনি তিনি অদ্ভুত দয়ারও আধার ছিলেন। রাজগৃহে ছাগগুলিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একবার এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য নিজ শরীরই দান করিয়াছিলেন। পাঁচশত বার পরার্থে জীবনবিসর্জ্জনের ফলে অল্পে অল্পে সেই পবিত্র দয়ারাশির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে বুদ্ধত্বপদবীতে আরোহণ করাইয়াছিল।

জনৈক যুবক, যাহাকে সে কখনও দেখে নাই এবং যাহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, এরূপ এক নায়িকার প্রতি গদ্গদকণ্ঠে নিজ প্রেম ব্যক্ত করিতেছে—ভগবান্ বুদ্ধ এই গল্পটী বলিয়া তৎপরে তাহার ঐ কষ্টকর অবস্থাকে মানবের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নানা উক্তির সহিত তুলনা করেন। এই ঘটনাটী হইতে, এত যুগের ব্যবধানেও, আমরা তাঁহার রসজ্ঞানের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। একমাত্র তিনিই ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গনরকাদি কল্পনা হইতে পৃথক্ করিতে পারিয়াছিলেন, অথচ উহাতে তাঁহার শক্তি এবং মানবহৃদয়ের উপর অধিকারের

কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র এবং সমসাময়িক লোকদিগের উপর উহার প্রভাবই ঐ সফলতার কারণ।

একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামিজী আমাদিগের কয়েক জনের জন্য বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার সহধর্ম্মিণী যশোধরার নিকট যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার একটী কাল্পনিক চিত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালকে আমি আর কখনও অমন জীবন্ত, চাক্ষুষ ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হইতে শুনি নাই। নিজে হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইহা খুব স্বাভাবিকই বোধ হইয়াছিল যে, বুদ্ধের ন্যায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তির "বিবাহ-সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের মত ধারণা" থাকিবে, এবং তিনি নির্ব্বন্ধসহকারে নিজেই নিজের পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও বাগ্‌দানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারটী স্বামিজী সাদরে বর্ণনা করিলেন। তৎপরে তিনি বিবাহের দীর্ঘকাল পরে উভয়ের দাম্পত্য-জীবনের এবং সেই বিখ্যাত বিদায়রজনীর বর্ণনা করিলেন। দেবতাগণ গাহিলেন, "জাগো, হে প্রবুদ্ধ! উঠ, এবং জগৎকে সাহায্য কর!" অমনি রাজপুত্রের মনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তিনি বার বার নিদ্রিত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে প্রত্যাগত হইলেন। "কোন্ সমস্যায় তাঁহার মন আন্দোলিত হইতেছিল? তিনি যে তাঁহার পত্নীকেই জগতের কল্যাণের জন্য বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন!—উহারই জন্য মনের মধ্যে সংগ্রাম! তিনি নিজের জন্য আদৌ ভাবিতেছিলেন না!"

তারপর তাঁহার জয়লাভ, এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ বিদায়গ্রহণ, এবং অতি সন্তর্পণে রাজপুত্রীর চরণচুম্বন—এত সন্তর্পণে যে, তিনি তাহাতে জাগরিতা হইলেন না—এ সকল বর্ণিত হইল। স্বামিজী বলিলেন, "তোমরা কি কখনও বীরগণের হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর নাই? উহা মহৎ, অতি মহৎ, সে মহত্ত্বের তুলনা নাই—তথাপি উহা আবার নবনীতের ন্যায় কোমল!"

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রাজপুত্র—এখন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার গমন-

দিবসাবধি যশোধরা তাঁহার স্ত্রীসুলভ উপায়ে স্বামীর ধর্ম্মজীবনের অনুবর্ত্তন করিয়া তথায়ই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কাষায় বসন, ভোজন শুধু ফল মূল এবং শয়ন অনাবৃত স্থানে ধরাশয্যায়। বুদ্ধ প্রবেশ করিলে যশোধরা প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিলেন। তখন ভগবানও তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে সত্য উপদেশ করিতে লাগিলেন।

উপদেশান্তে তিনি উদ্যানে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে যশোধরা চমকিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শীঘ্র তোমার পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে তোমার পিতৃধন যাচ্ঞা কর! বিলম্ব করিও না!"

তারপর শিশু যখন প্রশ্ন করিল, "মা, ইঁহাদের মধ্যে কে আমার পিতা?" তখন তিনি গর্ব্বভরে—"রাজপথ দিয়া যিনি সিংহের ন্যায় গমন করিতেছেন, উনিই তোমার পিতা!"—এতদ্ব্যতীত আর কিছুই উত্তর দিলেন না।

শাক্যবংশের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার তখন পিতার নিকট যাইয়া বলিল, "পিতঃ, আমাকে আমার পিতৃধন প্রদান করুন।"

তিনবার সে এইরূপ যাচ্ঞা করিলে বুদ্ধ আনন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাও উহাকে!" তখন একজন বালকের উপর গৈরিক-বস্ত্র ফেলিয়া দিল।

তারপর সেই প্রধান শিষ্য যশোধরাকে দেখিয়া এবং তিনিও স্বামীর নিকটে থাকিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে বলিলেন, "ভগবন্, স্ত্রীগণও এই সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারে কি? ইঁহাকেও কি আমরা গৈরিকবস্ত্র প্রদান করিব?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "জ্ঞানে কি কখনও লিঙ্গভেদ থাকিতে পারে? আমি কি কখনও বলিয়াছি যে স্ত্রীগণের এই সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার নাই? কিন্তু আনন্দ, ইহা তোমারই উপযুক্ত প্রশ্ন হইয়াছে!"

এইরূপে যশোধরাও শিষ্যত্বে পরিগৃহীত হইলেন। তারপর সেই সাত বৎসরের রুদ্ধ প্রেম ও করুণা সমস্ত জাতকগল্পাকারে প্রবাহিত

হইল! কারণ ঐগুলি সমস্ত যশোধরারই জন্য কথিত। পাঁচশতবার উভয়ের প্রত্যেকেই অহংভাবনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা উভয়ে একত্র চরম পূর্ণত্ব লাভ করিবেন।

"—এইরূপই হইয়াছিল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না! যশোধরা এবং সীতার পক্ষে, একশত বৎসর তাঁহাদের পতিব্রতা পরীক্ষার পর্য্যাপ্ত সময় নহে!"

একটু চুপ করিয়া আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তিকালে স্বামিজী আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "না, না—এস আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, এখনও আমাদের কাম ক্রোধাদি রহিয়াছে! এস, আমরা প্রত্যেকেই বলি—'আমি আদর্শ অবস্থায় উপনীত হই নাই!' কেহ যেন কখনও অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভগবান্ বুদ্ধের সহিত তুলনা করিবার সাহস না করে!"

আমাদের আচার্য্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজরাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার বৃহৎ মন্দিরের পুনরুদ্ধারকার্য্য সাধিত হইতেছিল,* এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই কার্য্যে যোগদান করায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোক ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ মাতিয়া উঠেন। আবার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার্ এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ইংরাজীভাষী দেশসমূহের সামান্য লেখাপড়া জানা সাধারণ লোকদিগের কল্পনাও বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। উক্ত পুস্তক অনেক স্থলে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' প্রায় অবিকল অনুবাদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামিজী কখনও অপরের মুখে শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন না, এবং এই বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন

* উক্ত বৃহৎ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খননকার্য্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রথম আরব্ধ হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার উহার ভার লয়েন, এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়।

নাই; অবশেষে তিনি ১৮৮৭খৃষ্টাব্দে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত একত্র শুধু 'ললিতবিস্তর' নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার বিখ্যাত গ্রন্থ মূল 'প্রজ্ঞাপারমিতা' * সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন †। তাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিই তাঁহাদিগকে পালিভাষা বুঝিতে সহায়তা করিল, কারণ, পালি সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত।' ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলী এবং 'লাইট অব এসিয়া' পাঠ স্বামিজীর জীবনের ক্ষণস্থায়ী ঘটনা মাত্র হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যের সদা অবহিত মনে তাঁহার শিষ্যত্বকালে এইরূপে যে বীজ উপ্ত হইল তাহা তাঁহার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পভারে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কারণ, ঐ সময়ে তাঁহার প্রথম কার্য্যই এই হইল যে, তিনি অবিলম্বে বুদ্ধগয়ায় গমন করিলেন এবং সেই মহাবৃক্ষের তলে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহা কি সম্ভব যে, তিনি যে বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস লইয়াছিলেন আমিও সেই বায়ুতেই শ্বাস প্রশ্বাস লইতেছি? তিনি যে মৃত্তিকার উপর বিচরণ করিয়াছিলেন, আমিও তাহারই উপর বিচরণ করিতেছি?"

তাঁহার জীবনের শেষভাগে—উনচত্বারিংশত্তম জন্মদিবসে প্রাতঃকালে তিনি আর একবার ঐরূপে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৺কাশী দর্শন করিয়া এই যাত্রার শেষ হয়। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ ভ্রমণ।

যে সময়ে স্বামিজী কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তাহারই কোন সময়ে তিনি বুদ্ধের ভস্মাবশেষ অস্থিসমূহ—সম্ভবতঃ যে স্থানে উহারা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেই স্থানেই—স্পর্শ করিতে পাইয়াছিলেন। তখন যে তিনি প্রবল ভক্তি ও

* যাহা বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়।

† এই দুইখানি পুস্তক তখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষ সম্পাদকতায় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য গ্রন্থের মূল পালির পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অক্ষরে ছিল।

নিঃসংশয়তার ভাবে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা পরে বহুবার ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন মাত্র তাঁহাতে উক্ত ভাবের কিছু কিছু প্রকাশ দেখিয়া আমরা একরূপ নিশ্চয় করিয়া লইতে পারি। কোন রমণী অবতারগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক; তিনি বলিয়াছিলেন, "বলিতে কি, যদি আমি ন্যাজারেথনিবাসী ঈশার সময়ে যুডিয়ায় বাস করিতাম, তাহা হইলে আমি অশ্রুধারায় নহে হৃদয়ের শোণিতে তাঁহার চরণযুগল ধৌত করিয়া দিতাম!"

একজন তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ঠিক না জানিয়া ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে বৌদ্ধ বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের দাসগণ, তাঁহাদের দাসগণ, তাঁহাদের দাস!"—তাঁহার বুদ্ধের প্রতি ভক্তি এরূপ প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁহার নিকট তন্মতে বিশ্বাসী হওয়াও যেন এক অতি উচ্চপদ—যেন তিনি উহারও উপযুক্ত নহেন।

বুদ্ধের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতাই শুধু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই। ঠিক ঐরূপ প্রধান আর একটী কারণ এই যে, তাঁহার গুরুদেবের জীবন—যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বের এই সর্ব্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের বহুশঃ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবান্ বুদ্ধের জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি ভগবান্ বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

একদিন বুদ্ধের দেহত্যাগের দৃশ্য বর্ণনকালে চকিতের ন্যায় তাঁহার মনের এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—এক বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য কম্বল বিছান হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দময় পুরুষ "সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া" মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। শিষ্যগণ লোকটীর ঐরূপ সময়ে প্রবেশ করা উচিত নহে জ্ঞান করিয়া, এবং তাঁহাদের প্রভুর মৃত্যুশয্যার নিকট কোনক্রমে গোলমাল হইতে দিবেন না সঙ্কল্প করিয়া, তাহাকে

তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদের কথোপকথন দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরাইয়া দিওনা! তথাগত সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন!" তখনই তিনি কনুইয়ের উপরে ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন। ঐরূপ চারিবার ঘটিল; তখন বুদ্ধ ভাবিলেন, "এখন আমি নিশ্চিন্তমনে মরিতে পারি।"—তাহার পূর্ব্বে নহে। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তিনি প্রথমে আনন্দকে ক্রন্দন করার জন্য তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, বুদ্ধ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটী উচ্চ অবস্থার নাম, এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ উহা লাভ করিতে পারেন। আর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত তিনি তাঁহাদিগকে কাহারও পূজা করিতে নিষেধ করিলেন।"

অমরকাহিনী ক্রমে সমাপ্ত হইল। কিন্তু যখন স্বামিজী বর্ণনা করিতে করিতে "কনুইয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন," এই স্থলটীতে আসিয়া একটু থামিলেন, এবং আনুষঙ্গিকরূপে বলিলেন, "দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমি উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি!" তখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক জনের নিকট এই অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা বহ্বর্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অমনি আমার মনের মধ্যে সেই ব্যক্তির কথা উদয় হইল—সেই আচার্য্যশ্রেষ্ঠের নিকট শিক্ষা লাভ যাঁহার ভাগ্যে ছিল। তিনি এক শত মাইল দূর হইতে আসিতেছিলেন, এবং যখন তিনি কাশীপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঠাকুরের অন্তিমকাল উপস্থিত।* এ ক্ষেত্রেও শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতেন না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আপনা হইতেই বলিলেন যে, আগন্তুককে আসিতে দেওয়া হউক, তিনি উহাকে উপদেশ দিবেন।

বৌদ্ধমতবাদের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থবত্তা সম্বন্ধে স্বামিজী সর্ব্বদাই গভীরভাবে মনে মনে আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে

* শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ঘোষের কাশীপুরস্থ উদ্যানে মহাসমাধি লাভ করেন।

হঠাৎ তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, তিনি যে ঐ বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন তাহা বুঝা যাইত। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ-সমূহ* হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—ইহারাই পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চতত্ত্ব। এগুলি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও একে অন্যের সহিত মিলিত হইতেছে। ইহারই নাম মায়া। কোন একটী বিশেষ তরঙ্গসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কারণ উহা এখন আর নাই। উহা ছিলমাত্র, এখন গত হইয়াছে। হে মানব, জানিও যে, তুমিই সাগরস্বরূপ!" তৎপরে আরও বলিলেন, "মহর্ষি কপিলও এই দর্শনই প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মহানুভব শিষ্যের (বুদ্ধের) অদ্ভুত হৃদয় উহাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।"

তার পর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কথাগুলি অন্তরের ভিতর ধ্বনিত হওয়ায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন। তৎপরে তাঁহার মানবাত্মার প্রতি অমর আদেশবাক্যের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট পন্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হও! কোন কিছু হইতে ভয় না পাইয়া, কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, তুমি গণ্ডারবৎ একাকী বিচরণ কর!

"সিংহ যেমন কোন শব্দে ভীত হয় না, বায়ু যেমন জালবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তুমিও সেইরূপ একাকী, গণ্ডারবৎ বিচরণ কর!"

(ক্রমশঃ)

* বিনয় পিটক, প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য

গল্পস্বল্প।

মাননীয় উদ্বোধন-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

দর্শনশাস্ত্রের কূটকচালে বিচারের প্রসঙ্গ হলেই প্রাণটা যেন আঁতকে ওঠে। মাসিকপত্রের পাতা উল্টে যদি গল্প পাই সেইটাই পড়ি—অন্য সব চাপা দিয়ে রাখি। 'উদ্বোধন' পত্রকে কি কারণে জানি না প্রাণের সহিত ভালবাসি, কিন্তু উহার পাতা ওল্টাতে গেলেই কেবল 'তত্ত্ব' আর 'তত্ত্ব'—পড়্‌তে পড়্‌তে মাথা টনটনিয়ে উঠে—রেখে দিতে হয়। বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকেরই আমার মত দশা। তাই মনে কর্‌লুম—আর কেউ ত উহাতে বড় গল্প লিখ্‌তে এগুচ্ছে না—আচ্ছা, আমি না হয় একবার বেয়ে চেয়ে দেখি, লিখ্‌তে পারি কি না। লেখ্‌বার চেষ্টা করে ত কিছু বেরুলো না। শেষে এই ঝোঁকে গোটাকতক সত্য ঘটনা জান্‌তে পার্‌লুম এবং আপাততঃ উদ্বোধন-পাঠকের খাদ্যস্বরূপে সেইগুলিই লিপিবদ্ধ করে দিলুম। ঘটনাগুলি বৈদেশিক এবং অনেকটা অলৌকিক গোছের। বোধ হয়, এই ছোট গল্পগুলি আপনার পাঠকদের নেহাত অরুচিকর হবে না। যদি ভাল লাগে বোঝেন, জানাবেন। আবার যোগাবার চেষ্টা করা যাবে; নইলে এইবারেই এই চেষ্টার ইতি। ইতি—

আপনার চিরপরিচিত

শ্রীগল্পপ্রিয় দেবশর্ম্মা।

"১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। আমাদের কলেজ বোর্ডিংএ আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে দিয়ে শুয়েছি। পূর্ব্বরাত্রে ঐরূপ সময়েই একটা ঘটনা হয়েছিল। শুয়ে রয়েছি—কে যেন এসে আমার হাতটা ধর্‌লে। ঘরে হঠাৎ কে ঢুক্‌লো মনে করে তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের চারদিক্ খুঁজতে আরম্ভ করলুম—কিন্তু

কোথাও কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না। পূর্ব্বরাত্রের সেই ঘটনার কথা বিছানায় শুয়ে ভাব্‌ছি। তখনও দিব্য জেগে রয়েছি। হঠাৎ বোধ কর্‌লুম, কি যেন আবার ঘরের ভিতর ঢুক্‌লো আর আমার বিছানার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। উহা বড় জোর এক মিনিট কি দু'মিনিট ছিল। আমি যে চক্ষু কর্ণ বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে উপলব্ধি করেছিলুম, তা নয়, কিন্তু যতক্ষণ উহা ছিল, ততক্ষণ যেন একটা ঘোর অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিলুম। দেখা শুনা প্রভৃতি সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আমাদের যতটা সুখ দুঃখ এনে দেয়, আমার এই অদ্ভুত অনুভূতির সময় তার চেয়ে আরও অধিকতর প্রবল অনুভূতি আমার হচ্ছিল—যেন আমার ভেতরটাকে একেবারে নাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছিল। বিশেষতঃ যেন বুকের ভিতর একটা প্রবল বেদনা জেগে উঠে বুকটাকে ছিড়ে ফেল্‌ছিল। কিন্তু যন্ত্রণা বল্‌লেও ঐ অনুভূতিটার যেন ঠিক ঠিক বর্ণনা করা হল না—বরং উহাকে একটা বিজাতীয় ঘৃণা বা বিরক্তি বলে বর্ণনা কর্‌লে যেন অধিকতর সঙ্গত হয়। যাই হক না কেন, একটা কিছু যে আমার কাছে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে চোখে প্রত্যক্ষ দেখে বরং সে দেখাটাকে ভুল বল্‌তে পারি, কিন্তু এই যে অনুভূতি, এ তার চেয়ে প্রত্যক্ষ—তার চেয়ে আরও স্পষ্ট আরও উজ্জ্বল। যেমন ঘরের ভিতর ঢুকেছিল অনুভব করেছিলুম—তেমনি যখন দরজার ভিতর দিয়ে চকিতের মত বেরিয়ে গেল, তখনও ঠিক সেই রকম স্পষ্ট অনুভব কর্‌লুম। আর উহা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ভয়ানক অস্বস্তি বোধটাও চলে গেল।

তার পরদিন রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আছি। আমার কয়েকটী বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, সেই সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌ছি। আবার পূর্ব্বরাত্রের মত ঘরে আমি ছাড়া আর একজনের অস্তিত্ব অনুভূত হল, কিন্তু ঐদিন আর কেউ ঘরে ঢুক্‌লো—এ রকম বোধ হল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোর অস্বস্তিকর ভাবটাও এলো। তখন আমি মনের

সমস্ত শক্তিটাকে একাগ্র করে মনে মনে সেইটের উদ্দেশে বল্‌তে লাগ্‌লুম—'যদি তুই মন্দ হস ত এখনই চলে যা; আর যদি ভাল হস, তবে তুই কেও্যা কি, তা বল্‌; আর যদি তোর নিজের পরিচয় দিবার শক্তি না থাকে, তা হলেও তুই চলে যা। আমি তোকে জোর করে বল্‌ছি, তুই চলে যা।' উহা পূর্ব্বরাত্রের মত চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহমনের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এলো।

আমার জীবনে আরও দুবার ঠিক ঐরূপ ঘটনা ঘটেছিল। একবার পুরো এক কোয়াটার ধরে ঐরূপ অনুভব হয়েছিল। এজগতের কোন লোক যদি আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত তাকে যতটা প্রত্যক্ষ, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল বোধ হতো, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলিতে একজন যেন আমার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এই বোধ তার চেয়েও প্রবল ছিল। উহা আমার খুব কাছে রয়েছে বলে বোধ কর্‌ছিলুম এবং যে সকল সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের হয়ে থাকে, তার চেয়েও বেশীরকম সত্য বলে অনুভব হয়েছিল। যদিও উহাকে আমারই মত সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ও দুঃখিত বলে বোধ করেছিলুম, কিন্তু উহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলে চিন্‌তে পারি নি।"

যাঁর এই উল্লিখিত অনুভূতিগুলি হয়েছিল, তিনি একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্‌ ও বিচক্ষণ লোক। সাধারণজনসুলভ কুসংস্কার তাঁর আদৌ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কি ব্যাখ্যা দিবেন? পাঠকবর্গ কি ইহাকে ভূত আখ্যা দিতে চান, না মনের কল্পনার তীব্রতা মাত্র? যদি এটীকে কল্পনা বলা যায়, তবে এই প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট ও অনুভূত জগৎটাই বা কল্পনা নয় কেন?" পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বর্ণনকর্ত্তাই তাঁর জীবনের আর কতকগুলি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন—ঐগুলি পূর্ব্বোক্ত অনুভূতিগুলিরই মত। পার্থক্য এই—প্রথমোক্ত অনুভূতি-গুলিতে দুঃখ ও ঘৃণার ভাব প্রবল, আর শেষোক্তগুলিতে ঠিক তাহার বিপরীত—উহাতে পরম আনন্দের ভাব জড়িত। পাঠক তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা শুনুন—

"অনুভব হলো কেউ যেন রয়েছে; শুধু তা নয় পরম মঙ্গলস্বরূপ, পরমানন্দময় কেউ যেন সামনে রয়েছেন। আর এ যে একটা অস্পষ্ট ভাসা ভাসা অনুভূতি তা নয়—কোন কবিতা পড়ে বা সুন্দর দৃশ্য দেখে বা সুগায়কের চিত্তহারী গান শুনে বা প্রাণমাতানি ফুলের গন্ধ শুঁকে হৃদয়ের ভিতর যেমন একটা আনন্দের ধারা বয়, এ ঠিক তা নয়। আমি নিশ্চিত জান্‌তে পার্‌ছি, কোন শক্তিমান্ পুরুষ আমার খুব নিকটে রয়েছেন। যখন চ'লে গেলেন, তখন তাঁর স্মৃতি রয়ে গেল—একটা সত্য বস্তুর যেরূপ স্মৃতি থাকে, এরও ঠিক সেই রকম স্মৃতিই রয়ে গেল। বোধ হল, জগতের অপর সকল বস্তু স্বপ্ন হতে পারে, কিন্তু উহা কখনই নহে।"

ইহাকে কি দেবদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন বলিবেন?

"আমি একখানি বই পড়্‌ছিলাম—প্রায় বিশ মিনিট পড়া হয়েছে—পাঠে একেবারে বেশ তন্ময় হয়ে গেছি—মনটা বেশ শান্ত, মনে অন্য কোন চিন্তা নাই—কোন বন্ধু বান্ধবের কথা তখন আদৌ মনে নাই—সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। এমন সময় হঠাৎ বোধ হল, আর একজন কেউ আমার ঘরে শুধু রয়েছে যে তা নয়, আমার খুব কাছে রয়েছে। যাঁরা কখন এরকম অনুভব করেন নাই, তাঁরা আমার এই অনুভূতি কতদূর প্রবল ও প্রগাঢ় রকমের হয়েছিল, সহজে কল্পনা কর্‌তে পার্‌বেন না। সমুদয় দেহমনটা যেন প্রবল অনুভূতিময় হয়ে উঠেছিল। বইখানা রেখে দিলুম। খুব একটা উত্তেজনার ভাব এসেছিল তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে মনের স্থৈর্য্য কিছুমাত্র হারাই নি—আর কোন রকম ভয়ের ভাবও আসে নি। আমি একখানি ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়্‌ছিলাম—সাম্‌নে আগুন জ্বল্‌ছিল—তার দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে ছিলুম। কিন্তু কি রকমে বল্‌তে পারি না—কিন্তু ঠিক জান্‌তে পার্‌লুম যে, আমার বন্ধু এ, এইচ। আমার বাম পার্শ্বে ঠিক পিছনে ও এত নিকটে যে, চেয়ারখানিই যেন মাঝখানে ব্যবধান। আমি শরীরটাকে না নেড়ে কেবল চোকটা সেই দিকে

ফেরালুম। একটা পায়ের নীচের অংশটা দেখ্‌তে পেলুম। তখন সে সদা সর্ব্বদা যে ধূসর নীলবর্ণের ইজের পোর্‌তো, তা চিন্‌তে পার্‌লুম। চুরুটের ধোঁয়া ক্রমাগত অবিচ্ছেদে উঠ্‌তে থাক্‌লে যে রকম দেখায়, ঠিক সেই রকম রং।"

* * * *

"ঘুমিয়েছিলুম, হঠাৎ জেগে উঠ্‌লুম। তখনও রাত বেশী হয় নি। বোধ হল, কেউ যেন আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জাগিয়ে দিলে। প্রথমটা ভাব্‌লুম, বুঝি বাড়ীতে চোর ঢুক্‌ছে। * * খানিকক্ষণ পরে পাশ ফিরে আবার ঘুমুবার চেষ্টা কর্‌লুম। কিন্তু তখনই মনে হল, কে যেন আমার ঘরে রয়েছে। আর আশ্চর্য্য ব্যাপার—কোন জীবিত ব্যক্তি রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না—যেন সূক্ষ্মশরীরী কেউ এসেছে। এ কথা শুনে আপনারা হেঁসে উঠ্‌তে পারেন, কিন্তু যা যা ঘটেছিল, আমি ঠিক ঠাক তাই আপনাদের কাছে বর্ণনা কর্‌ছি। আর কোন রকমে উহার বর্ণনা কর্‌তে পার্‌ছি না, কাযে কাযেই বল্‌ছি—বোধ হল যেন সূক্ষ্মশরীরী কেউ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গা-ছম্‌ছমানি এবং ভয়ও এলো। মনে হল, বুঝি কিছু ভয়ানক ও আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘট্‌বে।"

"বিশ থেকে ত্রিশ বৎসরের ভিতর আমি ক্রমশঃ বেশী বেশী অজ্ঞেয়বাদী ও ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হতে লাগ্‌লুম। কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার সমুদয় দৃশ্যজগতের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণ সত্যবস্তুর যে 'অস্পষ্ট অনুভূতির' কথা অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন, সেই অস্পষ্ট অনুভূতি যে আমি কোন কালে হারিয়েছি তা বল্‌তে পারি না। আমার কাছে ঐ সত্যটী যে হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনসঙ্গত খাঁটি একটা অজ্ঞেয় বস্তু—ঠিক তা ছিল না। কারণ, যদিও 'আমি ঈশ্বরের নিকট অজ্ঞ' শিশুজনোচিত প্রার্থনা ছেড়ে দিয়েছিলুম, আর ঐ 'তৎ' বস্তুর কাছে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে প্রার্থনা কখনই কর্‌তুম না, কিন্তু আমার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, ঐ 'তৎ'

বস্তুর সঙ্গে আমার একটা কোন রকম সম্বন্ধ ছিল —আর যাকে লোকে 'প্রার্থনা' বলে, নামে না হলেও কার্য্যতঃ উহা সেই জিনিষই ছিল যখনই কোন গোলমালে পড়্‌তুম, বিশেষতঃ পারিবারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে, যদি অপর লোকের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ হত অথবা যখন আমার মনের ভিতর নৈরাশ্যভাব আস্‌তো অথবা কোন বিষয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হতুম, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তখনই সান্ত্বনার জন্য—আশ্রয়লাভের জন্য—এই বিশ্বব্যাপী মূল 'তৎ' বস্তুর আশ্রয় নিতুম। অনুভব কর্‌তুম যেন ঐ 'তৎ' বস্তুটী সেই বিশেষ গোল-যোগের সময় আমার পক্ষে রয়েছে অথবা আমি তার দিকে রয়েছি। আর উহাতেই আমাকে সর্ব্বদা বল এনে দিত—উহাতে আমার ভিতর যেন একটা অনন্ত জীবনীশক্তি এনে দিত—উহার সত্তার উপলব্ধিতে আমি একটা দাঁড়াবার জায়গা—একটা আশ্রয়স্থল পেতুম। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন দুর্ব্বলতা আস্‌তো, তখনই আমি যেন সংস্কারবশে তার আশ্রয় নিতে ছুটতুম। আর সেই জীবন্ত, ন্যায়, সত্য ও বলের উৎসস্বরূপ 'তৎ' বস্তুটীর আশ্রয় লাভ থেকে কখনই বঞ্চিত হতুম না। এই 'তৎ' বস্তুর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল—এখন জান্‌ছি। কারণ, কিছুকাল হতে ইহার সহিত ভাব আদানপ্রদানের শক্তি আমার নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেই জন্য আমার জীবনে একটা স্পষ্ট ক্ষতি হয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখনই সেই 'তৎ'এর দিকে ফিরতুম—তখনই তাকে পেতুম। তার পর কয়েক বর্ষ এমন ভাবে কাট্‌লো যে, কখন কখন তাকে পেতুম আবার কখন বা একেবারেই তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌তে পারতুম না। স্মরণ হয়, বহু রাত্রি এমন কেটেছে যে বিছানায় শুয়ে নানান কষ্টে ও দুশ্চিন্তায় ঘুম আস্‌ছে না—অন্ধকারে এপাশ ওপাশ কর্‌ছি—মনে মনে হাতড়াচ্ছি—কোথায় আমার মনের ভিতর সেই উচ্চতর মন—যা আমি পূর্ব্বে সদা সর্ব্বদা অনুভব কর্‌তুম,, যা সদা সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থেকে আমাকে আশ্রয় দিত—কিন্তু তার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, তার বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন কে এখন

কেটে দিয়েছে। তখন সেই 'তৎ'এর বদলে শূন্য—কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এখন পঞ্চাশ বছর বয়সে উহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের শক্তি আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমার জীবনের একটা মহা সহায় আমি হারিয়েছি। একটা ঔদাসীন্যময় জীবন্ম,তভাব আমার এসেছে। আর এখন আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, গোঁড়ারা যাকে 'প্রার্থনা' নাম দেয়, আমার পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতাও সম্ভবতঃ ঠিক সেই একই জিনিষ ছিল। কেবল আমি তার 'প্রার্থনা' নামটী দিতুম না। আমি যাকে 'তৎ' আখ্যায় অভিহিত কর্‌লুম, তা ঠিক স্পেন্সারের অজ্ঞেয় বস্তু নয়, উহা আমার সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগত ঈশ্বর—যাঁর উপর আমি মানবসুলভ সহানুভূতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ সহানুভূতি লাভের ভরসা রাখ্‌তুম—আর যাঁকে আমি কি জানি কেন এখন হারিয়েছি।"

* * * *

"আমার সেই রাত্রিটীর কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আর শৈলশিখরের সেই স্থানটীর কথাও বেশ স্মরণ আছে। আমার আত্মা যেন বিকাশ পেয়ে সেই অনন্তস্বরূপে গিয়ে পড়্‌লো—অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ দুই জগৎই যখন পরস্পর পরস্পরের দিকে প্রবলবেগে ছুটে এসে মিলে গেল। আমার আত্মার গভীরতম প্রদেশ—সেই ভিতরের জিনিষ যা আমার ক্রমাগত চেষ্টা ও সাধনার ফলে খুলে গেছ্‌লো, তার আহ্বানে যেন বাহিরের সেই নক্ষত্রপুঞ্জেরও পারবর্ত্তী অসীম গভীর সাড়া দিলে। অনুভব কর্‌লুম—যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি জগতের সকল সৌন্দর্য্য, ভালবাসা, দুঃখ, এমন কি প্রলোভনেরও সৃষ্টি করেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে একলা দাঁড়িয়ে। অনুসন্ধানের চেষ্টা নাই—তাঁর সঙ্গে আমার আত্মার সম্পূর্ণ একত্ব অনুভব কর্‌লুম। সাম্‌নে যে সকল সাধারণ দৃশ্য ছিল, তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তের জন্য এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও উল্লাস ছাড়া আমার আর কোন ভাব রইল না। এই উপলব্ধিটী সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব। কতকটা এই বল্‌লে বোঝা যেতে পারে যে, যেন

ঐক্যতান বাদনের বিভিন্ন সুরগুলি সব এক সঙ্গে মিশে গেছে—শ্রোতা আর কিছু অনুভব করছে না। কেবল অনুভব করছে, তার আত্মা যেন ক্রমাগত ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর দিকে ছুটেছে—সে যেন নিজের ভাবে নিজে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতম নিশা যেন গম্ভীরতর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন ও চমকিত হতে লাগলো। সেই তমসার ভিতর একটা সত্তার অনুভব হতে লাগলো—তাকে চোকে দেখা যাচ্ছে না বলেই যেন অধিকতর উজ্জলভাবে অনুভব হতে লাগলো। আমি যেমন নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ করতে পারি না, তদ্রূপ তিনি যে সেখানে রয়েছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যো রইল না। বরং আমি আমাকে এই দুইএর মধ্যে যেন কম সত্য বলে বোধ করতে লাগলুম।

"তখন হতে ঈশ্বরসম্বন্ধে যথার্থতম ধারণা ও তাঁর প্রতি উচ্চতম বিশ্বাস আমার ভিতর জন্মালো। যে পর্ব্বতে আমার এই দর্শনলাভ হয়, তথায় তারপর অনেক বার গিয়ে দাঁড়িয়েছি—সেই অনন্তস্বরূপকেও আমার চতুর্দ্দিকে অনুভব করেছি, কিন্তু প্রথম দিনে যেরূপ হৃদয়ের প্রবল আবেগ অনুভব করেছিলুম, সেরূপ আর কখনও হয়নি। আমার বিশ্বাস, সেই দিন আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলুম—এবং সেই পরমাত্মার অনুপ্রাণনে নব জন্ম লাভ করেছিলুম। আমার স্মরণ হচ্ছে যে, আমার চিন্তা বা বিশ্বাসে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে নি—কেবল আমার প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরবিষয়ক অপরিপক্ক ধারণারূপ কুসুমকলি যেন ফুটে উঠে প্রস্ফুটিত কুসুমের আকার ধারণ করেছিল। পুরাতন যা ছিল তা নষ্ট হয় নি, কিন্তু সেইটীই যেন দ্রুত ও অদ্ভুতভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই সময় থেকে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন প্রকার তর্কবিতর্কই আমার বিশ্বাসকে বিচলিত করতে পারে নি। একবার পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে দীর্ঘকালের জন্য আমি কখন তাঁকে হারাই নি। আমার সেই সাক্ষাৎ দর্শন—সেই উচ্চতম অনুভবের স্মৃতি এবং যাঁরাই ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদেরও জীবনে এইরূপ কোন না কোন ঘটনা ঘটেছে—

অধ্যয়ন ও গভীর প্রণিধানলব্ধ এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমার ঈশ্বরবিশ্বাসের গভীরতম ভিত্তি। আমি জানি, ইহাকে যথার্থই 'রহস্যময়' (mystical) বলা যেতে পারে। আমার দার্শনিক জ্ঞান ততদূর নাই, যাতে উক্ত বা অন্য কোনরূপ' অভিযোগের ক্ষালন করে আমার এই অনুভূতির পক্ষে কিছু বল্‌তে পারি। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমি আমার অনুভূতির ব্যাপারটীকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারি নি, কেবল কতকগুলি কথার ঝুড়ি রচনা করেছি মাত্র। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, এখন আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা সতর্কতার সহিত উহার সঠিক বর্ণনা করেছি।"*

নীচে রচিত গ্রন্থাদির পরিচয়।

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আমরা নীচের কতকগুলি পুস্তকের পরিচয় প্রদান করিয়াছি—এইবার তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

The Genealogy of Morals গ্রন্থ—কতক পরিমাণে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ Beyond Good and Evil গ্রন্থের টীকাস্বরূপ লিখিত হয়। Beyond Good and Evil গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুইজারল্যাণ্ড দেশের একজন সমালোচক এক বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উক্ত সমালোচক বলেন যে—এই গ্রন্থ অরাজকতার (Anarchism) পৃষ্ঠপোষক। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থে ইউরোপের জাতিসকলের সংকীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে নীচে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছিলেন সেই সমস্ত

* লেখক মহাশয় এই গল্পগুলি প্রফেসর জেমসের 'Varieties of Religious Experience' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন—উঃ সঃ।

কথাই নির্দ্দেশ করিয়া নীচেকে অরাজকতার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নীচে এই সমালোচনাপাঠে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াই The Geneology of Morals গ্রন্থ লেখেন।

এই গ্রন্থে তিনটি প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রবন্ধে খৃষ্টান ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এক অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সন্দেহ নাই। নীচে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষের যা কিছু মহৎ, আদর্শ হওয়া উচিত, খৃষ্টান ধর্ম্ম ঠিক তাহার বিপরীত আদর্শ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিবেকের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। "বিবেক মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী"—এই প্রবন্ধে নীচে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মানুষ সাধারণতঃ কি উদ্দেশ্যে, এবং কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া নৈতিক আদর্শসমূহ সৃষ্টি করে, এবং বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত আদর্শের স্বরূপতঃ কোন মূল্য বা সার্থকতা আছে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের সূক্ষ্ম আলোচনা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় প্রবন্ধে মধ্যযুগের সন্ন্যাসের আদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। নীচের মতে সন্ন্যাসের আদর্শ মনুষ্য জাতিকে ক্রমশঃ অবনতির দিকে লইয়া যায়, এবং পরে এক মহাশূন্যের মধ্যে তাহার বিলোপ সাধন করে। তবে এই ক্রম-অবনতিশীল আদর্শ এক সময়ে যে এত প্রবল হইয়াছিল তাহার কারণ ইহা নয় যে—ঈশ্বরের শক্তি এই আদর্শের পশ্চাতে কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ, সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন আদর্শ তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। এবং নীচে বিশ্বাস করেন যে, Superman—অতিমানুষবাদ—এই আদর্শ মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হইবার পর সন্ন্যাসের আদর্শ আর মানুষকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হইবে না।

The Twilight of the Idols—মাত্র কয়েক দিনের পরিশ্রমে লিখিত হয়। নীচে বলেন, যদি কেহ আমার সময়ে বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে নৈতিক ও ধর্ম্মের আদর্শ প্রভৃতি কিরূপে ভ্রান্ত পথে ধাবিত

হইয়াছিল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন আমার The Twilight of the Idols গ্রন্থখানি পাঠ করেন।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও নীতির সেকেলে আদর্শসকল নীচের আবির্ভাবের পর হইতেই পালাইবার পথ পাইতেছে না।

নীচে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যেরূপ দাম্ভিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই অনেকে নীচের মানসিক অবস্থাসম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থসম্বন্ধেও তাঁহার আত্মপ্রশংসা সাধারণের চক্ষে আত্মম্ভরিতার নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থসম্বন্ধে বলিতে গিয়া নীচে বলিতেছেন যে, "সত্যের আদর্শ একমাত্র আমার কাছেই আছে; কেবলমাত্র একা আমিই ভালমন্দ বিচার করিতে সক্ষম। এতদিন পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা ক্রমশঃ অবনতির পথেই ধাবিত হইয়াছে—আমিই সর্ব্বপ্রথম তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, আমার পূর্ব্বে আর কেহই, সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য প্রকৃত উন্নতির পথ কি, তাহা জানিত না। কিন্তু এখন আর কোন ভাবনা নাই; কেননা মানুষের প্রকৃত উন্নতির পথ এখন আমি খুব পরিষ্কার রকমে মানচিত্র অঙ্কনের ন্যায় চিত্রিত করিয়া দিয়া গেলাম। মানুষের এই নূতন সভ্যতার আমিই হইতেছি সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।"

The Twilight of the Idols—গ্রন্থসম্বন্ধে এইরূপ মত নীচে যে পোষণ করিতেন, তাহা উক্ত গ্রন্থ লেখার দুই বৎসর পরে তিনি প্রকাশ করেন।

অপরকে আক্রমণ ও গালাগালি দিবার স্পৃহা এই গ্রন্থে অতিমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ জাতিকে এই গ্রন্থে বিশেষরূপে গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। কার্লাইল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কেহই বাদ যান নাই।

এই গ্রন্থ লেখা যে দিন শেষ হইয়াছে, ঠিক সেই দিনই নীচে

"An Attempted Transvaluation of all Values"—গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া যান। নীচের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যে সমস্ত আদর্শ (values) সাধারণতঃ সভ্যজগতে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল —নীচের বিশ্বাস যে তাহাতে ক্রমশঃ মনুষ্যসমাজের অবনতি হইতেছে। কাজেই তিনি সেই সমস্ত আদর্শকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এই গ্রন্থে একটা প্রয়াস করিয়াছেন। যাহা কিছু প্রচারিত, আচরিত বা প্রচলিত আছে—তাহাই যে একমাত্র সম্ভবপর সত্য আদর্শ বা বস্তু, নীচে তাহা বিশ্বাস করেন না। অনেক ভ্রান্ত আদর্শ—ধর্ম্ম ও নীতি, যাহা মনুষ্যসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতে উদ্যত তাহাও অবাধে, বিনা বিচারে ও পরীক্ষায়, মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত গৌরবের সহিত প্রচলিত আছে। নীচে সেই সমস্ত আদর্শের মস্তকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিবেন, যে গুলি দৃঢ় তাহারা টিকিবে, যেগুলি জীর্ণ—সেগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে।

The Case of Wagner গ্রন্থ—কেবলমাত্র ওয়েগনারের—ব্যক্তিগত বিশেষত্বসম্বন্ধে লেখা হয় নাই। ইহাতে সাধারণভাবে "A Musician's Problem"—সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সমস্যার বিশদ্ আলোচনা আছে। নীতির আদর্শে এবং ধর্ম্মের আদর্শে—নীচে খৃষ্টানী নিষেধাত্মক (Nay saying) আদেশ বা Commandments কে যেরূপ ঝাঁটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে Yea-saying আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন—সাধারণভাবে আর্ট—এবং বিশেষভাবে সঙ্গীতসমাজেও নীচে সেইরূপ একটা সংস্কারের কথা বলিয়াছেন। নীচের বিশ্বাস যে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতও নিষেধাত্মক (Nay-Saying) আদর্শ দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছে। এবং ইহারও সংস্কার প্রয়োজন।

সঙ্গীতসম্বন্ধে বলিতে গিয়াই ওয়েগনারের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অথবা ওয়েগনারকে উপলক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থে নীচে তাঁহার সঙ্গীতসম্বন্ধে সংস্কারের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নীচে বলিতেছেন—"আমি একজন বহু যুদ্ধের ফেরতা সৈনিক—আমি কি ইচ্ছা করিলে আমার এই বন্দুক ওয়েগনারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে পারি না? কিন্তু ওয়েগনার ও আমার মধ্যে যাহা কিছু হইয়াছে—তাহা আমি বাহিরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি যে ওয়েগনারকে ভালবাসিয়াছি (I have loved Wagner !") আশ্চর্য্য! ওয়েগনার ও নীচের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল—যে অমানিশার অন্ধকার, যে অশনিগর্জ্জন আমাদিগকে ব্যথিত, ভীত, ও বিস্মিত করিয়া আসিয়াছে—তাহার মধ্য হইতে নীচের কণ্ঠে এই দৃঢ় স্থির মনুষ্যোচিত বাণী—বিশেষতঃ একেবারে উন্মাদ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই—স্বতঃই নীচের জন্য আমাদের চক্ষুকে বাষ্পার্দ্র করিয়া তুলে! নীচে যে শেষ পর্য্যন্ত বলিতে পারিয়াছেন; ওয়েগনারকে আমি ভালবাসিয়াছি, ইহাই তাঁহার সমস্ত তীব্র উক্তির তলদেশে একটি মহান্ ও গভীর মনুষ্য-হৃদয়ের পরিচয়।

এই গ্রন্থসম্বন্ধে নীচে তাঁহার নিজের মত ব্যক্ত করিতে যাইয়া সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে এমন ভাবে গালাগালি দিয়াছেন যে, আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। নীচের মতে গত চারিশত বৎসরের মধ্যে সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বড় বড় পাপ করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই জার্ম্মাণেরা করিয়াছে। [Every great crime against culture for the last four centuries lies on their (the Germans') conscience].

The Antichrist নামক যে গ্রন্থ আমরা পাই, তাহাকে একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। নীচে আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে একখানি বৃহৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থে তাঁহার সমস্ত প্রধান প্রধান মতগুলি সন্নিবেশিত করিয়া তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তাহা তিনি কখনই পারিয়া উঠেন নাই। তাঁহার মন্দ স্বাস্থ্য বা তাঁহার স্বভাব বা কবিপ্রতিভা কি ইহার অন্তরায় ছিল, কে বলিবে? মানসকল্পিত এইরূপ একখানি সম্পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম ভাগ হইতেছে, The Antichrist। বলা বাহুল্য যে ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় বা অন্য কোন

ভাগই আর বাহির হয় নাই। এইগ্রন্থে নীচে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ধর্ম্মেই ত্রুটি আছে, কিন্তু নীচের মতে খৃষ্টান ধর্ম্মের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কেননা ইহার অনুষ্ঠান ও আদেশ, যাহাতে জীবনের বিকাশ হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। খৃষ্টান ধর্ম্ম মনুষ্যজীবনের বিকাশবিরোধী। আর নীচের দর্শন মনুষ্যজীবনের বিকাশপ্রার্থী। কাজেই খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ আপোষ নীচের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হয় নীচে নয় খৃষ্ট—এক সঙ্গে দুই একেবারে অসম্ভব।

The Will to Power—গ্রন্থও একখানি বৃহদাকারের সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিবার কল্পনা ও প্রয়াস হইতে লিখিত হয়। নীচের অপরাপর দুএকখানি গ্রন্থ যেরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে, কোন কোনটা বা দুচার সপ্তাহের মধ্যেই লেখা আরব্ধ ও শেষ হইয়াছে, এ গ্রন্থখানি কিন্তু সেরূপ হয় নাই। দীর্ঘ ছয়টি বৎসর ধরিয়া নীচে এই গ্রন্থখানির বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। ১৮৮৩—৮৯ এই ছয় বৎসরেও নীচে এই গ্রন্থখানিকে তাঁহার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না।

এই গ্রন্থের প্রধান জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, মনুষ্যজীবনের মূল এবং প্রকৃতিগত লক্ষ্য কি? উত্তর হইতেছে—The Will to Power—শক্তির অর্জ্জন বা উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা। নীচের পূর্ব্বে দার্শনিক জগতে মনুষ্যজীবনের প্রকৃতিগত লক্ষ্যের বিষয় বলিতে গিয়া যাহারা উক্ত প্রকৃতিগত লক্ষ্যকে Struggle for Existence বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, নীচে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, জীবনের লক্ষ্য Struggle for Existence নয়, জীবনের লক্ষ্য হইতেছে—The Will to Power। শুধু কোন রকমে কায়-ক্লেশে জীবন-সংগ্রামের মধ্যে টিকিয়া থাকা—ইহা জীবনের প্রকৃতিও নয়, লক্ষ্যও নয়। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির উদ্বোধন ও অর্জ্জন, নব নব শক্তির উন্মেষ ও একনিষ্ঠ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে জীবনে তাহা আয়ত্ত করা—ইহাই হইতেছে মনুষ্যজীবনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য। এবং নীচে এই নূতন মতবাদের আবিষ্কারক।

এই গ্রন্থের উপরোল্লিখিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি ব্যতিরেকে আরও অনেক সমস্যার অবতারণা ও তাহার সম্পূরণের চেষ্টা ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে সমাজিক সাম্যবাদকে (Socialism) মূর্খ এবং ছোট লোকের অত্যাচার (The tyranny of the meanest and the most brainless) বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মকে অক্ষম ও দুর্ব্বলের ধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে, মিল ও স্পেন্সারের দর্শনকে অর্ব্বাচীনের দর্শন বলিয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে। জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ও সুপ্রজনন বিদ্যা (Eugenics) সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত মতবাদ হইতে অল্লাধিক নূতন ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ মতবাদের অবতারণাও এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মোটের উপর এই গ্রন্থে নীচে মানবজীবনের প্রকৃতিগত লক্ষ্য যে The will to power—তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং যে সমস্ত মনুষ্য দৃঢ় ইচ্ছার প্রয়োগে জীবনে এই শক্তির বোধন করিতে অগ্রসর হইবেন,তাঁহারা অবশ্যই—খৃষ্টান ধর্ম্ম, বর্ত্তমান সামাজিক সাম্যবাদ (socialism), মিল স্পেন্সারের মেকী দর্শন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নীচের পথে চলিবেন। এবং সেই will to power এর পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে Superman বা অতি-মানুষবাদে গিয়া সম্ভবতঃ একদিন উপনীত হইবেন।

Ecce Homo—নীচের শেষ গ্রন্থ। ইহা নীচের আত্ম-জীবনী। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই বইখানি লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার পর নীচে সম্পূর্ণ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আর কোন গ্রন্থ লিখিতে পারেন না।

এই গ্রন্থপাঠে প্রায় অধিকাংশ পণ্ডিতই স্থির করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ মানসিক বিকারের অবস্থায় লিখিত হয়।

নিশ্চয়ই এই গ্রন্থের উক্তিতে যুক্তিতে, আত্মম্ভরিতায় এমন কিছু প্রকাশ পায়, যাহা সাধারণভাবে যাহাদের সুস্থ বলা হয়, তাহাদের পক্ষে অশোভনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু নীচে কোন্ গ্রন্থে এবং কোন কালেই বা সাধারণতঃ সুস্থ মানুষের মত লিখিয়াছেন

বা জীবনধারণ করিয়াছেন? নীচের আত্মম্ভরিতা ও সাধারণ মানুষের আত্মম্ভরিতাকে আমি এক বস্তু মনে করিতে পারি না। কেননা বিনয় ও দীনতা সাধারণ মানুষের নীতির আদর্শ, অবিনয়ী হওয়া, আত্মগুরি হওয়া তাহাদের পক্ষে মহা অন্যায়। কিন্তু বিনয়, দীনতা প্রভৃতিকে যে মনুষ্য ভ্রান্ত নৈতিক আদর্শ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজীবন প্রয়াসী, তাঁহার পক্ষে বিনয়ী হওয়ার মত অপরাধ ও অন্যায় আর কি হইতে পারে? মোটের উপর Ecce Homo গ্রন্থকে যাহারা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করেন,—আমরা তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে প্রস্তুত নই।

এই গ্রন্থে নীচে তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে এবং তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীকে মাত্র তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছেন যে, ঠিক এই বৎসরেই কি করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন—ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়! মানসিক বিকার ও অসুস্থতাই যদি Ecce Homo গ্রন্থরচনার প্রেরক হয়, তবে সাধারণ মানুষের মানসিক বিকার মনুষ্যজাতির জন্য ও সভ্যতার উন্নতির জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির অদ্ভুত নামকরণ দেখিয়াই অনেক পল্লবগ্রাহী গুঞ্জনপ্রিয় পাঠক দূর হইতে নাক সিঁটকাইয়াই মুখ ফিরাইতে পারেন এমন আশঙ্কা হয়। কেননা ইহার অধ্যায়গুলির নাম হইতেছে—

(১) কেন আমি এত জ্ঞানী (Why I am So Wise)?

(২) কেন আমি এত চতুর (Why I am So Clever)?

(৩) কেন আমি এত উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম হইলাম (Why I write such Excellent Books)?

(৪) কেন আমি এত বিপজ্জনক (Why I am a Fatality)?

নিজের সম্বন্ধে নীচের যে একটা অতি পরিষ্কার রকমের আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান ছিল, মানুষ তাঁহাকে যাহা ভাবিতে পারে, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারিতেন,— Ecce Homo গ্রন্থ পাঠে আমাদের সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে।

বুদ্ধবাণী

আসন-প্রসঙ্গ।

(পালি হইতে)

(শ্রীগোকুলদাস দে, বি, এ)

ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারার্থ দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে কোশলরাজ্যে সঙ্ঘসহ আগমন করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিমহিমা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্হৎ, সম্যক্-সম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচার-সম্পন্ন, লোকজ্ঞ, পুরুষসিংহ, দুষ্টের দমনকর্ত্তা, পাপত্রাতা এবং দেব ও মানবের অধীশ্বর—ভগবান্ বুদ্ধ আবালবৃদ্ধ-বণিতার পূজনীয় হইয়াছেন। তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া—সাক্ষাৎ সত্য উপলব্ধি করিয়া—দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যলোকে বিশেষতঃ শ্রমণ, ব্রাহ্মণদিগের ভিতর জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন, ইহা সকলেই জানিতেন। তাঁহার ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্তই কল্যাণময়। যেহেতু একমাত্র অনাবিল ব্রহ্মচর্য্য সাধনই তাঁহার ধর্ম্মের এবং যুক্তি ও ব্যাখ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, তত্রস্থ অধিবাসিগণ তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই আগ্রহের সহিত তাঁহার দর্শনমানসে ব্যাকুল হইয়া ছুটিত। এমন কি, তাঁহার ধর্ম্মের প্রতিবাদী ব্রাহ্মণগণও কেবল তাঁহার সেই অভীঃবাণী-নিঃসারী প্রেমময় বৈরাগ্যমূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে আগমন করিতেন এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার

চরণে প্রণত হইতেন। তাঁহার মিষ্ট আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া অবশেষে কেহ কেহ বা তাঁহার ধর্ম্মও গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে তিনি কোশলরাজ্যের অন্তর্গত বৈণাকপুরে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহা ব্রাহ্মণগ্রাম বলিয়াই অভিহিত হইত। অচিরে তথাগতের আগমন-সংবাদ গ্রামমধ্যে ঘোষিত হইল। দর্শনপিপাসু লোক দলে দলে ভগবানের নিকট আসিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বৈণাকপুর-নিবাসী ব্রাহ্মণগণও আগমন করিতে লাগিলেন। সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী ভগবান্‌কে অভিবাদন করতঃ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী আসন গ্রহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তন্মণ্ডলী মধ্যস্থ 'বচ্ছগোত্ত'নামক এক ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এই বাক্যগুলি বলিলেন—

"হে গোতম, আমরা আপনার এতাদৃশ শুদ্ধাবস্থা দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আপনার কান্তি অতীব সুশ্রী ও প্রভাময়। ধনী ও রাজন্যবর্গ সেবিত বলিয়া আপনি নিশ্চয়ই এই সকল মহামূল্য আসন ও শয্যাগুলি অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। যথা (১) আসন্দি, (২) পল্লঙ্ক, (৩) গোনক, (৪) চিত্তকা, (৫) পটীকা, (৬) পটলিকা, (৭) তুলিকা, (৮) বিকতিকা, (৯) উদ্দলোমী, (১০) একন্তলোমী, (১১) কট্টিস্সং, (১২) কোসেয্যং, (১৩) কুত্তকং, (১৪) হত্থত্থরং, (১৫) অস্সত্থরং, (১৬) রথত্থরং, (১৭) অজিনপ্পবেণি, (১৮) কদলিমিগপবরপচ্চত্থরণং (১৯) সউত্তরচ্ছদং এবং (২০) উভতলোহিত কুপধানং।*

*(১) একরূপ দীর্ঘ আরামপ্রদ কাষ্ঠাসন (২) সাধারণ খাট বা পর্য্যঙ্ক (৩) মেষরোম-প্রস্তুত আস্তরণ (৪) বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট পশমী আস্তরণ (৫) শ্বেত পশমী বস্ত্র (৬) পুষ্পাঙ্কিত পশমী আস্তরণ (৭) একপ্রকার মূল্যবান শয্যা (৮) সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি চিত্রাঙ্কিত পশমী আস্তরণ (৯) উভয়পার্শ্বে লেশযুক্ত পশমী আস্তরণ (১০) একপ্রান্তে লেশযুক্ত পশমী বস্ত্র (১১) একপ্রকার নানারত্ন-মণ্ডিত রেশমী বস্ত্র (১২) রেশমী বস্ত্র (১৩) পশমী আস্তরণ (১৪) হস্তীর আস্তরণ (১৫) অশ্বের আস্তরণ (১৬) রথের আস্তরণ (১৭) মৃগচর্ম্ম-নির্ম্মিত কম্বল (১৮) কদলিমৃগের আস্তরণ (১৯) মূল্যবান আচ্ছাদনযুক্ত শয্যা (২০) উভয়প্রান্ত লোহিত এইরূপ উপাধান।

তচ্ছ্রবণে ভগবান্ ব্রাহ্মণকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন—

"হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে সকল আসনের উল্লেখ করিলে তাহা প্রব্রজ্যা-অবলম্বনকারীদিগের অযোগ্য এবং লভ্য হইলেও তাহারা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

"কিন্তু আমার তিনপ্রকার আসন অনায়াসে অধিগম্য হইয়াছে, তাহাদের কথা তোমাদিগকে বলিব। যে তিনটী আসন মহাপুরুষগণ উচ্চাবস্থায় প্রাপ্ত হন, তাহা দিব্য, ব্রহ্ম এবং আর্য্যাসন।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, তাহাদের মধ্যে দিব্যাসন কিরূপ?"

ভগবান্ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, কোন গ্রাম কিম্বা নগরের নিকট অবস্থান করিবার কালে আমি পূর্ব্বাহ্ণে পাত্রচীর ধারণ করিয়া ভিক্ষুবেশে সেই গ্রাম কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থ গমন করি। তথায় আহারাদির পর পুনরায় সেই বনপ্রদেশে ফিরিয়া আসি এবং অরণ্যের অনায়াসলব্ধ তৃণ কিম্বা পর্ণ একত্র করিয়া আসন প্রস্তুত করি। তৎপরে দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া এবং স্মৃতি জাগ্রৎ রাখিয়া তদুপরি মুক্ত-পদ্মাসনে আসীন হই। অনন্তর ধ্যানস্থ হইয়া কামাদি সর্ব্ববিধ গুণবিবর্জ্জিত বিবেকজনিত বিতর্ক ও বিচার-প্রসূত আনন্দসম্পন্ন প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হই। তৎপরে বিতর্ক এবং বিচার নিবৃত্ত হইলে অবিতর্ক অবিচারসমাধি-সমুৎপন্ন চিত্তের স্থিরতা দ্বারা অন্তরে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দকর—দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হই। তৎপরে রাগ ও দ্বেষ উভয়কে উপেক্ষা করিয়া দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াই সেই আর্য্যগণ-কথিত আত্মপ্রসাদ-সম্ভূত উপেক্ষাযুক্ত জ্ঞানময় ও পরমসুখকর অবস্থা—তৃতীয় ধ্যান লাভ করি। তৎপর মানসিক সুখদুঃখের পূর্ব্ব হইতেই অবসান হওয়ায় উপেক্ষা-সহায়ে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সুখদুঃখের বোধনাশক শুদ্ধ জ্ঞানময় অবস্থা—চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হই। হে ব্রাহ্মণ এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়া যদি আমি পাদচারণ করি, তাহাকে দিব্যপাদচারণ কহিয়া থাকে। দণ্ডায়মান থাকিলে তাহাকে দিব্যস্থান বলে। উপবেশন

করিলে তাহাকে দিব্যাসন বলে এবং শয়ন করিলে তাহাকে দিব্য-শয়ন বলে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ উচ্চ এবং মহান্ দিব্যশয্যা এবং আসন আমার অক্লেশে অধিগম্য হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে গৌতম, ইহা বাস্তবিকই অতীব আশ্চর্য্যকর! আপনি ব্যতীত এইরূপ দিব্যাসন আর কেহ লাভ করিতে সমর্থ নহে।" অতঃপর ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, ব্রহ্মাসন কিরূপ?"

ভগবান্ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বের ন্যায়—গ্রাম কিম্বা নগরোপকণ্ঠে অবস্থান করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণের পর বনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তৃণ কিম্বা পর্ণ দ্বারা আসন রচনা করিয়া তদুপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হই। অতঃপর হৃদয়, মন মিত্রভাবে পূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক এবং অধঃ ঊর্দ্ধে সেই ভাব সঞ্চারিত করি। এইরূপে বিপুল, মহান্, অপ্রমেয়, অবৈর, অব্যাপাদ (দ্বেষরহিত) ও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা সর্ব্বদিক স্পন্দিত করি।

"এইরূপে চিত্তকে করুণা, হর্ষ ও উপেক্ষা দ্বারা পূর্ণ করিয়া অধঃ, ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দিকে সেই ভাবসকল সঞ্চারিত করিয়া দিই। এইরূপে বিপুল, মহান্, অপ্রমেয়, অবৈর, অব্যাপাদ, করুণা, হর্ষ ও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা সর্ব্বদিক স্পন্দিত করি। তখন প্রেমপূর্ণ ও দ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া বিচরণ করিলে তাহাকে ব্রহ্মপাদচারণ, দণ্ডায়মান থাকিলে ব্রহ্মস্থান এবং শয়ন করিলে ব্রহ্মশয়ন বলিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ ব্রহ্মাসন আমার অক্লেশে অধিগম্য হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে গৌতম, ইহা অতীব আশ্চর্য্যকর! আপনি ব্যতীত আর কেহ এইরূপ ব্রহ্মাসন লাভ করিতে সমর্থ নহে। হে গৌতম, আর্য্যাসন কিরূপ?"

ভগবান্ কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তৃণ ও পর্ণ সংগ্রহ করিয়া একান্তে মুক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট হই এবং দেহকে ঋজুভাবে রাখিয়া এইরূপ ধারণা করি যে, আমার রাগ, দ্বেষ ও মোহ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহারা দাবদগ্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত

হইয়াছে; তাহারা আর পুনরায় জন্ম লাভ করিবে না—এইরূপ ধারণা করিয়া বিচরণ, দণ্ডায়মান, উপবেশন বা শয়ন করিলে তাহাকে যথাক্রমে আর্য্য বিচরণ, স্থান, আসন ও শয়ন কহিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ আর্য্যাসন আমার অক্লেশে অধিগম্য হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "হে গৌতম, আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি! আপনি ব্যতীত কেহ এইরূপ আসন বিনা পরিশ্রমে লাভ করিতে পারে না। হে গৌতম, আপনার বাণী অতীব সুন্দর—ইহা মূঢ়কে সত্যপথ প্রদর্শন করে। আমরা আপনার এবং ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলাম। অদ্য হইতে আমাদিগকে আপনার শরণাগত ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

এইরূপে ভগবানের শরণ লইয়া সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে বন্দনাপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীকদর্শন] [প্লেটো সম্প্রদায়

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্লেটো-দর্শনের আলোচনায় অবগত হইয়াছি, মূল সৎপদার্থ এক এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ—এই প্রতীয়মান বিশ্বজগৎ তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া বা বিকাশমাত্র। তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় এই মূল সত্যকে কিন্তু একই ভাবে গ্রহণ করেন নাই। ফলে তিনটী অথবা কাহারও মতে পাঁচটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি, অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়ে প্লেটো শিষ্য-

দিগকে শিক্ষাদান করিতেন। সম্প্রদায়বিভাগের সহিত সেই বিদ্যালয়ের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়, পুরাতন (Old), মধ্য (Middle) ও নূতন (New) অ্যাকাডেমি। প্লেটোর ভাগিনেয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus) প্রথমটীর নেতা ছিলেন। তাঁর মতে যাবতীয় পদার্থ সেই মূলপদার্থের বিকাশ বা প্রতিচ্ছায়া বটে কিন্তু সেই মূলপদার্থ কালতঃ শেষ পদার্থ। কথাটী উদাহরণসাহায্যে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক— ভিন্ন ভিন্ন সুবর্ণ-খণ্ড ও সুবর্ণ বলয়ের মধ্যে সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এক খণ্ড সুবর্ণ হইতে সুবর্ণবলয় সুন্দরতর পদার্থ; পরন্তু সুবর্ণবলয় সুবর্ণ হইতে প্রস্তুত হওয়ায় কালতঃ পরবর্ত্তী। সুবর্ণখণ্ড সুবর্ণবলয়ের সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, কতকাংশে করে, সেই হিসাবে সুবর্ণখণ্ডকে সুবর্ণবলয়ের প্রতিচ্ছায়া বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এইরূপ যুক্তির দ্বারাই স্পিউসিপ্পাসের সিদ্ধান্ত "সৌন্দর্য্যস্বরূপ বা কল্যাণস্বরূপ যাবতীয় সুন্দর পদার্থের মূল হইলেও, কালতঃ সকলের পরবর্ত্তী" প্রতিপন্ন হয়। এরিষ্টটলের দর্শন আলোচনাকালে এই মতের ফলাফল আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে সমর্থ হইব। স্পিউসিপ্পাসের মতে প্রকৃতির অনুকূল জীবন যাপনই সুখের একমাত্র উপায়। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে, প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণ করিলে শাস্তিভোগ অবশ্যম্ভাবী—কঠিন নির্ম্মমভাবে যথোচিত দণ্ড দিতে তিনি সর্ব্বত্র সততই বিরাজ করিতেছেন। এই 'প্রকৃতি' বলিতে কি মানুষের সহজজ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধিকে বুঝাইতেছে না?

স্পিউসিপ্পাসের পর জেনোক্রেটিস (Xenocrates) পুরাতন অ্যাকাডেমির কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর মত পিথাগুরুর (Pythagoras) মতানুযায়ী; পরন্তু তিনি সংখ্যা ও ভাবপদার্থকে অভিন্ন মনে করিতেন—এটী প্লেটোর শিক্ষার ফল, সেকথা বলাই বাহুল্য। মূল 'এক' সংখ্যা হইতেই 'অসংখ্য' সংখ্যার উৎপত্তি হয়। 'একে'র পুনরুক্তিই 'দুই'য়ের সৃষ্টি করে। 'এক'কে বাদ

দিলে 'দুই'য়ের অস্তিত্বই নাই।—এবম্বিধ যুক্তির সাহায্যে তাঁহার মত কতকটা বুঝা যায়। পিথাগুরুর মতে পদার্থের সহিত 'সংখ্যার' অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উহা ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সে কথা এস্থলে মনে রাখিলে জেনোক্রেটিসের মত সহজেই বুঝা যাইবে। এস্থলে আমরা সে বিষয়ে অধিক কথার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁর মতে ধর্ম্মজ্ঞানলাভ ও ধর্ম্মানুচরণশক্তি বিনা, মানব কখনও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

জেনোক্রেটিসের পর হেরাক্লাইডাস (Heraclides) পুরাতন অ্যাকাডেমির শিক্ষা ভার প্রাপ্ত হন। তিনি জ্যোতিষবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ফলে নূতন কোন তথ্য প্রচার হওয়ার কথা আমরা অবগত নহি। সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হয় পশ্চিমে অস্ত যায়—কিন্তু সূর্য্য স্থির রহিয়াছে, পৃথিবীই আপনার মেরুদণ্ডের উপর বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে—এই বৈজ্ঞানিক সত্যসিদ্ধান্তে বহুকাল পূর্ব্বে উপনীত হইয়া হেরাক্লাইডিস চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

পুরাতন অ্যাকাডেমির শিক্ষাগুরুর মধ্যে ফিলিপ (Philip), হারমোডোরাস (Hermodorus), পলিমো (Polemo), ক্রটার (Crautor), ও ক্রেটীসের (Crates) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা নূতন কোন মত প্রচার করেন নাই—প্লেটোর দার্শনিক মতের বিস্তার করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল।

মধ্য সম্প্রদায়ের (Middle Academy) অন্তর্গত আবার দুটী শাখা সম্প্রদায়ের উল্লেখ শুনা যায়। একটীর নেতা আরসেসিলাস (Arcesilas) (৩১৫—২৪১ খৃঃ পূঃ), এবং কারনিডিস (Carneades) (২১৪-১২৯ খৃঃ পূঃ) অপর সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। এই সম্প্রদায়ের নূতন কোন মতামত স্থাপন করা উদ্দেশ্য ছিল না—প্লেটোর দার্শনিক মতামতের বিচার ও সন্দেহ উত্থাপন করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ফলে সন্দেহবাদের উদয় হইয়াছিল।

নূতন সম্প্রদায়ের (New Academy) অন্তর্গতও দুটী শাখা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। প্রথমটীর স্থাপয়িতা ফিলো (Philo) নীতিশাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। আমাদের মনে হয় ষ্টোয়িক (Stoic) সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্থাপনের সূচনা তিনিই করিয়া যান। ফিলোর পরে তাঁহার শিষ্য এন্টিয়োকাস (Antiochus) দ্বিতীয় শাখা স্থাপন করেন। ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের মত প্লেটো-দর্শনের অন্তর্ভুর্ত—এই কথা প্রমাণ করাই তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা কালে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদানে প্রয়াসী হইব। অতঃপর এরিষ্টটলের দর্শনালোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

এরিষ্টটল।

কোন দার্শনিকের মতামত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার জীবনী ও তৎপ্রণীত গ্রন্থের সাহায্যে সেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া, আমরা এস্থলে প্রথমে ঐ দুইটী বিষয়ে অল্পবিস্তর কথার অবতারণা করিতে প্রয়াসী হইলাম।

থ্রেস (Thrace) দেশে ষ্ট্যাগিরা (Stagira or Stageron) নগরে আন্দাজ ৩৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দর্শনশাস্ত্রের স্থাপয়িতা মহামতি এরিষ্টটল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে। আন্দাজ ৩৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি দার্শনিক গুরু প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও প্রায় বিশ বৎসর কাল যাবৎ তদধীনে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষালাভ কালে স্বীয় গুরুর সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে প্রীতির সূত্র কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং তদ্বিরুদ্ধে যে সকল উপকথা শুনা যায় তাহা অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাজ্য। এ স্থলে সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গুরুর অন্তর্দ্ধানের পর জেনোক্রেটিসের সহিত তিনি সিসিয়া দেশের অন্তর্গত আটারনিয়াস (Atarneus) ও আসন (Ason) দেশের

রাজা হারমিয়াসের রাজদরবারে গমন করেন। সেখানে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া মিটিলিনে (Mytylene) ও পরে ম্যাসিডোনিয়ার (Macedonia) রাজা ফিলিপের (Philip) রাজদরবারে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি প্রায় সাত বৎসর বাস করেন, এবং তৎকালে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শবর্ষের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। আলেকজান্দারের রাজ্যাভিষেকের পর এরিষ্টটল এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও লিসিয়ামে (Lyceum) বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এস্থলে মনে রাখা দরকার, প্লেটোর 'ভাবজগৎ' প্রথমে এরিষ্টটলের নিকট একটী কল্পিত জগৎ বলিয়া মনে হইয়াছিল। বাস্তবজগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া প্রথমে তিনি একপ্রকার দুষ্কর মনে করিয়াছিলেন; এবং আলেকজান্দারের পক্ষে ভাবপদার্থের চিন্তা বা ভাবজগতের পর্য্যালোচনা অপেক্ষা কার্য্যকরী-বিদ্যা সমধিক আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আলেকজান্দারকে তদনুরূপ শিক্ষাপ্রদান করেন। লিসিয়ামে নিজ শিষ্যদিগকে কিন্তু একইরূপে শিক্ষা দিতেন না। প্রাচীন ঋষিরা বনে তপস্যা করিতেন—শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। জনসমাকীর্ণ মানবসমাজের কোলাহল হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কারণ, নিভৃত নির্জ্জন স্থান তপস্যা বা বিদ্যার্জ্জনের বিশেষ অনুকূল। পাশ্চাত্য দার্শনিক গুরু মহামতি এরিষ্টটলের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বনরাজিশোভিত লিসিয়ামে এরিষ্টটল পাদচারণ করিতে করিতে মার্জ্জিতবুদ্ধি অন্তরঙ্গ শিষ্যকে দর্শন-বিজ্ঞানের গূঢ় উপদেশ প্রদান করিতেন, আর যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে নাই, তাহাদিগকে একত্রে একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন। এই কথা মনে হইলে সেই হিন্দু, প্রাচীন ঋষিবর্গের কথাই স্মরণ হয়।

রাজা ফিলিপ ও তৎপরে আলেকজান্দারের সহায়তা তাঁহার

দার্শনিক চিন্তার বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। শুধু তাহাই নহে, রাজা হারমিয়াসও তাঁহার দর্শনালোচনার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। হারমিয়াসের নিকট এবিষয়ে তিনি যে বিশেষ ঋণী ছিলেন, সেটী তদুদ্দেশ্যে প্রশংসাবাদক কবিতা হইতে বেশ বুঝা যায়। এই প্রশংসাবাদক কবিতাই প্রকারান্তরে তাঁহার অপবাদের কারণ হইয়াছিল। হারমিয়াসকে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করাই সেই কবিতার উদ্দেশ্য—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করেন—ফলে তাঁহাকে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে হারমিয়াসকে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি ধর্ম্মের গুণগান করিয়াছিলেন এবং পারসিকদিগের হস্তে অকারণ ধর্ম্মের জন্য নিগৃহীত ও নিহত হওয়ায় হারমিয়াসকে ধর্ম্মের জন্য জীবনোৎসর্গী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া কলসিস (Chalchis) গমন করেন এবং আন্দাজ ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিষপানে জীবন ত্যাগ করেন কিন্তু সে বিষয়ে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পিতামাতার দোষগুণ পুত্রে কতক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, এটী আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত বাক্য। শুধু তাহাই নহে; পুত্রের জীবনগঠনে পিতামাতা সমধিক দায়ী—তাহার চিন্তার গতিও তাঁহাদেরই দ্বারাই অনেকাংশে নিয়মিত হয়। সেই জন্য চিকিৎসাব্যবসায়ীর পুত্র হওয়ায় প্রত্যেক বিষয় পরীক্ষা দ্বারা অনুভব করিবার স্বাভাবিক বুদ্ধি এরিষ্টটলের জন্মিয়াছিল। এই স্থলে প্লেটোর সহিত এরিটলের পার্থক্যের কারণ প্রণিধানযোগ্য। বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে উপনীত হওয়া উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য হইলেও, এরিষ্টটল সেই বাহ্যজগতের ব্যাপার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা তৎমূলে সত্যলাভের প্রয়াসী ছিলেন। প্লেটোর নিকট বাহ্যজগৎ যেন একটী প্রকাণ্ড ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি যেন সেই মূল সত্যকে

প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের ব্যাপারকে সামান্য জ্ঞানে—তার বিশেষ পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। গগনস্পর্শী মন্দিরের চূড়ার সহিত মন্দিরের যে সম্বন্ধ প্লেটোদর্শনের সহিত এরিষ্টটলেরও সেই সম্বন্ধ বলিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। প্লেটোর দর্শনে কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম, কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি সকলের মূল এক। সেই মূল সত্যকে যে ভাবেই উপলব্ধি কর না কেন তাহা এক ভিন্ন দুই নয়—মন্দিরের চূড়ার ন্যায় বিন্দুতে গিয়া সব অবসান। এক একটী প্রস্তরের সংযোগে কেমন করিয়া সেই সুমহান্ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি—এই সকল বিশদ বিবরণ প্লেটো প্রদান করেন নাই। সে সংবাদ জানিতে হইলে এরিষ্টটলের আশ্রয় লইতে হইবে। এই বিশ্বজগতের রচনাবৈচিত্র্যের বিশেষভাবে অনুসন্ধান পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু এরূপ সুন্দরভাবে আর কেহ যে প্রয়াস করেন নাই, সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। দার্শনিক আলোচনার পথপ্রদর্শক সক্রেটীস যে সত্যের আলোক জ্ঞানিজনসমক্ষে প্রদর্শন করেন, সেই আলোকের সাহায্যে প্লেটো সত্য দর্শন করেন। এরিষ্টটল আবার তাহারই সাহায্যে সেই পথের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। পাশ্চাত্য জগতের আদি দার্শনিক—সক্রেটীস, দার্শনিক গুরু—প্লেটো, দর্শন শাস্ত্রের স্থাপন কর্ত্তা—এরিষ্টটল। অতঃপর আমরা এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর মোটামুটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এথেন্সে প্লেটোর নিকট শিক্ষালাভ কালে এরিষ্টটল কথোপকথন আকারে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইউডিমাস (Eudemus) পুস্তকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিসিলিতে ডাইয়োনিসাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে প্লেটোশিষ্য ইউডিমাস ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নিহত হন। তাঁহারই নামে পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হয়। ঐ পুস্তকে আত্মার অবিনাশিতাসম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি দেখা যায়। ঐ পুস্তকখানিকে প্লেটো-রচিত ফিডোগ্রন্থের এক পর্য্যায়ভুক্ত

বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাউক সে কথা, এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী মোটামুটি দুইভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—গূঢ়বিদ্যা বা তত্ত্বকথা প্রকাশক পুস্তকগুলি এক শ্রেণীভুক্ত ও বাহ্যজগৎ বিষয়ক পুস্তকগুলি অপর শ্রেণীভুক্ত। আমাদের মনে হয়, প্রথমটী বিশেষতঃ মার্জ্জিতবুদ্ধি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের জন্যই রচিত হইয়াছিল—অপরটী সাধারণের জন্য। ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশই ম্যাসিডোনিয়া হইতে এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রচিত হয়। গ্রন্থে আলোচিত বিষয় অনুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীকে চারিভাগে বিভাগ করা হয়:—(১) ন্যায়শাস্ত্র (Logic), (২) নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র (Ethics), (৩) পদার্থবিদ্যা (Physics) ও (৪) পরমার্থ বা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)। ন্যায়শাস্ত্রকে Organon নাম দেওয়া হয়। পরমার্থবিদ্যা মূল বা আদি পদার্থের আলোচনায় ব্যাপৃত, তাই বুঝি তাহার নাম দেওয়া হয় First Philosophy বা প্রথম দর্শন। প্রকৃতি, বাহ্যজগৎ বা পদার্থবিষয়ক আলোচনা যে সকল পুস্তকে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে পদার্থবিজ্ঞান (Physics) বা প্রাণিগণের ইতিহাস (Natural history of Animals) আখ্যা দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন, সেগুলিকে পরমার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াই সঙ্গত। নীতিশাস্ত্রে তিনি প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রয়াসী ছিলেন এবং তিন খণ্ডে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—Nicomachean Ethics, Eudemean Ethics এবং Magna moralia। পলিটিকস্ (Politics) পুস্তকে রাষ্ট্র ব্যাপার ও রাজনীতির ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে। Rhetoric ও Poetic পুস্তকে কলা ও সৌন্দর্য্যবিদ্যার আলোচনা দেখা যায়।

আমরা চারিভাগে এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী বিভাগের কথা উল্লেখ করিলাম কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক তিন ভাগে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম ভাগে পরমার্থবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা বা জ্ঞানকথা, দ্বিতীয় ভাগে নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব বা কর্ম্মকথা ও

শেষভাগে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিকে সন্নিবেশিত করেন। এইরূপ বিভাগের ফলে অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যাকে তাঁহারা প্রথম-শ্রেণীভুক্ত এবং ধর্ম্মনীতি (Ethics) ও রাজনীতিকে (Politics) এক শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

Categories, De interpretatione, Analytics ও Topics পুস্তকগুলি ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত। এইখানে মনে রাখা আবশ্যক এরিষ্টটলকে ন্যায়শাস্ত্রের আদি গুরু বলা হয়; ক হয় খ হইবে, নয় খ হইবে না—এই দুইটী বিপরীতের মধ্যে ক একটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকা চাই—ন্যায়ের এই মূল সূত্র তিনিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

Physics, De cœlo, De generatione et corruptione, the Meteorology, De anima, Parva naturalia, History of Animals, On the Parts of Animals, On the Progression of Animals, On the Generation of Animals পুস্তকগুলিকে পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত করা হয়। মোট 'কথা খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভের উপযোগী সকল বিদ্যাই এরিষ্টটল অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম ও মোক্ষ।

(ব্রহ্মচারী সাধুচৈতন্য)

জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই কোন্ না কোন আদর্শবিশেষ লইয়া গঠিত। ইজিপসিয়ানদের ধর্ম্ম—মৃত্যুর পর জীবাত্মার অস্তিত্ব শবদেহের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে—এই স্থির বিশ্বাস লইয়া। পারসিকদের ধর্ম্ম সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্ব লইয়া, খৃষ্টানধর্ম্ম সর্ব্বমঙ্গলময়ী ভালবাসা লইয়া এবং হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ লইয়া গঠিত। হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ মহান্ আদর্শের বিষয়ে উপদেশ দেয় তাহা জগতের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। সে অবস্থায় জাগতিক সম্বন্ধের কথা কি, দ্বৈত, অদ্বৈত আমি তুমি, সকল ভাবের লয় হইয়া যায়—যাহাকে ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়াও বর্ণনা করা যায় না—উহা এক অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতা, যাহা আপেক্ষিক ভাষা বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এই অবস্থালাভের একমাত্র উপায় আত্যন্তিক ত্যাগ বা আমিত্বের সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন।

হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ ত্যাগমূলক বলিয়াই শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াও এখনও জীবিত এবং জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ। উক্ত কারণেই উহা বিবিধ ধর্ম্মবিপ্লবকারী মহা প্লাবনসমূহ প্রতিহত করিয়া এখনও পূর্ব্বগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ঐ সকল ঘাতপ্রতিঘাতের যুগে নিজ অভ্যন্তরীণ আশ্চর্য্য শক্তির পরিচায়ক যুগপ্রবর্ত্তনকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণের জন্ম দান করিয়াছে। শুধু ইহা নহে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অন্য অন্য আদর্শসমূহকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইবার ক্ষমতা থাকায় ঐ সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের এই বিচিত্র লীলা যেন আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বাপেক্ষা

বৃহৎ তরঙ্গসঙ্কুল আর একটী মহাপ্লাবন, ভূভাগের প্রায় অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিবার স্পর্দ্ধা লইয়া উপস্থিত—অভিপ্রায়, হিন্দু-মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত করিয়া নিজ সলিললীন করিয়া লয়। এরূপ মহাপ্লাবন হিন্দুধর্ম্মমূলে কখনও আঘাত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। উহাতে হিন্দুধর্ম্ম যেন একটু বিচলিতও হইয়া পড়িয়াছে—উহা ফেনশীর্ষ আধুনিক খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য সভ্যতা। উহা যেন বলিতে চাহে, হে হিন্দুগণ, তোমাদের ত্যাগমূলক সভ্যতাই যদি শ্রেষ্ঠ, তবে তোমাদের দেশ এত দীনহীন কাঙ্গালের বাসস্থান কেন? তোমরা জাতিসমাজে এত হেয় কেন? ব্যাপকত্বই যদি শক্তিমত্তার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে তোমাদের সে ব্যাপকত্বই বা কোথায়? যে ধর্ম্ম বা সভ্যতা ইহজগতেই জীবকে সুখের অধিকারী করিতে পারে না, তাহার পরজগতে জীবকে সুখী করিবার সামর্থ্য কোথায়? অতএব তোমরা এতদিন যাহাকে জীবনসমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসারূপে বিশ্বাসপূর্ব্বক ধরিয়া আছ, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, উহা অন্ধবিশ্বাস। আমাদের ভোগমূলক সভ্যতার অনুসরণ কর—এ জীবনে সুখভোগ কর, পর জীবন আছে কি না সন্দেহ, সুতরাং তাহার চিন্তা ত্যাগ কর। দেখ, পৃথিবীর যে প্রদেশ আমাদের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা কিরূপ উন্নতিশীল, তাহারাই ত একরূপ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তোমরা এখনও আমাদের অনুসরণ কর, তোমাদিগকেও আমরা সহভোগী করিয়া লইব।

এই ত গেল বাহিরের আহ্বান। আমাদের সমাজশরীর এবং উহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি সুস্থ হইত সবল, তাহা হইলে ইহাতে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণই থাকিত না। কিন্তু আমরা সকলেই ত সবল, সুস্থ নই। যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব আমাদের মধ্যে অনেকে, তাহারা সমষ্টির তুলনায় অল্পসংখ্যক হইলেও, পাশ্চাত্য মোহে ভুলিয়াছে, পাশ্চাত্য মতে জীবন সমস্যার

মীমাংসা করিতে চায়। শুধু তাহাই নহে, তাহারা আবার ভোগমূলক মীমাংসা প্রচারে প্রয়াসী। ইহাদের প্রাদুর্ভাবই হিন্দুধর্ম্মকে কথঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছে। তাহা না হইলে শঙ্কিত হইবার কোন কারণই থাকিত না।

শঙ্কিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। শরীর নিরাময় করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সবল ও দৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু উহা করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, ত্যাগীর সমাজে এই ভোগেচ্ছারূপ ব্যাধিবীজ কোথা হইতে আসিল এবং কোথায়ই বা উহা উপ্ত রহিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, শরীর যদি সবল থাকে তাহা হইলে বাহির হইতে আগত কোন ব্যাধিবীজই কোনরূপ অনিষ্ট ত করিতে পারে না বরং উহা নিজেই নষ্ট হইয়া যায়। শরীর যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলেই নানারূপ ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। সেইজন্য কোন ব্যাধি দূর করিবার পূর্ব্বে শরীরের যেস্থান দুষ্ট হইলে উক্ত ব্যাধির সম্ভাবনা, তৎস্থানের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ কর্ত্তব্য, সমাজ জীবনেও সেইরূপ করা উচিত। অতএব হিন্দুধর্ম্মশরীর ব্যাধিমুক্ত করিতে হইলে, বাহিরের কোন কারণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া, শরীরের প্রতিই প্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে। দেখিতে হইবে কোন্ স্থান দূষিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি হিন্দুগণ সকলেই সেই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য ও ত্যাগের অনুশীলন করিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে এ ভোগেচ্ছা কিরূপে সম্ভবপর? কারণ, যে সমাজ বা জাতি যত উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিবে, সেই সমাজ বা জাতি তত উন্নতিশীলই হইবে। বাস্তবিক ইহা খুব সত্য কথা। কিন্তু আদর্শে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। যাঁহারা ভুল পথ অনুসরণ করিবেন তাঁহারা উদ্দেশ্যে পৌঁছাইতে না পারিয়া আদর্শ সম্বন্ধে সন্দিহান এবং ভোগপরায়ণ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? কোন স্থানে যাইবার যেমন বিভিন্ন পথ থাকে, তাহার মধ্যে

কোনটী বা সোজা কিন্তু বিপদসঙ্কুল, কোনটী বা বক্র এবং সময়-সাপেক্ষ কিন্তু নিরাপদ্। যিনি বিপদের ভয় করেন না বা সমর্থ তিনি সোজা পথের, আর যিনি অপারগ তিনি বক্র পথটীর অনুসরণ করেন। তেমনি উক্ত আদর্শে পৌঁছিবারও ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, উহাদিগকে প্রধান দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, সন্ন্যাসধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম। যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য বা সংস্কার তাঁহার সেইরূপ পথ অবলম্বন করা উচিত। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ভুলপথ অনুসরণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়। সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্রসমূহ সংস্কার বা অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই অধিকারীবাদ হিন্দুধর্ম্মের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই উহা অপর ধর্ম্মমতসমূহের উপর অপরাপর ধর্ম্ম অপেক্ষা উদার ভাবাপন্ন এবং সেইজন্যই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এত শাখা প্রশাখা সমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

উক্ত সাধারণ ব্যবস্থা অনুসৃত হয় না বলিয়া আজকাল হিন্দু-সমাজের সকলের মধ্যেই একটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোক্ষ শুধু সন্ন্যাস ধর্ম্মেই লভ্য অপরধর্ম্ম অবলম্বনে উহাত লাভ হয় না, বড় জোর উহা সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিবার উপযুক্ত করিয়া দিতে পারে মাত্র। এই ধারণায় মোক্ষলাভেচ্ছু হিন্দুগণ স্ব স্ব সামর্থ্য না বুঝিয়াই সেই সর্ব্বত্যাগমূলক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে—যে আশ্রম ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করে না, সংসার, তোমার আমার অস্তিত্ব আছে কিনা দেখে না, যাহা জাগতিক সুখ দুঃখের মধ্যে সংসারের বিপদ্ আপদের মধ্যে সেই বিভু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে চায় না। উহা চায় তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে, নিজের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার নির্গুণভাব অনুভব করিতে, সর্ব্বশেষে নিজেকেই তৎস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিতে। আমরা সকলেই এই একই পথ ধরিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ছুটিয়াছি বলিয়াই সফল হইতে পারিতেছি না এবং লক্ষ্যকে এক খেয়াল বলিয়া ধারণা করিয়া যাহা আপাতমনোরম তাহার অনুশীলনে রত হইতেছি এবং ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ হইয়া

এক প্রকার ধর্ম্মভ্রষ্ট, অবিশ্বাসী ও নাস্তিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পড়িতেছি। এই অসফলতার জন্যই ভোগভিত্তিমূলক ধর্ম্ম, যাহার আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্যতা, আজকাল আমাদের মধ্যে স্থান পাইতেছে।

প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, শাস্ত্রসমূহে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ তৎপরে সন্ন্যাসের উপদেশ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী আশ্রমের পর সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রের স্থানে স্থানে যে প্রথমেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয় বলিয়া উক্ত আছে, উহা উৎকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষেই প্রযোজ্য। যদি হিন্দুদিগের চিন্তারাশির ভাণ্ডার স্বরূপ শাস্ত্রে এইরূপ ধারা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমরা এই একমাত্র সন্ন্যাসপ্রবৃত্তি কোথা হইতে পাইলাম? নিশ্চয়ই মোক্ষার্থী হিন্দুদিগের সম্মুখে কোন না কোন যুগে সন্ন্যাসপথের উজ্জ্বল আদর্শ ধৃত হইয়াছিল।

আমরা যদি সেই যুগের পরিচয় লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বৌদ্ধযুগে যাইতে হইবে। ভগবান্ বুদ্ধ উদার হৃদয়ের প্রেরণায় জীবদুঃখে কাতর হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞান লাভান্তর স্ত্রীপুরুষ সকলকেই প্রব্রজ্যা দান করেন। তাঁহার দানে হৃদয় ছিল। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তিগণ খঞ্জমেধ শাবককে স্কন্ধে লইয়া যাওয়ারূপ হৃদয়বত্তা গ্রহণে অক্ষম হন—তাঁহারা শুধু হৃদয়হীন সন্ন্যাসেরই ঘোষণা করিয়া যান। তাঁহাদের পশ্চাতে নবার্জ্জিত সত্যের শক্তি থাকায় তাঁহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণই সত্যলাভের একমাত্র উপায় ইহা সমাজমনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে সমর্থ হন। এইরূপে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সেই সময় হইতেই অন্যান্য আশ্রমধর্ম্মসমূহ অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাস আশ্রমের এইরূপ প্রশংসা যে কুফল আনয়ন করিবে তাহা তৎকালীন বিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহাতে এই ভাব প্রাধান্য লাভ না করিতে পারে তৎবিষয়ে মনোযোগীও হইয়াছিলেন।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই এই ধারা প্রতিহত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য আজও আমাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথম রাজা অশোক এই প্রবৃত্তিতে আশঙ্কিত হইয়া "ধর্ম্ম" নাম দিয়া শ্রীবুদ্ধের মহান্ হৃদয়ের প্রচার ও সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি ইহাতে সফল হইলেনই না বরং তাঁহার এই সদুদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্মজগতে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া দিল। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান, মহাযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সুযোগ উপস্থাপিত করিয়া দিল—এমন কি, শেষে উহা জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতেই বিতাড়িত হইল। তৎপরে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি ইহা প্রচার করিলেন যে, সন্ন্যাস আশ্রম সকলের পক্ষে নয়, উহা যাঁহারা বর্ণাশ্রমের শীর্ষে অবস্থিত সেই সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের জন্য। তিনি উহার বিস্তার সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন বটে কিন্তু আপামর সাধারণের জন্য এই জীবনেই মোক্ষ লাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়া না দেওয়ায় তিনিও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অপর সকলে অন্য কোন পথ দেখিতে না পাইয়ায় সেই পুরাতন প্রথারই অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপ পর পর আচার্য্য এবং অবতারকল্প মহাপুরুষগণ নানা উপায়ে ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সকলেরই চেষ্টা শ্রীশঙ্করের ন্যায় একদেশী হওয়ায় তাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। যেমন, উদারহৃদয় শ্রীরামানুজ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই নিজধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দান করিলেন বটে; কিন্তু নিজ মতই মোক্ষলাভের প্রধান উপায়, ইহা ঘোষণা করায় তিনিও একদেশিত্ব দোষদুষ্ট হইয়া পড়েন।

বৌদ্ধযুগ হইতে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও উহা ঐ সকল সভ্যতা প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে যে সঙ্কটমুহূর্ত্ত উপস্থিত, উহাতে উত্তীর্ণ হইতে

হইলে ভুলপথ অনুসরণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে হইবে এবং জীবনসমস্যার আমাদের মীমাংসাই যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অনুভব করিয়া অপরকে সেই পথ প্রদর্শন ও উহার প্রচার করিতে হইবে। তবেই আমরা ভোগভিত্তি পাশ্চাত্য প্রলোভন প্রতিরোধ করিতে পারিব।

আমরা দেখিয়াছি, সকলেই এক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনে উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করাতেই আমাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতকার্য্য এবং উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সন্দিহান এবং কুপথগামী হইতেছে। অতএব দেখিতে হইবে, অন্য কোন উপায়ে উহা লাভ হয় কিনা। আমাদের প্রায় সকলেই গৃহস্থ—দেখিতে হইবে এই গৃহস্থধর্ম্ম আচরণেও তথায় পৌঁছান যায় কিনা।

আমরা হিন্দু, আমরা শাস্ত্রপ্রমাণ বিশ্বাস করি—কারণ শাস্ত্রসমূহই উপলব্ধ সত্যসকলের ভাণ্ডার। অতএব শাস্ত্র যদি ঐ মতের পোষণ করে, তবেই আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। আমরা যদি শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করি, দেখিতে পাইব, উহা বলিতেছে, যিনিই স্বধর্ম্মপরায়ণ তিনিই মোক্ষলাভ করিবেন। অর্থাৎ যিনি যে ধর্ম্মের; সন্ন্যাস বা গার্হস্থ, যে অবস্থায় আছেন তদবস্থার ধর্ম্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করিলেই মোক্ষ লাভ করিবেন। একজন মহাপুরুষও উক্ত সত্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—এমন কি, সামান্য মেথরও যদি নিজধর্ম্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করে, সেও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করিবে। মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণিত সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মব্যাধের কথা মনে করুন। তিনি কি নিজধর্ম্ম পালন করিয়া সন্ন্যাসিযুবক অপেক্ষা উচ্চাবস্থা লাভ করেন নাই? ত্যাগই যখন মোক্ষলাভের প্রধান অবলম্বন—উহা কি গার্হস্থ আশ্রমে সম্ভবপর নয়? উহা শুধু সন্ন্যাসীর নিজস্ব বস্তু নয়—উহা সকল আশ্রমের, সকল অবস্থার, সকল লোকেরই। আর সন্ন্যাসজীবনের যেমন, গার্হস্থ্যজীবনেরও তেমনি ভিত্তি ত্যাগের উপরই স্থাপিত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত কর্ম্মযোগের সেই পক্ষিপরিবারের কথা

স্মরণ করুন। অতিথিসেবার্থ নিজেদের শরীর পর্য্যন্ত দান—এইরূপ ত্যাগ সন্ন্যাসীর ত্যাগের ন্যায় কি মহিমময় নয়? এইরূপ ত্যাগ যদি সন্ন্যাস আশ্রম ব্যতীত অপর আশ্রমেও সম্ভব হয়, তাহা হইলে কে বলিবে যে তদ্ধর্ম্ম আচরণে মোক্ষ লাভ হইবে না? আর ইহাও সত্য যে, সৎ গৃহস্থের গৃহেই আদর্শ সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন। অতএব আমাদের সকলেরই শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বাণীর অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া শ্রেয়লাভে অগ্রসর হওয়াই উচিৎ। আর যাঁহারা প্রবেশার্থী তাঁহাদেরও নিজ সামর্থ্য বিচার করিয়া মার্গবিশেষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি নিজ বুদ্ধির উপর বিশ্বাস না হয়; তাহা হইলে সংস্কারদর্শী সৎগুরুর পরামর্শে নিজ জীবন নিয়মিত করাই শ্রেয়ঃ। যিনি যে আশ্রমের যে অবস্থায় আছেন, তাদৃশাবস্থার ধর্ম্ম পালন করিলে যেমন তাঁহার শ্রেয়োলাভ সুগম হইবে, অপর দিকে আদর্শে উপনীত হওয়ায় উহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভবে পাশ্চাত্য প্রলোভন হইতে আপনাদিগকে এবং পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্মকেও রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান।

(চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিদ্ চুয়াং-ৎস্যুর উপদেশাবলী হইতে।)

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত)

একদা শিশনের সাধু আই লিয়াও সুদেশের অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের বিমর্ষভাব অবলোকন করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নে সম্রাট্ নিম্নলিখিতরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—

"মহাশয়! আমি প্রাচীন সাধু-মহাত্মাদের উপদেশাবলী বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছি। ধর্ম্মের উপর আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই।

সতের—শ্রেয়ের সম্মান কি করিয়া করিতে হয়, বিশেষভাবেই জানি এবং করিয়াও থাকি। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমার তিলমাত্র শৈথিল্য নাই। এই সকল অনুষ্ঠানসত্ত্বেও আমি আমার কর্ম্মফল—আমার ভাগ্যপ্রসূত দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেছি না। এই কারণে আমি সদাই বিমর্ষ।"

সম্রাটের এবম্বিধ প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া সাধু বলিলেন, "সম্রাট্, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে আপনার অনুষ্ঠিত উপায়-সমূহ অকিঞ্চিৎকর।"—বলিয়া নিম্নলিখিত উদাহরণটির সহায়ে সম্রাটের দুঃখের কারণ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

"একদা একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন জম্বুক এক উচ্চ পর্ব্বতের পশ্চাতে আর একটি জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতগাত্রে নিরাপদ ভাবিয়া আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। দিনের বেলা আলোকে জম্বুক সেই গুপ্ত বাসস্থানে লুকাইয়া থাকিত, কদাপি বাহির হইত না। রাত্রি হইলে অন্ধকারে চুপিচুপি অতি সন্তর্পণে বাহিরে আসিত। এরূপ সাবধানতা সত্ত্বেও জম্বুক শিকারীর ফাঁদ এড়াইতে পারিল না—এক দিন ফাঁদে পড়িয়া জীবন হারাইল। এই জম্বুকের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এত সাবধানতা, তথাপি এই জম্বুকের এই দুর্গতি কেন হইল? জম্বুকের কি অপরাধ? ইহার এক মাত্র উত্তর—ব্যাধ তাহাকে জম্বুক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। জম্বুক-চর্ম্মই ঐ জম্বুকের ব্যাধের নজরে পড়িবার কারণ। এক কথায় জম্বুকের বহিরাবরণই জম্বুকের দুর্ভাগ্যের কারণ। হে সম্রাট্, তোমার এই সম্রাটের পরিচ্ছদই তোমার জম্বুক-চর্ম্ম। এই রাজ্য, পদ, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতাই তোমার আবরণ হইয়া তোমাকে দুর্ভাগ্যের কবলে পাতিত করিয়াছে। দুঃখের কারণগুলি ত্যাগ কর, হৃদয় পবিত্র কর, রিপুর বশ্যতা হইতে উহাকে মুক্ত কর, তাহা হইলে মৃত্যুহীন, দুঃখহীন রাজ্যে যাইতে পারিবে।

"হে সম্রাট্, এই হ্যান্-উছ্ দেশে এক জনপদ আছে—এক রাজ্য আছে, সে রাজ্যের নাম ধর্ম্মরাজ্য। সে দেশের অধিবাসীরা সৎ, সরল, স্বার্থলেশশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়। তাহারা উপার্জ্জন করে কিন্তু সঞ্চয় করে না, দান করে কিন্তু প্রতিদান আকাঙ্খা করে না। তাহারা মহা উদ্যমে কার্য্য করে, কিন্তু তাহাতে দাসসুলভ বাধ্যবাধকতার আভাস পর্য্যন্ত নাই। তাহারা অব্যাহত স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, কোনরূপ দেশকালোচিত বিশিষ্ট নিয়মের বন্ধন নাই। তাহাদের কার্য্যকলাপে অনুশাসনের বাঁধাবাঁধি নাই, তথাপি তাহারা জ্ঞানের পথ হইতে—সত্যের পথ হইতে এক তিলও বিচ্যুত নয়। হে সম্রাট্, তুমি সেই রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর; এই সংসার, সংসারের ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া থাক। একমাত্র ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাতে আত্মসমপর্ণ করিয়া যাত্রা কর।"

অধিপতি সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া হতাশকণ্ঠে বলিলেন—

"মহাশয়, আপনি এই যে পথের কথা বলিলেন, সে পথ অতি দীর্ঘ এবং অতীব বিপদসঙ্কুল। এ পথে কত শত বাধা—নদ নদী, কত পাহাড় পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে হইবে! সে নদী উত্তীর্ণ হইবার আমার তরণী কোথায়? সে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিবার যান কোথায়?"

সাধু বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। সম্রাট্, শরীরমনের বদ্ধ-ভাবই প্রধান প্রতিবন্ধক। দেহমনের প্রতিবন্ধকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না, সে পথের তুমিই তোমার যান হইবে।"

সম্রাটের ভীত চিত্ত সাধুর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারায় পুনরায় বলিল,

"এ পথ অসীম—ভয়ঙ্কর—নিরানন্দ—লোক-সমাগমশূন্য। বিপদে কেহ আমার ডাকে সাড়া দিবে না, কেহ সাহায্য করিবে না, ক্ষুধায় অন্ন দিবে না! আমি কি করিয়া এই পথে যাত্রা করি?"

"বাসনা ত্যাগ কর, শক্তির অযথা অমিত ব্যবহার কমাও। দেখিবে, কোন কিছুর দরকার হইবে না, কিছু না পাইলেও তাহাতে অভাব বোধ হইবে না। নদী অতিক্রম কর, অসীম অপার সমুদ্রের

বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। যে সব চিন্তা তোমায় দেহমনের রক্ষার ভার গ্রহণের ভান করিয়া সতত তোমার দেহবুদ্ধি জাগ্রৎ রাখিয়াছে, তাহারা তোমার এই আত্মনির্ভরতায় তোমায় পরিত্যাগ করিবে। নদীতীরে তাহারা পড়িয়া রহিবে, তুমি অসীম সাগরবক্ষের উপর দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকিবে। দেহবুদ্ধি—অর্থাৎ 'আমি মানুষ মাত্র'—এই বোধই বন্ধনের কারণ। সম্রাট্, জানিবে, মানুষই মানুষের দুঃখের কারণ। মানুষে মানুষ-জ্ঞান—ইহা হইতেই যত দুঃখের উদ্ভব। সুতরাং এই সব বাধা, এই দুঃখের কারণসমূহের সংশ্রব ত্যাগ কর, আপনাকে সর্ব্বরকমে মুক্ত কর, একমাত্র ঈশ্বর সত্য জানিয়া তাঁহাতে নির্ভর করিয়া সেই অনন্তের রাজ্যের জন্য যাত্রা কর।

"হে সম্রাট্, মনে কর, একখানি তরণী একটি নদী পার হইবার জন্য চলিয়াছে আর একখানি মাঝি এবং আরোহিবিহীন শূন্য তরণী ভাসিয়া আসিতেছে। পারে যাবার তরণী সেই শূন্য তরণী দেখিয়া চীৎকার করিবে না, 'সামলাও' বলিয়া হাঁকিবে না। কিন্তু যদি সেই শূন্য তরণীতে একজন আরোহী থাকে, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিবে, 'সামলাও—আমায় পথ দাও।' যদি তার চীৎকারে, তার কথায় প্রথম তরণী কর্ণপাত না করে, তা হইলে তখনই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিবে, নানারূপ বচসা করিবে। তরণীদ্বয়ের প্রথম অবস্থায় কোনরূপই ক্রোধের অভিনয় হয় নাই, কোনরূপ বচসা হয় নাই। কেন? শূন্য তরণী ক্রোধে উন্মত্ত হয় না, তাহার মুখে ভাষা নাই—নির্ব্বাক্। হে সম্রাট্, মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। মানুষ যদি দেহজ্ঞান ভুলিয়া, অহং ভাব ভুলিয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলে কে তাহাকে বিরক্ত করিবে, কে তাহার ক্ষতি করিবে?"*

* আমেরিকা "Vedanta centre" হইতে প্রকাশিত "The Message of the East" নামক মাসিক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত :—উঃ সঃ।

সৎকথা।

ভগবানের দয়া না হলে ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্ম হয় না। তিনি যাঁর প্রতি কৃপা করেন, তাঁকে দিয়ে কর্ম্ম করিয়ে নেন। হিংসা কর্‌লে কি হবে, যিনি কর্ম্মী তিনিই বড় হন। অমুকের মত বড় হব মনে কর্‌লেই কি বড় হয়। তাঁরা কত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন তবে না বড় হয়েছেন। কর্ম্মহীন. ব্যক্তিকে ভগবান্ ঘৃণা করেন। পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। যে বেশী কর্ম্মী তাঁকেই ভগবান্ বেশী করে খেতে পর্‌তে দেন। কর্ম্মতেই বড় করে, আবার কর্ম্মতেই ছোট করে—মানুষ কি আর ভাল মন্দ আছে। কর্ম্মই হল প্রধান। কর্ম্মের জন্য কেউ বা পূজা পাচ্চে কেউ বা গাল খাচ্চে। যারা কর্ম্ম করে পূজা পায় তারাই ধন্য। যাঁরা নিস্বার্থভাবে কাজ করেন তাঁরা বলেন, 'কর্ম্ম না কর্‌লে কি চলে! ভগবান্‌ই কর্ম্ম লিখেছেন—তিনিই আবার কর্ম্ম কাটেন।' করমসে করম কাটে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম্মের দ্বারাও ভগবান্‌কে বুঝা যায়।

*   *   *

যদি কিছু কঠিন থাকে তবে সেটা ধর্ম্ম। ভগবানের দয়া ভিন্ন হয় না। মনটাকে সংযম করা কি সোজা কথা—মন ভারী পাজি, একটা কড়া কথা বল্‌লেই ছোট হয়ে যায়, সেই মন নিয়ে কি ধর্ম্ম হয়। আজ কাল লোকে যে 'ধর্ম্ম, ধর্ম্ম' কর্‌ছে ও সব হুজুগে-ধর্ম্ম। ঠিক্ ঠিক্ লোক কটা? কটা লোক ধর্ম্ম চায়? সকলেই হুজুগে-ধর্ম্ম করে, তবে ভালর মন্দটাও ভাল এই পর্য্যন্ত। স্কুলে যেমন মাষ্টারের কথা না মান্‌লে লেখা পড়া হয় না, তেমনি যে ধর্ম্ম জানে তার কথা না মান্‌লে ধর্ম্ম হয় না। ফাঁকি দিলে ধর্ম্ম হয় না। রামপ্রসাদ বলেছেন,—

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে,

শ্যামা মারে পাবে!
এ ছেলের হাতের লাড়ু নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥
সাত গেঁয়ে আছে মামদো-বাজি,
কেবা কারে ফাঁকি দিবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া
আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥

তুমি ভগবান্‌কে ফাঁকি দেবে কি! তিনি তোমার চেয়েও চালাক।

* * * *

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ করে দেখিয়ে দিলেন যে মানব-দেহ ধারণ কর্‌লেও ভগবান্‌কে কষ্ট কর্‌তে হয়। মানুষের আর কি কথা? ভগবানের রাজ্য থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি! দশরথ পুণ্য করেছিলেন, তাই শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। আবার তাড়িয়ে দিলেন, তিনি স্বচ্ছন্দে বনে চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র দুর্গা-পূজা করেছিলেন। রাবণের মত হও ভগবান্ তোমার বিনাশ কর্‌বেন। সৎ, পবিত্র হলে ভগবান্‌ই তোমার সাহায্য কর্‌বেন—মানুষ কি কথা? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্জ্জুনের সঙ্গে থাক্‌তেন; অর্জ্জুন ভয় পেয়ে বলেছিলেন, সখা! কি হবে? ভগবান্ বল্‌লেন, 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ'—সখা যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষে জয় নিশ্চয়। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌তে পার্‌তেন, "সখা আমি আছি, ভয় কি?" তা তিনি বলেন নি।

* * * *

ভগবান্ কাহাকেও অর্থ দেন, কিন্তু দান কর্‌বার ইচ্ছা দেন না, আবার যাকে দান কর্‌বার ইচ্ছা দেন, তাকে অর্থ দেন না। যাকে দুইই দেন, বুঝ্‌তে হবে তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

ভগবান্ যাকে টাকা দেন তাকে হয়ত ছেলেপুলে দেন না, আবার হয়ত যে খুব গরীব তাকে ছেলেপুলে দেন। যাকে দুইই দেন বুঝ্‌তে হবে তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

জগতে সকলের চেয়ে ভালবাসে মা। পরিবার গেলে পরিবার পাওয়া যায়, কিন্তু মা গেলে মা পাওয়া যায় না। কাজকর্ম্ম করে ঘুরে ফিরে এসে মার সঙ্গে কথা বল্‌লে প্রাণটা স্ফূর্ত্তি হয়। ঐহিক সুখ ত্যাগ না কর্‌লে মাতৃভক্তি হয় না। মার চেয়ে ভালবাসেন ভগবান্।

* * * *

যে সাধন ভজন কর্‌বে তাকে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। সে নিজের কাজ নিজেই করে যাবে। যে সাধন ভজন করে তার মেজাজই আলাদা।

* * * *

হাজার ত্যাগী হক্ না কেন, মৃত্যুর সময় যা ভাব্‌বে তাই হবে। সেইজন্য যতদূর সম্ভব সৎচিন্তা করা উচিত; তাহলে মৃত্যুর সময় সৎ ভাবই মনে আস্‌বে।

* * * *

সুখের সময় লোকে কি ভগবান্‌কে চায়? তখন ভাবে আমিই কর্ত্তা, বিধাতা। দুঃখের সময় ত ভগবান্‌কে ভজনা কর্‌বেই। কিন্তু যে সুখের সময়ও ভগবান্‌কে ডাকে সেই ত মানুষ।

* * * *

সংসারী জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন ভাল, কারণ যদি কখনও বৈরাগ্য আসে তাহলে সংসারী লোক ছেলেপিলের মায়া ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না—অবিবাহিত লোক পারে।

* * * *

চাকুরীর চেয়ে বরং ভিক্ষা করা ভাল। যে ভিক্ষা করে তার যে দিন ইচ্ছা না হল সে দিন ভিক্ষায় বেরুল না। কিন্তু চাকরে লোকের তা হবার জো নাই, ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, চাকরীতে বেরুতে হবে।

* * * *

ভগবানের যুক্তি এক, আর মানুষের যুক্তি আর এক রকম। ভগবান্ মানুষের যুক্তি অনুসারে চল্‌তে পারেন না।

* * * *

সৎবুদ্ধি হলেই ভগবান্ স্বপক্ষে থাকেন, হীনবুদ্ধি হলে ভগবান্ বিপক্ষ হন। তাঁর হুকুম পালন না করলে দুর্দ্দশা হবেই।

*

যত অবতার বলছেন, "সাধুসঙ্গ কর?" ঠিক ঠিক সাধু ভগবান্ লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

* * * *

ভগবানের উপদেশে আর জীবের উপদেশে বহু তফাৎ—ভগবানের সিদ্ধান্তই ঠিক। ভগবানের আরাধনা কর, ভজনা কর তাঁর জোরেই জোর। তাঁকে না মান তাতে তাঁর কি?

* * *

যে ধর্ম্মে যত ত্যাগী জন্মায় সেই ধর্ম্মই তত শ্রেষ্ঠ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

গ্রেকোর্ট গার্ডেন্স।
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম।
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয়—

আমি খুব শীঘ্রই, সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষে যাত্রা করছি। কারণ, পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখ্‌বার বিশেষ ইচ্ছা এবং আমি কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছাস্বত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার জেনস্ বাস্তবিকই অতি চমৎকার কাজ কর্‌ছেন। তিনি আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেরূপ সহৃদয়তা দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, তজ্জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা বাক্যে প্রকাশ কর্‌তে অক্ষম। এখানে প্রচারকার্য্য বেশ সুন্দর ভাবেই চল্‌ছে। তুমি শুনে খুসী হবে যে রাজযোগের প্রথম সংস্করণ সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং আরও কয়েকশ 'অর্ডার' এসে পড়ে রয়েছে।

---

(২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, দক্ষিণ-পশ্চিম।

লণ্ডন।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয়—

আমার মনে হয়, যে কোন কারণেই হউক, তোমাদের চার জনকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি এবং আমি সগর্ব্বে বিশ্বাস করি যে তোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে তোমাদিগকে কয়েক ছত্র স্বতঃ প্রণোদিত হয়েই লিখ্‌ছি। লণ্ডনের প্রচারকার্য্যে চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে। ইংরাজ জাতি আমেরিকানদের মত অত বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু একবার যদি তুমি তাদের হৃদয় অধিকার কর্‌তে পার, তাহলে তারা চিরকালের জন্য তোমার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি উহা অধিকার কর্‌ছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ছমাসের কাজেই, সাধারণ বক্তৃতার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসেই বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্চে। এখানে প্রত্যেকেই কাজ বোঝে—ইংরাজ কর্ম্মতৎপর। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং মিঃ গুড্‌উইন কাজ কর্‌বার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ব্যয় কর্‌বেন। এখানে আরও বহুলোক ঐরূপ কর্‌তে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের

স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে তাদের মাথায় একবার যে ভাবটা ঢুকেছে সেটা কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তেও বদ্ধপরিকর। এত দিন পরে, কিন্তু তা হলেও কম নয়, ভারতে কাজ আরম্ভ কর্‌বার জন্য অর্থ সাহায্য এসেছে এবং আরও আস্‌বে। ইংরাজ জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি প্রভু কেন তাদের অন্য সব জাতের চেয়ে অধিক কৃপা করেছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর ভাবুকতায় পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙ্গে দিতে পার্‌লেই হল—বস্ তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলিকাতায় একটা ও হিমাচলে আর একটী কেন্দ্র স্থাপন কর্‌তে যাচ্চি। প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ একটা গোটা পাহাড়ের উপর হিমাচল-কেন্দ্রটী স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টী গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল কিন্তু শীতকালে খুব ঠাণ্ডা। কাপ্তেন ও মিসেস সেভিয়ার ঐখানে থাক্‌বেন এবং ঐটে ইউরোপীয় কর্ম্মিগণের কেন্দ্র হবে। কারণ, আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবন ধারণ প্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের অগ্নিময় সমতল ভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেল্‌তে চাই না। আমার কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করুক্ আর সেখান থেকে নরনারী যোগাড় করে ভারতবর্ষে কাজ কর্‌তে পাঠাক। এতে বেশ ভাল আদান প্রদান হবে। কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে আমি Book of Job কেতাবের লোকটীর মত উপর নীচে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব! আজ এখানেই শেষ—তা না হলে চিঠি ডাকে যাবে না। সব দিকেই আমার কাজের সুবিধা হয়ে যাচ্ছে—এতে আমি খুসী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুসী হবে।

তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ধর্ম্মপালের খবর কি? তিনি কি কর্‌ছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।

বিঃ

(৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

রামনাদ।

শনিবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭।

প্রিয়—

চার্‌দিকের অবস্থা অতি আশ্চর্য্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আস্‌ছে। সিংহলে কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভূখণ্ড রামনাদে, সেখানকার রাজার অতিথিস্বরূপে রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল—হাজার হাজার লোকের ভিড়—রোসনাই—অভিনন্দন ইত্যাদি। রামনাদে যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি সেই স্থানে ৪০ ফিট উচ্চ একটী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্চে। রামনাদের রাজা তাঁহার অভিনন্দন পত্র একটী সুন্দর কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড স্বর্ণ পেটিকায় (Casket) করে আমাকে প্রদান কর্‌লেন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা আমার জন্য হাঁ করে রয়েছে—যেন সমস্ত দেশটা আমাকে সম্মান কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুতরাং তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমি আমার অদৃষ্টের চরম সীমায় উঠেছি। তথাপি আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, বিশ্রান্তিপূর্ণ, শান্তিময় দিনগুলোর দিকেই ছুট্‌ছে—কি বিশ্রাম, শান্তি ও প্রেমপূর্ণ দিন! এখনই তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসিছি। আশা করি, তুমি বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডাক্তার ব্যারোজকে সাদর অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার দেশের লোকদের চিঠি লিখেছি। তারা তাঁকে খুব জমকাল গোছের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু লোকে যে তাঁর

তেমন নিতে পারেনি তার জন্য আমি দোষী নই। কলকাতার লোক-গুলোর মাথায় সহজে কিছু ঢোকে না। ডাক্তার ব্যারোজ—আমার সম্বন্ধে আকাশ পাতাল ভাব্‌ছেন, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। এই ত সংসার!

মা, বাবা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

(৪)

(ইংরাজী হইতে অনুদিত।

আলমবাজার মঠ,

কলিকাতা।

৫ই মে, ১৮৯৭।

প্রিয়—

ভগ্ন স্বাস্থ্যটা যাতে পূর্ব্বের মত সবল এবং সুস্থ হয় সেই জন্য এক-মাস দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম ফ্যারাম দার্জ্জিলিঙ্গেই পালিয়েছে। আমি কাল আলমোড়া যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটী শৈল নিবাস।

আমি পূর্ব্বেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না। যদিও সমস্ত জাতটা এককাট্টা হয়ে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল!! শক্তির কার্য্যকরী দিক্‌টা ভারতবর্ষে আদৌ পাবে না। কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্ত্তমান মতলব হচ্ছে, প্রধান তিনটী নগরে তিনটী কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়স্বরূপ হবে—ঐ তিন স্থান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ কর্‌তে চাই।

আমি আর দুচার বৎসর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতি-পূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।

প্রফেসার জেন্সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। তাতে তিনি আমার বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তুমিও লিখেছ যে,—এতে খুব রেগে গেছে। তিনি অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে খুব ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপার নিয়ে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লে, তার সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁরা যেটাকে নানাবিধ কুৎসিৎভাব পূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বলেন তা হচ্ছে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মেরই বদহজম মাত্র। এটা স্পষ্টরূপে বুঝ্‌লে হিন্দুদের পক্ষে উহা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের যা প্রাচীন ভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধাপরায়ণ। আর তুমি বোধ হয় জান যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করে থাকি। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মও তত সুবিধারনয়। সিংহল ভ্রমণকালে আমার সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেছে। সিংহলে যদি কেহ প্রাণবন্ত থাকে তা এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে—এমন কি —এবং তাঁহার পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্তু এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এই পর্য্যন্ত খাতির করে যে, তারা এখন যেখানে সেখানে 'কসাইয়ের দোকান' খোলে !!! এমন কি, পুরোহিতরা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে উৎসাহ দেন !!! আমি এক সময়ে ভাব্‌তুম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানকালেও অনেক উপকার কর্‌বে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়েছিল ****।

থিয়জফিষ্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ করা উচিত যে, ভারতবর্ষে থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র আছে—নাই বল্‌লেই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ্‌ করে দুচার জন প্রাচ্যবাসীকে নিজেদের মত শুনাতে পারে,

কিন্তু হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন দুজন বৌদ্ধ বা দুশজন থিয়জফিষ্ট আমি ত দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলুম এখানে আর এক লোক হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত জাতটা (হিন্দু) আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি (authority) বলে মনে করছে—আর সেখানে একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র ছিলাম। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে এমন কথা বলতে হবে,যাতে সমস্ত জাতটার—আমার স্বদেশবাসীর মঙ্গল হয়, তা সেগুলো দুচারজনের যতই অপ্রতিকর হক না কেন। যা কিছু খাঁটি এবং সৎ সেই সকলকে গ্রহণ, এবং তাদের প্রতি ভালবাসা ও উদারভাব পোষণ করতে হবে কিন্তু ভণ্ডামির প্রতি নয়। —রা আমাকে আদরও খোসামোদ করতে চেষ্টা করেছিল, কারণ; এখন আমি ভারতের একজন প্রধান ও গণ্যমান্য লোক হয়েছি। আর সেই জন্যই তাদের কাজ করা, কি তাদের আজগুবিগুলোর সমর্থন করা দুচারটে কড়া স্পষ্ট কথায় বন্ধ করতে হয়েছে—আর ঐ কাজ হয়ে গেছে। আমি এতে খুব খুসী। যদি আমার শরীর ভাল থাকত তাহলে ঐ সব ভুঁইফোঁড়গুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে দিতুম, অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম। আমি যতদূর যা দেখিছি তাইত, ভারতে ইংলিস চর্চ্চের যে মিশনরি আছে তাদের উপর বরংআমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি পুনরায় তোমাকে বলছি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের হয়ে গেছে। *** আমি এখানকার কাজ একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। ইতি

বিবেকানন্দ।

মনীষা।

ভগবান্ যখন কাহারও কাণে কথা বলেন, তখন কেবল একটি বিষয়ের কথাই বলেন না, সকল কথাই বলেন। নিখিলভুবন তাঁহার বাণীতে পূর্ণ সে অনুভব করে।

—এমার্সন।

* * * * *

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাটি 'জ্বাল্‌লে তখনই আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মান্তরের পাপও তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * * * *

প্রত্যেক ভোজে (feast) স্মরণ রাখিবে, দুজন অতিথিকে ভোজন করাইতে হইবে—এক এই শরীর, অপর আত্মা। এবং এ কথাও স্মরণ রাখিবে, তোমার দেহ-অতিথিকে যাহা দিবে তাহা তখনই লোপ পাইবে, কিন্তু আত্মারূপ অতিথিকে যাহা দিবে তাহা চিরকাল বর্ত্তমান্ থাকিবে।

—এপিক্‌টেটাস্।

* * * * *

জ্ঞান অর্জ্জন কর ; কেন না যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, সে ঈশ্বরেরই কার্য্য করে। যে জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে, সে ঈশ্বরেরই গুণগান করে। যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, সে ঈশ্বরেরই পূজা করে। যে উহা বিতরণ করে, সে প্রকৃতই প্রীতির কার্য্য করে। যে উহা কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সে প্রকৃতই ভক্তির অনুষ্ঠান করে। জ্ঞান-

সহায়ে লোকে সদসৎ বুঝিতে পারে। জ্ঞান স্বর্গপথের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্ঞান নির্জ্জনে বন্ধু, বন্ধুহীনের বন্ধু।

—মহম্মদ

*

মানুষের প্রধান লক্ষ্য কি? প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করা—তাঁর স্তুতি করা এবং তাঁহাকে চিরসম্ভোগ করা।

—ওয়েষ্টমিনিষ্টর কেটিকিজম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা নিবারণ কার্য্য

গুস্করা (বর্দ্ধমান) এবং বালিয়া।

আমরা বিগত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯১৬, যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে সাধারণকে জানাইয়াছি যে, অজয় নদের বন্যাপীড়িত স্থানীয় অধিবাসিগণকে মাহাতা, গুস্করা, ভেদিয়া এবং মঙ্গলকোট এই চারিটী কেন্দ্র হইতে সাহায্য করিতেছি। বন্যার প্রথম অবস্থায় অনেকের ঘর বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় এবং বৎসরের খোরাকি সঞ্চিত ধন, ও অন্যান্য জিনিস পত্রাদি ভাসিয়া যাওয়ায় সকলেই বিব্রত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহারা আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিবে না ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের শীত, তাপ হইতে রক্ষা করিবে। এরূপ অবস্থায় চাউল সাহায্য পাওয়ায় তাহারা শেষোক্ত অভাব দূর করিতে মনোযোগ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর এখন ধান কাটা,ধান গৃহে আনা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় মজুরেরা কাজ এবং যাহাদের জমিজায়গা আছে তাহারা ধান পাই-তেছে। এই জন্য এখন আর চাউল সাহায্যেরও প্রয়োজন নাই। আর

আশঙ্কা হইয়াছিল যে বন্যায় অনেক ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়া যাইবে—ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হয় নাই। এই সকল কারণে লোকের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমরা ভেদিয়া, গুস্করা, মঙ্গলকোট এবং মাহাতা এই চারিটী কেন্দ্র যথাক্রমে বিগত ১২ই, ১৩ই, ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

নিম্নে সকল কেন্দ্রের ২৯শে নভেম্বর হইতে শেষ পর্য্যন্ত চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
ভেদীয়া	২২	১৯০	৯॥৫
ঐ (পর সপ্তাহে)	২২	১৮৫	৯।৫
গুস্করা	২১	১৩৩	৭/০
ঐ (পর সপ্তাহে)	২১	১৩১	৭/০
মঙ্গলকোট	১৯	১১৭	৬।০
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৮	১৭৪	৯।০
ঐ	১৮	১৬৪	৮॥০
মাহাতা	২৬	১৭১	৮৸৬
ঐ (পর সপ্তাহে)	২৭	২৫৪	১২৸৮
ঐ	২৭	২৫৩	১৩/২

গতবারের কার্য্যবিবরণীতে আমরা ইহাও প্রকাশ করিয়াছি যে, কাশী জেলার কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দিয়া আমরা বালিয়া জেলার বারিয়া গ্রামে একটী সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছি। উক্ত কেন্দ্র বিগত ৬ই নভেম্বর খোলা হয় এবং উক্ত তারিখ হইতে ১লা জানুয়ারী, ১৯১৭, পর্য্যন্ত উক্ত কেন্দ্র হইতে গড়পড়্তা ১৭ খানি গ্রামের ২২১ জনকে ১৬৫।৫ সের খাদ্যদ্রব্য—গম, যব ইত্যাদি সাপ্তাহিক সাহায্য করা হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী শেষ বিতরণান্তে উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় লোকের অভাব এখনও কথঞ্চিৎ থাকিলেও এই দুই মাসে পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা যে অনেক ভাল হইয়াছে তাহাতে

আর সন্দেহ নাই। এখন আশা করা যায় তাহারা কোন রকমে চালাইয়া লইতে পারিবে।

সর্ব্বশেষে যাঁহারা আমাদিগকে নিজেদের ব্যয়ভাগ এবং সাধারণ সাচ্ছন্দ্য সংক্ষেপ করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হউক এবং তাঁহাদের হৃদয় দরিদ্র ও আতুরের সেবার্থ উন্মুক্ত থাকুক—ইহাই আমাদের সতত প্রার্থনা।

অতঃপর যিনি যাহা দান করিবেন তাহা আমাদের স্থায়ী প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য রসিদ দেওয়া হইবে। উল্লিখিত সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ আঃ, হাওড়া।

১৪—১—১৭ বিনীত

কলিকাতা। সারদানন্দ।

দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রাপ্তি স্বীকার।

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

শ্রীরামধন সাহা অধিকারী; কুলাঘড়া ৫৵০
শ্রীসত্যচরণ কর্ম্মকার ও শ্রীচৈতন্যলাল দে, কলিকাতা ১০
সেক্রেটারী নৈতিক শিক্ষা সম্মিলনী ,, ৬
শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সোনারূপা চা বাগান ২৲
শ্রীজহরিলাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৲
শ্রীহেমন্তকুমার বসু ,, ১
,, বি, এন, পাল, মীরাট ১২১৲
,, চিত্রলেখা রায়, ধুবুডাঙ্গা ৪
শ্রীরোহিণীরঞ্জন সেন, চট্টগ্রাম ২৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ,, ১৲
জনৈক ভক্ত, কলিকাতা ১৫৲
জমাদার এন, এন, বসু, বসরা ৭৲
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রিজলকোনা ১॥০
শ্রীভূতনাথ বসু, বাসুলডাঙ্গা ১

জনৈক বন্ধু
কানাইলাল সেন স্মৃতিভাণ্ডার, আলিপুর
সেক্রেটারী নাগপুর দুর্ভিক্ষভাণ্ডার
শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা
শৈলেশমোহিনী রায়, ঘুঘুডাঙ্গা
শ্রীসত্যচরণ শী, বেসিন
শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর
শ্রীচুনিলাল শীল, হাওড়া
জনৈক বন্ধু
শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জ্জি, কলিকাতা
জনৈক ভদ্রমহিলা
শ্রীকানাইলাল পাল ,, ১০
মাঃ স্বামী সর্ব্বানন্দ, মান্দ্রাজ ৮১।৴১০
শ্রীজয়ানন্দ সোম, ভবানীপুর ৩
সেক্রেটারী বার লাইব্রেরী, আলিপুর ৮১৷৹

৫ই হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত

মিঃ কে এল দে, ওয়ার্দ্ধা, সি, পি, ১৭৲
জনৈক বন্ধু ২৲
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা ১৲০
চৌধুরী রহমন আলি, লক্ষ্ণৌ, ২৬৵০
জনৈক মান্দ্রাজবাসী ভদ্রলোক ৫৲
মিঃ এস কে মজুমদার পোর্টব্লেয়ার ২৲

ত্রিচিনোপল্লির নেটিব এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ২৲
ডাক্তার, বি এম বোস্, বর্ম্মা ৫৲
মিঃ ভি পনাম্বলম, পোর্ট সিটেনহাম্ ৫০॥৵০
মিসেস্ সেভিয়ার ৬৲

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

শিক্ষা ও সংসারসংঘর্ষ।

(স্বামী সারদানন্দ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

পিতার মৃত্যুর পরে এক দুই করিয়া তিন চারি মাস গত হইল, কিন্তু দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হওয়া দূরে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষৎমাত্রও রঞ্জিত হইল না। বাস্তবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার জীবন আর কখনও আচ্ছিন্ন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরীর আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত না কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্ব্বলের, দরিদ্রের, এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্ব্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে, এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে

হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন, বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—

বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—ইত্যাদি।

শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে, নে, চুপ্ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখন সহ্য করিতে হয় নাই, টানা-পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই সেদিন মাতাকে আমার নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল

দুই এক জন কখন কখন বলিত, তোকে আজ এত বিষণ্ন ও দুর্ব্বল দেখিতেছি কেন, বল দেখি? একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্র-মধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক যে সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেছিল তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতেও সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য হীনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম, তাহারা সত্য সত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপে প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি ত করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'

"যাহা হউক, এত দুঃখ কষ্টেও এতদিন আস্তিক্য বুদ্ধির বিলোপ অথবা ঈশ্বর মঙ্গলময় একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ মননপূর্ব্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জ্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যা ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া

উঠিলেন, 'চুপ্ কর্ ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান্, ভগবান্, ভগবান্ ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে আসিল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন - তোর ভগবান্ যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা, কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

"গোপনে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক অন্তরের চিন্তাটি পর্য্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই, একথা হাঁকিয়া ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয় পর্য্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের

ন্যায় ক্ষণিক সুখভাগী হইতে পারি একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

"কথা কাণে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইসারায় জানাইলেন। আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্ব্বলতা একথা প্রতিপন্নপূর্ব্বক হিউম্, বেন্, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম, আমার অধঃপতন হইয়াছে, একথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার প্রচণ্ড অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন, মানুষের ভাল মন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!' তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখন ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না!'

"ঐরূপে অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে

কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে বিশেষতঃ, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে জীবনে যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই সকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম - ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণ ধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই ; দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূর পরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

"গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসিল। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

"সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতর সাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্ব্বক সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

> কথা কহিতে ডরাই
> না কহিতেও ডরাই
> (আমার) মনে সন্দ হয়
> বুঝি তোমায় হারাই হা রাই।

অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি

ততদিন আমার জন্য থাক!'—বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল। পূর্ব্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটর্ণির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জ্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন—তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া পরার কষ্ট যাহাতে দূর হয় এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব, আমার জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং না-ছোড়-বন্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে আমি যে ওসব কথা বল্‌তে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস্ না সেই জন্যই তোর এত কষ্ট।' বলিলাম, 'আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন, বল্‌তেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে আমি যে কতবার বলেছি, মা নরেন্দ্রের দুঃখ কষ্ট দূর কর, তুই মাকে মানিস্ না সেই জন্যই ত, মা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বল্‌ছি আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন!'

"দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। এক প্রহর গত

হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্য সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল। জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মাই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস ত?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না, মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই ত, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা, যা ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম এবং মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কিরে এবার বলিয়াছিস ত?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি প্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না। পারিস ত আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায় চলিলাম কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ মাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম,

একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা এ যে সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায়, ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন বার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না। অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে ঐরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে, উহা বাহির হয় না। তোকে বল্লুম, মার কাছে যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি, তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই। তা আমি কি করিব।' বলিলাম, 'তাহা হইবে না মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐকথা বলিতেই হইবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' ঐরূপে যখন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা তাহা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁহাকে উপাসনা করিবার গূঢ় মর্ম্ম এতদিন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী মূর্ত্তি সকলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন ভক্তিভরে দর্শন করিতে পারিতেন না। এখন হইতে ঐরূপ উপাসনার সম্যক্ রহস্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আনয়ন করিল। ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। আমাদিগের জনৈক বন্ধু *

* শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল।

ঐ ঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

"তারাপদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম্ম করায় ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। তারাপদের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজন্য আফিসে তারাপদের নিকটে নরেন্দ্রকে ইতিপূর্ব্বে কখন কখন দেখিয়াছিলাম। তারাপদ একদিন কথায় কথায় বলিয়া-ও-ছিল পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ ভালবাসেন, তথাপি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি নাই। অদ্য মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে ছাখ্, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মান্‌ত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে তাই মার কাছে টাকা কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পার্‌লে না, বলে, 'লজ্জা কর্‌লে।' মন্দির থেকে এসে আমাকে বল্‌লে মার গান শিখিয়ে দাও—'মা ত্বংহি তারা' গানটি * শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে! তাই এখন ঘুমুচ্চে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না?' তাঁহার ঐকথা লইয়া বালকের ন্যায়

* (আমার) মা ত্বংহি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীন দয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।।
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য মূলে গো মা,
আছ সর্ব্ব ঘটে অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা।

আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, হাঁ, মহাশয় বেশ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারম্বার ঐকথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁসিয়া এক প্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখ্‌ছি কি এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বল্‌ছি—কিছুই তফাৎ বুঝ্‌তে পার্‌চি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। বুঝ্‌তে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব।' আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর ত ভারি হীনবুদ্ধি! তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত দুইখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই তিন

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা ॥

বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সে কথা শুনে কে? 'দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদবুদ্ধি' এই কথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্য দ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখন খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন!

"কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাণ মাত্র করিয়া ফিরিয়া থাকে।'"

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধদিগের প্রথম সভা এবং তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া বিবাদের বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "তাঁহাদের কিরূপ তেজ ছিল, তোমরা কি তাহা কল্পনায়ও আনিতে পার? একজন বলিলেন, 'আনন্দই সভাপতি হইবে, কারণ, সেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত।' কিন্তু আর একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'তাহা হইবে না। কারণ, আনন্দ তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন করার অপরাধে অপরাধী।' অমনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা হইল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু বুদ্ধ এই মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবিতেন, সমগ্র জগৎকে উপনিষদের উচ্চ আদর্শে উন্নীত করা যাইতে পারে। ফলে স্বার্থপরতা আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা অপেক্ষা বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ, তিনি দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ আপোষের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আপোষ করার জন্য অবতারপুরুষও যে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকে বুঝিতে না পারিয়া যে তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে—ইহা জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আপোষ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি সমগ্র এসিয়ায় ঈশ্বরের ন্যায় পূজিত হইতে পারিতেন। তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন জান? তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধত্ব একটী উচ্চ অবস্থা মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে!' বাস্তবিক তিনিই জগতে একমাত্র লোক,

যাঁহার সম্পূর্ণ মাথার ঠিক ছিল—সমগ্র জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।"

খৃষ্টান আমরা কষ্টকে পূজা করিতে ভালবাসি। স্বামিজী আমাদের ঐরূপ ভাবকে ঘৃণা করিতেন। ইহা ভারতবাসিগণের সম্যক্ চিন্তাশক্তিরই পরিচয়। পাশ্চাত্যে অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, বুদ্ধ যদি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব লোকের আরও অধিক হৃদয়গ্রাহী হইত! ইহাকে তিনি "রোমক নিষ্ঠুরতা" বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা নীচ এবং পাশব প্রকৃতির লোকেরাই একটা কিছু অসাধারণ রকমের ব্যাপারের পক্ষপাতী। সেই জন্যই জগৎ চিরকাল Epic বা মহাকাব্য ভালবাসিবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারত—'হেঁটমুণ্ডে গভীর অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন' (Hurled headlong down the steep abyss) ইত্যাকার রচনার স্রষ্টা মিল্‌টনের ন্যায় কবি প্রসব করেন নাই। ঐ কাব্যের সবটার বদলে ব্রাউনিংএর দুই ছত্র কবিতা পাওয়া গেলেও লাভ!" তাঁহার মতে খৃষ্টের জীবনবৃত্তান্তের এই কাব্যোচিত ওজোগুণই রোমকদিগের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম যে রোমীয় জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার ঘটনা হইতেই। তিনি আবার বলিলেন, "এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, পাশ্চাত্যবাসী তোমরা মস্ত মস্ত কাজ দেখিতে চাও! জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনাটীর কবিত্ব তোমরা এখনও বুঝিতে পার না। অল্পবয়স্ক মাতার মৃতপুত্র ক্রোড়ে বুদ্ধের নিকট আগমন,—ইহার সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা আর কি কোন সৌন্দর্য্য অধিক হইতে পারে? অথবা, ছাগদিগের জীবন-রক্ষার গল্পটী? তোমরা জান যে, মহাভিনিষ্ক্রমণ ব্যাপারটী ভারতে নূতন জিনিস ছিল না। গৌতম এক সামান্য রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকবার লোকে ঐরূপ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাণের পর, আহা দেখ কি কবিত্ব!

"রাত্রিকাল, অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি এক গোপের কুটীরে আগমন করিয়া ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। ছাঁচ হইতে বৃষ্টির জল ঝরিতেছে। মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে এবং বায়ুও প্রবলতর হইতেছে।

"ভিতরে গোপ জানালা দিয়া চকিতের মত একখানি মুখ দেখিতে পাইল, এবং মনে মনে বলিল, 'বা, বা, গেরুয়াধারী! থাক ঐখানে! তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।' তার পর সে গান ধরিল—

'আমার গরুবাছুর ঘরে উঠিয়াছে, আগুনও খুব জ্বলিতেছে; আমার স্ত্রী নিরাপদ, ছেলেমেয়েরাও সুখে নিদ্রা যাইতেছে! সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার।'

"বুদ্ধ বাহির হইতে উত্তর দিতেছেন, 'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যাহৃত; আমার হৃদয় দৃঢ়। সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার!'

"গোপ আবার গাইল, 'ক্ষেতে ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে, ঘাসগুলিও খামারে ভাল করিয়া রাখা আছে; নদীতে যথেষ্ট জল আছে, এবং রাস্তাগুলিও বেশ শক্ত। সুতরাং মেঘ সকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার!'

"এইরূপে খানিকক্ষণ চলিতে লাগিল, অবশেষে গোপ বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। *

"অথবা ক্ষৌরকার উপালির † গল্পটীর অপেক্ষা আর কিছু অধিক সুন্দর আছে কি?

* স্বামিজী এখানে সুত্তনিপাতান্তর্গত ধনিয় সুত্তের Rhys David কৃত পদ্যানুবাদের ভাবার্থটী স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন। Rhys David এর আমেরিকা বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য।

† এই 'উপালিপৃচ্ছা' নামক গল্পটী প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যে আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ একটী রচনা যে ছিল, তাহা 'বিনয় পিটক' প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে উহার উল্লেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

'ভগবান্ আমার বাটীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন।

আমি ক্ষৌরকার, আমারও বাটীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন!

'আমি দৌড়িলাম, কিন্তু তিনি নিজেই ফিরিলেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি ক্ষৌরকার, আমারও জন্য অপেক্ষা করিলেন!

'আমি বলিলাম, —প্রভু, তোমার সহিত কথা কহিতে পারি কি?

তিনি বলিলেন, হাঁ।

আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও 'হাঁ' বলিলেন।

'আমি বলিলাম—নির্ব্বাণ আমার মত লোকদের জন্য কি?

তিনি বলিলেন, হাঁ।

আমি ক্ষৌরকার আমার জন্যও!

'আমি বলিলাম—আমি তোমার পিছু পিছু যাইতে পারি কি?

তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই!

আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও!

'আমি বলিলাম—প্রভু, আমি তোমার নিকট থাকিতে পারি কি?

তিনি বলিলেন, পার।

আমি দরিদ্র ক্ষৌরকার, আমাকেও!'"

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে এইভাবে বলিতেছেন যে, উহার তিনটী যুগ আছে—পাঁচশত বৎসর বুদ্ধোক্ত বিধিসমূহের যুগ, পাঁচশত বৎসর প্রতিমাপূজার যুগ, এবং পাঁচশত বৎসর তন্ত্রের যুগ। বলিতে বলিতে তিনি সহসা সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "কখনও মনে করিও না যে, ভারতে কোন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম নামে একটী পৃথক ধর্ম্ম ছিল, আর তাহার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতাদি বর্ত্তমান ছিল! মোটেই নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম চিরকাল হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমগ্র জাতিটী সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল।" আমার মনে হয়, পণ্ডিতগণের নিকট স্বামিজীর উক্ত মতের সত্যতা আরও প্রতিপন্ন হইতে এখনও

বহু সময় ও অধ্যয়নের আবশ্যক হইবে। এই মতানুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল দেশ, প্রচারক প্রেরণ দ্বারা জয় করিয়াছিল, কেবল সেই দেশগুলিতেই সম্পূর্ণ নিজস্ব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কাশ্মীর এই সকল দেশের অন্যতম। স্বামিজী এই সম্বন্ধে এই মনোহর ইতিহাসটুকুর বর্ণনা করিলেন,—ঐ দেশে ভারতীয় মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন। ফলে স্থানীয় নাগগণ (অর্থাৎ লোকে পুণ্যতোয় কুণ্ডগুলির অভ্যন্তরে যে সকল অদ্ভুতক্ষমতাশালী সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করিত) তাহাদের দেবত্ব পদবী হইতে বিচ্যুত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাদের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে, লোকে পুরাতন সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করিয়া, অথচ নূতনগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া এক মহা সঙ্কটে পড়িল, এবং ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি পুরাতন কুসংস্কার ও নূতন সত্য এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা আপোষ করিয়া লইল। তাহারই ফলে নাগগণ নূতন ধর্ম্মের ঋষি বা গৌণ দেবতারূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মানুষ যে এইরূপ করিয়াই থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল নহে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রসূতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একটী প্রধান পার্থক্য এই যে, হিন্দুরা একই আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর পরিগ্রহ দ্বারা কর্ম্মসঞ্চয়ে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, এই আপাতপ্রতীয়মান একত্ব মায়া মাত্র, এবং ক্ষণিক। বৌদ্ধেরা বলেন যে, আমরা এ জীবনে যে কর্ম্ম সঞ্চিত রাখিয়া যাই, তাহা অপর এক আত্মা প্রাপ্ত হয়, এবং আমাদের ঐ অভিজ্ঞতা লইয়া নূতন কর্ম্মবীজ বপনে অগ্রসর হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বী মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টীতে কতটা সত্য নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে স্বামিজী অনেক সময় বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেন। তাঁহার মত, যাঁহাদের নিকট মহান্ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাঁহারা,—আর যাঁহারা কেবল উহার ছায়াংশে বাস করিয়াছেন, কতক পরিমাণে তাঁহারাও—দেখেন যে আত্মার শরীরে অবস্থিতি একটা চির-যন্ত্রণাদায়ী

বন্ধন। পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা শরীররূপ কারাগারের শলাকাসমূহে বিদ্রোহীর ন্যায় ক্রমাগত পক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকে; উহা শরীরের বহির্দ্দেশে এবং পারে সেই শুদ্ধ, চৈতন্যময়, ভাবঘন, সদানন্দ, পরম জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিতে পায়; উহাই তাহার আদর্শ এবং গন্তব্য স্থল। এই সকল ব্যক্তির নিকট শরীর, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার সহায় হওয়া দূরে থাকুক, বরং একটা আবরণ বা প্রাচীরস্বরূপ। সুখ দুঃখ সেই আদি জ্যোতিই—শুধু উহা ব্যষ্টিচৈতন্য-রূপ পরকলার মধ্য দিয়া আসিতেছে। লোকের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত—উহাদের উভয়ের অতীত হইয়া সেই শুদ্ধ, অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা।

আচার্য্যদেব প্রচলিত ধারণাসমূহ সহিতে না পারিয়া যে সকল মত প্রকাশ করিতেন, তাহাতে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবপরম্পরাই লক্ষিত হইত। যেমন, একদিন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! একজন্ম শরীর ধারণ করাই যেন লক্ষ লক্ষ বৎসর কারাবাস বলিয়া মনে হয়, লোকে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে চাহে! এক এক দিনের ভাবনা দুশ্চিন্তাই সেই দিনকার পক্ষে যথেষ্ট, আর অন্যদিনের ভাবনায় কাজ নাই!" তথাপি একই দীর্ঘ, শৃঙ্খলিত অভিজ্ঞতা পরম্পরায় বিভিন্ন ব্যক্তি-গণের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কতটা সম্বন্ধ—এই প্রশ্নটী তাঁহার সকল সময়েই চিত্তাকর্ষক হইত। পুনর্জ্জন্মবাদকে তিনি কখনও অবিসংবাদী সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার নিজের কাছে উহা একটী বিজ্ঞানসম্মত অনুমান মাত্র, তবে উহাতে মনের খুব সন্দেহ ভঞ্জন হয়। আমাদের পাশ্চাত্যদেশে, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হইতেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি—শিক্ষাসম্বন্ধে এই যে এক মত আছে, তাহার প্রতিকূলে স্বামিজী সর্ব্বদাই জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দেখাইয়া দিতেন যে, পাশ্চাত্যকথিত এই জ্ঞানোন্মেষ প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সুদূর অতীত জীবনে ঘটে বলিয়া আর উহাকে লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।

তথাপি উভয় পক্ষের সব বক্তব্য শেষ হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম অবশেষে দার্শনিক হিসাবে যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন বিচারাধীনই রহিয়া যায়। একই আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে, অথচ উহা সেই একই রহিয়া যাইতেছে—এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, সমস্তই ভ্রান্তিমূলক নহে কি? এবং পরিশেষে উহা 'একই সৎ, বহু অসৎ'—এই চরম অনুভূতির নিকট পরাভূত হয় না কি? একদিন তিনি দীর্ঘকাল একাকী চিন্তা করিয়া পরিশেষে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই 'বৌদ্ধধর্ম্ম ঠিক বলিতেছে! পুনর্জ্জন্ম মরীচিকা মাত্র! কিন্তু এই অনুভূতি কেবল অদ্বৈতমার্গেই লাভ হইতে পারে!"

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ণতাটুকু দূর করিবার জন্য অদ্বৈতবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, স্বামিজী যেন বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া কৌতুক দেখিতে ভালবাসিতেন। হয়ত, ইহাতে ইতিহাসের দুইটী বিভিন্ন যুগের সম্মিলন সাধিত হয় বলিয়া তিনি উহাতে এত প্রীতি অনুভব করিতেন; কারণ, উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে একটী অপরটীর সাহায্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—ইহাই ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইল। মনুষ্যত্বের চরম 'বিকাশের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে তিনি সর্ব্বদাই "বুদ্ধের হৃদয় এবং শঙ্করাচার্য্যের মনীষা"—এই কথা কয়টীর প্রয়োগ করিতেন। বৌদ্ধ কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে জনৈক পাশ্চাত্য রমণীর যুক্তিসমূহ তিনি ঐরূপ ভাবেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত মত গ্রহণ করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে একটা অসাধারণ সামাজিক দায়িত্ববোধ* আসিয়া থাকে, সে কথা এই রমণী ধরিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "যে স্থলে আমার কৃত সৎকর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিতে পাইব না, অন্যে করিবে,

* যদি আমরা ভাবি যে, আমাদের দুষ্কৃতসমূহের ফলভোগ আমরা না করিয়া অপরে করিবে, তাহা হইলে আমাদের সৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিটী আরও দৃঢ়ীভূত হয়। অপরের সম্পত্তি বা সন্তানসন্ততি রক্ষার জন্য আমরা যে অধিক দায়িত্ববোধ করিয়া থাকি, তাহাও এই জাতীয়।

সে স্থলে কেন আমি আদৌ সেরূপ কর্ম্ম করিতে যাইব, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না!"

স্বামিজী নিজে এরূপ ভাবে চিন্তা করিতে একান্ত অশক্ত হইলেও উক্ত মন্তব্য তাঁহার খুব মনে লাগিল, এবং তিনি দুই এক দিন পরে সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "সে দিন যে কথাটী উত্থাপিত হইয়াছে, সেটী বড় চমৎকার কথা,—অর্থাৎ পরোপকার করিবার কোনই কারণ থাকে না, যদি যাহাদের উদ্দেশে উহা করা হয় তাহারা না হইয়া অপরে উহার ফলভোগী হয়!"

যাঁহাকে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন, তিনি অশিষ্টের মত উত্তর দিলেন, "কিন্তু উহা লইয়া ত তর্ক হয় নাই! কথাটী এই ছিল যে, আমি ছাড়া অপর কেহ আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগী হইবে!"

স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তাহা জানি, কিন্তু আমাদের পরিচিতা রমণী যদি ঐ ভাবে কথাটী উঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মতটী আরও যুক্তিযুক্ত হইত। বরং তিনি ঐ ভাবেই প্রশ্নটী করিয়াছেন—অর্থাৎ আমরা কাহারও উদ্দেশে সেবা করিয়া বঞ্চিতই হইয়া থাকি, কারণ, ঐ সেবা তাহাদিগের নিকট পৌঁছায় না। দেখিতেছ না, উহার একটী মাত্র উত্তর আছে, তাহা অদ্বৈতবাদ! কারণ, আমরা সকলেই এক!"

তিনি কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান কালের হিন্দুমনের মধ্যে এইটীই প্রভেদ যে, ভারতের আধুনিক ধারণায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধের জন্য স্থান থাকিবেই? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন যে, যে রামায়ণ ও মহাভারত গুপ্তরাজগণের সময় হইতে ভারতীয় শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত অতঃপর সাধারণ লোকে অশোকের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইতিহাসও জুড়িয়া দিবে? এসিয়ার পক্ষে এরূপ একটী সমন্বয়ের অর্থ কতদূর ব্যাপক, উহাতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে কি নব জীবন বৌদ্ধ দেশসমূহে সঞ্চারিত হইবে, আবার জননীস্বরূপ হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে চিনিতে পারিয়া কন্যাস্থানীয় বৌদ্ধ জাতিসমূহকে

জ্ঞানামৃতদানে তৃপ্ত করিলে স্বয়ং ভারতও কত বলবীর্য্য লাভ করিবেন—এ সকল কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন কি? ভাবিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই দুইটী ধর্ম্মের দৃঢ় সম্মিলনভূমি তিনি হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জননীই (হিন্দুধর্ম্ম) সর্ব্বমত-সমঞ্জসা; কন্যা (বৌদ্ধধর্ম্ম) নহেন। তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী জননী, তাই তিনি চিরকালের জন্য তাঁহার অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা বীরহৃদয়, মহামহিম বুদ্ধাবতারকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তিনি তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়সমূহকে স্থান দান করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা বুঝিতে পারেন ও উহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে মাতার ন্যায় স্নেহ করেন, এবং তিনি যে সকল নবজাত সন্তান তাঁহার পাদমূলে আনিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কখনও বলিবেন না যে, বুদ্ধ সত্যকে যে আকারে প্রচার করিয়াছেন, তাহার বাহিরে আর সত্য নাই; কখনও বলিবেন না যে, শুধু সন্ন্যাসীর নিয়মের মধ্য দিয়াই মুক্তি লাভ হয়; অথবা চরম পূর্ণতালাভের মাত্র একটী পথ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি সম্ভবতঃ এইটী :—

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন, 'যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই মায়া বলিয়া জানিও!' আর হিন্দুধর্ম্ম বলেন, 'জানিও যে মায়ার অন্তরালে সেই সত্য বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছেন।' কি করিয়া এই অনুভূতি লাভ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম কোন ধরাবাধা নিয়ম করিয়া দেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের আদেশ শুধু সন্ন্যাসমার্গের দ্বারাই পালন করা চলে; হিন্দুধর্ম্মের আদেশ জীবনের সকল অবস্থায় পালিত হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম বলেন যে, সকল মতই সেই অদ্বিতীয় সত্যে উপনীত হইবার এক একটী পথ। হিন্দুধর্ম্মের এক অতি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এক ব্যাধের (ধর্ম্মব্যাধ) মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।

ব্যাধ এক পতিব্রতা রমণীর নির্দেশক্রমে এক সন্ন্যাসীর নিকট ঐ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন (ব্যাধগীতা)। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সন্ন্যাসাশ্রমের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও, চিরকাল নিষ্ঠাপূর্ব্বক দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পালনকেই—তা যাহার যেরূপ হউক না কেন—ঈশ্বরলাভের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে।"

(ক্রমশঃ)

তন্ত্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়)

গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা ভারতে অতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত—এমন কি, বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগেও উহার প্রচলনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনতম উপনিষদ্‌সমূহে যদিও সকল স্থানে "গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান্" এরূপ ভাবের ততটা স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি শিষ্যগণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর সেবা করিতেন দেখিতে পাই, তাহাতে গুরুর ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস—গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে পূর্ব্বাবধিই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎকালেও আচার্য্য-সেবাই জ্ঞানলাভের প্রধান সাধন ছিল। যে শিষ্য যতটা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত গুরুর সেবা করিত তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ততটা ফুটিয়া উঠিত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" অর্থাৎ তাহার (ব্রহ্মের) প্রত্যক্ষানুভূতিলাভের জন্য সে (শিষ্য) সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে; "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" অর্থাৎ যে পুরুষের আচার্য্য আছে তিনিই জ্ঞান লাভ করেন; "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

অর্থাৎ যাঁহার দেবে (ঈশ্বরে) পরম ভক্তি আছে এবং ঈশ্বরে যেমন গুরুতেও তেমনি ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শ্রুতিমন্ত্র-সমূহের অভ্যন্তরস্থ সত্যসকল প্রকাশিত হয়।

উপনিষদের অনুসরণ করিয়া শ্রীভগবানও গীতায় বলিতেছেন, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" জ্ঞানের সাধন বলিতে গিয়া আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—"আচার্য্যোপাসনং" ইত্যাদি। সপ্তদশ অধ্যায়ে শারীরতপস্যার কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন—"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং" ইত্যাদি। অবশেষে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—"ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং" অর্থাৎ গুরুসেবাহীন ব্যক্তিকে গীতা বলিবে না। ভাগবতাদি পুরাণ সমূহেও গুরুভক্তি সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেখিতে পাই। ফলতঃ, শ্রুতি এবং তদনুবর্ত্তী হইয়া স্মৃতিও উচ্চকণ্ঠে একতানে আচার্য্যোপাসনার মহিমা প্রচার করিতেছেন। তন্ত্রও এ ক্ষেত্রে শ্রুতিরই সম্যক্ অনুবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রুতিতে যে ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাই, পুরাণাদিতে ক্রমবিকশিত হইয়া তন্ত্রে তাহাই যেন মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণত। শ্রুতিতে আচার্য্যোপাসনা সম্বন্ধে সূত্রাকারে যে উপদেশ নিবদ্ধ আছে, তন্ত্র যেন তাহারই বিস্তৃত ভাষ্য করিয়াছেন মাত্র। মহাভারতের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটা কথা আছে যে,—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" শ্রুতির সম্বন্ধেও এই কথাটী বেশ খাটে এবং আমরা বলিতে পারি যে, যাহা শ্রুতিতে নাই তাহা ভারতীয় ধর্ম্মে নাই। শুধু তাই বা বলি কেন ?—জগতের কোন ধর্ম্মেই নাই। সুতরাং ভারতে প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মভাবেরই বীজ আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাইব, ইহা নিঃসন্দেহ। গুরুর ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু পরবর্ত্তী পুরাণতন্ত্রাদির ন্যায় শ্রুতিতে বিশেষরূপে ও বিস্তৃতভাবে শ্রীগুরুর মহিমা লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। ইহার কারণ কি ?

ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। এক কারণ হইতে পারে যে, শ্রুতি ত সাধারণ ভাবেই ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিতেছেন—"তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম", "একো দেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং গুরু যে ব্রহ্ম তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার কি প্রয়োজন? সব বিশেষ উপদেশই ত ঐ সাধারণ উপদেশেরই অন্তর্ভুক্ত? ঐ সাধারণ উপদেশ-সমূহকে ভিত্তি করিয়া যাহার যে ব্যক্তি বা বস্তু ভাল লাগে, সে প্রথমে তাহাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে পারে এবং উহাতে সফলপ্রযত্ন হইলেই তাহার সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের চক্ষু খুলিয়া যাইবে। তবে কথা এই যে, এই কামকাঞ্চনসংস্পর্শকলুষিত সংসারে কেবল শ্রীগুরুর প্রতিই কামকাঞ্চনগন্ধহীন বিশুদ্ধ ভালবাসা হওয়া সম্ভব। আর সে ভালবাসা না হইলে ভগবৎপ্রেমের স্বর্গীয় ভাব জীবের মলিন মনবুদ্ধির অনধিগম্য। তাই শাস্ত্রকারগণ গুরুপ্রতীক অবলম্বনে অগ্রসর হইবার জন্য সাধকমাত্রকেই উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রুতিতে শ্রীগুরুর মহিমা পুরাণতন্ত্রাদির ন্যায় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ না থাকার আরও এক কারণ হইতে পারে যে, বৈদিকযুগে জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ ঋষিকুলের অভ্যুদয় হইলেও অবতারশ্রেণীর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব পৌরাণিক যুগেই হইয়াছিল। সকলের মধ্যেই ব্রহ্মত্ব অন্তর্নিহিত আছে এ বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও এই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত মানবদেহের মধ্যেই যে অনন্ত ভগবচ্ছক্তির পূর্ণাভি-ব্যক্তি হইতে পারে তাহা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ভারত শিখিয়াছে। তাঁহাদের অতিমানুষ কার্য্যকলাপ দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই ভারত "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" বলিয়া শ্রীগুরুর স্তব করিয়াছে। ফলতঃ, অবতার-গুরুর অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ ও লীলাসমূহ দেখিয়াই যেন পুরাণতন্ত্রাদি শ্রীগুরুর মহিমাকীর্ত্তনে শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে সেই অবতার-গুরুর শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে সকলের মধ্যেই

সেই আদি শ্রীগুরুর সঞ্চারিত গুরুশক্তি বিদ্যমান আছে ভাবিয়া সকল গুরুতেই পূর্ণব্রহ্মবোধ আনয়নের উপদেশ দিয়াছেন।

এখন গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলেন তাহা দেখা যাউক। নিম্নে আমরা তন্ত্রশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেনঃ—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোম্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোঽনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাৎ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোঽহমাকৃতির্দ্দেবি নর দৃগ্‌গোচরা ন হি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥

* * *

সদাশিবস্য দেবস্য শ্রীগুরোরপি পার্ব্বতি।
উভয়োরন্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী॥

* * *

শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্নামি পার্ব্বতি।
গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশং নিকৃন্তয়ে॥"

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! যে শিব সর্ব্বব্যাপী, আবার যিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অণু হইতেও অণু, যাঁহার কণা অর্থাৎ অংশ নাই, যিনি মনোরাজ্যের ঊর্দ্ধে, যিনি অব্যয়, যিনি আকাশতত্ত্বের মত (সর্ব্বত্রই অনুস্যূত আছেন অথচ ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিবার যো নাই), যিনি অজ ও অনন্ত সেই নির্গুণ পুরুষকে কি ভাবে পূজা করা যায়? তাই (জীবের পূজা গ্রহণ করিয়া জীবকে ধন্য করিবার জন্য) সেই চরাচর গুরুই মনুষ্য গুরুরূপ আশ্রয় করিয়াছেন। হে দেবি! তাঁহাকে ভক্তির সহিত সম্যক্ পূজা করিবে। (পূজিত হইয়া তিনি) ভোগ মোক্ষ (যার যেরূপ মানসিক অবস্থা তদনুসারে) দান করেন। হে দেবি!

আমি শিব, আমার মূর্ত্তি জীবের নয়নগোচর নহে। তজ্জন্য আমি সর্ব্বদা শ্রীগুরুরূপে শিষ্যদিগকে (দর্শন দিয়া) রক্ষা করি। স্বীয় শিষ্যগণকে অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ পরমশিব অর্থাৎ নিগুর্ণ ব্রহ্ম মনুষ্যচর্ম্মে আবৃত হইয়া গুপ্তভাবে (সাধারণ জীবের রাক্ষসী ও আসুরী জ্ঞানের অতীত থাকিয়া) পৃথিবীতে পর্য্যটন করেন। হে পার্ব্বতি! সদাশিব এবং শ্রীগুরু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই—যে ভিন্ন জ্ঞান করে সে পাতকী। হে পার্ব্বতি! আমি শিবরূপে সংস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করি (ধ্যানভজনাদি সাধনের বিষয় হই), আর গুরুরূপ গ্রহণ করিয়া (সাধকের) ভবপাশ ছেদন করি।'

তন্ত্র হইতে এইরূপ আরও অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা পৃথক ভাবে দেখিবারও প্রয়োজন নাই—মূল ভাবটী দেখিলেই হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখিলাম গুরুদেহ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি। সাধককে মায়ার পর পারে লইয়া যাইবার জন্য তিনিই শ্রীগুরুরূপে আগমন করেন। নতুবা ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য যে জীবের ভববন্ধন মোচন করে? তাঁহার তত্ত্ব তিনি না জানাইলে কাহার সাধ্য তাহা জানে? তাই সেই ইষ্টদেবই লীলায় শ্রীগুরুরূপ ধারণ করিয়া, শিষ্যকে তাঁহার স্বরূপাভিমুখে অগ্রসর করিতে থাকেন। সাধনরাজ্যের সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে শিষ্য যখন শ্রীগুরুর করুণাবলে ইষ্টমূর্ত্তির সম্মুখীন হয় তখনই গুরু ইষ্টে লীন হইয়া যান—শিষ্যের নিকট তখন গুরু আর ইষ্ট দুটী জিনিষ থাকে না, এক হইয়া যায়। তখন গুরুকে আর গুরুরূপে দেখা যায় না, গুরুতেই তখন ইষ্ট দর্শন হয়, সুধু গুরুতেই বা বলি কেন, সর্ব্বত্রই যে তখন ইষ্টদর্শন হয়—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" তখনই "নৈব গুরুর্নশিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ" শিবোঽহং শিবোঽহং" এ বাক্যের সার্থকতা হয়। কিন্তু সে অদ্বৈতাবস্থা লাভের পূর্ব্বে "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ" এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীগুরুরস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা আর একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, সকল গুরুই এক—তোমার গুরু, আমার গুরু, তাঁহার গুরু—পরস্পর ভিন্ন নহেন। পার্থিবদেহে তোমার গুরু, আমার গুরু পরস্পর ভিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু গুরুতত্ত্বের স্বরূপে সকলেই অভিন্ন। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।" অর্থাৎ আমার নাথই জগতের নাথ, আমার গুরুই জগতের গুরু। যোগিনীতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, মহাদেব বলিতেছেন :—

> আদিনাথো মহাদেবি মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ।
> গুরুঃ স এব দেবেশি সর্ব্বমন্ত্রেষু নাপরঃ॥
> মন্ত্রপ্রদানকালে হি মানুষে নগনন্দিনি।
> অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি॥
> অতস্তু গুরুতাদেবি মানুষে নাত্র সংশয়ঃ।
> মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যদ্‌ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ॥
> তদ্‌ধ্যানং কুরুতে দেবি শিষ্যোঽপি শীর্ষপঙ্কজে।
> অতএব মহেশানি এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ॥
> অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মানুষেষু মহেশ্বরি।
> মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তস্য সর্ব্বশাস্ত্রেষু শঙ্করি॥"

অর্থাৎ—হে মহাদেবি! যিনি আদিনাথ মহাকাল, হে দেবেশি, সর্ব্বমন্ত্রে তিনিই গুরু—অন্য কেহ নহেন। নগনন্দিনি! শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান কালে মানবের দেহে সেই মহাকালের অধিষ্ঠান হয়। শঙ্করি! তজ্জন্যই মানবের গুরুত্ব ইহা নিঃসংশয়। দেবি! মন্ত্রদাতা নিজ শিরঃপদ্মে গুরুর যাদৃশ মূর্ত্তি ধ্যান করেন, শিষ্যও নিজ শীর্ষপঙ্কজে গুরুর সেই স্বরূপই ধ্যান করেন। অতএব, হে মহেশ্বরি, গুরু শিষ্য উভয়ের নিকটেই গুরুপদার্থ এক। শঙ্করি! মনুষ্য গুরুর দেহে সেই পরমগুরুর অধিষ্ঠান হয়—এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে সেই গুরুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন—"মুক্তির্ন জায়তে দেবি মানুষে গুরুভাবনাৎ।

এই উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে সকল গুরুর একত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া তন্ত্র শ্বেতপদ্মাসীন শ্বেতমাল্যাম্বরধারী গুরুর একটী বিশেষ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তুমি আমি ভিন্ন ভিন্ন মানব গুরুর শিষ্য হইলেও গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে ঐ এক মূর্ত্তিই তোমার আমার এবং সকলেরই ধ্যান করিতে হইবে। যাহাতে লোকে গুরুর জড় দেহটার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ ভুলিয়া না যায় এই সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই তান্ত্রিক আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিষ্য সকলের জন্য গুরুর এক প্রকার ধ্যানই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এতটা সাবধানতা অবলম্বন না করিলেও চলিত। কারণ, সবই ত সেই অনন্ত ব্রহ্মের এক একটী রূপ মাত্র। সুতরাং নিজের গুরুর মূর্ত্তিটীকেই ঠিক ঈশ্বরমূর্ত্তি ভাবিয়া ধ্যান করিলে এমন কি দোষের বিষয় হইতে পারে? মন লইয়া কথা। আমি যদি ঈশ্বরভাব ঠিক রাখি তবে যেখানে ইচ্ছা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। আমি যদি মনে রাখি যে, আমার গুরুমূর্ত্তিটীও অনন্তরূপী শ্রীভগবানের একটী রূপ, আমাকে কৃপা করিবার জন্য তিনি ঐরূপে অবতীর্ণ—তাহা হইলেও ত একত্বের কিছুমাত্র বাধা হয় না। যেহেতু, কারণ-স্বরূপে ত সকলেই এক। উপনিষদ্ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" "অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" গুরুর পার্থিব মূর্ত্তিটীর ধ্যান করায় আরও সুবিধা এই যে, উহাতে আর কাল্পনিক রূপ ধ্যান করিতে হয় না। যে রূপটী চিরদিন প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছি, যে রূপের সঙ্গে আমার প্রাণের অনেক মধুর স্মৃতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত সেই রূপটী ধ্যান করিতে আমার আর বৃথা কল্পনায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিতে হয় না। সে রূপটী হৃদয়ে উদয় হইবামাত্রই আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, জীবনের কত মধুরিমাময় চিত্র চিত্তপটে উদয় হয়—জোর করিয়া ভক্তি আনয়ন করিতে হয় না, আপনা আপনি ভক্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। প্রকৃতিই আমাকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীগুরুর মহিমা সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর উক্তি আছে। কিন্তু ঐ সমুদয় উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, তাই গুরুতত্ত্বের আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

নীচে (Friedrich Nietzsche) রচিত গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ।

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল)

নীচে রচিত সমুদয় গ্রন্থগুলিকে পর পর সাজাইয়া, আমরা তাহার কোনটীতে কি তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে মোটামুটি তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোন কবি বা দার্শনিকের গ্রন্থাবলীকে পর পর সাজাইয়া গেলেই সেই সমস্ত গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ হয় না। শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে কোন একটা আদর্শের অনুপাতে করিতে হয়।

(ক) পাশ্চাত্যদেশে হেফ্ডিং (Höffding) এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের একটা চেষ্টা করিয়াছেন। নীচের গ্রন্থাবলীতে আমরা কতকগুলি বড় বড় তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই—যেমন পুনরাবর্ত্তন (Eternal Recurrence), অতিমানুষবাদ (Superman), প্রভু ও দাসের নীতি (Master and Slave morality), শক্তির অর্জ্জনে প্রবৃত্ত ইচ্ছা (The will to Power), ইত্যাদি। এই সমস্ত তত্ত্ব যে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে এক এক শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া হেফ্ডিং একটি তত্ত্বের সহিত আর একটি তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়েরও চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে নীচের উদ্ভাবিত বিভিন্ন তত্ত্বের

পরস্পর অসামঞ্জস্য ও নীচের অব্যবস্থিত চিত্ততার উপর কটাক্ষ করিয়া হেফ্‌ডিং নীচের গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ কার্য্যের দুরূহতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছেন। হেফ্‌ডিংএর এবম্বিধ শ্রেণীবিভাগ একমাত্র সম্ভবপর শ্রেণীবিভাগ বলিয়া ধরিয়া না নিলেও ইহাতে হেফ্‌ডিংএর বিশ্লেষণমূলক (analytic) সমালোচনার প্রশংসা আমরা করিতে বাধ্য।

(খ) নীচের মানসিক অবস্থা সব সময়ে একরকম থাকিত না। কখন কখন তিনি সুস্থ থাকিতেন, আবার কখন কখন তাঁহার মানসিক অসুস্থতা ও বিকার দেখা দিত। কাজেই যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তাহা কখন সুস্থ অবস্থায় কখনও বা বিকারের অবস্থায়। সুতরাং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর যেগুলি সুস্থ অবস্থায় লিখিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর যে গুলি মানসিক বিকারের অবস্থায় লিখিত।

কিন্তু আমাদের মতে ইহা খুব উচ্চদরের শ্রেণীবিভাগ নহে। নীচে যে রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার উদ্ভাবিত তত্ত্বাদি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ উদ্ভট বলিয়া মনে হয় তাহাতে তাঁহার কোন্ তত্ত্ব সুস্থ অবস্থায় এবং কোন্ তত্ত্ব বিকারের অবস্থায় উদ্ভাবিত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। নীচের মানসিক অবস্থা সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা হইতে স্বভাবতঃই পৃথক, ইহা বলা যত সহজ, কোন্ গ্রন্থ লিখিবার সময়ে নীচের মানসিক অবস্থা সাধারণ মানুষের মত সুস্থ, আর কোন্ গ্রন্থ লিখিবার সময় তাহা নয়, ইহা বলা তত সহজ নহে। এরূপ বলিলে নীচের সমগ্র মানসিক অবস্থার মধ্যে যে এক অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে এবং সমস্ত অবস্থার পশ্চাতেই যে এক অখণ্ডমন বিরাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে বিস্মরণ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

(গ) অনেকের নিকট নীচের দার্শনিক তত্ত্বগুলির কোনই মূল্য নাই। তবে শিল্পী (Artist) বা কবি (Poet) হিসাবে তাঁহার স্থান খুব উচ্চে একথা তাঁহারা স্বীকার করেন। সুতরাং কাব্যের

হিসাবে তাঁহার যে সমস্ত গ্রন্থগুলি উৎকৃষ্ট তাহাই প্রথম শ্রেণীর, আর তদতিরিক্ত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

এই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে, নীচের সকল সমালোচকই নীচেকে শিল্পী হিসাবে প্রথম স্থান দিয়া, দার্শনিক হিসাবে দ্বিতীয় স্থান দেন নাই। পরন্তু এমন সমালোচকও থাকিতে পারেন, যাঁহারা নীচের কবিত্ব অপেক্ষা দার্শনিকতারই অধিকতর পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহাদের নিকট উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ একেবারেই উল্টা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ইহা নিশ্চিত। এরূপ শ্রেণীবিভাগ সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে না।

(ঘ) পাশ্চাত্য সভ্যতায় কতকগুলি জটিল সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা লইয়া খুব বিব্রত। এমন কি ঐ সমস্ত সমস্যার মীমাংসার উপরেই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। নীচেও ঐ সমস্ত সমস্যাগুলির মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থগুলি, তাহা কাব্যই হউক আর দর্শনই হউক, রচনা করিয়াছেন। নীচের ঐ সমস্ত মীমাংসার উপযোগীতা ও সভ্যতার উপর এযুগে তাঁহার প্রতিভা ও কৃতিত্ব স্থান পাইবে। সুতরাং অনেকের মতে নীচের মীমাংসার উপযোগীতার অনুপাতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ হওয়া সঙ্গত।

ইহা একটি সমীচিন এবং প্রণিধানযোগ্য কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিবে যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার যদি একটা সঙ্কট মুহূর্ত্তই উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে সেই সঙ্কটকালে তাহার সমস্যাগুলি কি? এবং তার পর অন্যান্য পণ্ডিতেরা যে গুলিকে সমস্যা বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন, নীচেও সেই গুলিকেই আসন্ন সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিনা? যদি এই সমস্যা নিরূপণ বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতদের সহিত নীচে একমত না হইয়া থাকেন, অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে যে গুলি সমস্যা সেগুলিকে যদি নীচে সমস্যা বলিয়াই স্বীকার না করেন, তবে নীচের উদ্ভাবিত

মীমাংসা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মীমাংসার কোন তুলনামূলক বিচারই হইতে পারে না।

নীচের প্রদর্শিত সমস্যা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের নিরূপিত সমস্যার পার্থক্য লইয়াও একটা বিচার চলিতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্ত্তমানে প্রকৃত সমস্যা কি, তাহা এখনই একেবারে বলিয়া ফেলা ও সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকার করা সঙ্গত হইবে না। তজ্জন্য আমাদিগকে এখনও কিছুকাল ধৈর্য্যের সহিত অনাগত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-ইতিহাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং উল্লিখিত আদর্শের অনুপাতে নীচের গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ সহজ ও সঙ্গত হইবে না।

(ঙ) নীচের লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক সমালোচক কেবল কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রলাপবাণী দেখিতে পান। আরও আক্ষেপের বিষয় এই, সমস্ত প্রলাপবাণী আবার অসংবদ্ধ ও পরস্পর-বিরোধী : যাহা অসংবদ্ধ ও পরস্পরবিরোধী তাহার মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য ও মিলের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া নীচের গ্রন্থাবলীকে একটা প্রাঞ্জল শ্রেণীবিভাগে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে।

এই রকমের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা আগে হইতেই একটা সিদ্ধান্ত লইয়া উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। এবং এই কল্পিত সিদ্ধান্তের সত্যতার উপরেই—এই শ্রেণী-বিভাগের উপযোগীতা নির্ভর করিতেছে। যদি এই কল্পিত সিদ্ধান্ত সত্য না হয় তবে তাঁহাদের এই শ্রেণীবিভাগের স্থান কোথায় ?

তবে, কবি ও দার্শনিক হিসাবে, নীচের মনের গতি ও পরিণতির একটা ক্রমাভাষ এবং তাঁহার উদ্ভাবিত বিচিত্র দার্শনিক তত্ত্বগুলির উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি, কাব্যের ভাষায় ঐ সমস্ত তত্ত্বের আশ্চর্য্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তির হেতু নির্ণয়—এই সমস্ত যদি উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগে সম্যক্ ফুটিয়া উঠে তবে অন্যান্য

আদর্শের অনুপাতে শ্রেণীবিভাগ হইতে ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করা যাইবে না।

(চ) কেহ বলেন, নীচে একজন দার্শনিক। কেহ বলেন, তিনি একজন কবি। আবার অনেকের মতে তিনি এক সঙ্গে কবি ও দার্শনিক—দুইই। অধিকাংশ সমালোচকই এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী।

কবির কাব্যের শ্রেণীবিভাগ চলে, দার্শনিকের দর্শনেরও শ্রেণীবিভাগ চলে। কিন্তু যাহা একসঙ্গে কাব্য ও দর্শন—দুইই, তাহার শ্রেণীবিভাগ বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে। হেফ্‌ডিং বলিয়াছেন যে, নীচের অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও পরস্পর-বিরোধী উক্তিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগের পক্ষে এক প্রবল অন্তরায়। তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা বলিতে চাই যে, নীচের গ্রন্থাবলী একসঙ্গে কাব্য ও দর্শন বলিয়াই, তাহার শ্রেণীবিভাগ সমালোচকের পক্ষে এতাদৃশ বিঘ্নসঙ্কুল।

নীচের গ্রন্থালোচনায় আমাদের ধারণা এইরূপ যে, (১) কতকগুলি গ্রন্থ সৃষ্টিমূলক (creative), আর কতকগুলি গ্রন্থ সমালোচনামূলক (critical); (২) আর সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলি সৃষ্টিমূলকগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা বা টীকাস্বরূপ লিখিত।

আরও আমাদের ধারণা যে, যে সমস্ত গ্রন্থ সৃষ্টিমূলক তাহার তত্ত্বের অংশে দার্শনিকতার উদ্ভব—আর ভাষায় প্রকাশের অংশে কাব্যের সৃষ্টি। সৃষ্টিমূলক গ্রন্থাদিতে দর্শন ও কাব্যের এইরূপ মৌলিক সংমিশ্রণের জন্যই, তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সমালোচনামূলক গ্রন্থাদির সৃষ্টি। কিন্তু এই সমালোচনামূলক গ্রন্থাদিও নীচের বিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া, ইহারও ভাবে ও ভাষায় এক নূতন সৃষ্টি। বস্তুতঃ প্রত্যেক সৃষ্টিমূলক গ্রন্থের মধ্যেও সমালোচনা আছে, আবার প্রত্যেক সমালোচনামূলক গ্রন্থেই নূতন সৃষ্টি বিদ্যমান। প্রভেদ এই যে, সৃষ্টিমূলক গ্রন্থে সমালোচনা প্রচ্ছন্ন—সৃষ্টি প্রকট। আর সমালোচনামূলক গ্রন্থে সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন—

সমালোচনা প্রকট। উভয় শ্রেণীর গ্রন্থই শিল্পীর (artist) প্রতিভা প্রসূত।

নীচের প্রথম গ্রন্থ 'Birth of Tragedy' কল্পনাবহুল, সৃষ্টিমূলক। শেষ গ্রন্থ 'Ecce Homo' সমালোচনামূলক। 'The Dawn of Day', যাহাতে তিনি পুনরাবর্ত্তন (Eternal Recurrence) মতবাদ প্রচার করিয়াছেন ; এবং 'Thus Spake Zarathustra', যাহাতে তিনি অতিমানুষবাদ (Superman) তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, —এই দুইখানি গ্রন্থই বিশেষভাবে সৃষ্টিমূলক। আবার 'Thoughts out of Season' এবং 'The Genealogy of Morals' গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত সমালোচনা-মূলক। 'Human, All-too-Human' একখানি প্রতিক্রিয়ামূলক আত্মোপলব্ধির গ্রন্থ—ইহাও সমালোচনামূলক। 'The Joyful Wisdom' এবং 'Beyond good and evil' ইহারা কল্পনাবহুল কাব্য বিশেষ। এই দুইখানি গ্রন্থ ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি সৃষ্টিমূলক গ্রন্থের (The Dawn of Day, Thus Spake Zarathustra) পর পর রচিত বলিয়াই ঠিক ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ সমালোচনামূলক গ্রন্থের শ্রেণীতে আমরা সন্নিবেশিত করিতে প্রস্তুত নহি। পরন্তু দুইটি গভীর তত্ত্বসমন্বিত গ্রন্থের পরে পরে এই দুইখানি গ্রন্থে নীচে তত্ত্ব ছাড়িয়া যেন কল্পনার মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। নীচের মানসিক গতি ও পরিণতির মধ্যে এই রকমের একটা প্রয়াস তাঁহার গ্রন্থরচনার পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা হইতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'The Will to Power' এক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। ইহাতে নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও যথেষ্ট প্রসার দেখিতে পাই। নীচের যাহা মূলতত্ত্ব, এই গ্রন্থে সেই তত্ত্বের, উপ-লব্ধির জন্য যেরূপ সাধনা আবশ্যক তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে সৃষ্টি ও সমালোচনা দুইই দৃষ্ট হয়।

আমাদের এই উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাতে কোন ত্রুটি নাই, এমন কথা বলিতে সাহসী নহি। যে কোন আদর্শের অনুপাতে যে কোন বড় দার্শনিক বা কবির গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ

করিতে গেলে, যে সমস্ত ত্রুটি অনিবার্য্য, তাহা আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। তবে পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের সম্মুখে নীচে রচিত গ্রন্থাদির এই কথঞ্চিৎ নূতন শ্রেণীবিভাগ উপস্থিত করিতে আমরা অভিলাষী।

নীচের উপর প্রভাব।

গ্রীক সভ্যতা।

প্রথম হইতেই নীচের জীবনে আমরা গ্রীক সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করি; এবং গ্রীকের আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে কার্য্য করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। কি নূতন তত্ত্বের উদ্ঘাটনে কি কাব্য-সৃষ্টিতে গ্রীক প্রভাব তাঁহার মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ সমালোচকই এবিষয়ে একমত। খৃষ্টান ধর্ম্মের নিষেধাত্মক (Nay Saying) নীতির আদেশের (commandments) বিরুদ্ধে নীচের যে ভীষণ সমরঘোষণা, মানব জীবনের একটা বাধামুক্ত, পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশের জন্য নীচের যে ব্যাকুলতা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহার মূলেও গ্রীক প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ নীচে খৃষ্টান ছিলেন না, গ্রীক বা প্যাগ্যান (pagan) ছিলেন। ইউরোপের সভ্যতার বর্ত্তমান সমস্যাসকল তিনি গ্রীক আদর্শের অনুপাতেই সম্পূরণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইউরোপের অন্ধযুগের (Dark Age) পর, পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীক সাহিত্য যে নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রীক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া, নীচেও তদনুরূপ আর একটি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে নীচে—

(১) গ্রীক সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। গ্রীকের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের (Valour, Virtue) আদর্শ তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে গ্রীকের নীতি-বাদ বা Justice এর আদর্শ তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। এবং তাহা পড়ে নাই বলিয়াই মনুষ্যজীবনের বিকাশের জন্য যে সমস্ত

তত্ত্বের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত থাকিলেও সেই সমস্ত মূলতত্ত্ব হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ নীতিবিগর্হিত হইয়াছে এবং স্ববিরোধী দোষে দুষ্টও হইয়াছে। কোন একটা পূর্ণ জিনিষের অংশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে যে সমস্ত একদেশদর্শিতা ও ক্রটি অনিবার্য্য, নীচের মধ্যে আমরা তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি।

(২) দ্বিতীয় কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে যে নবযুগের সূচনা দেখা দিয়াছে, তাহা শুধু গ্রীক সভ্যতার প্রেরণা হইতে সফলতা লাভ করিতে পারে না। ইউরোপকে যুগে যুগে উদ্বোধিত করিতে যাইয়া গ্রীক সভ্যতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আর গ্রীক সভ্যতার দিবার বিশেষ কিছু নাই। অনেক পণ্ডিতদের মতে ইউরোপের এই নবযুগের প্রেরণা আসিবে হিন্দু সভ্যতা হইতে। কিন্তু নীচে, মনুর স্মৃতিগ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলেও এবং পল্ ডয়সেনের (Paul Deussen) বন্ধু হইলেও হিন্দু সভ্যতার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিছুই প্রভাবান্বিত হয়েন নাই। এযুগে গ্রীক ও হিন্দু এই উভয় সভ্যতা দ্বারা পরিপুষ্ট না হইয়া ইউরোপের এই সঙ্কটময় নবযুগে কোন মনীষীই সকল দিক হইতে একটা পূর্ণ মীমাংসা বা সমন্বয়ের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না। নীচেও পারেন নাই। হিন্দু সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াই তাহার অন্যতম কারণ।

সোপেনহয়ার (Schopenhauer)।

গ্রীক সভ্যতার পরেই নীচের উপর সোপেনহয়ারের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই এবং তাঁহার উপর সোপেনহয়ারের এই প্রভাবসম্বন্ধে ১৮৬৬ খৃঃ তিনি পল্ ডয়সেনকে এক চিঠিও লিখিয়াছিলেন।

সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক অনাদি অনন্ত ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি (will force) কার্য্য করিতেছে। সৃষ্টি জ্ঞানপ্রসূত নহে, ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত এবং এই বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানময় নহে,—

ইহা অজ্ঞান ও অন্ধ। ইচ্ছাশক্তির এক অনির্ব্বচনীয় অন্ধ প্রেরণায় এই সৃষ্টির বিকাশ, স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে। এই দার্শনিক তত্ত্ব যে নীচের উপর প্রথম জীবনে স্বতঃই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাই। সৃষ্টির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে যে বাস্তবসত্তা (reality) কার্য্য করিতেছে, তাহা জ্ঞান নয়, ইচ্ছাশক্তি,—এই ধারণা নীচে সোপেনহয়ারের নিকট হইতে লাভ করেন।

নীচের মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সোপেনহয়ারের প্রভাব ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ—

(১) সোপেনহয়ারের দুঃখবাদ (Pessimism) নীচে পরবর্ত্তী জীবনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মানবজীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি ও তাহার সাধনায় এবং বিকাশে এই দুঃখবাদ বিশেষ সহায়তা করিতে ত পারেই না, পরন্তু উহা এক বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। সমস্ত রকম দুঃখ, ক্লেশ, পাপ-তাপের মধ্যেও জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতেছে আনন্দ ও মুক্তিতে। নীচের এই সিদ্ধান্ত সোপেনহয়ারের দুঃখবাদকে ক্রমে অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়।

(২) সোপেনহয়ারের দয়াবাদ (Pity) নীচে একেবারেই সহ্য করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) সামাজিক হিতবাদের (Utility) দিক হইতে এই অনুকম্পার একটা স্থান বা উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক সামাজিক সাম্যবাদ (Socialism) এই অনুকম্পাবৃত্তির উপর অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নীচে ইহার একান্ত বিরোধী। নীচের মতে, যে দয়া করে তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, আর যাহার প্রতি দয়া করা হয়, তাহারও মনুষ্যত্ব নষ্ট করা হয়। যাহারা দয়ার পাত্র, তাহাদিগের একান্ত বিলোপ বা উচ্ছেদসাধনেই মনুষ্যজাতির কল্যাণ। নীচের মত এ বিষয়ে সোপেনহয়ারের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, সোপেনহয়ারের দুঃখবাদ (Pessimism) ও দয়াবাদ (Pity) নীচেকে তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে বাধ্য করে।

ওয়েগনার (Wagner)।

নীচে জীবনের প্রথমেই ওয়েগনারের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। নীচে বাল্যাবধি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। আর সঙ্গীত-বিদ্যায় ওয়েগনার তখন ইউরোপের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কিন্তু পরে ওয়েগনারের সহিত নীচের বিচ্ছেদ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়ে।

(১) নীচে, ওয়েগনার ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিচ্ছেদের যদি কিছু ব্যক্তিগত কারণ থাকে, তাহা কোন পক্ষ হইতেই সাধারণে প্রকাশ হয় নাই।

(২) নীচে একরূপ ওয়েগনারের শিষ্যের মত ছিলেন। ওয়েগনার একজন অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী বিখ্যাত ব্যক্তি। সাধারণতঃ এইরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা গুণমুগ্ধ যুবকদের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেন। তাহাতে এই সমস্ত যুবকদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। নীচে সম্ভবতঃ ওয়েগনারের প্রভাবের পেষণে নিজ স্বাতন্ত্র্য বিলোপের আশঙ্কাতেই ওয়েগনারকে ছাড়িয়া আসেন।

(৩) ওয়েগনারের দুঃখবাদ (pessimism) এবং

(৪) ওয়েগনারের মধ্যযুগের খৃষ্টানী আদর্শ স্বতঃই নীচেকে ওয়েগনার হইতে দূরে সরাইয়া আনিতে বাধ্য করে।

(৫) আমাদের মনে হয়, ওয়েগনার ও নীচে উভয়েই অসাধারণ প্রতিভা ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ। কাজেই ইঁহাদের মধ্যে মতের বিরোধিতাই পরস্পর বিচ্ছেদের প্রধান কারণ।

ইউরোপের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment of Europe) নীচের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমাদের এইরূপ ধারণা।

এক দিকে নীচের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অন্য দিকে ইউরোপের সমস্যা, ইহার সংঘর্ষ হইতেই নীচের জীবন, কাব্য ও দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপের সঙ্কট নীচেকে উদ্বেলিত করিয়াছে।

এবং ইউরোপের দিক হইতেই. তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

সুতরাং আমাদের মতে ইউরোপের বর্ত্তমান সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই (Environments) নীচের জীবনকে বিশিষ্টরূপে আন্দোলিত ও বিকশিত করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভগিনী নিবেদিতা।*

আমরা যে সমস্ত উদ্দেশ্যে আজ এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহাদের মধ্যে-একটী উদ্দেশ্য আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণোদিত সিষ্টার নিবেদিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত আমাদের এই বালিকাবিদ্যালয়টীর বিষয়ে কিছু আলোচনা করা। স্কুল ও স্কুলের কার্য্য আলোচনা করিতে গেলেই, যিনি আত্মবলিদানে আমাদের এই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করিতে হয়; কেন না, আমাদের স্কুল বলিলে আমরা ইষ্টককাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত একটা বাড়ী বা কতকগুলি বিশেষ কার্য্যপ্রণালী বা নিয়মকে স্মরণ করি না, কিন্তু তিনি যে মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমগ্র নারীজাতির উন্নতি-কামনায় আপন স্বার্থ, আপন সুখ, আপন দেহমন-প্রাণ বলি দিয়া আত্মনিবেদন বা প্রেমের সাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্য ও নিবেদিত হৃদয়টীকেই স্মরণ করি। সেই উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা এক কথায় এই যে, নারীজাতির নারীত্বের বিকাশ। ইহারই

* সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ে ৺ সরস্বতী পূজোপলক্ষে সিষ্টার নিবেদিতার প্রিয় ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক পঠিত।

একটী উপায় শিক্ষাদান। সমুদ্ররূপ পূর্ণ বিকাশের যে তরঙ্গরূপ ক্ষুদ্র স্ফূরণ এই প্রাণ-মন-দেহের সমষ্টি, ইহারই অন্তর্নিহিত বৃত্তি-গুলিকে বিকাশমুখীন করাকেই বলে শিক্ষাদান; আর জীবনব্যাপী এই শিক্ষাব্যাপারের একটী সোপানের নাম বিদ্যাশিক্ষা; এবং সেই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত।

দ্বিতীয়তঃ, সিষ্টার নিবেদিতার সেই হৃদয়ের, তাঁহার সেই প্রেম-পূর্ণ নিবেদিত হৃদয়ের বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষায় আমরা তাঁহাকে যতটুকু বুঝিতে সক্ষম হই-য়াছি, তাহাই প্রকাশের চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

তাঁহার হৃদয় বলিতে আমরা তাঁহার ভালবাসা ও ত্যাগ, বিশেষতঃ এই দুইটী বিষয়েরই উল্লেখ করিতেছি। সেই যে মহাপুরুষ-বাক্য—

"স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন—"

"দাও আর ফিরে নাহি চাও,

থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল—"

সে বাক্য যথার্থই তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এখন, এইরূপ দিতে হইলে যে কতখানি ভালবাসিতে হয়, বা কতখানি ভালবাসিলে যে ইহা দেওয়া যায়, ইহাই চিন্তার বিষয়।

বাস্তবিক, কতখানি ভালবাসিলে মানুষ অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে? কতখানি ভালবাসিতে পারিলে মানুষ অপরের যন্ত্রণায় যন্ত্রণা বোধ করে, ও সেই যন্ত্রণা ও দুঃখ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে? কতখানি ভালবাসায় নারীজাতির দুর্দ্দশা, দুঃখ, নির্জ্জীবতা নিবেদিতার হৃদয়কে আঘাত দিয়াছিল যাহার প্রেরণায় নিজের নিজস্ব ভুলিয়া সারা জীবনব্যাপী কঠোর সংযম ও তপস্যা দ্বারা তিনি এই নির্জ্জীবতা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, নিজের জীবনপাত করিয়া প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা আপন আপন হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা এবং কার্য্যে পরিণত করাই আমাদের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। এমন যে মহতী শিক্ষা, তাহারই আশাবীজ

বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের বিদ্যালয় দণ্ডায়মান। কাজেই ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের মধ্যে এক হিসাবে কোনও প্রভেদ নাই। ইহা তাঁহারই যেন প্রত্যক্ষ প্রতীক। ইহার ও ইহার কার্য্যসম্বন্ধে আলোচনা, ও নিবেদিতা-জীবনের আলোচনা, যেন একই কথা। এই একত্বের সিদ্ধান্তই তাঁহার দৈহিক অভাব-জনিত মর্ম্মান্তিক দুঃখে শান্তি প্রদান করিতেছে।

তাই আজ এই বিশেষ দিনে যে দিন সমগ্র জগৎ অবিদ্যানাশিনী বিদ্যার আরাধনায় আনন্দে ভাসিতেছে; সেই বিশেষ দিনে আমরাও সেই শিক্ষাধিষ্ঠাত্রী বিদ্যারূপিনী বাণীর পূজান্তে আমাদের শিক্ষা-দায়িনীকে স্মরণ করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করি। সেই শিক্ষা-দায়িনী নিবেদিতা যে শিক্ষার আদর্শ আমাদের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছেন, যে শিক্ষা সকলকে দান করিবার জন্য আমাদের পথ উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, যে প্রেমের প্রবাহ তুলিয়া দেখাইতেছেন যে, স্বামীজির মন্ত্রাদিষ্ট 'দিয়ে দেওয়ার' সঙ্গে সঙ্গে কি মহান্ 'পাওয়ায়' হৃদয় ভরিয়া যায়, আজ তাঁহার সেই ঘোষণার সেই উৎসাহের বাণী বীণাবাদিনীর বীণায় ঝঙ্কারিত হইতেছে। তাঁহার সেই শুভ্র নির্ম্মল পুষ্পসকাশহৃদয় শ্বেতবরণার শ্বেতবর্ণে প্রতি-ভাত হইতেছে এবং তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও আশা আজ হাস্যময়ীর মৃদু হাস্যে ব্যক্ত হইতেছে। আর ঐ দেখ নারীজাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁহার যে উদ্দাম অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা আজ তাহা শত দিকে শত ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে।

আজ গৃহাগতা দেবীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিয়া তাঁহার নিকট এই মনস্কামনা নিবেদন করি, যেন তিনি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরিত করিতে সহায় হউন; যেন অবিদ্যানাশিনীর কৃপায় আমরা সকল অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেমপূর্ণ প্রাণ লইয়া বিশ্বের সেবায়, বিশ্বে সেই বিশ্বপ্রাণকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া জীবন সফল করি।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে এরিষ্টটলের জীবনী ও গ্রন্থাবলী মোটামুটী আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার দর্শনালোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

এই স্থলে প্রথমে প্লেটোর সহিত এরিষ্টটলের দর্শনের ভেদাভেদ বিচার করিয়া দেখা দরকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বাহ্যজগত প্লেটোর নিকট একটী প্রকাণ্ড ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি প্রজ্ঞাশক্তিবলে জগৎ রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন; আর আদর্শের তুলনায় প্রতিচ্ছবি যেমন হীন, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ, কল্যাণ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ মূল পদার্থের তুলনায় বিশ্বজগৎ অকিঞ্চিৎকর—এই বোধে তিনি সেই মূল তত্ত্বের আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব তিনি একেবারে অস্বীকার করিতেন না। প্লেটো ও এরিষ্টটলের এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তবে প্লেটোর মতে বাহ্যজগতের সহিত ভাব জগতের সম্বন্ধ কি সেটী সহজে বুঝা যায় না—সেই কারণ এরিষ্টটল প্লেটোর দর্শনে দোষ প্রদর্শন করেন। প্লেটোর মতে ভাব-পদার্থকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে উভয়ের মধ্যে সেরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। দুইটীকে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ মনে করিলে উভয়ের সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। এবং যদি জড়-পদার্থ ও ভাব-পদার্থ দুইটী বিরুদ্ধ পদার্থ হয় তাহা হইলেই ঐ আপত্তি উঠিতে পারে। প্লেটোর দর্শনালোচনায় প্রথমেই ঐ সন্দেহ অনেকের মনে উঠিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই কি দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয় না।

দেখা যাক, এরিষ্টটল এ-বিষয়ে কি বলেন। তাঁহার মতে দুইটী বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ অস্বাভাবিক। ভাবপদার্থকে জড়াতিরিক্ত (Transcendent) না বলিয়া জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত (Immanent) বলিলেই উভয়ের সম্বন্ধের যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায়। জড়াতিরিক্ত কোন ভাবপদার্থের অস্তিত্ব এজগতে স্বীকার করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এরিষ্টটল এবম্বিধ মত প্রচার করিলেও তাঁর মতে মূল পদার্থ অজড় (Immaterial) মূল পদার্থে জড়ের সম্বন্ধ নাই—মূল পদার্থ ভাব-স্বরূপ।

এরিষ্টটলের মতানুসারে জাগতিক পদার্থ মাত্রেই রূপ (from) ও জড়ের (matter) সমাবেশ বর্ত্তমান। রূপ ছাড়িয়া জড় নাই, জড় ছাড়িয়া রূপ নাই—বিশ্বজগতের ইহাই নিয়ম। 'রূপ' বলিতে কি বুঝায় একটু প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ রূপ বলিতে আকারকেই বুঝায়। এই দোয়াতটী চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটী পদার্থ, দোয়াতের ইহাই রূপ। এরিষ্টটল কিন্তু 'রূপ' শব্দ এই সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতেন না। পিথাগুরু সম্প্রদায় এই 'রূপ'কে 'সংখ্যা' দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে কথা যথাযথ স্থানে আলোচিত হইয়াছে। প্লেটো 'সংখ্যা' বলিতে শুধু পরিমাণকে (Number বা Quantity) বুঝিতেন না। 'সংখ্যা' বলিতে গুণকেও (Quality) বুঝিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে প্লেটোর দর্শনে সংখ্যার আলোচনা দ্রষ্টব্য। এরিষ্টটল 'রূপ' শব্দের দ্বারা অবিকাশাবস্থার (Potential State) বিকাশাবস্থাকে (Actual State) বুঝিতেন। তাঁর মতে 'জড়' পদার্থ পদার্থের অবিকাশাবস্থা, 'রূপ' পদার্থ তাহারই বিকাশাবস্থা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থ মাত্রই এই বিকাশে ও অবিকাশের সমাবেশে গঠিত। সদ্যোজাত শিশুর অবস্থা বালকের অবস্থার তুল্য নয়—অবিকাশাবস্থা। বালকের অবস্থা আবার পূর্ণযৌবন মানবের অবস্থার তুলনায় অবিকাশাবস্থা, পাক্ষান্তরে কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর অবস্থার তুলনায় বালকের অবস্থা বিকাশাবস্থা। সদ্যোজাত শিশুতে আবার গর্ভস্থ প্রাণের

তুলনায় বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে কোন পদার্থ লও না কেন সর্ব্বত্রই এই বিকাশ অবিকাশের, এই বিপরীতের অদ্ভুত ঐক্যবন্ধন। আরও দেখা যায়, একই পদার্থে এক হিসাবে বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য হিসাবে অবিকাশেরও পরিচয় মেলে।

প্লেটোর দর্শনালোচনায় দেখা গিয়াছে, তাঁহার মতে প্রত্যেক পদার্থ এক হিসাবে বিশেষ-পদার্থ (particular) ও অন্য হিসাবে তাহা জাতি (genus) ; বিশেষ-পদার্থ জাতির অন্তর্গত, জাতি আবার পরতর জাতির, পরতর জাতি পরতম জাতির, এই ক্রম অবলম্বনে সকলগুলিকে শেষে মূল জাতি বা মূল সত্তার অন্তর্গত করিয়া লওয়া যায়। এরিষ্টটলের মতে প্রত্যেক পদার্থই অবিকাশ অবস্থা হইতে বিকাশাবস্থায় পরিণত হইতেছে। মূল পদার্থে এই পরিণতির বিরাম হইয়াছে, মূল পদার্থে বিকাশের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মূল পদার্থ জড়-সম্বন্ধহীন (Immaterial)।

প্লেটোর ও এরিষ্টটলের দর্শনের মূল সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই, বুঝা গেল। যাহা কিছু অনৈক্য আছে, শুধু চিন্তা-প্রণালী লইয়া। এই স্থলে উভয় দর্শনের ভেদাভেদের আলোচনায় আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক।

আমরা দেখিয়াছি, প্লেটোর মূল ভাবপদার্থ এক হইলেও তিনি বহু ভাবপদার্থের উল্লেখ করিতেন। পরন্তু ভাব-পদার্থগুলিকে শ্রেণীপরম্পরায় সুসজ্জিত করিয়া সকলগুলিকেই একের অন্তর্গত করিয়া লওয়াই তাঁহার দর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। সকল ভাবপদার্থই মূল ভাবপদার্থের বিকাশ মাত্র—দেশগত, কালগত বিকাশ বা প্রতিচ্ছায়া। মূল ভাবপদার্থকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। এবং সেই ক্রমপরম্পরায় তাহারা এক হিসাবে ব্যষ্টি ও অপর হিসাবে সমষ্টির পরিচায়ক। ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টিতে সমধিক বিকাশ, সে কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মূল পদার্থে সকলেরই সমাবেশ সুতরাং মূল পদার্থের বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট অন্য কথায় মূল পদার্থ পূর্ণ বিকশিত, বহু ভাব পদার্থগুলি

তাহারই আংশিক বিকাশ মাত্র। প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শনে তবে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ এই যে, প্লেটো স্বীয় প্রজ্ঞাশক্তিবলে মূল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই জগৎকে তাহারই বিকাশ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, এরিষ্টটল এই প্রত্যক্ষ জগতের যাবতীয় পদার্থেই বিকাশের অপূর্ণতা দেখিয়া চিন্তা ও তর্কশক্তি দ্বারা পূর্ণবিকাশের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আর একটী কথা, প্লেটোর মতে যাবতীয় পদার্থ সেই মূলকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। মূল পদার্থই আদর্শ পদার্থ, জাগতিক পদার্থ মাত্রেই তাহার আংশিক বিকাশ আবার যাবতীয় জাগতিক পদার্থকে ক্রমপরম্পরায় বিকাশশীল বলা চলে; যে পদার্থ যে পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে সে তদপেক্ষা কম বিকশিত পদার্থের আদর্শরূপে বর্ত্তমান। ফলে পাওয়া গেল, মূল আদর্শ এবং সেই মূল আদর্শের অন্তর্গত বহু আদর্শ; এবং সেই বহু আদর্শ আবার পরস্পরের আদর্শ। এরিষ্টটল 'রূপ' (from) বলিতে এই আদর্শকেই বুঝিয়াছিলেন—জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই রূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—একমাত্র মূল পদার্থই স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। এরিষ্টটের from ও প্লেটের Idea আমাদের মনে হয় একই পদার্থ।

এই স্থলে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এরিষ্টটলের দর্শন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব। সক্রেটীস প্রচার করেন, বস্তুর ভাব (Conception) হইতে বস্তুর জ্ঞান জন্মে। বস্তুর জ্ঞান ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি হয় না। বস্তু বলিতে কি বুঝি, বিশ্লেষণ করিলে সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সম্বন্ধ জ্ঞানসাপেক্ষ। ফলে দাঁড়ায়, বস্তুর সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ। জ্ঞানের উপর তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। সক্রেটীসের Conception, প্লেটোর Idea, এরিষ্টটলের form একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

সৎকথা।

ভগবানের উপর শ্রদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। তাঁর কৃপা না হলে হয় না। সেই জন্য সাধুরা কি করে তাঁর কৃপালাভ করেছেন বুঝ্‌তে হয়, তাঁদের জীবন দেখ্‌তে হয়, আলোচনা কর্‌তে হয়। সেই জন্যই যত অবতার বলেছেন, "সাধুসঙ্গ কর"।

*　*　*　*

সৎলোকের নিন্দে কর্‌তে নেই। যদি কোন বড় লোকে সৎ-লোকের নিন্দা করে, তা হলে কতকগুলি লোককে সৎসঙ্গ হতে বঞ্চিত করা হয়। কারণ বড় লোকের কাছেই বেশী লোক আসে। ঐরূপ করা অতি খারাপ। আর যদি সে সৎএর প্রশংসা করে তা হলে পাঁচজন সৎসঙ্গ কর্‌তে চাহিবে। কারণ, তারা বুঝ্‌বে এ লোকটাও যখন তাকে ভালবাস্‌ছে তখন সাধুর সঙ্গ করা উচিত।

*　*　*　*

মানুষের সংশয় লেগেই আছে। সংশয় যাওয়া কি মুখের কথা! মানুষের সংশয় দূর কর্‌বার জন্য ভগবান্ শরীর ধারণ করেন।

*　*　*　*

ভগবান্ কাহাকেও বড় করেন, আবার কাহাকেও ছোট করেন। তার অর্থ কি? সংসারেই দেখা যায়, ধনীলোক মৃত্যুর সময় তার বিষয়-সম্পত্তি তার উপযুক্ত সৎপুত্রের হাতে দিয়ে যায়। কারণ, সে জানে এ ছেলেটা নিজেও খাবে, অপর ভাইদেরও দেবে। লক্ষ্মী-ছাড়া ছেলেদের দিয়ে যান না; তারা নিজেও খাবে না, অপর ভাই-দেরও দেবে না। সেই রকম ভগবান্ এমন লোককে শক্তি দিয়ে বড় করেন, যার দ্বারা অপরেরও উপকার হবে।

*　*　*　*

এমন শক্তি আছে, যাতে নিজেও সুখী হয়, পরকেও সুখী করে; ইহা সৎশক্তি। আর নিজেও দুঃখী হয়, আর অপরকেও দুঃখী করে, ইহা অসৎ শক্তি।

ঈশ্বর লাভ করতে হলে ঠিক ঠিক ত্যাগ চাই, ভগবান্ ত্যাগীকে খুব ভালবাসেন। ত্যাগের ভাব না এলে ভগবান্ লাভ হয় না। ত্যাগ বল্‌তে গেলে—ধন, মান এসব ত ত্যাগ করতে হবেই, এমন কি দেহটাও যা এত আদরের সামগ্রী সে দেহটাকেও সময় সময় ভুলে যেতে হবে। ভোগের ইচ্ছা একটু থাকলে ত্যাগ কখনও সম্ভব হয় না। বাসনা-পূর্ণ মন কখনও কি ত্যাগের কথা পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারে? যে মান চায়, তার কাছে ভগবান্ দূরে।

* * * *

ধন মানের মধ্যে থেকে ভগবানের উপর মন রাখা কি কম কথা? ঈশ্বর হতে যে কোন জিনিষ আমাদিগকে পৃথক্ করে, তাহাই মায়া। মায়ার বন্ধন কাটিতে না পারলে ভগবানের কৃপা লাভ হয় না। সাধন ভজন ও গুরুকৃপা ব্যতীত এই মায়া কাটাতে পারা যায় না।

* * *

এ জগতে ঠিক ঠিক গুরুও দুর্লভ, শিষ্য মেলাও দুর্লভ। যে শিষ্য গুরুবাক্য পালন করে, তার সংসারে কেউ শত্রু থাকে না। ভগবান্ তাঁর সঙ্গে সদা সর্বদা থাকেন। সে এক দিন না এক দিন ভগবানকে বুঝ্‌তে পারে।

* * * *

ভগবান্ লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। তার মধ্যে যে কোন একটা জোর করে ধরে থাকতে হয়। ভগবান্ লাভ করতে হলে একনিষ্ঠ হতে হয়।

মন্নাথে জানকীনাথে যদিচ অভেদ পরমাত্মনি,
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচন।

হনুমানের মত এইরূপ একনিষ্ঠ নিষ্ঠা চাই।

মানের মত পাজি জিনিষ আর নেই। কত রকম সংশয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। কিন্তু ভগবানের নাম করতে করতে মান যশের আকাঙ্ক্ষা চলে যায়; চিত্ত শুদ্ধ হয়।

* * * *

সৎগ্রন্থ, যাতে ভগবানের কথাবার্ত্তা আছে তারা সৎসঙ্গের কাজ করে। সকল সময়েই ত আর ভগবানের নাম করতে পারা যায় না সেই জন্য ঐরূপ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তাতেও ভগবানের শরণ-মনন করা হয়। যাঁরা দিনরাত ভগবানের নাম করতে পারে তাদের সহিত ভগবানের কি তফাৎ?

* * * *

ঠিক ঠিক গুরু, শিষ্যকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেন। যে শিষ্য টাকাকড়ি, মানযশ চায় তাদের কখনও সৎগুরু লাভ হয় না। যাঁরা ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে তারা সৎলোকের নিকট জাগাতিক কোন সুখের আশা না থাকলেও যায়।

* * * *

অভাব থাকতে মানুষ ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাকতে পারে না। কিন্তু মানুষের অভাবের সীমা নেই। অভাববোধ এমনি জিনিষ যত মনে করবে আমার অভাব আছে ততই দেখবে অভাব বাড়ছে। সেইজন্য যারা ভগবানকে পেতে চায় তাদের নিবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত।

আমরা এমনি পাজি যে, যদি ভগবানকে ডাকবার কখনও ইচ্ছা হল, ত অমনি খতাতে বসি যে, আমি যদি ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করি, তাহা হইলে, আমাকে খাওয়াবেই বা কে, আমার পরিবার-বর্গকে খাওয়াবে কে, আমি থাকবো কোথায় ইত্যাদি। কিন্তু একটু ভেবে দেখি না পৃথিবীতে এতলোক যে ভগবানের জন্য ঘর বাড়ী ত্যাগ

করেছে তাদের কি কখনও কোন অভাব হয়েছে! ভগবানের জন্য যে ত্যাগ করে, তাকে তিনিই খেতে দেন, পড়্‌তে দেন, বল ভরসা সব দেন। তার সমস্ত সুবিধা করে দেন—তাঁর নাম নিয়ে একবার বেরিয়ে পর্‌তে পার্‌লেই হল।

* * * *

ঠিক ঠিক গুরু শিষ্যের সংস্কার, মনের গতি, পূর্ব্বের কর্ম্ম ইত্যাদি বিচার করে কথা বলেন—যাতে তার উপকার হয়। সেই জন্য যার তার কথা শুনে নাচ্‌তে নেই। এ এটা বল্‌লে, সে সেটা বল্‌লে, সকলের কথা শুনে নেচে এধারও হয় না ওধারও হয় না।

* * * *

হাজার হাজার ধর্ম্মকথা জানার চেয়ে, বলার চেয়ে, লোককে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ভগবানকে ডাকা ভাল।

সফল সাধনা।

(শ্রীমায়াময় মিত্র)

কার্ত্তিক মাসে পবিত্র তপোভূমি উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ তীর্থ কেদারনাথের পট (দ্বার) দীপান্বিতা অমাবস্যার পর বন্ধ হয়। শীত-ঋতুর প্রারম্ভেই এ অঞ্চলে যাত্রীর সংখ্যা বিরল হইয়া থাকে।

দীর্ঘ ছয়মাসকাল এই তুষারাবৃত কেদারের রাজ্যে বাস করিয়া প্রধান পূজারী ও সেবকগণ গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত। আজই মধ্যাহ্নে নিয়মিত পূজার পর মন্দির বন্ধ হইয়াছে। আবার বৈশাখ মাসে সাধারণের জন্য পট খোলা হইবে। প্রবল শীতে কেহই সেখানেই বাস করিতে পারেন না। আবার প্রবাদও আছে শীতের কয় মাস দেবতারা কেদারনাথের পূজা করিয়া থাকেন সুতরাং মর্ত্ত্যবাসীর সে সময়ে দর্শনাদির সুযোগ হয় না।

অপরাহ্নে জনৈক সাধু দীর্ঘ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ মন্দির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্শনপ্রার্থী হইয়া তিনি প্রধান পূজরীকে একটিবার দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সন্নিবন্ধ অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনাসত্ত্বেও পূজারী সংক্ষেপে জানাইলেন প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া আগামী বৈশাখের পূর্ব্বে মন্দিরদ্বার কিছুতেই খুলিতে পারা যায় না।

একনিষ্ঠ সাধক চিরপোষিত আশাভঙ্গে ব্যথিত হইয়া সংকল্প করিলেন যে, ইষ্ট দর্শন না করিয়া তিনি কিছুতেই এস্থান ত্যাগ করিবেন না ; মন্দিরের উপকণ্ঠে কোথাও বাস করিবেন।

পূজারী তাঁহাকে এই জীবন-সংশয় কঠোর প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করিবার বহু চেষ্টা করিলেন। উত্তরে সাধক জানাইলেন যে, প্রবল শীতে যদি তাঁহার দেহপাতও হয় তাহাও বরং বাঞ্ছনীয় তথাপি তিনি দর্শন পূজাদি না করিয়া অন্যত্র যাইবেন না।

পূজারী ও সেবকগণ ফিরিয়া গেলেন, অল্পসময়ের মধ্যেই সেই জনমুখরিত যাত্রীবহুল তীর্থভূমি নীরব হইয়া গেল। সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া পর্ব্বতগাত্র ছাইয়া ফেলিল। তপস্বী কেবলমাত্র সেই বিজন গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী বিষণ্ণচিত্তে স্বীয় মন্দ ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া শিবসকাশে মনবেদনা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

তপস্বী কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দির পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখেন যে, এক প্রসন্ন বদন বিভূতি মণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহারই

দিকে আসিতেছেন। তিনি সেই সৌম্য-গঠন জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীকে নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

নবাগত সন্ন্যাসী তপস্বীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয় আপনি এমন সময়ে কাহার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছেন ?”

সাধক সংক্ষেপে স্বীয় মন্দভাগ্যের কথা বিবৃত করিলেন। সন্ন্যাসী তাহার মনঃক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশ্যে বলিলেন, “আসুন, আপাততঃ শীত নিবারণের জন্য ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া অদ্য রাত্র অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করি।”

অপরিচিত হইলেও নবাগত সন্ন্যাসীর সরল ব্যবহারে অল্প সময়েই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিল।

পরে তিনি তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোন খেলা ধূলা জানেন কি ?”

তিনি উত্তর করিলেন, “হাঁ দাবা খেলা একটু জানি”—পরক্ষণেই ক্ষুদ্র ঝুলিটির ভিতর হইতে একখানি ছক ও খেলার সরঞ্জাম বাহির হইল।

উভয়ে মগ্ন হইয়া খেলিতে লাগিলেন।

* * * *

ঊষার রক্তিম ছটায় পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল—তপস্বী ফিরিয়া দেখিলেন রাত্র ভোর হইয়াছে। সন্ন্যাসী তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিলেন, “খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আসি, আপাততঃ খেলা বন্ধ থাক।” এই বলিয়া তিনি ছক্ প্রভৃতি ঝুলির ভিতর পুরিয়া উঠিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই প্রধান পূজারী ও সেবকগণ মন্দিরসমীপে আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করায় তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গতকল্য সন্ধ্যায় আমার

সকাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন—অথচ আজ প্রভাতেই সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পট খুলিতেছেন, আপনার এই ব্যবহারের অর্থ কি?”

বিস্ময়ে পূজারী বলিলেন, “সে কি আমরা যে ছয় মাস পরে আজ এই প্রথম আসিলাম; আপনি কি এতদিন এই খানেই ছিলেন?”

পরে সেই সন্ন্যাসীর অশ্রুতপূর্ব্ব খেলার কথা শুনিয়া সকলেরই ভ্রম ঘুচিয়া গেল। তপস্বীর সফল সাধনায় উপস্থিত জনমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া গেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার, বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে তিথিপূজা ও ২১ জানুয়ারী, রবিবার, মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন স্বামীজির গৃহ এবং সমাধি-মন্দির নানাবর্ণের বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্বামীজির গৃহটীতে ফুলগুলি এবং স্বামীজি যে সকল জিনিষপত্র ব্যবহার করিতেন সেইগুলি এরূপভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, উক্ত স্থানে উপস্থিত হইবামাত্রই মনে হইতেছিল, স্বামীজি বুঝি ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণান্তর এইমাত্র অন্যত্র গমন করিয়াছেন। সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলগুলিকেও দেখিয়া মনে হইতেছিল তাহারাও যেন মহাপুরুষের সেবায় ব্যবহৃত হওয়ায় নিজদিগকে ধন্য

এবং অপর সকল পুষ্প অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে। এবং ফুলগুলি ভক্তবিশেষের প্রাণেও সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের সহিত স্থানবিনিময়ের বাসনা উদ্দীপিত করিয়া দিতেছিল। উক্ত দিবস প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই স্বামীজির যথাবিধি পূজা ও ভোগরাগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন।

মহোৎসবের দিবস মঠবাটী নানাবিধ পতাকা, পুষ্প, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস সকলেরই মুখে তাহারা তাহাদের আদর্শ পুরুষের জন্মোৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছে বলিয়া যেন একটা আনন্দ ও উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইতেছিল। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বামীজির গৈরিক-বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসিবেশের তৈলচিত্রখানি মস এবং নানাবিধ লতাপাতা এবং পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হওয়ায় দর্শকগণের মনে যুগপৎ ভক্তি এবং ত্যাগের ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিতেছিল। চিত্রসম্মুখে প্রথমে কন্সার্ট ও পরে ব্যাঁটরা কালীকীর্ত্তনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুর মাতৃনাম গীত হওয়ায় স্থানটীকে এরূপ ভাবময় করিয়া তুলিয়াছিল যে, উক্ত স্থানে যাইবামাত্রই সকলের মন ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীজির সমাধি-মন্দির ও তাঁহার মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিটী অতি সুন্দরভাবে পুষ্পাদির দ্বারা সাজান হইয়াছিল। উৎসবের প্রধান অঙ্গ দরিদ্র-নারায়ণ সেবা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সেবাকার্য্যে যুবকগণের উৎসাহ দর্শন করিলে মনে হয়, স্বামীজি যে বলিয়াছিলেন,—আমার ভক্তগণ পরে আসিতেছে; তাহা বোধ হয় ইহারাই। মান অপমানের কথা ভুলিয়া, সকলকে আত্মজ্ঞানে, শুধু সেবার অধিকারে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত অনুভব করিয়া সেবা করিবার ভাব যে ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহাদের কার্য্যকলাপেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছিল। স্বামীজি ইহাদের এই ভাব চিরজাগরূক রাখুন! এই উপলক্ষে আমাদের স্মরণ করা উচিত স্বামীজি অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদান এবং তদপেক্ষা জ্ঞান-

দানের দ্বারা সেবা করাকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। কিন্তু ঐরূপ সেবা করিতে হইলে উহা নিজদিগকেই প্রথমে অধিগত করিতে হইবে। উহা অধিগত হইলে তবেই আমরা বিদ্যা এবং জ্ঞানদানের দ্বারা অপরকে সেবা করিতে সক্ষম হইব। অতএব, আসুন, আমরা সকলে সেই মহাপুরুষের জন্মোৎসব দিন হইতেই, দরিদ্র নারায়ণগণকে সেবা করাই যাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, যিনি উক্ত কার্য্যে নিজ জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এইরূপ-ভাবে সেবায় যত্নবান হই।

উক্ত দিবস প্রায় চতুঃসহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণ তৃপ্তিসহকারে সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ব্যতীত আরও তিন সহস্র ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় দশ সহস্র ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহাদের মূহুর্মূহু 'জয় স্বামীজির জয়' ধ্বনি সকলেরই প্রাণে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছিল। অবশেষে সন্ধ্যাসমাগমে যখন ভক্তবৃন্দ দলে দলে নৌকাযোগে কিম্বা অন্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন— তখন বাস্তবিকই অপর সকলকে এই আনন্দের পর একটু বিমর্ষ হইতে হইয়াছিল।

ময়লাপুর, মাদ্রাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ হোমে শ্রীশ্রীস্বামীজির তিথিপূজা এবং জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের দিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও ভজনাদি হয়। তাহার পর সমাগত প্রায় দুই সহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান। বৈকালে দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত পি, কেশবা পিল্লাই মহাশয়ের সভাপতিত্বে সদালোচনার জন্য একটী সভা আহূত হয়। প্রথমেই ব্রহ্ম শ্রীচক্রবর্ত্তী আয়েঙ্গার মহাশয় 'বিভীষণের শরণাগতি' সম্বন্ধে বলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত এম, কে, তাথাচারিয়ার, বি, এ, মহোদয় তামিল ভাষায় 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সার্থকতা' সম্বন্ধে এবং চিঙ্গলিপুটের জেলামুন্সেফ শ্রীযুক্ত সি, ভি,

কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, বি, এল, মহাশয় ইংরাজী ভাষায় "হিন্দু-শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় স্বামীজির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার পর সভা এবং উৎসর্ব সমাপ্ত হয়।

বাঙ্গলোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে তিথিপূজা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন যথাবিধি পূজা ও ভোগরাগাদির পর বৈকালে প্রায় একশত বালকবালিকাকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং রাত্রে প্রায় ২৫০।৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান। উৎসবের দিবস সহরের কয়েক স্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজির প্রতিমূর্ত্তি রথাদিতে স্থাপন করিয়া ভজন করিতে করিতে প্রায় বেলা ১২॥০ সময় আশ্রমে আগমন করেন। তৎপরে বেলা ৫॥০ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ লোক প্রসাদ পান। অবশেষে ইংরাজী ও কানাড়ী ভাষায় স্বামীজির সম্বন্ধে বক্তৃতার পর উৎসব সন্ধ্যাসমাগমে সমাপ্ত হয়।

সারগাছি (বহরমপুর) শ্রীরামকৃষ্ণমিশন অনাথ আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে যথাবিধি তিথিপূজা ও উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই দিবসই পাঠশালার ছাত্রগণকে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কৃষকগণকে ভোজন করান হইয়াছিল।

মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীস্বামিজীর তিথিপূজা ও তদুপলক্ষে উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উৎসবের দিবস স্তোত্র পাঠ, গান, ভজন, পূজা ইত্যাদি হয়। উক্ত দিবস প্রায় ৫০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ভদ্রলোক তৃপ্তির সহিত প্রসাদ পান।

কনখল, বৃন্দাবন, কাশী, মায়াবতী প্রভৃতি মিশনের ও মঠের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহেও স্বামীজির জন্মোৎসব যথাবিধি সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ভক্তগণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন, সন ১৩২৩ সাল, ইংরাজি ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭, রবিবার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্ব্যশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড়মঠে মহোৎসব হইবে। ভক্তগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আমরা কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অক্টোবর মাসের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। গত পৌষ সংখ্যায় আমরা উক্ত আশ্রমের সেপ্টেম্বর মাসের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে সাধারণকে জ্ঞাত করিয়াছি যে, ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে যাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়, তাহাদের সংখ্যা সাড়ে সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ ঐ প্রকার রোগী জানুয়ারীতে ৭টী ভর্ত্তি হইয়াছিল, সেপ্টেম্বরে ৫২ জন ভর্ত্তি হয়। কিন্তু অক্টোবরের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে ঐ মাসে ঐরূপ নূতন রোগী ৭৪ জন ভর্ত্তি হয়, এবং ১১ জন পুরাতন রোগী ছিল। ইহাদের মধ্যে ৬৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ২ জন মারা যায়, ৪ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ১২ জন

মাসশেষেও চিকিৎসাধীন আছে। গত সেপ্টেম্বরে ৫২ জন রোগীকেই স্থানাভাববশতঃ, যক্ষ্মা ওয়ার্ডের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় স্থানে, রোগীর সংখ্যা কম থাকায় রাখা হইয়াছিল, এবার যখন গত আলোচিত মাস অপেক্ষাও রোগীর সংখ্যা ২২ জন অধিক, তখন তাহাদিগকে স্থান দান করা কিরূপ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলা অসম্ভব। রোগীর সংখ্যা এরূপ মাস মাস বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সাধারণ রোগীদিগকে রাখিবার জন্য অন্ততঃ চারিটী ঘর সংযুক্ত একটী ওয়ার্ড নির্ম্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ওয়ার্ড নির্ম্মাণের সম্ভাবিত ব্যয় ৫০০০৲ টাকা। ঐ ওয়ার্ডের দুইটী ঘর নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সিয়ারসোলের রাণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী একখানি ঘর নির্ম্মাণের ব্যয় ১২৫০৲ টাকা এবং বম্বের সেট রামদাস কিষণদাস আর একখানি ঘরের জন্য ১২৫০৲ টাকা দান করিয়া আশ্রমবাসিগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এখনও দুইখানি ঘর নির্ম্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যাঁহারা এ দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবার সহিত নিজেদের প্রিয়জনের নাম জড়িত রাখিতে চান, তাঁহারা উক্ত দুইখানি কিম্বা একখানি ঘরের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া উক্ত ঘরের উপর মার্ব্বেল পাথর বসাইয়া তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত উক্ত ওয়ার্ড নির্ম্মাণার্থে কিম্বা আশ্রমের অন্যান্য ব্যয়ের জন্য যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন।

অক্টোবর মাসে যাহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ৩৪৮৩ জন; তন্মধ্যে ১৪৮৭ জন নূতন রোগী।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—স্বামী কল্যাণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল পোঃ সাহারানপুর।

বিগত ২৮শে জানুয়ারী, রবিবার, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট হলে একটী সভা আহূত হয়।

কুচবিহার অধিপতি মহারাজ স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, ডাক্তার হিরালাল বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনিষ্টিটিউটের সুপ্রশস্ত হলটী জনসমাগমেপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডেইসের দুইধারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামীজির দুইখানি তৈলচিত্র পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক মঙ্গলাচরণের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পুলীনবিহারি মিত্র 'স্তিমিত চিৎসিন্ধু নীরে' এই গানটী সুললিত কণ্ঠে গাহিবার পর, শ্রীযুক্ত দয়াময় মিত্র স্বামীজি রচিত 'To The Awakened India' নামক ইংরাজী কবিতাটী অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেন। তৎপরে বিবেকানন্দ সোসাইটী যে তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত—(১) বেদান্তের সার্ব্বজনীনভাব যাহা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজেদের জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাবের আলোচনা এবং উপলব্ধি করা; (২) উহা সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এবং (৩) প্রত্যেক মানবকে ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জ্ঞানে তাঁহাদের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সহায়তা করিয়া সেবা করা—তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গত বৎসর সোসাইটী যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করা হয়। উহাতে দেখা যায় সোসাইটী গত বৎসর সাধারণের মধ্যে বেদান্তের সত্যসমূহ প্রচারের জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সহায়তায় সাধারণ সমক্ষে ৩৬টী বেদান্ত বক্তৃতার, সপ্তাহিক একটী করিয়া গীতাক্লাশ ও কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে ১২টী ধর্ম্ম সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও দেখা যায় সদস্যগণ যাহাতে নিজ নিজ ইষ্ট এবং উপাস্যসম্বন্ধে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে পারেন তজ্জন্য সোসাইটীর একটী ধ্যানগৃহ আছে। সোসাইটীর

কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচশত সংগ্রন্থাবলী সম্বলিত একটী লাইব্রেরী এবং সাধারণের জন্য একটী পাঠাগারও আছে—তথায় সাধারণে সংগ্রন্থ পাঠ এবং সৎচর্চ্চা করিতে পারেন। দরিদ্র বিদ্যার্থীদের জন্য একটী ষ্টুডেণ্টস ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। ১৯টী ছাত্র উক্ত ফণ্ড হইতে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত সদস্যগণ সাধারণ জনহিতকর ও সেবাকার্য্যে যথাসাধ্য অর্থ এবং সেবক প্রেরণ দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করিয়াছেন। সোসাইটীর এখন সদস্য সংখ্যা ১২০ জন।

কার্য্যবিবরণী পাঠের পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বার-এট ল মহাশয় ইংরাজীতে বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহের আলোচনা করেন। তৎপরে মাননীয় জাষ্টিস উড্‌রফ সংক্ষেপে তন্ত্রের সহিত বেদান্তের সম্বন্ধ ইংরাজী ভাষায় বিবৃত করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বামীজিকে বেদান্তের সত্যসমূহের পুনঃ-প্রচারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে তাঁহার জন্মোৎসবের দিন হইতেই উক্ত সত্যসমূহ উপলব্ধি এবং তাহাদের প্রচারার্থ চেষ্টান্বিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, আমরা ভাবের ঘরে চুরি না করিলে যে নিজেদের নিজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইব এবং উহা যে স্বামীজির জীবনের একটা মস্ত কথা তাহা তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনার বিবৃতির দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বামীজি যে সকল শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলেন। তাহাদের মধ্যে মানুষ গড়িয়া তোলা (Man making principle) যে তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ ছিল এবং আপামর সাধারণের মধ্যে জাগতিক শিক্ষার বিস্তারেই যে জাতীয় উন্মেষ সম্ভবপর এই দুইটীর বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সর্ব্বশেষে স্বামীজি রচিত 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি'—"এই

গানটী গীত এবং মহাবীরের পূজা ও রামনাম সংকীর্ত্তনান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

সারগাছি (বহরমপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রমে দুই বৎসর যাবত একটী লাইব্রেরীগৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইয়া আসিতেছি। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য কতক পরিমাণে অগ্রসর হইলেও অর্থাভাববশতঃ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর উহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন বলিয়াছেন, এমন কি, তিনি স্বয়ং কোষাধ্যক্ষ হইয়া তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। মাননীয় কুমার বাহাদুর এই সৎউদ্দেশ্যের জন্য আশ্রমবাসী এবং সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি, ২৫০৲ টাকা; মাননীয় রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া, আজিমগঞ্জ, ১০০৲ টাকা এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণপুর, ৬৬৲ টাকা উক্ত লাইব্রেরী নির্ম্মাণার্থ ইতিপূর্ব্বে দান করিয়া আশ্রমের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণও আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং উহার ব্যয়ভার বহনার্থ অর্থ সহায্য করিয়া আশ্রমবাসিগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পাকপাড়ার রাণী শ্রীমতী দেবেন্দ্র বালা আশ্রমের জমীর (৫০ বিঘা) বার্ষিক ২০০৲ টাকা খাজনার জন্য এক কালীন ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মুক্তাগাছার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী উক্ত জমির খাজনার জন্য বাৎসরিক ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আশ্রমের সাধারণ-হিতার্থে রাজা বিজয় সিংহ দুধোরিয়া বার্ষিক ৬০৲ টাকা এবং এককালীন দানহিসাবে মিঃ বি, কে, চক্রবর্ত্তী বার-এট ল, ২০৲; মিঃ জি, সি, গডফ্রে, বি, এন, রেলের এজেণ্ট, ২০০৲ টাকা;

রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, দিনাজপুর, ৫৲; এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু, দুম ৪০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত দিনাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, আশ্রমস্থ বালক ও সেবকগণকে ভূরী ভোজন করাইয়া এবং ৺শারদীয় পূজার সময় তহাদের জন্য বস্ত্র ইত্যাদি এবং শীতেরসময় শীতবস্ত্র পাঠাইয়া দিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমরা বৃন্দাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বিগত জানুয়ারী মাসের কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে দেখা যায়, যাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয় এরূপ রোগী গত বৎসরের ৬ জন ছিল এবং আলোচ্য মাসে ২১ জন নূতন রোগী আসে। তাহাদের মধ্যে ১৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, দুই জন মারা পড়িয়াছে, দুই জন চলিয়া যায় এবং ৮ জন চিকিৎসাধীন আছে। যাহারা ঔষধ লইয়া যায় এরূপ রোগীর সংখ্যা ২২২৫ তাহার মধ্যে ৬৬ জন নূতন এবং অবশিষ্ট উঁহাদেরই পুনরাবৃত্তি। ইহা ছাড়া দুইজনকে তাহাদের বাড়ী যাইয়া ঔষধপথ্যাদির দ্বারা সেবা করা হইয়াছে। অলোচ্য মাসে মোট আয় ১২৫।৷০ টাকা ; তন্মধ্যে মাসিক চাঁদা হিসাবে ১১৮৷৷০ টাকা এবং এককালীন দান হিসাবে ৭৲ টাকা। উক্ত মাসে মোট ৮১২৶৷৷৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে ; তন্মধ্যে সেবাশ্রমের সাধারণ খরচ বাবদ ১৫৩৷৷৫ টাকা এবং বিল্ডিং ফণ্ড হইতে ৬৫৯৶০ খরচ হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৭, কলিকাতা বাগবাজারস্থ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটীর' প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সোসাইটীর সদস্যগণ পল্লীস্থ ভদ্রগৃহস্থের বাটী হইতে প্রতি সপ্তাহে চাউল সংগ্রহ করিয়া, পল্লীরই অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশিগণকে চাউল সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পল্লীতেই যদি এইরূপ

এক একটী করিয়া গরীবকে সাহায্য করিবার বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে অনেক নিরন্নের অন্নের সংস্থান হয়। সোসাইটীর সদস্যগণের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হউক।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, ইংরাজীতে এবং বাঙ্গলায় "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশ" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে যথাক্রমে একটী স্বর্ণপদক এবং একটী রৌপ্যপদক ও স্বামীজির সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পারিতোষিকরূপে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত এন. আর, কেদারী রাওএর—টিচার্স কলেজ, সৈদাপেঠ, মান্দ্রাজ—ইংরাজী প্রবন্ধটী এবং ময়মনসিং জেলার ঘারিন্দা নিবাসী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাঙ্গালা প্রবন্ধটী উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাঁহারা উক্ত পারিতোষিকদ্বয় লাভ করিয়াছেন।

বিগত পৌষ সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর স্নান উপলক্ষে যাত্রিগণের সেবা-কার্য্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এবারও মিশন হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮ জন সেবক গিয়াছিলেন। সেবকগণ নিম্নলিখিত ভাবে তীর্থযাত্রিগণের সেবা করেন। কলেরা ও অন্যান্য রোগীর সন্ধান করিয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ডাক্তারের সহযোগিতায় চিকিৎসা করা। কলেরা হাঁসপাতালটীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করা। এবৎসর দুইটী কলেরা রোগীকে সেবা করা হয় তাহারা দুই জনেই আরোগ্য লাভ করে। তদ্ব্যতীত সর্ব্ব-সমেত ১৩৬ জন রোগীকে সেবকগণ নানাপ্রকার রোগের জন্য চিকিৎসা করেন। যাতায়াতের পথে ষ্টিমারের উপর কয়েকজন রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি দিয়া সেবা করা হয়। জনতার মধ্যে যাত্রীরা আত্মীয়গণকে হরাইয়া ফেলিলে খুঁজিয়া তাহাদের স্বজনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।

মেসার্স হোরমিলার এণ্ড কোং এবৎসর ষ্টিমারের উপর ও মেলায় ব্যবহার করিবার জন্য সমস্ত ঔষধ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও সেবকগণের

যাতায়াতের জন্য ২০ খানি পাস দিয়া এবং মেসার্স কিলবরণ কোং ২০ খানি পাস দিয়া মিশনের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মেলার কণ্ট্রাক্টার নিজ ব্যয়ে মিশনের জন্য ৩ খানি ঘর প্রস্তুত করিয়া দেন। সবডিভিসনল অফিসর, পুলিস, ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কর্ম্মচারিগণ ও অপরাপর স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী মেলার কয়দিন অতি সহৃদয়তার সহিত সেবকগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রোগীর পথ্য, সেবকগণের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাবদ এবৎসর ১৭২৯/০ আনা ব্যয় হইয়াছে। মেলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট এককালীন অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাসমল, কাঁথি, ৫০৲; মাঃ প্রেসিডেণ্ট, বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলিকাতা, ১৬৷৷০; ও শ্রীযুক্ত নৃত্যানন্দ ধর, কলিকাতা, ২৲।

পথিক।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ

দিবস ফুরায়ে আসে ঘনাইছে অন্ধকার,
নিসঙ্গ ব্যথিত প্রাণে ছুটিয়াছি অনিবার।
হবে নাকি যাত্রা শেষ? পুরোভাগ কি বন্ধুর!
বিক্ষত চরণ দুটি যেতে নারে অত দূর।
চৌদিকে করাল ছায়া, চৌদিকে ভীতির গান,
পলে পলে করে হৃদি নিরাশায় ম্রিয়মান।
তবু যেতে হবে মোরে—নাহিক আশ্রয় আর
দিবস ফুরায়ে আসে—ঘনাইছে অন্ধকার!

কবে যে অজানা দিনে, বাহিরিনু একদিন,
ছায়া তার পড়ে মনে স্বপ্নসম পরিক্ষীণ।
সেদিন প্রভাত-রবি প্রসারি পিঙ্গল কর
বলেছিল 'জাগ পান্থ, হও ত্বরা অগ্রসর।'
বাহিরিনু পথমাঝে নবোৎসাহে পূর্ণ হিয়া,
বাঁধিনু হৃদয়-যন্ত্র বাসনার তন্ত্রী দিয়া।
সলজ্জ প্রকৃতিলক্ষ্মী গুণ্ঠন খুলিলা তার,
চারিদিকে কি উৎসব, কি সৌন্দর্য্য-পারাবার!

নবীন জীবনযাত্রী, নবীন পথের আলো,
ধরণীর নবীনতা বড়ই লাগিল ভাল।
পথমাঝে হল দেখা কতজন কব কায়,
আদরে ধরিয়া মোরে সকলে বাঁধিতে চায়।

জনকজননী-স্নেহ, সখা সখী প্রিয়ভাষী,
প্রিয়ার আনন-ইন্দু প্রবাহিল সুধারাশি,
পিয়ায় আগ্রের স্রোত, কোথা ক্লান্তি শ্রান্তি আর!
রূপ রস গন্ধে মরি পুলকিত চারিধার!

উদিল মধ্যাহ্ন রবি খর কর লাগে গায়,
একে একে প্রিয়জন বিদায় মাগিতে চায়।
এল ক্লান্তি—আশা তবু বলে বাড়াইয়া কর,
"অদূরে বিরাজে কুঞ্জ, হও পান্থ অগ্রসর।"
ছুটিলাম ছুটে যথা তৃষিত পথিক হায়,
এক বিন্দু বারি-আশে সুদুস্তর সাহারায়।
হৃদয়ে বাসনাসিন্ধু উদ্বেলিত নিরন্তর,
এলায়ে আসিল পদ, স্বেদসিক্ত কলেবর।

আজি এই অপরাহ্নে সজল দুইটি আঁখি,
কত না অতীত স্মৃতি পড়ে মনে থাকি থাকি।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—চিহ্ন কিছু নাহি আর,
বিস্তৃত প্রান্তর শুধু ধূ ধূ করে অনিবার।
নিসঙ্গ সম্বলহীন দীন হতে দীনতম,
কে মোরে দেখাবে পথ, হরিবে আশঙ্কা মম!
দেখা দাও মায়াধীশ দেহ পদাশ্রয় আর,
দিবস ফুরায়ে আসে—ঘনাইছে অন্ধকার!

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ

[যেমনটী দেখিয়াছি]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর মত।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

আমাদের জীবনের কোন কোন সুগভীর বিশ্বাসের মূলে এমন কতকগুলি ব্যাপার থাকে, যাহারা স্বভাবতঃই আমাদিগকে ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না। যেমন, ব্যক্তিবিশেষ-সম্বন্ধে বা কাহারও কোন উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে আমরা তৎক্ষণাৎ যে ধারণা করিয়া লই, তাহা সেরূপ জীবন্তভাবে অপরকে বুঝান যায় না; তথাপি উহা আমাদের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়। উহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, অর্থাৎ উহা হয়ত এমন এক সূক্ষ্ম দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা অতি অল্প লোকেরই পক্ষে সম্ভবপর; অথবা উহা ভাবপ্রসূত মাথার খেয়ালমাত্র হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, যাঁহার মনে একবার ঐরূপ প্রবল অনুভূতির ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার পরজীবনের চিন্তাসমূহ অনেকটা উহার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইবেই; আর অপরে, সৌভাগ্যক্রমে যদি উহা বাহ্য ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে 'জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করিবে, আর দুরদৃষ্টবশতঃ যদি মিল না হয়, তবে উহাকে খেয়াল বলিয়া গণ্য করিবে। সেইরূপ, যদি তর্কের খাতিরে আমরা পুনর্জ্জন্মবাদকে সত্য বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, কতকগুলি লোক আপনাদের অন্তরস্থ সুপ্ত স্মৃতিভাণ্ডারে মধ্যে মধ্যে প্রবেশসুখ লাভ করিতে পারেন; তাহা অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহাও সম্ভবপর যে, ঐরূপ

গতিবিধির ফলে তাঁহারা অনেক বিষয়ে মূল্যবান তথ্যের আভাস পাইতে পারেন, যদিও শুদ্ধ কল্পনা ও ইহার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, তাহা কেবল যিনি ঐরূপে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

আমার গুরুদেবের চিন্তা ও মনের উপর যে তিনটী অদ্ভুত আন্তর্জ্জগতিক অনুভূতি স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কতকটা ঐভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে প্রধান, সম্ভবতঃ,—তাঁহার ধ্যানযোগে সিন্ধুনদতীরে এক বৃদ্ধকে বৈদিক ঋঙ্মন্ত্র আবৃত্তি করিতে দেখা। উহা হইতেই তিনি তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তির অদ্ভুত রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন; উহা সাধারণ বেদোচ্চারণপ্রণালী অপেক্ষা, অনেকাংশে গ্রিগরি-প্রবর্ত্তিত সাদাসিধা সুরের* সদৃশ। তিনি সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতেন যে, এই উপায়ে তিনি আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গীতের সুরটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের কবিতাবলীতে তিনি এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার সহিত এই আবৃত্তিকরণপ্রণালীর আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য আছে। এই ঘটনাটীর প্রসঙ্গেই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আচার্য্য শঙ্করও তাঁহারই ন্যায় কোন প্রকারের দর্শন হইতে বেদোচ্চারণরীতির ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন। †

ঐরূপ আর একটী অনুভূতি তাঁহার বাল্যকালে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গমনাগমন

*খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ প্রথম গ্রিগরি রোম্যান-ক্যাথলিক উপাসনার অঙ্গস্বরূপ উক্ত সুরের প্রবর্ত্তনা করেন। উহা সাদাসিধা অথচ গম্ভীর, এবং উহাতে বেশী আরোহ অবরোহ নাই।

† স্বামী সারদানন্দ বলেন—স্বামিজীর ঐ দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের প্রায় দুই বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটিয়াছিল। যে মন্ত্রটী তিনি শুনিয়াছিলেন তাহা গায়ত্রী দেবীর আবাহন:—

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।"

করিতেছেন। একদিন তিনি বাটীতে নিজ ক্ষুদ্র পাঠাগারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি আয়তবপুঃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদনে এমন একটী স্থির, গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছিল যে, তরুণবয়স্ক স্বামিজী তাঁহার দিকে চাহিয়া বোধ করিলেন যেন তিনি অনন্তকাল ধরিয়া দুঃখ ও সুখ উভয়ই বিস্মৃত হইয়াছেন। সাধক আসনপরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আগত পুরুষপ্রবরের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন; তৎপরে ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার বোধ হইল, যেন সম্মুখস্থ মূর্ত্তি কিছু বলিবেন। কিন্তু উহাতে বালকের মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, এবং তিনি কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনি আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এই দর্শন সম্বন্ধেই স্বামিজী পরে বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার বাল্য-কালে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। "আর আমি তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াছিলাম, কারণ আমি জানিতাম, স্বয়ং ভগবান্ই আসিয়া-ছেন।" বুদ্ধের প্রতি স্বামিজীর যে জীবন্ত জ্বলন্ত ভাব ছিল—তাঁহার অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং তাঁহার অসীম ত্যাগ ও দয়া সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, এ সকলের কতটা তাঁহার বাল্যের সেই সাক্ষাৎ দর্শনমুহূর্ত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

তাঁহার অন্তরঙ্গগণের যতদূর জানা আছে, তাঁহার এই বিশিষ্ট দর্শনগুলির তৃতীয় এবং শেষ দর্শন তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। বুঝা যায় যে, ইউ-রোপের ক্যাথলিক দেশসমূহে ভ্রমণকালে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী অপর সকলের ন্যায়, হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সহস্র নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের Blessed Sacrament (ঈশ্বরোদ্দেশে রুটী ও মদ্য নিবেদন) তাঁহার নিকট হিন্দুদিগের ভোগ নিবেদনেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হইত। যাজক-দিগের Tonsure বা মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডন, ভারতীয় সন্ন্যাসিগণের

মস্তকমুণ্ডনের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিত। আর যখন তিনি একখানি চিত্রে দেখিলেন যে, জাষ্টিনিয়ান * দুইজন মুণ্ডিতমস্তক সাধুর নিকট হইতে মুসাপ্রচারিত ধর্ম্মবিধি গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি যাজকদিগের মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডন প্রথার উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিশ্চিত মনে ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেও ভারতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ছিল, এবং ইউরোপ Thebaid † নামক গ্রন্থ হইতে তাহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু-ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান ও গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকদিগকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গে অঙ্গুলি-দ্বারা ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে দেখিয়া, তাঁহার হিন্দুদিগের পূজাদিতে ন্যাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। তারপর যখন তিনি এক গীর্জ্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহাতে অল্প কয়েকখানি মাত্র চেয়ার রহিয়াছে, এবং ঘেরা নির্দ্দিষ্ট আসন (Pews) মোটেই নাই—তখন তিনি এই বিষয়ের চরম নিদর্শন পাইলেন। এতদিন পরে তিনি যেন ঠিক নিজেদের দেশেই রহিয়াছেন, বোধ করিলেন। এখন হইতে আর তিনি খৃষ্টধর্ম্মকে বিদেশী জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

আমি স্বামিজীর যে স্বপ্নবৃত্তান্তটী বলিতে যাইতেছি, আর কতকগুলি চিন্তা হয়ত তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে উহার জন্য উন্মুখ করিয়া দিয়াছিল। উহাদিগের মূল এই :—আমেরিকায় তাঁহার এক ইহুদী শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বামিজীকে নিষ্ঠাবান্ ইহুদী-সমাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে অল্পবিস্তর মনোযোগ সহকারে ইহুদী-

* ফ্লেবিয়াস্ এনিসিয়াস্ জাষ্টিনিয়ানাস্ (৪৮২-৫৬৫)—রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত নীতিসমূহ "Corpus Juris Civilis" নামে সংহত করেন এবং এই জন্যই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

† ষ্ট্যাসিউস্ প্রণীত থীব্‌সের ইতিবৃত্তমূলক ল্যাটিন কাব্য—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্‌স প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধই উহার আখ্যানবস্তু।

দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ তালমুদ (Talmud) পাঠ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বামিজী; যে পারিপার্শ্বিক চিন্তারাশির মধ্য হইতে সেণ্ট পল উদ্ভূত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি আমেরিকায় "কৃশ্চান-সায়েন্স" নামক সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্বদা তিনটী জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—মতবাদ, কর্ম্মকাণ্ড এবং ইন্দ্রজাল অথবা অলৌকিক ব্যাপারজাতীয় আর একটী জিনিস, যাহা সচরাচর রোগ ভাল করা রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমার মনে হয়, তাঁহার উক্ত লক্ষণত্রয়ের শেষটীকে গণনা করার কারণ—কতকটা তাঁহার কৃশ্চান-সায়েন্স ও ঐ শ্রেণীর অপরাপর আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা (তৎসঙ্গে তাঁহার নিজ বিশ্বাসের কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা এক্ষণে ধর্ম্মের এক নূতন মহা সমন্বয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি), এবং কতকটা তাঁহার বক্ষ্যমান অনুভূতিটী—কারণ, উহা তাঁহার মস্তিষ্কে এত জ্বলন্তভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে, উহাকে তিনি জীবন্ত, বাস্তব প্রত্যক্ষ সকলেরই অন্যতম বলিয়া চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন।

রাত্রিকাল; তিনি নেপল্‌স্‌ হইতে যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহা তখনও পোর্ট সৈয়দ অভিমুখে চলিতেছে, এমন সময়ে তিনি এই স্বপ্নটী দেখেন। জনৈক বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "যে স্থানটী তোমাকে দেখাইতেছি, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও। তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে। এই স্থানেই খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ।" খৃষ্টধর্ম্মের এই উৎপত্তির সমর্থন জন্য বৃদ্ধ দুইটা শব্দের উল্লেখ করিল—তন্মধ্যে একটী শব্দ 'থেরাপিউটা'—এবং উভয়েই যে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহাও বলিল। উত্তরকালে স্বামিজী

পুনঃ পুনঃ এই স্বপ্নটীর কথা বলিতেন এবং সর্ব্বদাই শব্দদ্বয়ের ধাতু-প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু তথাপি অপর শব্দটী * আর এখন পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয় কখনও যাইবে না। বৃদ্ধ 'থেরাপিউটী' (থেরপুত্র) শব্দের অর্থ বলিয়াছিল—থের অর্থাৎ উচ্চপদস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পুত্রেরা। ভূমির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এইখানে আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে!"

স্বামিজী জাগিয়া উঠিলেন—বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ স্বপ্ন দেখেন নাই। তিনি বায়ুসেবনের জন্য কোন প্রকারে ডেকের উপরে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়াই জাহাজের একজন কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলেন—তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া নিজ কামরায় ফিরিতেছেন। স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কটা বাজিয়াছে?"

উত্তর হইল, "মধ্যরাত্রি।"

"আমরা এখন কোথায়?"

"ক্রীটের ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে!"

এই অপ্রত্যাশিত ঐক্য দর্শনে স্বামিজী বিস্মিত হইলেন; উহাতে তাঁহার স্বপ্নটীকেও অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হইল। এক্ষণে তাঁহার বোধ হইল, যেন উক্ত অনুভূতি হইতে এমন কতকগুলি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, যাহা উহার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার নিকট চিরকাল অর্থহীন ও অসম্বদ্ধই রহিয়া যাইত। পরে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে খৃষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কথা তাঁহার মনেই হয় নাই, কিন্তু ইহার পরে তিনি আর উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি সহসা বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল সেণ্ট পল সম্বন্ধেই আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। Acts of the Apostles (খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের কার্য্যাবলী) নামক

* আমার নিজের বিশ্বাস যে, দ্বিতীয় শব্দটী 'Essene'; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় আমার মনে নাই—নিবেদিতা।

গ্রন্থ Gospel (খৃষ্টের জীবনী) চতুষ্টয় অপেক্ষা কেন প্রাচীনতর, তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরও অনুমান করিলেন যে, হয়ত খৃষ্টের উপদেশাবলী র‍্যাবি হিলেল (Rabbi Hillel) * হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং ন্যাজারীন নামক প্রাচীন সম্প্রদায় এবং তাহার সুদূর অতীতের গর্ভ হইতে প্রতিধ্বনিত সুন্দর সুন্দর উক্তিসমূহ,—হয়ত ইহারাই খৃষ্টের নাম ও জীবন, এই দুইটিক জোগাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু যদিও তাঁহার দর্শনটী এইরূপে তাঁহার নিজ মনের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি তিনি উহাকে প্রমাণস্বরূপে অপরের নিকট উপস্থিত করিতে যাওয়াকে বাতুলতা জ্ঞান করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, এইরূপ অনুভূতির কোন ফলাফল আছে বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা শুধু যিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছেন তাঁহারই কাজে আসিতে পারে। ইহার প্রভাবে স্বামিজী ন্যাজারেথ-সম্ভূত ঈশার ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ক্রীট দ্বীপই যে সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্মের জন্মভূমি, একথা কখনও বলেন নাই। উহা একটী অনুমান মাত্র, যাহার সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ কেবল লৌকিক পণ্ডিতেরাই করিতে পারিবেন। এতৎ সংক্রান্ত ভৌগোলিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় ও মিসরীয় উপকরণসমূহের সম্মিলনের সর্ব্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কথাই শুধু তিনি উল্লেখ করিতেন। আর বিচারবুদ্ধির চক্ষে এই সন্দেহটুকু থাকিলেও, উহাতে তাঁহার মেরীতনয়ের প্রতি জ্বলন্ত প্রেমের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। হিন্দুদিগের মতে, কোন আদর্শের আদর্শহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, উহার দেশকালের সহিত সম্বন্ধ কতদূর সত্য তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং স্বামিজীর পক্ষে ভক্তির ভাব হইতে Sistine Madonna বা পুত্র-ক্রোড়ে খৃষ্টমাতার একখানি ছবিকে আশীর্ব্বাদ করিতে অস্বীকার, এবং

*ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিতবর্গের অন্যতম। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তৎপরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের বালগোপালমূর্ত্তির পাদপদ্ম স্পর্শ করা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল। সেইরূপ জনৈক মহিলার প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল,—"যদি আমি ন্যাজারেথ-নিবাসী ঈশার সময়ে প্যালেষ্টাইনে বাস করিতাম, তাহা হইলে আমি অশ্রুধারার পরিবর্ত্তে হৃদয়ের শোণিতে তাঁহার পাদযুগল ধৌত করিয়া দিতাম।" এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্ট সম্মতিও পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি ঐরূপ একটী প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্যগ্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "একথা কি তোমার মনে হয় না যে, যাঁহারা এরূপ সব জিনিস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অপরের উপাসনার নিমিত্ত যে সকল আদর্শ প্রচার করিতেন, নিজেরাই সে গুলির সজীব বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন?"

সত্যলাভ।

(ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য)

সত্য কি?

উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেই বিকার প্রাপ্ত হয়। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম (birth), সত্তা (relative existence), বৃদ্ধি (growth), বিপরিণাম (change), অপক্ষয় (decay) ও বিনাশ (death)। একটী বৃক্ষের কথা ধরুন। এই বৃক্ষটী ইতিপূর্ব্বে ছিল না। একদিন একটী বীজ পুঁতিলাম, সেই বীজ রস ও উত্তাপ সহযোগে অঙ্কুরিত হইল—বৃক্ষটী জন্মলাভ করিল। এতদিন বৃক্ষের সত্তাই ছিল না; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের অস্তিত্ব হইল। তৎপরে বৃক্ষটী বড়

হইতে লাগিল ; ক্রমে তাহাতে পত্র, পুষ্প ও ফলোদ্গম হইল। বৃক্ষটী তাহার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিল। এইবার বৃক্ষদেহের মূলীভূত কারণগুলি ধীরে ধীরে পৃথক্ হইতে লাগিল—কার্য্য কারণে লয় হইয়া গেল—বৃক্ষের ক্ষুদ্র জীবনের অবসান হইল—বৃক্ষ মরিয়া গেল। ইহাই নামরূপাত্মক যাবতীয় বস্তুর জীবনেতিহাস। কারণ, যাহা কিছু দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন তাহাই কতকগুলি কারণের সমবায়ে গঠিত—তাহা বদ্ধ—তাহার অস্তিত্ব কারণগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। যতদিন তাহারা সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবে ততদিনই বস্তুর অস্তিত্ব—যে মুহূর্ত্তে তাহারা পৃথক্ হইয়া যাইবে সেই মুহূর্ত্তে তাহার লয়। সূর্য্য, চন্দ্র, কোটী কোটী নক্ষত্রমণ্ডলী সকলেরই এই পরিণাম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—তাই ইহার নাম জগৎ অর্থাৎ সদা পরিবর্ত্তনশীল—তাই ইহা অনিত্য—মিথ্যা।

তবে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই—সবই মিথ্যা—সবই দুদিনের? আছে। এই দেশ-কাল-নিমিত্তের পারে এমন এক বস্তু আছে যাহা অপর কতকগুলি কারণের সমবায়ে জন্মলাভ করে না—যাহা এ থাকের বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাহার অস্তিত্ব ধার করা নয়—যাহা নিজের সত্তায় সত্তাবান্—যাহা অস্তিঃস্বরূপ। দেশে যাহার উদ্ভব নয়, দেশ যাহা হইতে উদ্ভূত ; কালে যাহার উদ্ভব নয়, কাল যাহা হইতে উদ্ভূত ; নিমিত্তে যাহার উদ্ভব নয়- নিমিত্ত যাহা হইতে উদ্ভূত।

এই দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত অবস্থা বুঝিতে হইলে, দেশ, কাল ও নিমিত্ত কি তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। পাশাপাশি দুইটী পদার্থ রহিয়াছে ; কে উহাদিগকে পৃথক্ করিতেছে?—দেশ (Space)। পর পর দুইটী একই প্রকার শব্দ হইল ; কে উহাদের পৃথক্ জ্ঞান উৎপাদন করিল?—কাল (Time)। আজ একটী বীজ রোপণ করিলাম, কাল উহা এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল ; কে এই পার্থক্য ঘটাইল?—নিমিত্ত (Causation)। অতএব

বহুত্বের জ্ঞান দেশ-কাল-নিমিত্ত হইতেই জন্মায়। বহুত্বজ্ঞানের আর অপর কোন কারণ নাই। সুতরাং যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত সেখানে দুই নাই—তাহা একমেবাদ্বিতীয়ং—তাহাই সত্য। যাহা এক তাহা অনন্ত, অসীম—কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবে? তাহা অবিনাশী—কে তাহাকে বিনাশ করিবে? তাহা অভয়—কে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে?

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ? তৎ কেন কং পশ্যেৎ? তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ? তৎ কেন কমভিবদেৎ? তৎ কেন কং মন্বীত? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ? যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ? বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?*

—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

আমরা কি করিয়া এই মহান্ সত্যকে লাভ করিব? ধনের দ্বারাই ধন লাভ হয়। বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয়, ত্যাগের দ্বারাই সন্ন্যাস লাভ হয়, প্রেমের দ্বারাই প্রেমস্বরূপকে লাভ করা যায়—আমরা সত্যের দ্বারাই সত্য লাভ করিব। শ্রুতি বলিতেছেন—

"সত্যেনলভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।"

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং

* যেখানে যেন দ্বৈতই হইয়াছে সেখানে এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দেখে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে চিন্তা করে এক অপরকে জানিতে পারে; আর যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া যায় সেখানে কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কে কাহাকে চিন্তা করিবে? কে কাহাকে জানিবে; যাহা দ্বারা এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইতেছে, তাহাকে কে জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কে জানিবে?

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।”

—মুণ্ডকোপনিষদ্।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি।

—প্রশ্নোপনিষদ্।

তাঁহাদেরই এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক যাঁহাদের কপটতা, মিথ্যা-ব্যবহার ও ছল নাই।

সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার দ্বারাই এই আত্মলাভ হয়। সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যার কখনও জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই সেই বিস্তীর্ণ দেবযান মার্গ লাভ করা যায়।

সত্যনিষ্ঠা বলিতে কি বুঝায়? কায়মনোবাক্যে সত্যপালনের নামই সত্যনিষ্ঠা। বাক্যে সত্যপালন, যথা—সত্য কথা বলা অর্থাৎ ফলাফলের দিকে না চাহিয়া কোন বিষয়ের যথাজ্ঞান বিবৃতি। মনে সত্যপালন, যথা—(১) মন হইতে সকল প্রকার মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করা; অর্থাৎ কোন একটী অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াও তাহা গোপন করিবার জন্য মনে মনে কোন প্রকার মিথ্যা কল্পনার পোষণ না করা। (২) সর্ব্বদাই সদসৎ বিচার করা। কায়ে সত্যপালন তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা—(১) কথা রক্ষা করা অর্থাৎ যাহা করিব বলিয়াছি তাহা কার্য্যে পালন করা। (২) অকপট ব্যবহার করা অর্থাৎ ভিতর বাহির সমান করিয়া চলা। যাহারা কপট তাহাদের মনে এক ভাব কিন্তু তাহারা বাহিরের হাবভাব চালচলনে অন্য প্রকার দেখায়—এরূপ না করা। (৩) মনে সদসৎ বিচার করিতে করিতে যেটী মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সত্যটী গ্রহণ করা।

অন্যান্য গুণ অপেক্ষা সত্যের এত আদর কেন? ইহার কারণ, সত্য সকল গুণের আয়তন—আধার। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন ভ্রমর আসিয়া জুটে, সেইরূপ যে সত্যকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকে, তাহার অন্তরে দিন দিন নব নব গুণের বিকাশ হইতে থাকে।

সত্যবাদী হইতে হইলে অকপট হইতে হইবে—মন মুখ এক করিতে হইবে। অকপট লোক সংসারে অতি বিরল। যে অকপট, লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করে এবং স্ত্রী-পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস করে। অকপট ব্যক্তি সকলের নিকট প্রাণ খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লয়। সে কোন অপবিত্র ভাব বা বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না—অন্ততঃ, লোকলজ্জার ভয়েও তাহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

একটা মিথ্যা কথা বলিলে সেটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আরও দশটা মিথ্যা কথা বলিতে হয়, নানারূপ প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি করিতে হয়—তাহার উপর সদাই ভয় কখন ধরা পড়ি কখন অপদস্থ হই। তাহার মন সর্ব্বদাই ভীত ও সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু সত্যবাদীর পথ অতি সরল—তাহাতে লুকোচুরি নাই—ভয় নাই। সে সদাই প্রফুল্ল—সদাই নিশ্চিন্ত। যদি কখনও সে অন্যায় করে তাহা হইলে তাহা স্পষ্টই স্বীকার করে এবং স্থিরচিত্তে তাহার ফলভোগ করে।

সত্যবাদীকে বাক্‌সংযম করিতে হয়। বেশী কথা বলিলে তাহার সঙ্গে দুই চারিটা মিথ্যা কথাও বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য তাহাকে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি বাজে কথা পরিত্যাগ করিতে হয়। কাজেই সে "বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতির্জ্জন সংসদি"—গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সচ্চিন্তায় কালাতিপাত করে।

সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার নিকট কথা কেবল শব্দ মাত্র নয়; সে জানে, Man's word is God in man—কথা দিলাম ত জান দিলাম—এই তার ভাব। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হউক অথবা প্রাধান্য লাভের জন্যই হউক, কোন কাজের জন্য প্রতিশ্রুত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না কিন্তু তার পর কাজের সঙ্গে কোন খোঁজ খবর নাই। আর যে সত্যবাদী সে হয় ত সব কাজ করিতে রাজি হয় না কিন্তু যেটী করিব বলিয়া কথা দেয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন যেন প্রতিজ্ঞা-

রক্ষা করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। এইরূপে সত্যবাদীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

সত্য হৃদয়ে সৎসাহস আনিয়া দেয়। দণ্ডীরাজ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অশ্বিনীকে লইয়া রাজামহারাজার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে নদীতে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে কে আশ্রয় দিয়াছিল কে তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল? একটী অবলা রমণী। কিসের সাহসে, কিসের প্রেরণায় রমণী তাহার ত্রিভুবনবিজয়ী ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ারূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইল? সত্যের প্রেরণায়। কি হেতু ভীমসেন প্রাণপ্রতিম যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? সত্যের প্রেরণায়। সত্যনিষ্ঠাই নচিকেতার হৃদয়ে সেই অমানুষিক সাহস আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে বালক মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যমালয়ে যাত্রা করিয়াছিল। সত্য-নিষ্ঠাই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিল। বালক পুনঃ পুনঃ প্রলোভিত হইয়াও যখন জলদগম্ভীর স্বরে বলিল,—

"যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥"

অর্থাৎ এই যে আত্মবিষয়ক গূহ্য বর, নচিকেতা এ ছাড়া অন্য কোন বর চায় না, তখনই যম তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

সত্যবাদীর হৃদয় দিন দিন শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার মন মিথ্যা, দু-দিনের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। কথায়, কার্য্যে, চিন্তায়—প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সে কেবল সত্যকেই অনুভব করিতে চায় এবং দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নব নব রহস্য অবগত হইতে থাকে। তাহার মুখে সত্যের বিমলজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়—যে

তাহার সঙ্গ করে সেই পবিত্র হইয়া যায়। সত্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না—উহা উপলব্ধির বস্তু যে উপলব্ধি করিবে সেই দেখিবে সত্যের ভাণ্ডারে কি অমূল্য ধন রহিয়াছে—পার্থিব রত্নরাজি তাহার নিকট তুচ্ছ। "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি" বলিয়া সনাতন নদীনীরে মাণিক ফেলিয়াছিল, এ সেই ধন। বহ্নিপুরাণে আছে—

> "সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।
> সত্যমেব পরোযজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতম্ ॥
> সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্।
> কীর্ত্তির্যশশ্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবর্ষি পূজনম্ ॥
> আপ্তো বিধিশ্চ বিদ্যাচ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।"

ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহা সত্যনিষ্ঠার জলন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ। বৈদিকযুগে সত্যকাম, পৌরাণিক যুগে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রভৃতির কথা আমরা পড়িয়া আসিতেছি এবং আধুনিক যুগে—আধুনিক যুগ বলি কেন, এই সেদিন বঙ্গদেশে—এই কলিকাতা নগরীর সন্নিকটে যে অশ্রুতপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত সত্যসূর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহার কথা কি আর স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? আমরা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতেছি। কি অমানুষিক অনুরাগের সহিত তিনি আজীবন সত্য পালন করিয়াছিলেন! যখন যাহা করিব বলিয়াছেন তখনই তাহা করিয়াছেন; যখন যেখানে যাইব বলিয়াছেন তখনই সেখানে গিয়াছেন; যাহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিব বলিয়াছেন, তাহারই নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; যাহা একবার করিব না বলিয়াছেন তাহা জীবনে কখনও করেন নাই। ছোট বড় সকল বিষয়েই তাঁহার সত্যের উপর সমান আঁট ছিল। আজীবন এইরূপে সত্য পালন করায় শেষে তাঁহার স্বভাব এইরূপ হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার মুখ দিয়া একবার যাহা বাহির হইয়াছে, ভুলক্রমেও তিনি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিতেন না—তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী তাহা

করিতে পারিত না। জানিনা আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কিনা, কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল। আজীবন একভাবে চিন্তা করিলে যে কি অদ্ভুত ফল প্রসব করে তাহা আমরা এই সকল মহাপুরুষের জীবনেই দেখিতে পাই। বিজ্ঞান এখনও ইঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইঁহাদের জীবনই নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। আমরা এই মহাপুরুষের জীবনের প্রথমাবস্থার ইচ্ছাকৃত এবং শেষাবস্থার স্বতঃপ্রণোদিত কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পার্শ্বেই শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগান-বাটী। ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন তিনি যদু মল্লিককে বলিয়াছেন যে তাঁহার বাগানে যাইবেন কিন্তু কোন কারণে সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার হঠাৎ সেই কথা মনে পড়িল। তখন তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সেই বাগানের দিকে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখেন যে বাগানের ফটক বন্ধ। কি করেন, কথা ত রাখিতেই হইবে। ফটকের দ্বারে ফাঁক ছিল, তিনি সেই ফাঁক দিয়া পা গলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, আমি এসেছি।" পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রা গেলেন।

পূর্ব্বের ঘটনাটী তাঁহার ইচ্ছাকৃত সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ, কিন্তু নিম্নের ঘটনা দুইটী তাঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা—যখন সত্যই তাঁহাকে চালিত করিত—যখন তিনি চেষ্টা করিয়াও অসত্য আচরণ করিতে পারিতেন না। ঠাকুর বলিতেন, "যার সত্যে আঁট আছে, মা তার কথা মিথ্যা হতে দেন না।" বাস্তবিকই নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটী হইতে আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

একদিন জনৈকা বৃদ্ধা ভক্ত (গোপালের মা) ভাত রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছেন। কিন্তু ভাতগুলি শক্ত ছিল। ঠাকুরের শক্ত ভাত সহ্য হইত না। তিনি উহা না খাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওর হাতে আর কখনও ভাত খাব না।" বাস্তবিকই

ইহার অল্পকাল পরে ঠাকুরের গলায় ঘা হইয়া ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং আর গোপালের মার হাতে খাওয়া হইল না।

আর একবার ঠাকুরের পেটের অসুখ করিয়াছিল। ঠাকুর শম্ভুবাবুর নিকট এই কথা বলিলে তিনি ঠাকুরকে তাঁহার নিকট হইতে একটু আফিম লইয়া গিয়া খাইতে বলিলেন। পরে দুই জনেই ঐ কথা ভুলিয়া গেলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুরের আফিমের কথা মনে পড়ায় তিনি ফিরিয়া গেলেন কিন্তু শম্ভুবাবুকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম লইয়া কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু কিছুদূর আসিতে না আসিতে তিনি আর পথ দেখিতে পাইলেন না। কে যেন জোর করিয়া পাশের নালার দিকে তাঁহার পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। রাস্তা ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন; তখন বেশ রাস্তা দেখিতে পাইলেন। আবার ফিরিলেন, আবার সেইরূপ পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন হঠাৎ তাঁহার আফিমের কথা মনে হইল। তিনি উহা শম্ভুবাবুর নিকট হইতে লইব বলিয়া তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে লইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শম্ভুবাবুর বাসায় ফিরিয়া গেলেন কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় আফিমের মোড়াটী খুলিয়া জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল।" এই বলিয়া তিনি শুধু হাতে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এবার বেশ পরিষ্কার পথ দেখিতে পাইলেন।

আমরা কি এই মহাপুরুষের জীবনী শুধু পাঠই করিব, না তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের জীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব?

আমাদিগের আদর্শ।

(শ্রীনীলকণ্ঠ চৌধুরী, বি এ)

আদর্শ জানা না থাকিলে আমরা পদে পদে বিপন্ন হইয়া পড়ি। উদ্দেশ্যবিহীন মানুষ বাতুলের ন্যায় ঘুরিয়া সমাজশরীরে ক্ষত উৎপাদন করে এবং নিজেও অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করে।

কোন একটি প্রাণিশরীর যেমন জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, সেইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার জন্য আমাদিগকে এক পূর্ণ আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব। আমাদিগের এই পূর্ণ আদর্শটি কি?

আমরাই আমাদিগের আদর্শ। যীশু কিম্বা বুদ্ধের যতই সাধ্য সাধনা করি না কেন আমরা আমাদিগকে ছাড়াইয়া কখনই উঠিতে পারিব না। বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে বুদ্ধের মত হইতে হয়। বুদ্ধের পরে অনেক ছোট ছোট বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধও কি নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন? তিনিও নিজের মধ্যে নিজেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। আমি' না থাকিলে বাহ্যজগৎ থাকে না। আমার উপর নির্ভর করিয়াই বাহ্যজগৎ এত মহৎ দেখাই-তেছে। বাহ্যজগতের প্রমাণ 'আমি'। উপাধিকে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই প্রকৃত 'আমি'। উপাধি কি? 'যাবৎ কালমবস্থায়ী ভেদহেতুরুপাধিতা'। সাময়িক পরিবর্ত্তনশীল ভেদহেতুর নাম উপাধিতা। যে ভেদ বা বিশেষত্ব বস্তুর স্বরূপভূত (Proprium) নহে তাহাকেই উপাধি (Accident) বলা যায়। আমার দেহের জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না এবং আমার মনবুদ্ধির জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকে না—এ সকল আমার উপাধি মাত্র কিন্তু আমার চৈতন্য বা সাক্ষিস্বরূপত্ব যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন কালেই সমান-

ভাবে বর্ত্তমান (কারণ সুষুপ্তিরও স্মৃতি থাকে) তাহাই আমার আত্মস্বরূপভূত। সুতরাং আদর্শের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে না।

"যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ॥

এই শান্ত, শিব, অদ্বৈতস্বরূপ 'আমিটিই' আমাদিগের আদর্শ। ইহার নিকট আর সমস্ত আদর্শ হীন। আমাদিগকে উহারা ক্ষণকাল শান্তি দিয়া স্বপ্নের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে আমাদিগকে এই আদর্শই ধরিতে হইবে।

কিন্তু এই 'আমিটির' অস্তিত্বের প্রমাণ কি? অনেকে বলিয়া থাকেন, অনন্তকে কি আমরা ধরিতে পারিব?, যদিও এই অনন্ত, 'আমির' অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, তথাপি আমাদিগকে 'সান্ত' লইয়াই থাকিতে হইবে। কারণ, আমরা সান্ত—ইহাই অনেকের মত। এখানে ধরাধরির কথা কিছু নাই। আমরা যদি সান্ত হইতাম—তাহা হইলে এই কথা বলা যাইত—কিন্তু আমাদিগের স্বরূপই অনন্ত। "প্রত্যক্ষ অনুভূত শ্রোত্রাদিগম্য শব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব কিরূপে অপ্রমাণিত হয়?" শব্দাদির ভেদ দ্বারা কি আকাশের একত্ব অপ্রমাণিত হয়? না তাহা হয় না। তবে শব্দস্পর্শাদির ভেদ দ্বারা ব্রহ্মেরও একত্ব ও অনন্তত্ব অপ্রমাণিত হয় না। ব্রহ্ম সকলের আত্মা, অতএব ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্যক্ সিদ্ধ। কারণ, সকলেরই আপন অস্তিত্বজ্ঞান আছে। 'আমি' নাই এরূপ কেহ অনুভব করেন না। 'আত্মা নাই' এ কথা সত্য হইলে, সকলেই অনুভব করিত 'আমি নাই'। কিন্তু 'আমি' না থাকিলে 'আমি নাই, এরূপ অনুভব করিবে কে? এই 'আমির' প্রমাণ 'আমিই'। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর সমস্ত অনুমানাদি প্রমাণ নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ নাই। অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষকে কিরূপে প্রমাণ করিব? "মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে। এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।" প্রমাণক্রিয়াকে বল সঞ্চার করে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে

যাহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কি? না, যে অগ্নি ইন্ধনে দাহিকা শক্তির সঞ্চার করে সেই অগ্নিকে ইন্ধন দ্বারা দগ্ধ করিতে। হাজার তর্ক করিলেও আবিষ্কৃত সত্যটি কখনও মিথ্যা হইয়া যাইবে না। ইহা চিরদিনই সত্য থাকিবে। প্রকৃত আমিটিকে হারাইয়া আমরা বৃথা ক্রন্দন করিয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

"ত্বমেব দশম ইতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ।
অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যতি এব ন রোদিতি॥"

দশজন ব্যক্তি একত্রে একটি নদী পার হইলেন। পর পারে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন গণনা রিয়া দেখিতে লাগিলেন, সকলে পার হইয়াছেন কিনা। কিন্তু তিনি নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করাতে নয়জন মাত্র হইল। তখন একজন জলে ডুবিয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেখানে আসিয়া রোদনের কারণ অবগত হইয়া গণনাকারীকে বলিলেন 'নয় জন হইবে কেন? দশ জনই ত ঠিক রহিয়াছে। তুমি নিজেকে গণনা করিতেছ না কেন? তুমিই ত দশম ব্যক্তি।' প্রকৃত-পক্ষে এই দশাই আমাদিগের হইয়াছে। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ছুটাছুটি করিতেছি—আর কেবল সন্দেহের সাগরে নিমগ্ন হইতেছি।

বেদান্তের কথা শুনিলে অনেকে উহাকে শুষ্ক তর্ক বলিয়া উপহাস করেন। বেদান্তের ব্রহ্মে যেন আনন্দ নাই—উহা নীরস! কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম আর এই 'আমি'তে কি কোন তফাৎ আছে? আমাপেক্ষা কে আমার অধিক প্রিয়তর কে অধিক আনন্দদায়ক? এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ 'আমিই' অভয় ও অমৃতস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যং সুখং" বলিয়াছেন, তাহা কি একটা অচেতন জড়কণা চিনির দানার ন্যায়? চিনি নিজের সুখ নিজে বোঝে না বলিয়া কি চেতনাস্বরূপ আমিও আমাতে থাকিয়া সুখ পাইব না? নিজের

মধ্যে আনন্দ না থাকিলে কি অন্য কেহ আমাদিগকে আনন্দ দিতে পারে! আমিই আনন্দস্বরূপ। আমার সহিত সম্পর্কিত হইয়াই ত অপরের আনন্দ।

দ্বিতীয়তঃ, 'তর্ক করিও না—তর্ক করিও না' এই রব প্রায়ই শুনা যায়। যেন তর্কের কোন প্রয়োজন নাই—যেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই সমস্ত সত্যটিকে বুঝিয়া ফেলিব! তর্ক করা যদি ভাল হয়, তবে তর্ক করিতেই হইবে। শাস্ত্রেও ত পুনঃ পুনঃ মননের কথা রহিয়াছে। তবে তর্ক করিতে এত ভয় কেন? যদি কোন বিশ্বাস যুক্তিতর্কের আঘাতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তবে যাউক—বিশ্বাস আমরা চাহি না—ইহাতে কেবল সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় এমন দেয় মাত্র।

এই বেদান্তের দেশে এত হীনতা এবং স্বার্থপরতা ঢুকিল কিরূপে? আমরা তথাকথিত ইতর লোকের সহিত মিশিতে পারি না। তাহারা হীন—অস্পর্শ! বেদান্তের দেশে ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বটে! যে দেশের লোক প্রতিদিন

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

পাঠ করিয়া থাকে সেই দেশের লোক কিনা মানুষকে ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা করে! আমরা শ্লোকটিই পাঠ করি, কিন্তু ইহাকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করি না। অনেকে বলিবেন—মহাশয়, এই শ্লোকটি সমাধিলাভের পরের অবস্থা বলিতেছে। ভাল যুক্তি বটে! যাহার হৃদয় অপরকে আলিঙ্গন করিতে সমাধির অপেক্ষা রাখে তাহার হৃদয় আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমরা যতই ধর্ম্মের জন্য গর্ব্ব করি না কেন—আমরা আদর্শ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। খ্রীষ্টান মিশনরী আসিয়া যখন চণ্ডালকে আলিঙ্গন করে তখন আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই না কেন? আবার তাহাদিগের নিকটই আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি! কয় জন আমরা গরীবের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি? আমাদের দেশের লোকের

মত এত গরীব—এত মূর্খ লোক আর কোথায়! এত বড় জমী পড়িয়া রহিয়াছে—কেবল কৃষকের অভাব!

এই যথার্থ 'আমি'কেই আদর্শ করিয়া আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে—উপাধি জনিত ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সকলের ভিতর একত্ব দর্শন করিতে হইবে সকলের ভিতরেই সেই 'আমি'কে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই আমরা চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে পারিব—নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিতে পারিব। এই আদর্শ টিকে পূর্ণমাত্রায় ধারণা না করিতে পারিলেও আমরা অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব—ছোট লোকের স্পর্শে আমাদের জাতি যাইবে না—আমরা যাহা তাহাই থাকিব।

আদর্শ বড় হইলে যে কাজও বড় হয় তাহার প্রমাণ Roman Law. "Law of Nature" ছিল Roman Lawএর আদর্শ। তাহার জন্যই উহা অন্যান্য দেশের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। এত বড় যে French Revolution—তাহারও গোড়া এই Law of Nature. দার্শনিক নীচের Superman প্রস্তুত করিতে হইলে এক বেদান্তেরই সাহায্যেই হইতে পারে—অন্য কিছুতে নহে। সেই অদ্ভুত বৈদান্তিক শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। তিনি নীচের Supermanএর চেয়েও কত বড়!

বিদেশীরাও আমাদিগের বেদান্তে শান্তি পায়, আর আমরা পাই না! Schopenhouerএর মত, Max Mullerএর মত লোক শান্তি পায়, আর আমরা উহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ভাবিয়া বসিয়া রহিয়াছি! 'আমি'টিকে ভুলিয়াই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা।

এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য কি যাইবে না? আবার কি শ্রীকৃষ্ণের গভীর বাণী "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" আমাদিগকে উদ্বোধিত করিবে না?

স্বামী বিবেকানন্দ।

(শ্রীভুবনমোহন হাওলাদার)

অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে বেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রচলিত। বেদান্ত হিন্দুজাতির অস্থিমজ্জাগত। তবে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ অনুষ্ঠান পদ্ধতি ভিন্নরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মূলে সেই একত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া ভারতে বৈষম্যের ভিতরও সাম্য আছে।

এদেশে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের সকলেরই সাধারণ লক্ষ্য "ত্যাগ"। ত্যাগী না হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, ইহাই হিন্দুজাতির বিশ্বাস। শুধু হিন্দু কেন? সমগ্র পৃথিবীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, ত্যাগীই বড়। এই ত্যাগ প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন যুগে, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কত অবতার এবং মুনিঋষিগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রাচীন, অতি প্রাচীন বার্ত্তা "ত্যাগ" প্রচার করিবার জন্য আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল— ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। যখন ভারত তাহার সনাতন আদর্শ আত্মসাক্ষাৎকার বিস্মৃত হইয়া দেহসুখের জন্য মনপ্রাণ নিয়োজিত করিতেছিল, তখন এই কামকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর দর্শনলাভেচ্ছায় মাটীতে মুখ ঘসড়াইতে ঘসড়াইতে বলিতেছিলেন, "মা জীবনের আর একটা দিন কাটিয়া গেল, এখনও দেখা দিলি না!" এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে হইবে। আসুন, একবার এই বিবেকানন্দ স্বামী কে তাহার পরিচয় লই।

ইনি কি সেই কলিকাতা শিমলার গৌড় মুখার্জ্জির লেনস্থিত দত্ত

পরিবারের নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি জেনারেল এসেম্ব্লি ইনিষ্টি-টিউসনের ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতকারী, বিস্ফারিত নেত্র, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ; সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে প্রশ্নকারী নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি সেই গাজিপুরের গঙ্গাতীরবাসী তত্ত্বদর্শী পওহারা-বাবা দর্শনতৃপ্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত? ইনি কি সেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াতকারী যুবক? ইনি কি সেই যুবক যিনি একদা বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া সংজ্ঞা-হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গুলীস্পর্শে ও হরিনাম শুনিতে শুনিতে সংজ্ঞালাভ করিয়া "দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ" গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন? ইনি কি সেই যুবক, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতেন? ইনি কি সেই যুবক, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহার ভিতর আপনার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া স্বীয় কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন? ইনি কি সেই যুবক, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর কৌপীনমাত্র অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্যটন করিয়া বিভিন্ন দেহসমূহের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম, আহার-বিহার সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইয়াছিলেন?— হাঁ, ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই যে তিনি উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দর্শনে বুঝা যায়। কি বীর্য্যে, কি তেজস্বিতায়, কি পাণ্ডিত্যে, কি সঙ্গীতাদিতে, কি বাগ্মিতায়, কি আমোদপ্রমোদে, কি ত্যাগবৈরাগ্যে, কি তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ জগতে অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজি যে সকল গুণের সমষ্টি ছিলেন সেই সকল গুণ তাঁহার এক একখানা ফটো দেখিয়া চিন্তা করিলেই বিশেষরূপে বুঝা যায়।

যষ্টি-হস্তে মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রাজকবেশের ফটোটি দেখিলেই কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী সংসারাসক্তি-বিরহিত যতি বলিয়া বোধ হয়। বাবরী-চুলবিশিষ্ট, চোগা-চাপকান-পরিহিত, চেয়ারে উপবিষ্ট বিবেকানন্দকে দেখিলে বোধ হয়, ব্রহ্মচর্য্যে লোককে যে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে, স্বামীজি সেই সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তাঁহার চিকাগোর সেই উষ্ণীষ-শোভিত, বাহু-বিজড়িত-বক্ষ বীরমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। আবার তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া, ইহ জগৎ হইতে উর্দ্ধে, অতি উর্দ্ধে কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা স্বামীজি ট্রেণে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। সেই গাড়ীতে মহামতি তিলক ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্যারিষ্টার ছিলেন। ব্যারিষ্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক হইতেছিল। ব্যারিষ্টার হিন্দুধর্ম্ম, বেদবেদান্ত অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। তিলকও যথাসাধ্য স্বীয় মত সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজি নাকে মুখে একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক শুনিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, তিলক আর ব্যবহারজীবীর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন মুখের কম্বল ফেলিয়া সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিয়া ব্যারিষ্টারের সহিত হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ব্যারিষ্টার অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরে তিলক চিকাগোর মহাসম্মেলনে হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া ঐ ব্যারিষ্টারকে বলিয়াছিলেন, "এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, গাড়ীতে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই এই ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানিং জন্মায় নাই।"

স্বামীজি অসাধারণ দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইউরোপ হইতে

প্রত্যাগত হইলে, কোন একটী লোক তাঁহাকে ঐ দেশের তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন যে, "ইউরোপ জড়বিজ্ঞান বলে পার্থিব উন্নতি এত করিয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ উহার তুলনায় নগণ্য।" প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ উন্নতির পরিণাম কি?" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "ঐ উন্নতির পরিণাম এই যে, হঠাৎ কোন সামান্য কারণে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংসপ্রায় করিবে।" বর্ত্তমান মহাসমরের প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজি এই কথা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারতবাসী নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত। তমোগুণ ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কর্ম্ম করিতে হইলে রজোগুণের প্রয়োজন এবং রজোগুণসম্পন্ন লোকেরাই শীঘ্র সত্ত্বগুণে পঁহুছিতে সমর্থ। তাই তিনি যুবকগণকে কর্ম্মোপদেশ দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার কথা বলিতেছি :— ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগ। ঠন্‌ঠনিয়ার কালীমন্দিরের সংলগ্ন যে দ্বিতল গৃহটী বর্ত্তমান, ঐ গৃহে রামমোহন লাইব্রেরী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের পূর্ব্ব দিবস ঐ লাইব্রেরীতে আমার একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাই। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের কথা আমি উত্থাপন করিয়া বন্ধুটীকে উৎসব দেখিবার জন্য অনুরোধ করি। আমার কথা শুনিয়া বন্ধুটী তথায় যাইতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা আমি যাব এবং বিবেকানন্দকে কয়েকটী কথা শুনাইয়া আসিব।" আমি বলিলাম, "কিছু বল্‌তে হবে না। দেখ, যেন তোমার ব্রাহ্মগিরি ছুটে না যায়।"

অতঃপর বন্ধুটী শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে তাঁহার সহিত দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া বন্ধুটী বলিতে লাগিল, "ভাই, চারি পাঁচ হাজার লোককে লুচি, পায়স, খিচুরী আকণ্ঠ খাওয়াইল!" আমি বলিলাম, "যাহা দেখিতে গিয়াছিলে তাহার কি হইল?" বন্ধুটী বলিল,

"বিবেকানন্দ স্বামীকে বলিলাম, "মহাশয়! আমাদিগকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" আমি আমার নাম বলিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়?" আমি বলিলাম, "সিটি কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।" স্বামিজী বলিলেন, "ফিলজফী পড় কি?" আমি—আজ্ঞে হাঁ। স্বামিজী—Define Philosophy.

আমি Stephenএর নোট পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা বলিলাম।

স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মাছ মাংস খাও?"

আমি—না, আমি নিরামিষ খাই।

স্বামিজী—তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন? তুমি মাছ খাও মাংস খাও, নাগরি জুতা পর, মাথায় পাগ্‌ড়ী পর, ছুটাছুটী কর, নড় চড়, কাজ কর। Look at the sky and think over that piece of cloud and you will know what Philosophy is. তুমি তরুণবয়স্ক যুবক, তোমার চক্ষু কোটরগত, তোমার মুখমণ্ডল মলিন! তোমায় দেখিয়া সুখী হইলাম না।

ভাই, এই কথাগুলি যখন স্বামিজী বলিতেছিলেন তখন তাঁহার চক্ষু দুইটা দেখিয়া বাস্তবিক আমার ভয় হইয়াছিল। আমি আর তাঁহার সহিত কথা না বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

স্বামিজী অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও নিরভিমান ছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনাটী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

সম্ভবতঃ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে অর্থাৎ পূজার ছুটীতে স্বামিজী কিছু দিনের জন্য দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। একদিন তিনি কোট প্যাণ্ট পরিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত দেওঘর স্কুলের একটী ছাত্রের সাক্ষাৎ হইল। ছাত্রটীর জুতার ফিতা আলুগা ছিল। তাহা দেখিবামাত্র তিনি স্বয়ং সেই বালকের জুতার ফিতা আঁটিয়া বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার

পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "Be active my dear boy." সেই বালকই এখন হাজারিবাগ Dublin Mission Collegeএ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি স্বামিজীকে চিনিতে না পারায় কথন আলাপ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিরদুঃখিত। রাস্তা দিয়া কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহার দিকে তাকায়? কিন্তু লোকশিক্ষকেরা কিছুই উপেক্ষা করেন না। তাঁহারা ছোট বড় সকল বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখেন।

আমেরিকাতে কত প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গুরুকৃপাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, ইন্দ্রিয়বিজয়ী বিবেকানন্দ ভোগ-বিলাসের লীলানিকেতন আমেরিকা ও ইউরোপে মহাবীরের ন্যায় দিগ্বিজয় করিয়া পূতভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যিনি হৃদয়-মন্দিরে ভগবানকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কাম-ক্রোধাদি ছয়টী পশুকে বলিদান করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে পার্থিব প্রলোভন দাঁড়াইতে পারিবে কেন?

লোকে বলে, ঈশ্বরকে দেখা যায় না—বিশেষতঃ কলিযুগে। তাঁহাকে দেখিবে কিরূপে? যে শক্তিসঞ্চয় হইলে আত্মদর্শন হয়, সেই শক্তির অভাব হইলে তাহা কিরূপে সম্ভবে? স্বামিজী অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও সত্যবাক্ ছিলেন বলিয়া সেই শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।" আমরাও যদি ভগবান্ লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে একটু সরল পথে চলিতে হইবে—পাটোয়ারী বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। মন পরিষ্কার হইলে ত সেই পথের পথিক হইতে পারিব। তাহা না হইলে আসা যাওয়া সকলই বৃথা।

স্বামীজি আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? তিনি পাশ্চাত্য-দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কলম্বোয় অবতরণ করেন এবং সেখান হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া

তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাঁহার প্রাণের কথা বলিয়া বেড়ান। তিনি বলিতেছেন:—

"তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে! এই কারণেই আমি বলিতেছি, এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর—কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে।

"আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না, আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না, আমরা ঘোর স্বার্থপর, আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া থাকি। আমরা ভাবি অনেক জিনিষ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করি না। এইরূপ তোতাপাখীর মত চিন্তা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না। আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে। ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।

"এই বীর্য্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে 'আমি আত্মা'। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে হইবে।

"বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না—বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব

আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইতে পারিবে। বিদার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে।

"সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক।

"প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না—তুমি কেবল সেবা করিতে পার। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠ, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। কাহারও উপর প্রভুত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও।"

আমরা যদি এই সকল অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে অচিরেই যে আমরা অমৃতের সন্ধান পাইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ। *

(স্বামী বিবেকানন্দ)

আমরা একবার এক ঘোর ঈশ্বরনিন্দুক ইংরেজের মুখে শুনেছিলাম সাহেবদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর—কিন্তু দো-আঁশলা জাতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নন, অন্য কেউ।

* স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক 'প্রবুদ্ধভারত' নামক ইংরাজী মাসিক-পত্রের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে লিখিত।

আজ হঠাৎ একটা জিনিষ পড়ে আমাদের ঐ ভাবের একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা কি, খুলে বলি।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সংস্কারোৎসাহের জীবন্ত বাণীস্বরূপ মিঃ জষ্টিস র্যানাডের প্রারম্ভিক অভিভাষণ কিছু দিন হল আমাদের কাছে এসে সমালোচনার জন্য পড়ে রয়েছে। পাঠ করে দেখা গেল, উহাতে প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা তালিকা রয়েছে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের উদার ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে, ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করেও সুন্দর খাঁটি উপদেশ সব দেওয়া হয়েছে—আর এগুলি এত ভাবের সহিত এবং এমন মোলায়েম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লেই বক্তাকে বাস্তবিকই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু বক্তৃতাটীর শেষ ভাগটায় একটী প্রসঙ্গ রয়েছে—তাতে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবল নূতন সম্প্রদায়টীর জন্য একদল আচার্য্য গঠন করবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দেখা গেল। বক্তা যদিও স্পষ্টতঃ ঐ সম্প্রদায়টীর নাম করেন নি, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি—তিনি আর্য্যসমাজকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলেছেন—যে সমাজটী, স্মরণ রাখবেন, জনৈক সন্ন্যাসীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশটা পাঠ করে আমাদের একটু বিস্ময় বোধ হল, আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠল যে,—

ঈশ্বর ত দেখছি ব্রাহ্মণদেরও সৃষ্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করলে কে?

আমাদের পরিজ্ঞাত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই সন্ন্যাসী ছিল ও আছে। হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসী—এমন কি, ইস্লামধর্ম্মে যে সন্ন্যাসকে অস্বীকার করবার একটা উৎকট ভাব আছে, তা থেকে একটু নরমসুরে নেমে তাঁদেরও দলকে দল ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে নিতে হয়েছে। সন্ন্যাসী আবার হরেক রকমের কেউ পুরা মাথা-কামান, কেউ খানিকটা কামান, দীর্ঘকেশ, হ্রস্বকেশ, জটাজুটধারী এবং অন্যান্য নানাবিধ ঢঙ্গের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছে।

আবার এঁদের পোষাকের তারতম্যও অনেক—কেউ দিগম্বর,

কেউ চীরাম্বর, কেহ কাষায়ধারী, কেহ পীতাম্বর—আবার কৃষ্ণাম্বর খ্রীষ্টিয়ান ও নীলাম্বর মুসলমান রয়েছেন। আবার ঐ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল নানারূপে দেহকে কষ্ট দিয়ে তপস্যার পক্ষপাতী, অপর একদল বলেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'—'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা-মারোগ্যং মূলমুত্তমম্।' প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই সন্ন্যাসীর ভিতর একদল যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় ছিল—নাগা সন্ন্যাসীর দল চিরকালই ছিল। পুরুষজাতির ন্যায় নারীজাতির ভিতরও তথাবিধ সেই ত্যাগের ভাব এবং উহার বিভিন্ন প্রকাশসমূহ ঠিক যেন সমান্তরাল রেখায় চলে আসছে। সন্ন্যাসীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ও বরাবর ছিল, এখনও আছে। মিঃ র‍্যাণাডে শুধু যে ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেছেন, তা নয়, তিনি একজন নারীজাতির মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে সদা বদ্ধপরিকর মহাশয় ব্যক্তিও দেখছি। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সন্ন্যাসিনীবৃন্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে বলে বোধ হচ্ছে। প্রাচীন কালের অবিবাহিতা ব্রহ্মবাদিনীরা—যাঁরা বড় বড় দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে এক রাজসভা থেকে আর এক রাজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বংশবৃদ্ধি—তাতে বাধা দিয়েছেন বলে তাঁর আশঙ্কা নেই বলে বোধ হয়—আর মিঃ র‍্যাণাডের মতে পুরুষজাতি সন্ন্যাসী হয়ে যেমন মানবজাতির অভিজ্ঞতার পূর্ণমাত্রা ও রকম থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, স্ত্রীজাতি সেই একই প্রকার কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করে ঐরূপ বঞ্চিত হয়েছেন—তা বোধ হয় না।

সুতরাং আমরা প্রাচীন সন্ন্যাসিনীকুল ও তাঁহাদের আধুনিক আধ্যাত্মিক বংশধরগণকে মিঃ র‍্যাণাডের সমালোচনা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বলে ছেড়ে দিলাম।

চূড়ান্ত দোষী পুরুষকেই কেবল তা হ'লে মিঃ র‍্যাণাডের সমালোচনার সব চোটটা সহ্য করতে হচ্ছে—এখন দেখা যাক্—এই চোটটা খেয়েও সে সামলে উঠতে পারে কি না।

আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই বিষয়ে যেন একমত

বলে বোধ হয় যে, এই যে জগদ্ব্যাপী সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের প্রথা, তার প্রথম উৎপত্তি আমাদের এই অদ্ভুত দেশটাতে—যে দেশটাতেই এত 'সমাজসংস্কারের' দরকার বলে বোধ হচ্ছে।

সন্ন্যাসীগুরু ও গৃহস্থগুরু—কুমার, ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্ম্মাচার্য্য উভয় প্রকার আচার্য্যই—বেদ যত প্রাচীন তত প্রাচীন।

'সর্ব্ব বিষয়ে চৌকস—সব বিষয়ের ভুক্তভোগী সোমপায়ী বিবাহিত গৃহস্থ ঋষিরই প্রথম অভ্যুদয় অথবা মানবোচিত অভিজ্ঞতা-হীন সন্ন্যাসী ঋষিই সৃষ্টির প্রথমে হয়েছিলেন,—এখন অবশ্য এ সমস্যার একটা মীমাংসা করা কঠিন। সম্ভবতঃ মিঃ র্যাণাডে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উঁড়ো কথার উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে আমাদের জন্য এই সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। যতদিন না এ মীমাংসা হচ্ছে ততদিন প্রাচীনকালের বীজবৃক্ষন্যায়ের মত ইহা একটা সমস্যাই থেকে যাবে।

কিন্তু উৎপত্তির ক্রম যাই হক, শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত সন্ন্যাসী আচার্য্যগণ গৃহস্থ আচার্য্যগণ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন —উহা হচ্ছে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যদি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জীবহত্যাকারী যাজ্ঞিকগণ উপনিষদ্বক্তা হতে পার্‌লেন না কেন?—জিজ্ঞাসা করি কেন?

এক দিকে বিবাহিত গৃহস্থঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূত-কিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন—খুব কম করে বল্‌লেও বল্‌তে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরণের; আবার অন্য দিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ঋষি-গণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চ ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন—যার অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রাণভরে পান করে তাঁদের অদ্ভুত

আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তিলাভ করেছিলেন, এবং যা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিন চার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজসংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা কর্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত দান কর্‌ছে।

বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজসংস্কারকগণের বেতন ও সুবিধা-গুলির তুলনায় ভিক্ষুসন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে কি সাহায্য, কি প্রতিদান পেয়ে থাকেন? আর সন্ন্যাসীর নীরব নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কার্য্যের তুলনায় সমাজসংস্কারকগণ কি কাযই বা করে থাকেন?

কিন্তু সন্ন্যাসীরা ত আর আধুনিকদের মত নিজের বিজ্ঞাপন নিজে প্রচার কর্‌বার—নিজের ঢাক নিজে বাজাবার উপায়টা শেখেন নি।

হিন্দু মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গেই 'এ জগৎটা যেন কিছুই নয়, একটা স্বপ্নমাত্র'—এই ভাব আয়ত্ত করে। এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে একমত—কিন্তু পাশ্চাত্যগণ ইহার উপরে আর কিছু দেখে না, সুতরাং সে চার্ব্বাকের মত সিদ্ধান্ত করে বসে যে, 'হেঁসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে—কবে যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।'—'এই পৃথিবীটা একটা দুঃখপূর্ণ গহ্বর মাত্র—এখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় ভোগ করে নেওয়া যাক্।' হিন্দুদের দৃষ্টিতে কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—এই জগৎ যতদূর সত্য, তার চেয়েও অনন্তগুণে সত্য—সুতরাং তাঁরা উহাদের জন্য জগৎটাকে ত্যাগ কর্‌তে সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত।

যতদিন সমগ্র হিন্দু জাতির মনের ভাব এইরূপ চল্‌বে—আর আমরা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্ব্বত্যাগ কর্‌বার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা কর্‌তে পারেন?

আর সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত আপত্তিটা ইউরোপে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙ্গালী সংস্কারকগণ তাঁদের কাছ থেকে ঐটী ধার করে নিয়েছেন—আর এখন আবার আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ উহা আঁকড়ে

ধরেছেন—অবিবাহিত থাকার দরুণ সন্ন্যাসীরা জীবনটাকে পূর্ণভাবে ও উহার নানারকমের সমুদয় অভিজ্ঞতার সহিত সম্ভোগ কর্‌তে বঞ্চিত। আশা করি, এইবার ঐ মড়াটা চিরদিনের জন্য আরবসাগরে ডুবে যাবে—বিশেষতঃ এই প্লেগের দিনে—আর হয়ত ঐ স্থানের উচ্চ-বংশীয় ব্রাহ্মণদের তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের পরম সৌরভময় শবদেহের প্রতি প্রবল ভক্তি থাকতে পারে, (তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ নির্ণয় কর্‌তে যদি পৌরাণিক কাহিনীর কিছু মূল্য আছে স্বীকার করা যায়) তা সত্ত্বেও।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়্‌ছে বলি—ইউরোপের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা এমন অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে—যাদের পিতামাতা বিবাহিত হলেও এই 'জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার' রসাস্বাদ কর্‌তে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

তারপর অবশ্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে একথা ত লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বৃত্তি দিয়েছেন—কোন না কোন ব্যবহারের জন্য। সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি কর্‌ছেন না, তিনি অন্যায় কায কর্‌ছেন—তিনি পাপী। বেশ, তা হলে ত কাম, ক্রোধ চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন—আর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটাই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবনরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি ঐগুলিও পূরা দমে চালাতে হবে নাকি? অবশ্য সমাজ-সংস্কারক দলের সঙ্গে যখন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁরা যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তাও ভালরকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এই প্রশ্নের হাঁ জবাবই দিতে হবে। আমাদের কি উগ্র-স্বভাব বিশ্বামিত্র, অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের বিশেষতঃ নারীজাতির সহিত মিশে 'পূরামাত্রায় নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনকারী' বশিষ্ঠ-বংশের অনুসরণ কর্‌তে হবে? কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থঋষিই বৈদিক সূক্ত পাঠ ও সোমপানের জন্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, যখন যেখানে পেরেছেন তখন

সেখানেই পুত্রোৎপাদনের বিষয়ে উদারতার জন্যও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ। অথবা যে সকল অবিবাহিত সন্ন্যাসীঋষি ব্রহ্মচর্য্যকেই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র বলে প্রচার করে গেছেন, আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করব?

তারপর অবশ্য ভ্রষ্টের দল ত রয়েছেই, তাদের মাথায় ত গালাগালের বোঝা পড়াই উচিত—যে সকল সন্ন্যাসী তাঁদের আদর্শ ঠিক ধরে রাখতে পারেন নি—দুর্ব্বল, অসৎপ্রকৃতি সন্ন্যাসীর দল।

কিন্তু আদর্শটী যদি খাঁটি ও সিধে হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ—কারণ, চলিত কথাই আছে যে—"ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল।"

যে কখন উন্নত জীবন লাভের চেষ্টাই করে নি, সে কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় সে ত বীর।

আমাদের সমাজসংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের যদি ভাল করে খবর নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত তা দেবতাদের ভাল করে গুণতে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাযকর্ম্মের এ রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর যে দেবতা রাখ্ছেন তিনি ত আমাদের নিজেদের হৃদয়মধ্যেই।

কিন্তু এদিকে দেখ—এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে—কারো কিছু সাহায্য চাচ্ছে না—জীবনে যত ঝড়ঝাপটা আসছে, বুক পেতে সব নিচ্ছে—কায কচ্ছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই—এমন কি, কর্ত্তব্য বলে লম্বানামে সাধারণে পরিচিত সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। সারা জীবন কায চল্ছে—আনন্দের সহিত স্বাধীনভাবে কায চল্ছে—কারণ, ক্রীতদাসের মত জুতোর ঠোক্কর মেরে কায করাতে হচ্ছে না—অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ-আকাঙ্খাও সে কার্য্যের মূলে নেই।

এ কেবল সন্ন্যাসীতেই পারে। ধর্ম্মের কথা কি বল? উহা থাকা উচিত, না, একেবারে অন্তর্হিত হবে? ধর্ম্ম যদি থাকে, তবে ধর্ম্মসাধনে বিশেষাভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক—ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্ম্মের বিশেষাভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ,

তিনি ধর্ম্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈনিকস্বরূপ। যতদিন একদল একনিষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্ ধর্ম্মের বিনাশশঙ্কা?

প্রোটেষ্টাণ্ট ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ক্যাথলিক-সন্ন্যাসীদের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছেন কেন?

বেঁচে থাকুন র‍্যাণাডে ও সমাজসংস্কারকদল! কিন্তু হে ভারত—হে পাশ্চাত্য-ভাবে অনুপ্রাণিত ভারত, ভুলিও না বৎস, যে এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, মীমাংসা করা ত দূরের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দার্জ্জিলিং।
২৮শে এপ্রিল ১৮৯৭।

প্রিয় ম—

কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি তোমার সুন্দর পত্রখানি পেয়েছি। গতকল্য হ্যারিয়েটের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে। প্রভু নবদম্পতীকে সুখে রাখুন।

* * * এখানে সমস্ত দেশবাসী যেন একপ্রাণ হয়ে আমাকে সম্মান কর্‌বার জন্য উৎসুক। শত সহস্র লোক, যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি কর্‌ছে, রাজা রাজড়ারা আমার গাড়ি টান্‌ছে, বড় বড় সহরের সদর রাস্তার উপর খিলেন করা হয়েছে

এবং তাতে নানারকম "সংক্ষিপ্ত উপদেশ-বাক্য" (motto) জ্বল্ জ্বল্ কর্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি !!! এই সকল বিষয়ের বর্ণনা শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও শীঘ্র একখান পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছিলাম, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় আমি একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের আশা পরিত্যাগ করে নিকটতম শৈলনিবাস দার্জ্জিলিঙ্গে চোঁচা দৌড় দিতে হবে। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আর মাসখানেক আলমোড়ায় থাক্লেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, আমার ইউরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিৎ সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী রবিবার ইংলণ্ড যাত্রা কর্ছেন। তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ পেড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা সে কথা মোটেই শুন্ছে না। সুতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে ; তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা করব।

আশা করি ব— এত দিনে আমেরিকা পৌঁছেছেন। আহা বেচারি! তিনি এখানে খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়ামির ভাবটা প্রচার কর্তে এসেছিলেন ; সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুন্ল না। অবশ্য তারা তাঁকে খুব যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেছিল কিন্তু এও আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি তাঁকে কিছুতেই আক্কেল দিতে পার্লাম না! তিনি যেন এক কি-এক-ধরণের লোক। শুন্লাম, আমি দেশে ফিরে আসাতে সমগ্র জাতিটা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তাই শুনে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। যা করেই হক, তোমাদের একজন মাথাওয়ালা লোক পাঠান উচিত ছিল, কারণ, ব— ধর্ম্মমহাসভাটীকে হিন্দুদের চক্ষে একটা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার (farce) করে

গেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথ-প্রদর্শক হতে পার্‌বে না। আর একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যতগুলো লোক এদেশে এসেছে, তাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের হাবাতে যুক্তি আছে যে, যেহেতু খৃষ্টানেরা শক্তিশালী ও ধনবান্, এবং হিন্দুরা তা নয় সেই হেতুই খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহার উত্তরে হিন্দুরা ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই জন্যই ত হিন্দুধর্ম্ম হচ্ছে ধর্ম্ম আর খৃষ্টানধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। কারণ, এই পশুত্বপূর্ণ জগতে পাপের কেবল জয়জয়কার, আর পুণ্যের সর্ব্বদা নির্য্যাতন। এটা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় যতই উন্নত হক না কেন, তত্ত্ববিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা ক্ষুদ্র শিশুমাত্র। জড়বিজ্ঞান মাত্র ঐহিক উন্নতি বিধান করে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান অনন্ত জীবনের সাথী। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শহিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রসূত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্খা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু আনয়ন করে।

এই দার্জ্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৭৫৭৯ ফিট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০০ ফিট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা যেন ছবিটির মত—তিব্বতীরা, নেপালীরা এবং সর্ব্বোপরি সুন্দরী লেপচা স্ত্রীলোকেরা। তুমি চিকাগোর কল্‌ষ্টন্ টারন্‌বুল নামে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষ পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখ্‌ছি জায়গাকে খুব পছন্দ কর্‌তেন, আর তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করত। জে—, মিসেস এ—, সিষ্টার জে—এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় 'Mill'রা কোথায়?

(ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে গুঁড়ো করে যাচ্ছে বোধ হয়?) আমি হ—কে তার বিবাহে কয়েকটী প্রীতিউপহার পাঠাব মনে করেছিলাম কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল—তাই এখন রেখে দিতে হচ্ছে। হয়ত, তাদের সঙ্গে আমার শীঘ্রই ইউরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে লিখ্‌তে তাহলে আমি, অবশ্য, অত্যন্ত আহ্লাদিত হতাম এবং অর্দ্ধ ডজন কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তাম।

* * * *

আমার চুল গোছায় গোছায় পাক্‌তে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া সমস্ত জড় হয়ে আস্‌ছে, এই মাংস শিথিল হয়ে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ, আমাকে শুদ্ধ মাংস খেয়ে থাক্‌তে হচ্ছে—রুটী নেই, ভাত নেই, আলু নেই এমন কি আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাস কর্‌ছি—তারা সকলেই নিকারবোকার পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকারবোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পাহাড়ে-হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখ্‌তে অথবা চার পা তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পাহাড়ে-রাস্তায় ওৎরাই চড়াই করতে দেখ্‌তে, তাহলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ, সমতল ভূমিতে বাস আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, সেখানে আমার রাস্তায় পা-টী বাড়াবার যো নেই, অমনি একদল লোক আমায় দেখ্‌বে বলে ভীড় করেছে!! নামযশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়!! আমি একটা মস্ত দাড়ি রাখ্‌ছি, এখন সেটা পাক্‌ছে। এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকাবাসী কুৎসারটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে। হে শ্বেতশ্মশ্রু, তুমি কত জিনিষই না ঢেকে রাখ্‌তে পার, তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ!

ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাই শেষ করলাম। তোমার দেহ মন ভাল থাক ও অশেষ কল্যাণ হক।

বাবা, মা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

কালিয়-দমন। *

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত)

যমুনা হ্রদ—কালিন্দীর বিষধর কালিয়ের কালকূটে কালিন্দীর তীরভূমি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্যাম তরুলতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কেবল কদম্বতরু শ্যামল পত্রপল্লবে শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কালিন্দীর তীরে—এই মৃত্যুর রাজ্যে—একমাত্র সজীব কদম্বতরু মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান।

কালিন্দীর অভ্যন্তরে সহস্রফণা বিষধর কালিয়ের বিষাগ্নিতে জলরাশি অবিরত বিষের তরঙ্গ তুলিত। হ্রদের বক্ষে সেই বিষতরঙ্গ-সংস্পর্শে বায়ু বিষকণা বহন করিয়া তীরভূমির দিকে প্রবাহিত হইত। সেই বিষবায়ুর স্পর্শে কালিন্দীতীরে আগত প্রাণিগণ প্রাণ হারাইত।

"খলসংযমনাবতারঃ"—গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ খলদমনার্থ অবতীর্ণ। বিষহ্রদ কালিন্দী পূতপুণ্য অমৃতধারা যমুনায় প্রবাহিত হইবে। বিষতরঙ্গ অমৃত তরঙ্গে নৃত্য করিবে। কালিন্দীর বিদগ্ধ তটভূমি যমুনার ফুলফলশোভিত শ্যামল কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া উঠিবে। বিষকণাবাহী বিষবায়ু অমৃতানিলে প্রবাহিত হইবে। মন্দ মন্দ ধীরসমীরে যমুনার শ্যামকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিবে। মৃত্যুর জ্বালাময় অস্ফুট রব

* শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ—১৩শ অধ্যায়।

কোকিলকূজনে ভ্রমরগুঞ্জনে শিখীনর্ত্তনে কুলু কুলু যমুনাকল্লোলের ছন্দে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে ধ্বনিয়া উঠিবে। কালিন্দীর কালিয়ের বিষে মৃত অচেতন চৈতন্যে অমৃতত্বে সঞ্জীবিয়া উঠিবে। অতঃপর সেই পুণ্য যমুনাতীর্থে প্রণতি—"সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।"—তুমি উপাসকদিগের পতি, তোমায় নমস্কার!

নিদাঘ কাল, প্রখর আতপতাপ। একদা কালিন্দীতীরে গোকুলের গোপগণ গোচারণ করিতে গিয়াছিল। গোচারণ করিতে করিতে গোপ এবং গোগণ আর্ত্ত হইল—পিপাসায় আকুল হইল। গো এবং গোপগণের প্রভু পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করিতেছিলেন। তবু তাহারা পিপাসায় আকুল হইল। এ পিপাসা নিদাঘের পিপাসা—আতপক্লেশের পিপাসা। গোগণ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন না হইয়া দূরে কালিন্দীর তরল কালকূটের আস্বাদনে ধাবিত হইল। পিপাসার ক্লান্তি, নিদাঘের শ্রান্তি দূরীকরণ-মানসে প্রমত্ত গোগণ গোপগণ কালিন্দীর জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিল। অমৃতের সাক্ষী—কদম্বতরু সে দৃশ্য দর্শন করিল। গোকুলের স্বামী শ্রীহরি কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া তাহাদের অবস্থা অবলোকন করিলেন। শ্রীহরির পদপ্রান্তে পতিত গোগণ গোপগণের প্রতি শ্রীহরির অমৃতবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। অমৃতের স্পর্শে তাহারা পুনর্জীবিত হইল। মৃত্যু হইতে জাগিয়া যমুনার তীরে কদম্বমূলে তাহাদের নাথ শ্রীহরিকে দর্শন করিল।

এই কালিন্দীকুল গোগণ এবং গোপগণের বিচরণভূমি। কৃপাময় শ্রীহরি কালিন্দীদূষিতকারী বিষধর শত্রু কালিয়কে নিগ্রহ করিয়া কালিন্দী হইতে বিদূরিত করিবার মানস করিলেন। বহুযুগ ধরিয়া সহস্রফণা বিষধর কালিয় হ্রদমধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে। কালিন্দী বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীহরির ক্রীড়াভূমি হইবে।

সেই অত্যুচ্চ অমৃততরু কদম্বশিরে শ্রীহরি আরোহণ করিলেন। বাহু আস্ফোটনপূর্ব্বক কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দিলেন। শ্রীহরির পতনবেগে সর্পগণ সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তাহাদের উদ্গীরিত

বিষতেজে হ্রদস্থ জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিল। উগ্রতর অহিবিষে তরঙ্গসমূহ কাষায়ীকৃত হইল। শ্রীহরি সেই বিষতরঙ্গ স্বীয় বাহুদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শব্দ শ্রবণে কালিয় রোষগর্জ্জন করতঃ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া হ্রদের তলদেশ হইতে উত্থিত হইল।

কালিন্দীতীরে গোপগণ শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছিল। বিষতরঙ্গমধ্যে সুকুমার, মেঘোজ্জলশ্যাম, পীতবসনাধরী, শ্রীবৎসশোভিত, সস্মিতানন, লাক্ষারসারুণ-চরণযুগল শ্রীহরি নির্ভয়ে বিহার করিতেছেন। কালিয় হ্রদতল হইতে উত্থিত হইল। হ্রদোপরি শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া রোষে সহস্র ফণা তুলিয়া শ্রীহরির মর্ম্মস্থলে দংশন করিল। দংশনান্তর স্বীয় শরীরাভোগে বেষ্টন করিল। সর্পশরীরাভোগে পরিবেষ্টিত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া তীরস্থ গোপগণ ভীত এবং ম্রিয়মান হইল। তাহারা শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিল।

শ্রীহরিপ্রিয় গোকুলের নরনারীর প্রাণ সহসা ভয়ে দুঃখে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহাদের মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহারা দর্শনলালসায় গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন। অপ্রমত্ত যোগিগণ শ্রুতিবর্ত্মযোগে গমনকরতঃ অন্যান্য পদের মধ্যে তৎ তৎ উপাধির অপবাদপূর্ব্বক পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণমতি গোকুল নরনারী তেমনি গাভীগণের বর্ত্মে গমন করতঃ অন্যান্য পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যবযুক্ত পদচিহ্ন নিরীক্ষণ করতঃ ত্বরায় যমুনাতীরে গমন করিলেন। যমুনাতীরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীমধ্যে সর্পশরীরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, তীরে গোপগণ নির্ব্বাক মুগ্ধ, গোগণ চতুর্দ্দিকে রোদন করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই দৃশ্যে গোকুলনরনারী অতিশয় আর্ত্ত হইলেন—দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণের জন্য কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হইলেন।

শ্রীহরি কালিন্দীর আবেষ্টন হইতে উত্থিত হইলেন। কালিন্দী-

প্রবেশোন্মুখ বিষাদিত গোকুল নরনারী শ্রীহরিকে উরঙ্গবন্ধ হইতে মুক্ত দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। বিষাদ অপনোদিত হইল।

শ্রীহরির বাহুর আঘাতে ভুজঙ্গের কলেবর ব্যথিত হইল। শ্রীহরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপিত ফণা উন্নত করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নাসারন্ধ্র বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। নয়নদ্বয় পাবকভাণ্ডবৎ সন্তপ্ত এবং স্তব্ধ হইল, বদন উল্মুকবৎ কালিমা প্রাপ্ত হইল। শ্রীহরি ক্রীড়াকরতঃ কালিয়ের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দংশনপ্রতীক্ষায় কালিয়ও ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিয়ের সামর্থ্য বিনষ্ট হইলে, শ্রীহরি সেই হৃততেজ ভুজঙ্গের উন্নত স্কন্ধ অবনত করিয়া মস্তকে আরোহণ করিলেন। কালিয়ের মস্তকস্থ রত্ননিকরের স্পর্শে শ্রীহরির পাদপদ্ম অপূর্ব্ব তাম্রজ্যোতি মণ্ডিত হইল। নৃত্যগুরু শ্রীহরি কালিয়ের চঞ্চল মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যচ্ছলে শ্রীহরির চরণাঘাতে কালিয়ের প্রধান শত শীর্ষ বিমর্দ্দিত হইয়া শোণিত উদ্গীরণ করতঃ মোহপ্রাপ্ত হইল। সহস্র ফণা শ্রীহরির আশ্চর্য্য নৃত্যে বিক্ষত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল।

এইরূপে হৃততেজ কালিয় দমিত হইয়া চরাচর পুরাণপুরুষ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইল। কালিয়কে শরণাপন্ন হইতে দেখিয়া কালিয়ের পত্নী-গণও তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শিশুসন্তানসহ কালিয়ের পত্নীগণ কালিয়ের মস্তকে দণ্ডায়মান শ্রীহরির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিল। এইরূপে বহু স্তুতি করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া কালিয়কে স্ত্রীপুত্রবন্ধু-সমভিব্যাহারে কালিন্দী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। কালিয় অন্তর্হিত হইল। শ্রীহরির অনুগ্রহে যমুনা বিষহীন হইল। যমুনার জল অমৃতবৎ সুস্বাদু হইল।

চিত্ত-কালিন্দী বাসনার সহস্রফণা তমোরূপ কালিয়ের দমনে পূত পুণ্য চিত্তযমুনায় পরিণত হয়। তখন উপাসকের পতি শ্রীহরি উপাসকের চিত্তযমুনায় তাহার সঙ্গে লীলা করেন।

সৎকথা।

ভগবানের নাম যত করতে পারা যায় ততই ভাল। বেশী না কর্‌তে পারলে, অন্ততঃ সকালে সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে ভগবানের যে কোন নাম, যা ভাল লাগে, করা উচিত।

* * *

ভগবানের নাম যেখানে হয়, সেখানে ভগবান্ আবির্ভূত হন।

* * *

ভোগেচ্ছা সহজে যায় না, সেইজন্য ছোটখাট দুচারটে বাসনা মিটিয়ে নিতে হয়। বড় বড় বাসনাগুলো বিচার করে ছাড়্‌তে হয়।

* * *

ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হতে গেলে অনেক হাজার জন্মের সাধনার দরকার। তারা কত জন্ম রাজত্ব করেছে, রাজসুখ ভোগ করেছে, তবে বিতৃষ্ণা এসেছে—তারপর না সন্ন্যাসী হয়েছে ?

* * *

ধর্ম্ম কি ইন্দ্রিয়সুখ যে হাতে হাতে ফললাভ হবে ? ধর্ম্মলাভ সময়-সাপেক্ষ, সৎপথে থেকে, ধৈর্য্যধরে থাক্‌তে হয়।

* * *

মানুষ ধর্ম্ম বুঝ্‌বে কি করে, রাত দিন কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে ব্যস্ত।

তবে যারা ঐ সংসারে থেকে মেহনৎ করে, টাকা উপার্জ্জন করে, দান ধ্যান করে, ভগবানের পূজা অর্চ্চনা করে, তাঁর বিষয়ে চর্চ্চা করে, তারা খুব বাহাদুর। এরা ভগবানের সন্তান।

* * *

সংসারে গিয়ে ভগবানের স্মরণ মনন করে জীবন কাটান খুব বাহাদুরি ! তবে ভগবানেরই সংসার মনে করে সংসার কর্‌লে খুব সুবিধা হয়।

সামান্য সুখ ভোগ, মান যশ, টাকা কড়ির জন্য লোক পাগল হয়, ঐ সকল লাভ কর্‌বার জন্য কত কুমতলবই না করে! বুদ্ধদেব সম্রাটের ছেলে, তিনি কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য রাজত্ব পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলেন। আবার তপস্যা কর্‌তে কর্‌তে যখন সিদ্ধাই আস্‌তে লাগ্‌ল, তখন তিনি বল্লেন, "তপস্যা না করেই রাজত্ব পেয়েছিলাম, এখন কি আবার তপস্যা করে ঐ সকল লাভ কর্‌তে হবে?"—এই বলে তিনি সিদ্ধাই টিদ্ধাই তাড়িয়ে দিলেন।

বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী হতে পার্‌লে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। ভগবানলাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্‌তে হয়। মুক্তি কটা লোকের হয়! রামপ্রসাদ বলেছেন, "ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।" অর্থাৎ ভগবান্ নিজেই মুক্ত করে দেন, আবার নিজেই মুক্ত পুরুষকে আদর করেন এবং বাহবা দেন।

*　　　*　　　*

সকলকেই কাঁদ্‌তে হবে—না কেঁদে উপায় নেই। কেউ ভাইয়ের জন্য, ছেলের জন্য কাঁদছে। যারা ভাই, ছেলের জন্য কাঁদে তারা জীব, আর যারা ভগবানের জন্য কাঁদে তারা যথার্থ ভাগ্যবান্ পুরুষ।

ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাক্‌লে তিনি বাধা বিঘ্ন সব কাটিয়ে দেন—কর্ম্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি ইচ্ছা কর্‌লে কি না কর্‌তে পারেন?

*　　　*　　　*

রোজকারী বাপ মলে ছেলে, দুঃখ করে আমার কি হবে? স্ত্রী দুঃখ করে আমার কি হবে? একবারও ভাবে না, যে গেল তার কি গতি হইবে? কয়জন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, "হে ভগবন্, ইনি যদি কোনও অন্যায় করে থাকেন, তবে ক্ষমা করিও?"

এই হল সংসার!

খিদে হলে সব জিনিষ মিষ্টি লাগে—তখন যা জুটল সব ভোর-পেট খেলে; ক্ষুধাই হল প্রধান। তেমনি, যার ভগবানের উপর অনুরাগ হয়েছে সে আর মত-পথ, তর্ক-যুক্তি অত বিচার করে না। যে কোন পথ অবলম্বন করে তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়।

ভগবানে অনুরাগ, বিশ্বাসই হল তাঁকে লাভ করবার প্রধান অবলম্বন।

* * *

ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব স্তুতি করতেন, তাই তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন 'আমি ভগবান্'। কিন্তু রাখালরা তাঁর সঙ্গে কত খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ করলে, তবুও তাঁকে জানতে পারলে না।

তাঁকে জানতে হলে সাধনভজন, স্তবস্তুতি করতে হয়। এইরূপে লেগে পড়ে থাকলে তিনি দেখা দেন, সব বুঝিয়ে দেন।

* * *

যতই ঘোর ফের না, দেখবে কোথাও কিছুই নেই, বরং মহা কর্ম্ম। এক জায়গায় বসে মন স্থির করে ডাকলেই হয়ে যাবে।

* * *

'ভগবান্ কি গাছের ফল? তাঁর কৃপা চাই, দয়া চাই। তাঁর কৃপা লাভ করতে হলে, সাধুদের ভালবাসা আশীর্ব্বাদ পেতে হয়। ভগবান্ আছেন বলে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করে যেখানে বসে ডাকবে সেইখানেই পাবে। ভগবান্ চিরকালই আছেন। জীব এল আর গেল, এই আছে এই নেই। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবই আবার ভগবান্ লাভ করে।

* * *

যে ভগবান্‌কে মানবে সেই বেঁচে যাবে, আনন্দ পাবে, সুখী হবে। আর যে না মানবে, সে দুঃখভোগ করবে।

সমালোচনা।

চিত্রপট—'নিবেদিতা'-প্রণেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দাসী রচিত; এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা ও কাপড়ে বাঁধান, বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিবার উপযুক্ত, মনোজ্ঞদর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানি বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সংগ্রহ। তন্মধ্যে চারিটি, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতির দোষগুণ লইয়া। দুইটি, ভগিনী ও স্ত্রীর নিঃস্বার্থ প্রেম লইয়া। একটী, প্রেমের প্রেরণায় উচ্চ স্বার্থত্যাগ লইয়া। একটি, আসন্ন বিপৎপাতের ছায়া ধরিবার মানবমনের স্বাভাবিক শক্তি লইয়া। একটি, সেকেলে বাপ ও একেলে ছেলের ভিতর প্রাচীন ও নবীন শিক্ষাপদ্ধতি যে সকল বিরুদ্ধ সংস্কারসমূহের ব্যবধান আনয়নপূর্ব্বক দিন দিন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই কেবল মাত্র উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা ও পুনরায় মিলিত করিতে সক্ষম, ইহা লইয়া। একটি, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিচারপূর্ব্বক সমাজ ও নীতি-বিগর্হিত অপরাধসকলের দণ্ড প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা লইয়া। একটি, অহঙ্কার ও অভিমানের প্রেরণায় বৈরাগ্যাবলম্বনের হাস্যাস্পদ পরিণাম লইয়া। এবং একটি ডিটেক্‌টিভদিগের প্রখর দৃষ্টি ও প্রবল অনুমানশক্তি লইয়া বিরচিত।

গ্রন্থকর্ত্রীর গল্পগুলি বলিবার বাঁধনি চমৎকার এবং ভাষা প্রাঞ্জল, ওজস্বী ও ভাবপ্রকাশের বিশেষ অনুরূপ। স্বল্পকথায় চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার দক্ষতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, বিশেষতঃ আবার স্ত্রীচরিত্র সকলের। 'চিত্র' গল্পের 'পার্ব্বতী' 'স্মৃতি'র 'স্মৃতি,' 'পথের দেখা'র 'উমা', 'স্মৃতিচিহ্নে'র 'হেমাঙ্গিনী', 'নিশি'র 'নিশি'

প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রগুলি বিশেষ জীবন্ত ও পরিস্ফুট। উহাদিগের করুণ কাহিনী পাঠে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না। করুণ রসের অবতারণায় গ্রন্থকর্ত্রী এক প্রকার সিদ্ধহস্ত। উদ্বোধনের পাঠকবর্গের সহিত শ্রীমতী সরলাবালার নূতন পরিচয় নহে। তাঁহার চিন্তাশীল দার্শনিক প্রবন্ধসকল ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়া তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগকে অবসর কালে ছোট ছোট গল্প বলিয়া এরূপে মুগ্ধ করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই ধারণা নাই। আশা করি, সুখপাঠ্য পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যেরূপ আনন্দে কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়াছি, তাঁহারাও ঐরূপে সেই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে বিলম্ব করিবেন না।

নচিকেতা—(উপনিষদের উপাখ্যান) শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকাসম্বলিত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা ও দুইখানি সুন্দর চিত্র সংযুক্ত—মূল্য বার আনা মাত্র।

উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা যমরাজের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতায় বিশেষ ফলোপধায়ক অগ্নির উপাসনা-প্রণালী ও আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, একথা সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে। উহার রসগ্রহণ করিতে হইলে উপনিষদের ভাষা ভিন্ন ঐ প্রাচীন যুগের আচার, ব্যবহার, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বঙ্গের সাধারণ পাঠকবর্গ ঐ কারণে কঠপ্রমুখ উপনিষৎ-নিবদ্ধ সরল মধুর অথচ গম্ভীর অধ্যাত্মবিদ্যাসম্বলিত উপাখ্যানসকলের মর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক আনন্দলাভে এতকাল একপ্রকার বঞ্চিত। উপনিষৎ সকলের বঙ্গানুবাদ প্রচলিত থাকিলেও উহাতে বৈদিক-যুগের সামাজিক আচারব্যবহারাদির কথা সরলভাবে বিবৃত না থাকায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণ উহার সহায়ে উক্ত উপাখ্যানসকলের যথাযথ ভাব গ্রহণ

করিতে পারেন না। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ঐ অভাব পূর্ণ করিয়া কঠোপনিষদের রসগ্রহণে পাঠককে নিঃসংশয় বিশেষ সহায়তা করিবে। গ্রন্থকার উক্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বস্তুগুলি বলিবার কালে তৎকালীন আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির এমন সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহা পড়িতে পড়িতে ঐ যুগের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চিত্র মানসপটে স্বতঃ অঙ্কিত হইয়া উঠে। গ্রন্থকারের ভাষাও বিশেষ সুললিত ও সুখপাঠ্য। পাঠকবর্গ গ্রন্থকারের বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক উপনিষৎ-নিবদ্ধ অন্য উপাখ্যানসকলের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ।

সপ্তস্বর (সচিত্র)—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট্ দ্বারা মুদ্রিত—মূল্য দেড় টাকা।

সুন্দর কাগজে, মনোজ্ঞ মলাট ও বাঁধাইয়ে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার পঞ্চদশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা ভারতী, সাধনা, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকখানি তাহারই সংগ্রহ। অধিকন্তু, গ্রন্থকার ও তাঁহার পিতার চিত্র ভিন্ন একুশ খানি রঙ্গিন চিত্রসম্বলিত হইয়া ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়সকলকে অধিকতর মনোরম করিয়াছে। ভূমিকার উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "সপ্তস্বর সেই (বিশ্ব) বীণানিক্কণেরই তরঙ্গাঘাতে সমুত্থিত"—এবং প্রার্থনা করিয়াছেন, "হৃদয়ের শিখরে সঙ্গীতের, যে ক্ষুদ্র নির্ঝর ছুটিয়াছে, তাহা সুবিশাল ভাবনদীতে পরিণত হইয়া জীবনের উপকূল প্লাবিত করুক!"—স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক আমরাও উহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করি। লেখকের যৌবনপ্রারম্ভের প্রথম উদ্যমের সাফল্যস্বরূপ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৩ই ফাল্গুন, রবিবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্ব্যশীতিতম জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে ১১ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী জন্মতিথিপূজা মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। জন্মতিথিপূজার দিন প্রায় ৫০০।৬০০ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতেই সেই দিন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল।

মহোৎসবের দিন মঠের বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উত্তরধারে একটী মণ্ডপ বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি প্রতিমূর্ত্তি লতা পুষ্পাদি দ্বারা মণ্ডিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০।৬০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারের বন্দোবস্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন নৌকাযোগে, রেলে ও পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় ১০ হাজার লোক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁদুলের কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায়, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কনসার্ট পার্টি এবং নানাস্থান হইতে আগত ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্কীর্ত্তণের দল ভগবানের নামগানে মঠটী সদ্ভাবে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অলোকসামান্য সাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করাই যে ভারতবাসীর প্রাণের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দিনে বিনা আহ্বানে এই বিপুল জনসঙ্ঘের সমাগমই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

কাশী, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে জন্মতিথিপূজা ও মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। মহোৎসবের দিন ঠাকুরের ছবি লতাপুষ্পাদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। প্রায়

১০০ শত সাধু ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বৈকালে চণ্ডীর গান হইবার পর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি এম এ, পি এইচ ডি, পি আর এস, মহোদয় ইংরাজীতে এবং শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন চ্যাটার্জ্জি মহাশয় হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের "জীবনী ও শিক্ষা" সম্বন্ধে সুললিত ও মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে ভজন ও প্রসাদ বিতরণান্তর উৎসব সমাপ্ত হয়। প্রায় ৮০০ ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস ভজনাদির পর পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ শর্ম্মা সাংখ্য-কাব্য-তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে সাধুসেবা ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, কুচবেহারে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় এবং দূরদেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক লোক উহাতে যোগদান করেন। উক্ত দিবস বিশেষভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা এবং ভজনাদি হয়। দরিদ্রনারায়ণগণের সেবাই উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল।

গত ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ, রবিবার ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল।

উক্ত দিবসই অপরাহ্নে মিশনগৃহে মিশনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, জি, হার্ট মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নাগপুর সীতাবলদিতে শ্রীমুরলিধরের মন্দির-প্রাঙ্গণে, ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ত্তনান্তর প্রফেসার শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রি মূলে ও প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীচরণ চ্যাটার্জ্জি এম, এ মহাশয়দ্বয় "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্তদিবস দরিদ্রনারায়ণ-সেবাও হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবন, কিষণপুর, মান্দ্রাজ, মায়াবতী. বাঙ্গালোর প্রভৃতি মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে এবং অন্যান্য স্থানে ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়।

(কার্য্যবিবরণী—১৯১৪-১৫ খৃঃ)

১৯০১ (খৃঃ) সালে প্রতিষ্ঠিত সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয় এবং ১৯০৪ সালে প্রারব্ধ অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাকার্য্য—আপাততঃ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে স্ত্রীজাতির কল্যাণকর যে সংস্থানের প্রবর্ত্তনা করা হইয়াছে, তাহার ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের কার্য্যবিবরণী (রিপোর্ট) সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইতেছে।

এই বিবরণী পাঠে আমাদের সহৃদয় বন্ধুবান্ধবগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত অভাব বিঘ্নসত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বিদ্যালয়াদির কার্য্যে পূর্ব্ববৎ উন্নতিশীলতা ও ফলোৎকর্ষ দেখা যাইতেছে। সিষ্টার নিবেদিতার মহান্ আত্মত্যাগ কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া আপনার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি আত্মত্যাগিনী শিক্ষয়িত্রীর সমাবেশ ঘটাইয়াছে; এই সমাবেশই যেন অনুষ্ঠানটীর স্থায়ী মূলধন,—

ইহার বিস্তার ও উন্নতির অব্যর্থ প্রতিভূস্বরূপ। এবং এই মহৎ কার্য্য যে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া বৃক্ষলতাদির মত চারিদিকে মুঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ১৭নং বোসপাড়া লেনস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, বালির শাখা বিদ্যালয়েরও সন্তোষজনক কার্য্যবিবরণ পাওয়া যাইতেছে এবং বেলুড় মঠের ট্রষ্টিগণকর্ত্তৃক ৬৮।২।বি নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মাতৃমন্দির নামে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে (যাহার সবিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান রিপোর্টের শেষভাগে সংলগ্ন করা হইল)। মনে হইতেছে, কালে সম্মুখের পথ ক্রমশঃই পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া আসিয়াছে এবং এখন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য—সমগ্র অনুষ্ঠানটীকে স্থায়িত্বের সোপানে প্রতিষ্ঠিত করা।

বলা বাহুল্য, এই স্থায়িত্বের মূল ব্যবস্থা করিতে গেলেই, প্রথমেই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ কতকটা জমি ক্রয় করা আবশ্যক। জমি পাওয়া গেলেই সদাশয় “বন্দেমাতরম্” সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে বাটীনির্ম্মাণ কার্য্য সুরু করা যাইতে পারে। অতএব, এই জমির অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের আবেদনে স্বদেশবাসিগণ কি আজ কর্ণপাত করিবেন না? যে অত্যুজ্জ্বল আত্মোৎসর্গ সমগ্র অনুষ্ঠানটীকে বিশিষ্ট পুণ্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, তাহারই স্মৃতিতে প্রণোদিত হইয়া তৎসৃষ্ট এই অনুষ্ঠানটীর জন্য একটা স্থায়ী আবাস-স্থানের ব্যবস্থা করিতে আজ আমরা কি সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিব না? এমন একটা পবিত্র আহ্বানের প্রতি ভারতবাসীর মন অতীতে ত কখনও উদাসীন হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে কখনও যেন সেরূপ না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সেই জন্য আজ আমাদের স্বদেশবাসীদের দ্বারা এই শুভকার্য্যের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনটীর পূরণ যে হইবেই হইবে, সে আশায় আমরা আশান্বিত রহিলাম।

আবশ্যকমত বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণমঠের ট্রষ্টিদের সহযোগে সিষ্টার ক্রিশ্চিন ১৭নং বোসপাড়া লেন হইতে উল্লিখিত স্ত্রীজাতির কল্যাণকর সংস্থানের উন্নতিকল্পে যে কার্য্য করিয়াছেন নিম্নে তাহারই একটী

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করি, বর্ত্তমান রিপোর্ট তাহারই পরবর্ত্তী।

সিষ্টার ক্রিশ্চিন ও তাঁহার কার্য্য।

প্রথমেই বলা দরকার যে, ১৯১৪ সালের এপ্রেল মাসে সংস্থানটীর প্রাণকল্পা সিষ্টার ক্রিশ্চিন ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতিবিধানার্থ ভারত ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া যান। তখন তাঁহারই স্বহস্তগঠিত কতকগুলি শিক্ষয়িত্রীর উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হয়। প্রথমে কথা ছিল যে, এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া সে ভার আবার গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় এবং আইনতঃ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অধিবাসিনী হইলেও জার্ম্মান বংশে তাঁহার পিতৃপিতামহের জন্ম হওয়ায়, এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা সে সময় তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। যাহা হউক, আমরা খুবই আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি এখন আপনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং যুদ্ধাবসানে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্বীয় কার্য্যভার পুনর্গ্রহণের প্রতীক্ষায় সাগ্রহে দিন যাপন করিতেছেন। সুতরাং ১৯১৪ সাল এপ্রেল মাস হইতে তাঁহার অনুপস্থিতিসত্ত্বেও সমভাবে কার্য্য চালাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং এই দীর্ঘকাল যে কার্য্যভারপ্রাপ্তা কুমারী সুধীরা প্রভৃতি শিক্ষয়িত্রীগণ এই বিষয়ে এতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাতে ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতা ও শিক্ষকতা বিশেষ প্রশংসার্হ বলিতে হইবে।

একই অনুষ্ঠানের দ্বিবিধ অঙ্গ।

এখন আমরা বিভিন্ন কার্য্যবিভাগের ও তৎপরিচালনার বিবিধ উপায় ও প্রণালীর কথা কিছু বলিব। আমরা পূর্ব্ব রিপোর্টে বলিয়াছি যে, বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগ বিভিন্ন সময়ে সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার ক্রিশ্চিনের দ্বারা পৃথক্‌ভাবে স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে কার্য্যের এই দুইটী অঙ্গ সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হইতেছে; সেই জন্য উহাদের বিবরণ পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইল না।

ছাত্রীসংখ্যা ও অন্তঃপুরচারিণীদের সংখ্যা।

বালিকাবিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত ১৫০ জন ছাত্রী বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং গড়পড়তায় তাহাদের দৈনন্দিন উপস্থিতির হিসাব ১২৫। অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগে ৩৭ জন শিক্ষালাভ করিতেছেন।

অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাদানে দুইটী প্রধান বিভাগ।

অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগে দুইটী প্রধান শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। প্রথম একটী শ্রেণীতে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষভাবে শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং দ্বিতীয় অংশে ঐ সমস্ত বিষয় ব্যতীত যাঁহারা শিক্ষাদানকার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে কার্য্যেরও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত বিভাগে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভুগোল, অঙ্কশাস্ত্র, সীবনবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য্যও প্রতি শনিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা বা ততোধিককাল বালিকাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষকতা করাইয়া শিক্ষাদানকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দেওয়া হয়। অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাকার্য্যের প্রথম বিভাগে ১১ জন বিধবা ও ৬ জন সধবা স্ত্রীলোক আছেন; ইঁহাদের অভিভাবকগণ সকলেই ইঁহাদের শিক্ষালাভে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ জন মহিলা শিক্ষকতা ও বিদ্যালয় পরিচালন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৩ জন সিষ্টার ক্রিশ্চিনের প্রধান সহকারিণী শ্রীমতী সুধীরার নেতৃত্বে সমগ্র বালিকাবিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য চালাইয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা জ্ঞাপন করিতে চাহি যে, উক্ত ১৭ জন শিক্ষার্থিনীর মধ্যে সপ্তদশবর্ষীয়া একটী কুমারীকে তাঁহার অতি দরিদ্র পিতামাতা ইচ্ছানুরূপ পাত্রস্থা করিতে না পারায় গত দুই বৎসর

হইল শ্রীমতী সুধীরা তাঁহাকে শিক্ষাদানরূপ মহৎ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগের সেলাই-কার্য্যে তিনটী বর্ষীয়সী মহিলা শিক্ষার্থিনী হইয়া যোগদান করিয়াছেন।

বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রেণীভাগ।

বালিকাবিদ্যালয়ে পাঁচটী শ্রেণী বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রথমবার্ষিক (শিশুদের) শ্রেণীতে তিনটী বিভাগ (সেক্‌শন) করিতে হইয়াছে; বাকি চারটী শ্রেণীর প্রত্যেকটীতে দুইটী করিয়া বিভাগ আছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্যসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

সমগ্র শিক্ষাকার্য্যের সাধারণ লক্ষ্য।

প্রায়ই বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়ে পড়িতে দেওয়া হয়, কারণ, তাহার পরই সাধারণতঃ তাহাদের বিবাহ-নিবন্ধন বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতে তাহাদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানে আবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারিত, ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই সমস্ত বিষয়ের মোটামুটি অথচ কালোপযোগী জ্ঞান তাহারা লাভ করে এবং সেই সকল বিষয়ের যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে বিচার ও প্রয়োগে অভ্যস্তা হয়। কাজে কাজেই প্রত্যেক শ্রেণীর নানাবিধ পাঠ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়াও একটী প্রধান অঙ্গ।

শিশু-শ্রেণীতে শিক্ষাকার্য্যের প্রণালী।

শিশুদের শ্রেণীতে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর অনুসরণ করা হয় এবং তাহাদিগকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের সব পাঠই মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত সংখ্যার গণন, যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি অঙ্ক, পুত্তলিকা প্রভৃতি ও বোর্ডের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, পদার্থবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান,

মৃত্তিকাশিল্প, তুলির কাজ, কার্ড-সেলাই, ড্রিল (drill) প্রভৃতি সামান্য সামান্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ সমস্তই চক্ষুকর্ণাদি প্রয়োগেই বেশীর ভাগ তাহারা শিক্ষা করে, কেতাবের সাহায্য অতি সামান্য লওয়া হয়। যেমন বাঙ্গালা শিক্ষার সময় তাহারা নানা শব্দ লিখিয়া লয় বটে, কিন্তু সে গুলির বানান করা বা ভিন্ন প্রকারের ই, উ, জ, শ, প্রভেদ করা প্রথম হইতেই শিক্ষা করে না। প্রায় ৬ মাস এই ভাবে শিখাইবার পর যে সুফল দেখা যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। কারণ, সে সময় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত শব্দ তাহারা বোর্ডে দেখিবামাত্র পড়িতে পারে, অথবা উচ্চারণ শুনিয়া লিখিয়া দিতে পারে। ইহার পরই তাহাদিগকে বর্ণপরিচয়াদি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সরলপাঠ, হিতোপদেশ প্রভৃতি সোজা সোজা বই পড়িতে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, ১০০ পর্য্যন্ত সংখ্যা, যোগবিয়োগ প্রভৃতি মুখে মুখে শিখান হয়; তৃতীয়তঃ, শ্রুতি সাহায্যে নানা ইংরাজী শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার-পর আজকালকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইংরাজী বর্ণপরিচয় করান হয়। চতুর্থতঃ, পুরাণ ও ইতিহাসের নানা গল্পের সাহায্যে ভূগোলের জ্ঞান অল্প অল্প দেওয়া হয়। এই শ্রেণীতে কার্ড-সেলাই, তুলির কাজ প্রভৃতির শিক্ষা আরও অগ্রসর হয়।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

(ক) কথামালা, শিশু রামায়ণ প্রভৃতি বইয়ের সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দসমূহ ও তাহাদের পর্য্যায়ের শিক্ষা দেওয়া এবং বানান শিখাইবার জন্য শব্দের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ।

(খ) সংস্কৃত বর্ণপরিচয়, সন্ধি প্রভৃতির শিক্ষা—"সংস্কৃত প্রবেশের" সাহায্যে।

(গ) পাটীগণিত।

(ঘ) ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখা, এবং "কিং প্রাইমারের" সাহায্যে ইংরাজী পাঠ করিতে শিখা।

(ঙ) মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোলশিক্ষা। রামায়ণ ও মহাভারত সাহায্যে প্রাচীন ভারতের কথা-কাহিনী এবং আধুনিক ইতিহাসের নানা গল্প।

(চ) সেলাই শিক্ষা এবং রুমাল, সেমিজ প্রভৃতির সোজা সোজা কাট শিক্ষা।

(ছ) তুলির কাজ।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

(ক) "পৌরাণিকী কাহিনী," "শিশু মহাভারত" এবং অন্যান্য পুস্তকের সাহায্যে গল্প ও প্রবন্ধরচনা।

(খ) সংস্কৃত ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃত প্রবেশ।

(গ) পাটীগণিত।

(ঘ) ইংরাজী—MacMillan's Readers, Tippings Third and Fourth Standard, Steps to Learning English (Parts I and II). Translation.

(ঙ) এশিয়ার ভূগোল।

(চ) শ্রীমতী হেমলতা দেবীর ও অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত ভারতেতিহাস।

(ছ) সেলাই ও কাট শিক্ষা।

(জ) তুলির কাজ।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

(ক) বাঙ্গালা—"সীতার বনবাস," "অলর্ক চরিত" "রাজপুত কাহিনী" ও অন্যান্য পুস্তক। বাঙ্গালা রচনাশিক্ষা।

(খ) "সংস্কৃত পরিচয়ম্" ও "ঋজুপাঠ" সহকারে সমগ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ।

(গ) সমগ্র পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সামান্য সামান্য অংশ।

(ঘ) ইংরাজী—MacMillan's Readers (Parts III and IV); Tipping's Fourth and Fifth Standard; Translation by Benimadhab Ganguli.

(ঙ) সমগ্র ভূগোল।

(চ) সমগ্র ভারতের ইতিহাস।

(ছ) সেলাই ও সাধারণ সাজসজ্জার আবশ্যক জামা প্রভৃতির কাটছাট শিক্ষা; সূক্ষ্ম সূচীশিল্প।

(জ) সূক্ষ্ম তুলির কাজ।

মাতৃমন্দির।

পূর্ব্বের রিপোর্টে আমরা জানাইয়াছি যে, নারীদিগের জন্য একটী আশ্রমস্থাপনা কার্য্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায় দেখিবার অভিপ্রায়ে আমরা ১৯১৪ সালে ঐরূপ একটী সামান্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করি। একটী আশ্রম স্থাপন করা যে নিতান্তই প্রয়োজন, তাহা নানা সময়ে নানা সমস্যা উপস্থিত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইত। প্রথম যখন একটী বাটীতে ঐরূপ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন কি ভাবে উহা চালাইতে হইবে তাহার বাঁধাধরা নিয়মকানুন গড়িয়া দেওয়া হয় নাই; বরং নিজের পরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা আশ্রমটীকে নিজের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা দ্বারা গড়িয়া লইতে দেওয়া হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, এই আশ্রমটী ইতিমধ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা আমাদের আশাতীত, এবং যে সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া এখন ইহা দণ্ডায়মান, তাহা নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে :—

(ক) যে সকল হিন্দুরমণী আজীবন ঐকান্তিকভাবে শিক্ষাপ্রচার ও সেবারূপ মহৎ ব্রত পালন করিবেন, আশ্রমটী তাঁহাদের বাসস্থানস্বরূপ।

(খ) এইরূপ হিন্দুরমণীর জীবনে যে উন্নত আদর্শের বিকাশ চাই, আশ্রমটী তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও তৎসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইবে এবং চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট প্রণালীর শিক্ষা ও অনুশীলনে সুবিধা বিধান করিবে।

(গ) নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিবার সুবিধা না থাকায় যে সকল বালিকা সিষ্টার ক্রিশ্চিন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইবার অভিলাষ পূরণ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ধার্য্য মাসিক অর্থ পাইলে এই আশ্রমে যথাসম্ভব তাহাদের জন্য থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) যাহারা লোকসেবাকার্য্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, এই আশ্রম হইতে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকাধীনে আধুনিক উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চিকিৎসা, শুশ্রূষা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থাদি করা হইবে এবং এখানে তাহারা নিজেদের উচ্চ আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইবে।

(ঙ) দরিদ্র অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ যাহাতে নানা প্রকার সেলাই-কার্য্য, চাট্‌নি তৈয়ারী করা ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যের দ্বারা অথবা ভদ্রপরিবারে পড়াইবার কার্য্য পাইয়া আত্মনির্ভরের উপর আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও সর্ব্ববিধ সুযোগ ও সুবিধা বিধান করা এই আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ যিনি যেরূপ সৎশিক্ষালাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, আশ্রম সেইরূপ শিক্ষারই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবে এবং যাহাতে যথার্থ আত্মনির্ভরের ভাব আশ্রমবাসিনীদের জীবনে পরিস্ফুট হয় তাহার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। আশ্রমটী প্রথমে বিদ্যালয় বাটীতেই খোলা হয়, কিন্তু অল্পদিনেই নানাকারণে দেখা গেল যে একটী পৃথক বাটী নিতান্তই আবশ্যক। সুতরাং ১৯১১ সালের নবেম্বর মাস হইতে কোন সহৃদয় বন্ধুর অর্থসাহায্যে মাসিক ৩০ ৲ টাকা ভাড়ায় বর্ত্তমান বাড়ীতে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়।

বর্ত্তমানে আশ্রমে ১১ জন বাস করেন; তন্মধ্যে একটী পিতৃ-মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া সাত বৎসরের বালিকা আছে; ইহাকে এক বৎসর হইল উড়িষ্যা হইতে ভদ্রকের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় হাঁসপাতালে তাহার মাতার মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ ১১ জনের

মধ্যে ৪ জনের অভিভাবকগণ মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে তাহাদের আশ্রমে থাকিবার খরচ দিয়া থাকেন; আর এক জন মহিলা নিজ খরচ মাসিক ৭৲ টাকা শিক্ষকতার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া দেন ও আমাদের কোন বন্ধু তাঁহার জন্য বাকি ৩৲ টাকা দিয়া থাকেন। যাঁহার উপর আশ্রমের ভার সংন্যস্ত তিনি নিজের ১০৲ টাকা নিজেই দিয়া থাকেন এবং বাকি ৪ জন আশ্রমবাসিনী ও পিতৃমাতৃহীন বালিকাটীর খরচপত্র সকলের দ্বারাই নির্ব্বাহিত সেলাই বিভাগের আয় হইতে এবং ভদ্রপরিবারে শিক্ষকতা দ্বারা অর্জ্জিত কাহারও কাহারও অর্থ হইতে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এই ১১ জন আশ্রমবাসিনী ছাড়া বাহিরের দুইজন অন্তঃপুরচারিণী মহিলা মাঝে মাঝে আংশিকভাবে স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য আশ্রমের সেলাইবিভাগে যোগদান করেন। আশ্রম হইতে একটী নিতান্ত দুস্থা ভদ্রস্ত্রীলোককে মাসিক দুই টাকা সাহায্য করা হয়, দুইটী দরিদ্র বালকের স্কুলের বেতনস্বরূপে মাসিক দুইটী টাকা দেওয়া হয় এবং গরীব বালিকাদিগকে জামা প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের আয়ের কথা।

বিদ্যালয়ের আয় প্রধানতঃ এই কয়েকটী উপায়ে অর্থাগমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।—(১) আমেরিকা হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্তি; (২) স্থানীয় হিতৈষীদের নিকট চাঁদা সংগ্রহ; (৩) উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত সিষ্টার নিবেদিতার পুস্তক বিক্রয়ের আয়; (৪) সর্ব্বসাধারণের অর্থদান।

দানের প্রাপ্তিস্বীকার।

কলিকাতা 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' বিদ্যালয়ের একটী পৃথক বাটী নির্ম্মাণার্থ মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৮০০০৲ টাকা, নগদ ১১০৷৶০ আনা, ডিবেঞ্চারের সুদ ৪২৪৶৮ পাই মধ্যে ঐ দানকার্য্য রেজেষ্টারী করিবার ও ষ্টাম্প ইত্যাদি খরচ বাবদ ৫৲৬ পাই বাদে মোট ৮৫২৯৸২ টাকা দান করায় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বালিকাবিদ্যালয়ের ১৯১৪—১৫ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

বিবরণ	টাকা
১৯১৩ সালের মজুদ	৪৯৲
১৯১৪- ৫ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে প্রাপ্ত	৪৯০৩।৶০
ডাক্তার এ, ব্যানার্জ্জি, শিলচর	৪৲
ই, এ C/o ভি, কে, এস, আয়ার	৪৬৲
বাবু নলিনীকান্ত ঘোষ, আটআনি রাজ-ষ্টেট, মুক্তাগাছা, মৈমনসিং	৭৲
" রাধারমণ সেন, গোরখপুর	২৲
" যোগেশচন্দ্র রায়	।।০
মিঃ পি, চৌধুরী, বার-এট-ল, কলিকাতা	১৩০৲
বাবু কান্তিচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা	৭৫৲
" শ্রীশপদ নিয়োগী, এ ভি স্কুল, স্যাণ্ডোওয়ে, লোয়ার বর্ম্মা	৬৫৲
" কেদারনাথ দত্ত	১৲
মিঃ পি, রায়	১৲
বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
'উদ্বোধন' আফিস হইতে সিষ্টার নিবেদিতার পুস্তক বিক্রয় বাবদ	৬৬৲
বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত	১২৲
মিঃ পি, সি, সেন, সাকচি	২৲
" ভাণ্ড ওয়ালা, C/o মিঃ এম, মিত্র, বি, এন্, রেলওয়ে, ওয়ার্দ্ধা	৩৫৲
ডাঃ এম, এল, বসু, ডিয়ানুটি টি ষ্টেট	৫৲
বাবু তারাপ্রসন্ন বিশ্বাস	৫৲
" সুধীরচন্দ্র সরকার, কলিকাতা	১০৲
জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু, কলিকাতা	১০৲
শ্রীমতী মৃণালিনী চৌধুরাণী, ঢাকা	৫৲
বাবু সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, C/o শ্রীযুক্ত এইচ, পি, বিদ্যান্ত, আলিগড়	২০০৲
জনৈক বন্ধু, মাতৃমন্দিরের বাটীভাড়া বাবদ	৪২০৲
মোট	৬০২৭৶০

খরচ—

বিবরণ	টাকা
বাটীভাড়া খাতে	১১৩৪।৶১৫
গাড়ী খাতে	১২৩২।।০
চাকর ও ঝির বেতন খাতে	৪৩০।৶১০
কাগজ ও পুস্তক খাতে	৪৪৸৫
আসবাব খাতে	৭১৶১০
শিক্ষায়িত্রী খাতে	১৯৭০৸৶০
সূচীশিল্পকার্য্য খাতে	৫২৸৶০
বালি শাখা-বিদ্যালয় খাতে	২৪৫
মাতৃমন্দিরের বাটীভাড়া খাতে	৩৫৲
	৫২১৯।৶০
নগদ মজুদ	৮০৭।৶০
	৬০২৭৶০

(স্বাঃ) সারদানন্দ,
সেক্রেটারী ট্রাষ্ট কমিটি, বেলুড় মঠ।

জমি ক্রয় ও বাটীনির্ম্মাণ কল্পে যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা যতই সামান্য হউক না কেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড়, হাওড়া (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মাইতি, বি, এল)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, জগতে প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে—সেই বিশেষত্বটুকু যতদিন সেই জাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিবে ততদিন সেই জাতি জীবিত থাকিবে। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দু অথবা আর্য্যজাতির বিশেষত্ব ধর্ম্মে। এই ধর্ম্মরূপ প্রাণশক্তি ভারতীয় আর্য্যজাতির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্ম যতদিন অবিকৃতভাবে হিন্দুগণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন ততদিন তাঁহাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বামিজীর কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বৈদিকযুগের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যতপ্রকার ধর্ম্মমত ভারতে হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, প্রাচীন ঋষিদিগের সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল মহাপুরুষ ও অবতার এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এত অধিক ধর্ম্মমত, এত অধিকসংখ্যক মহাপুরুষ বা অবতার অন্য কোন দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বৈদিকধর্ম্ম/সনাতনধর্ম্ম মূলতঃ এক হইলেও কালক্রমে তাহা বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল শাখাপ্রশাখা অধীত, অধ্যাপিত ও অনুষ্ঠিত হইত। এক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ পুনরায় শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। সমগ্রবেদ কোন মহাপুরুষ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ছিলেন কি না তাহার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ষড়ঙ্গ চারিবেদ কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কণ্ঠস্থ হওয়ার বিষয় শাস্ত্রে আছে সত্য, কিন্তু বেদোক্ত

সাধনপ্রণালী সমূহ অবলম্বন করিয়া বেদোক্ত সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোন মহাপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রধানতঃ এই দুই বিষয়ের উপদেশ পাওয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের এই বিরোধ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গীতায় এই বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে। গীতা বলেন, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪র্থ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) কর্ম্মের জ্ঞানপরত্ব দেখাইয়া গীতাকার এই বিরোধের মীমাংসা করিলেন।

গীতায় বহুবিধ মতবিরোধের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাগ্রন্থ সর্ব্বোপনিষদের সারস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে সকল মত সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতসকল গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল মতের বীজ গীতায় আছে সত্য, কিন্তু এই সকল মত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ সত্ত্বেও কিরূপে ক্রমবিকাশরূপ একটী সূত্রে নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতে পারে তাহা গীতায় প্রদর্শিত হয় নাই। অধিকন্তু শিব, কালী, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরীয় মূর্ত্তি ও ভাবের নিষ্কাম উপাসনাদ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহাও গীতা উপদেশ দেন নাই। যাগ-যজ্ঞাদি সকাম ক্রিয়ার দ্বারা দেবতাগণের উপাসনা করিলে অনিত্য স্বর্গাদি সুখমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, গীতাকার এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। গীতায় যে ভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধাভক্তি গীতার রাজ্যের বাহিরে—এ বিষয়ে গীতা নীরব। গীতোক্ত ভক্তি জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নহে।

গীতার যুগের পরেই বৌদ্ধযুগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস, অর্জ্জুন, উদ্ধবাদি ব্রহ্মজ্ঞগণ যে মত প্রচার ও

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা যে নিশ্চয়ই কালক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের আবশ্যকতা আনয়ন করিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিকগণ সকলেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। বুদ্ধদেব সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ দেখিতে পান নাই, তাই তিনি বেদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতির সত্যে ও ফলদাতৃত্বে সন্দিহান হইয়া ধ্যানবলে চতুরার্য্যসত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবনী পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম উপনিষদের অংশবিশেষ ব্যতীত কিছুই নহে। অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া বুদ্ধদেব কেবলমাত্র দুঃখ পরিহার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাণবাদের প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মায়াবাদও বেদান্তেই প্রথম প্রচারিত হয়। যে সকাম যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনার নিকৃষ্টত্ব গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া বেদান্তে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই যাগযজ্ঞ, দেবতা ও ব্রহ্মকে বাদ দিয়া বৈরাগ্য, শান্তি, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, ও পরার্থপরতামূলক মত প্রচার করিয়া বুদ্ধ বেদান্তের সারোপদেশসমূহই ভারতীয় ও ভারতবহির্ভূত নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণাবলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া স্বজাতীয় ও ও বিজাতীয় ব্যক্তিগণকে শান্তিপ্রাণ ও বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ত্যাগ, শান্তি ও পরার্থপরতা যদি মানবজীবনের আদর্শ হয় তাহা হইলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ যে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিবেন।

দেশপ্রচলিত সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা ছিল না বলিয়া বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বাংশে না হইলেও কতকাংশে উপনিষদ্‌মূলক হওয়াই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের উদারতা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও বুদ্ধের ন্যায়

অতি তীব্র পুরুষকারসম্পন্ন সাধকগণই ঐ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে সক্ষম। দুর্ব্বলতা, অপূর্ণতা, পরমুখাপেক্ষিতাই মানবমনের সাধারণ ধর্ম্ম। সামান্য মানব আশ্রয়বিহীন হইয়া কেবলমাত্র পুরুষকারসহায়ে বাসনাসমূহ ও তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ অহংভাবকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ পদবীর অধিকারী হইতে পারে না। ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা দুর্ব্বল মনে যে বলসঞ্চার হয়, চিত্তের যে প্রসন্নতা ও বিশুদ্ধিলাভ হয় তাহা বুদ্ধদেব বোধ হয় উপলব্ধি করেন নাই। অপিচ শ্রীগৌরাঙ্গ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়া জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন—সর্ব্বোপরি যে উন্নত উজ্জ্বল মধুর রস বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, যে নিষ্কামপ্রেমের তরঙ্গরঙ্গে ব্রজগোপগোপীগণ কুলশীলমান বিসর্জ্জন দিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, সেই নিষ্কাম ঈশ্বরপ্রেম বুদ্ধদেব আদৌ প্রচার করিলেন না। আমাদের বিশ্বাস এইটী বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ণতা। বুদ্ধদেবের প্রেম জীবজগতে প্রাণিমাত্রে অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রবাহিত, কিন্তু জীবজগতের আত্মারূপী প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানে পৌঁছিয়া পূর্ণতালাভ করে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া জীবজগৎরূপ পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল; বুদ্ধদেবের প্রেম জীবজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রেমের মহাসমুদ্রে আপনাকে মিশাইতে পারে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় জগৎ হইতে স্থূলাতিস্থূল জড়জগৎ পর্য্যন্ত প্রেমবলে অধিকার করিয়াছিলেন; বুদ্ধদেবের প্রেম কেবলমাত্র স্থূল জগতে আবদ্ধ থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সামাজিক পরার্থপরতার আদর্শ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত ছিল। শাস্ত্র বলেন, "এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—জীবজগৎ ভগবানের এক অংশে নির্ম্মিত, পরন্তু ঈশ্বর জীবজগৎ হইতে অধিক। যাঁহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন তাঁহারা জীবজগতের প্রেমকেই সম্পূর্ণ মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা বৈদান্তিক তাঁহারা জীবজগতের নিয়ন্ত-

রূপী শ্রীভগবানকে প্রেমস্বরূপ মনে করিয়া তদাশ্রিত প্রেমকেই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই অপূর্ণতা দূর করিবার জন্যই শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্যদেবাদির আবির্ভাব।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। কুমারিল আবির্ভূত হইয়া অনেকটা বৈদিকধর্ম্মের প্রভাব পুনঃস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া একদিকে কুমারিলের প্রচারিত কর্ম্মবাদ, অপরদিকে হীনবল বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কয়েকজন ক্ষত্রিয় নরপতি এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শঙ্করের যুক্তিবলে এবং তাঁহার শিষ্য ও ঐ সকল নরপতির অস্ত্রবলে ভারতের চতুঃসীমা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও কুমারিল-প্রচারিত নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ বিতাড়িত হইল বেদোক্ত জ্ঞান ভারতে একাধিপত্য লাভ করিল। শঙ্করাচার্য্য বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শঙ্করাচার্য্য প্রধানতঃ জগতের ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণ করিতেই স্বকৃত ভাষ্যে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত নাস্তিক মতসকল তৎকালে ভারতে অত্যন্ত চলিত ছিল বলিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মবাদী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বৌদ্ধ মায়াবাদ অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন—নামরূপ একবারে মিথ্যা ইহা বৌদ্ধমত। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের ন্যায় মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তাই তিনি এই মায়াবাদ স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই মিথ্যা নামরূপ যাহা হইতে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। অহংভাবাশ্রিত চিত্তবৃত্তিসকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিলে নির্ব্বাণলাভ হইবে ইহাই বুদ্ধের মত। নির্ব্বাণ যে কি তাহা বুদ্ধ কখনও বর্ণনা করেন নাই; এই বিষয়ে

তাঁহার নীরবতাই পরবর্ত্তী শূন্যবাদের উৎপত্তির গৌণ কারণ। অহং-ভাবের লোপ হইলে বাকী কি থাকে তাহা যদি বুদ্ধ বলিয়া যাইতেন তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বোধ হয় প্রয়োজন হইত না। অবশ্য যাহা বাক্য ও মনের অতীত তাহা বাক্যে প্রকাশ না করিয়া বুদ্ধদেব ঠিকই করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তাঁহার নীরবতার গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ অসার অযৌক্তিক শূন্যবাদের সৃষ্টি করিল তখনই আবার ধর্ম্মজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। শূন্য হইতে শূন্যের উৎপত্তিই সম্ভব—শূন্যাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করা যায় না সুতরাং জগৎ বলিয়া কোন পদার্থই নাই, সমস্তই মিথ্যা। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শঙ্কর বলিলেন, "জগৎ যে মিথ্যা, ইহা তুমি কখন জানিলে? যখন তোমার সত্যবস্তুর জ্ঞান হইল; সত্যবস্তু না জানিতে পারিলে মিথ্যার মিথ্যাত্ব জানিবে কিরূপে? সেই সত্য বস্তুই ব্রহ্ম। যদি শূন্যকেই সত্যবস্তু বল তাহা হইলে তাহাকে শূন্য আখ্যায় অভিহিত করা অন্যায়।" এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদ খণ্ডন করিলেন।

বৌদ্ধদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় তিনি বেদের সাহায্য লইতে পারেন নাই, কারণ, উভয় পক্ষে তাহার প্রামাণিকতা স্বীকৃত নহে। সেইজন্য উভয় পক্ষের স্বীকৃত জগতের মিথ্যাত্ব অবলম্বনে যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি সত্যবস্তুর অস্তিত্বমাত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাংখ্য ও কর্ম্মবাদিগণের সহিত বিচারে তাঁহার আরও সুবিধা হইয়াছিল, কারণ, এস্থলে বেদের প্রামাণিকতা উভয়েরই স্বীকৃত সুতরাং তিনি জগতের কারণ এবং কর্ম্মের ফলদাতাস্বরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম সহজেই বেদান্তসাহায্যে প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন। সাংখ্যবাদী ও কর্ম্মবাদিগণ জগতের একটা মূলকারণ অবশ্যই স্বীকার করেন—সাংখ্যমতে তাহা প্রকৃতি, কর্ম্মবাদীর মতে তাহা কর্ম্মফলরূপ অদৃষ্ট। শূন্যবাদীদিগের এইরূপ একটা কারণস্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ, যাহা একেবারে অস্তিত্বহীন সেই জগতের আবার কারণ কিরূপে থাকিতে পারে? যাহা নাই তাহার

কারণ অনুসন্ধান করা অযৌক্তিক। সুতরাং শূন্যবাদীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে যাইয়া স্বাধীন যুক্তিসহায়ে কেবলমাত্র সত্তাবশেষ নিগুর্ণ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিলেন। সেই নিগুর্ণ ব্রহ্মই যে আবার সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময় ঈশ্বররূপে জগতের সৃষ্টাদির নিয়ন্তা হইতেছেন তাহা প্রমাণ করিতে স্বাধীন যুক্তি অক্ষম হয় নাই—বেদের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

এইরূপে বেদ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ প্রচারকরতঃ বৈদিকধর্ম্মকে ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বৈদান্তিকগণ উপাসনা ও ভক্তির আশ্রয়স্বরূপ সগুণ ব্রহ্মকে নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অতি নিকৃষ্টাবস্থা বিবেচনা করিয়া নিগুর্ণব্রহ্ম প্রাপ্তির আশায় সাধনচতুষ্টয় ও 'নেতি নেতি' বিচার-পথ আশ্রয় করিলেন। বৌদ্ধগণের ন্যায় তাঁহারাও ঈশ্বরোপাসনা এবং ভগবৎপ্রেমকে অতি নিকৃষ্ট ও নিম্নাধিকারিগণের উপযোগী মনে করিয়া ভক্তিবিহীন শুষ্ক বিচার ও কঠোরতা আশ্রয় করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, বেদান্তে অধিকারলাভের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করায় কর্ম্মে ঔদাসীন্য ভাব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিল। এই ভক্তিবিহীন জ্ঞানপক্ষপাতিত্ব ও কর্ম্মশৈথিল্য শঙ্কর-মতানুযায়ী বৈদান্তিকগণের প্রধান দোষ। এই দোষ দূর করিবার জন্যই রামানুজের আবির্ভাব। রামানুজ বলিলেন, বেদান্তে অধিকার লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতেই হইবে এবং উপাসনা ব্যতীত মুক্তি নাই। এই মত প্রচার জন্য তাঁহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের এরূপ ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা বোধ হয় আর কখনও কেহ করিতে পারেন নাই।

রামানুজ এইরূপে ভক্তি প্রচার করিয়া অদ্বৈতবাদের শুষ্কতা দূর করিলেন ; কিন্তু যে নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমের চরম মাধুরী বৃন্দাবনলীলায় প্রকটিত, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় জনসমাজে অপ্রকাশিত রহিল। এই প্রেমপ্রচারের জন্য মধ্ব ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। শঙ্কর যাহার

বিরোধী নাস্তিকভাবসকল উন্মূলিত করিয়া গিয়াছিলেন, রামানুজ যাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, মধ্ব কর্ত্তৃক যাহার বীজ রোপিত হইয়াছিল সেই বীজসম্ভূত মহাপ্রেম বঙ্গদেশে বিগ্রহবান্ হইয়া আবির্ভূত হইল—শ্রীগৌরাঙ্গ অননুভূতপূর্ব্ব উজ্জ্বল মধুর রসের বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে উদিত হইলেন।

প্রাচীনতম বৈদিকগণ যাজ্ঞযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গাদি লোকসকল লাভ করিয়া যে আনন্দের ছায়ামাত্র সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী জ্ঞানবাদী বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মানন্দে যে আনন্দের কণামাত্র উপভোগ করিতেন, অর্জ্জুন, উদ্ধব প্রভৃতি গীতাকারের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে নিষ্কাম প্রেমের জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রেম অপরিস্ফুটভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বজীবহিতচিকীর্ষা যে প্রেমের অবান্তর ফলস্বরূপ, শঙ্কর রামানুজ মধ্ব প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে প্রেম আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই, সেই চরম প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গে মূর্ত্তিমান হইয়া ভারতে এক অভিনব যুগের অবতারণা করিল।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করপ্রচারিত সোঽহং-ভাবের বিরোধী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, মুরারিগুপ্ত, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণকে স্বমত ত্যাগ করাইয়া নিজমতে অর্থাৎ দ্বৈত ভাবের উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিতে তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার ভক্তির প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্বমত ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি দ্বৈতভাবপ্রচারকগণ সকলেই শঙ্করের সোঽহংভাবের বিরোধী ছিলেন—আচার্য্যপ্রবরের মহান্ ভাব তাঁহারা কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীচৈতন্য সময়ে সময়ে সোঽহংভাব প্রাপ্ত হইতেন সত্য, কিন্তু তিনি উহাকে ভাবাধিক্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন,—জীবন্ত দার্শনিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। প্রেমের পরিপক্কাবস্থায় যে অদ্বৈতভাব স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয় গোপিনীগণের ও চৈতন্যদেবের আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান তাহারই উদাহরণ। কিন্তু বৈষ্ণবা-

চার্য্যগণ এই অভেদের মধ্যেও একটা ভেদ দেখিতে পান, তাই তাঁহারা নিজ মতকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ ব্যাখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইলেও উহা কেবলমাত্র কৃষ্ণাশ্রিত। অনন্তভাবময় ঈশ্বরের শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি অন্য যে সকল রূপ ও ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে তাহা ঐ প্রেমের সীমার বাহিরে অবস্থিত। বিশেষতঃ মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা তাঁহার ধর্ম্মে একেবারেই নাই এবং শঙ্করপ্রচারিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদও তিনি স্বীকার করেন নাই। এইটী বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ণতা।

বুদ্ধের পর শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকল মহাপুরুষই যীশুখ্রীষ্টের ও মহম্মদের পর আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁহারা কেহ খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল ধর্ম্মমতকে উপেক্ষা করিতেন না। নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তত্তৎ-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী সাধনপথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সমন্বয় সাধন না করিয়া উভয় ধর্ম্মকে সংমিশ্রিত করিয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। শিখনীতি ও শিখধর্ম্ম এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই এই সংমিশ্রণের বোধ হয় প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ধর্ম্মকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্য ও রামানুজ যখন আবির্ভূত হন তখন ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও শঙ্করাদি সকল আচার্য্যগণই বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শঙ্করের বৌদ্ধবিদ্বেষ লোকবিশ্রুত। এই সকল আচার্য্য-গণের এই বিদ্বেষভাব ও অন্য ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ইঁহাদিগকে চিরকাল সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে পরিগণিত করিয়া রাখিবে।

বেদে যে সকল ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহা গীতাকার সংগ্রহ করিয়া একটী মালা গাঁথিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থে নানা ভাবের সমন্বয় দৃষ্ট হইলেও কতকগুলি ভাব অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ভাব একেবারে প্রকাশ হয় নাই। গীতাকার এই উদার ধর্ম্মমতের উপদেষ্টা ও মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি যে ধর্ম্মশক্তি ভারতে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা লুপ্তপ্রায় হইলে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধ, কুমারিল ও রামানুজ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রচার করিয়া যান। শ্রীচৈতন্য ভক্তিপ্রেমের চরমাদর্শ প্রকটিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমত বিকৃত হইয়া পড়ে এবং ভারতে মুসলমানাধিকার লোপ হইয়া ইংরাজাধিকার প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী হিন্দু ও অন্যান্য জাতির শরীর ও মনের উপর ইংরাজের পাশ্চাত্য ভাবের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। বৈদিকযুগের সময় হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ গৃহ, সমাজ ও রাজ্যশাসনে যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী নীতিসকল ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতর প্রবেশ লাভ করিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্থলে স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তিসাম্য (free competition) প্রাচীন গুরুর পরিবর্ত্তে বেতনভোগী হ্যাট-কোট-চসমাধারী মাষ্টার মহাশয়, পঞ্চায়েতী বিচারের স্থলে আইন আদালত প্রভৃতি নানাপ্রকার নূতন নূতন পরিবর্ত্তন হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিল হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে। ঠাকুরদেবতার পূজায় অশ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে অবিশ্বাস, 'ইয়ং বেঙ্গলগণের' বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা এই সময়ে প্রাচীন মত মানিয়া চলিতেন তাঁহারাও ভিতরে ভিতরে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন। একদিকে সকল বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরদিকে ভণ্ডামী সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা হিন্দুগণের পুতুলপূজা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইতে লাগিলেন। এমন বিপ্লব হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এমন ধর্ম্মের গ্লানি পূর্ব্বে কখনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় নাই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের তুলনায়

এই বিপ্লব সহস্রগুণ অধিক। এই বিপ্লবের সময় মহাত্মা রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া শিক্ষিত হিন্দুর খ্রীষ্টান হইবার ঝোঁক অনেকটা কমাইয়া দিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল হিন্দুর স্থান হইল না। যে সকল নব্যশিক্ষিত হিন্দুসন্তান নিরাকার একেশ্বর উপাসনাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এবং হিন্দুদেবদেবীর পূজার ভিতর সেই একেশ্বরবাদের বিরোধী ভাব দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ডিরোজিওর শিষ্য নব্যশিক্ষিত নাস্তিকগণ, এবং প্রাচীন মতাবলম্বী নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইঁহাদের মতের বিরোধী সুতরাং ইঁহারা লক্ষ্যহীন অবস্থায় যাহা যাহার অভিরুচি তাহাই করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হইলেন—তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার সকলই নবাগত বৈদেশিক ভাবের বিরোধী—তাঁহাদের আশা ভরসা সমস্তই অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ রাজ্যে নিবদ্ধ। সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, অথচ সেই সকল অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিও তৎকালে অত্যন্ত দুর্লভ, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে একজন সাধু মহাত্মা তৎকালে প্রকটিত ছিলেন তাঁহারাও যেন ভয়ে ভয়ে আপনাদের অন্তরে শাস্ত্রলিখিত সত্যগুলি লুক্কায়িত রাখিয়া কোন রকমে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এতাদৃশ শক্তিশালী নহেন যে, ঐ সকল সত্য বিশ্বাসসংস্কারে অন্যের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের অনুগত ও আস্তিক্যবুদ্ধিশালী অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদের দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রাচীন মতাবলম্বিগণ নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা আদর্শ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে নিজেরাই যেন প্রাচীন বিশ্বাসগুলির উপর সন্দিহান হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহারা কতকটা চিরাগত দৃঢ়সংস্কার

বশতঃ প্রাচীন মতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ঐ সকল মতের উপর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। এই জন্য তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালধর্ম্মানুসারে যেন ভণ্ড হইয়া পড়িতেছিলেন।

কেবল যে হিন্দুসমাজের এইরূপ অবস্থা তাহা নহে। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও বহুদিন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অনাবির্ভাব বশতঃ নাস্তিকভাব প্রসারিত হইতেছিল। তাঁহারাও নিজ নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে বলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ও প্রাচীন পুরোহিতদিগের শক্তির লোপ এই নাস্তিকতার মূলকারণ। আমাদের বিশ্বাস এই যে, পূর্ব্বকালের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের অভাবই ইহার প্রধান কারণ, কারণ যাহাই হউক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এই ঘনীভূত ও সর্ব্বব্যাপী নাস্তিকতার তুলনায় প্রাচীনকালের ধর্ম্মবিপ্লব সূর্য্যের ক্ষণিক-আবরণ-সম্ভূত ছায়ার ন্যায় অতি তুচ্ছ।

ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লবের কাহিনী পাঠ করা যায়, তাহা দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব সমগ্র জগতে সকল ধর্ম্মে, সর্ব্বসম্প্রদায়ে, সকল জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা পাইতেছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ কেহই ইহার সর্ব্বগ্রাসী শক্তির বাহিরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সকলেই ইহার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া—"Eat, drink, and be merry" অর্থাৎ "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। এই নাস্তিকতা জড়-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারসমূহের দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী হইবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছিল। ধর্ম্ম আর বুঝি রহিল না—বেদ বেদান্ত, কোরাণ বাইবেল বুঝি চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যায়—ঈশ্বর, উপাসনা, দেবতা যাগযজ্ঞ বুঝি বা একেবারে

লোপ পায়, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, মঠ হয়ত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলের হৃদয়েই এই আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অন্তরের ব্যথা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া শ্রীভগবানের চরণে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভু কোথায় তুমি, যদি থাক রক্ষা কর।

হিন্দুর পরব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, বৌদ্ধের বুদ্ধ খ্রীষ্টানের পরমপিতা আবার মায়ার অন্তরালে বিভূতি গোপন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মময় মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন -ধর্ম্মজগতে আবার বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তিনি সাধনা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, "সকল ধর্ম্মই সত্য— ঈশ্বরে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র"। বেদ, কোরাণ, বাইবেল সকল শাস্ত্রই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

মূর্খতাদ্বারা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইল, অপরোক্ষ প্রত্যক্ষকে পরাস্ত করিল, বৈরাগ্য সংসারকে জয় করিল, যোগজশক্তির নিকট জড়শক্তি মস্তক অবনত করিল—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী জগদ্‌গুরুকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারত জগতের সমক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল; নূতন পুরাতনের দ্বারা বিজিত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিপ্লবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম জগতে প্রকাশ করিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এই প্রকার উদার ভাববোধক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মহাপুরুষ ঐ ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই বাক্য সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবপ্রকাশক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ঐ বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মত জনসমাজে গৃহীত হইবার পর ঐরূপ অর্থ কল্পিত হইতেছে। মহিম্নস্তবকর্ত্তা "নৃণাং গম্যস্ত্বমেকঃ পয়সামর্ণব ইব" বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

শিক্ষার প্রভাবে অন্তঃকরণ প্রসারতালাভ করিলে সকলেই ঈশ্বর এক বলিয়া স্বীকার করেন। বুদ্ধি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি এবং সাধনা দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি এক নহে। গুরূপদেশ বা শাস্ত্রপাঠজনিত যে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে শাব্দিক জ্ঞান কহে, ইহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন কোন সাধক স্বমতে সাধন করিয়া নিজ উপাস্যদেবতার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বদেবদেবীরূপে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সাধু মহাপুরুষ অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ শাক্তমতে সাধন করিয়া জগন্মাতা কালীর সাকার নিরাকার উভয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "কালী-কৃষ্ণ-শিব-রাম সকল আমার এলোকেশী"। ইহাও খুব উদার ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলা যায় না। ইহার নাম নিজ ইষ্ট দেবতায় সকল দেবতার দর্শন ; এইরূপ দর্শনফলে নিজ ইষ্ট দেবতার পূর্ণত্বজ্ঞান মাত্র লাভ হইয়া থাকে। কালীকে কৃষ্ণরূপে দেখা, এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপেই দেখা স্বতন্ত্র কথা। পূর্ব্বোক্ত দর্শনে সাধকের মাতৃ-ভাবের উপাসনা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ঐ ভাবের অনুগত করিয়া কৃষ্ণাশ্রিত মধুর ভাবের উপলব্ধি হয় ; শেষোক্ত ভাবে মধুর ভাবটী প্রধান হইয়া অবিমিশ্রিতরূপে অনুভূত হয়।

শ্রীরামপ্রসাদ কখনও বৈষ্ণবমতে সাধনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের চিন্ময়মূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। তিনি কালীকে কৃষ্ণরূপে এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এইটুকু পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের অননুভূত-পূর্ব্বত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ভগবান্ এক কিন্তু তাঁহার ভাব অনন্ত, নাম অনন্ত, রূপ অর্থাৎ মূর্ত্তিও অনন্ত। এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী ভাব, নাম ও রূপ লইয়া গঠিত হইয়াছে এই সকল বিভিন্ন ভাব-নাম রূপের উপলব্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই জন্য সকল মতের সাধন-প্রণালী এক হইতে পারে না। বৈষ্ণবমতের সাধনপ্রণালী অবলম্বন

করিলে কখনও কালীভাবের উপলব্ধি হইতে পারে না। শাক্তমতে সাধনা দ্বারা কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ কালীমূর্ত্তিকে সর্ব্ব দেবদেবীময় ভাবিতে পারিলে তবেই কালীভাবে সিদ্ধ হওয়া যায়। সেইরূপ বৈষ্ণবমতে সাধনা করিয়া কৃষ্ণদর্শনের পর ঐ কৃষ্ণকেই সকল দেব-দেবীর আশ্রয় বলিয়া জ্ঞান হইলে তবেই কৃষ্ণসাধন সম্পূর্ণ হইবে। কারণ, সাধক যতক্ষণ নিজ ইষ্টদেবতাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু ইহাকে সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় বলিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাতে প্রত্যেক ভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না—অন্য সমুদয় ভাবগুলিকে নিজ ভাবের অধীন ও অনুগত করিয়া লওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সাধনা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক মতের ঈশ্বরীয় ভাব স্বতন্ত্র ও মুখ্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইটী ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার উদারভাব কেবল যে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নানাপ্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়সাধন করিয়াছে তাহা নহে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত যে মহম্মদীয় ধর্ম্মের বাহ্যিক আচারব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই মুসলমানধর্ম্মকেও ভ্রাতার ন্যায় আপনার করিয়া লইয়াছে। খ্রীষ্টানভাবের সকল তত্ত্বও তিনি গভীর সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগপথ অবলম্বনে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার কাহিনী অতি আশ্চর্য্য। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক তাহা তাঁহার জীবনচরিতে পাঠ করিতে পারেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব। জগতে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচলিত রহিয়াছে, সকল মতের সাধনাতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাপ্রকার ধর্ম্মমত মিশ্রিত করিয়া কোন নূতন ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন নাই। এইরূপ করিলে তিনি নানকের ন্যায় একটী সঙ্কর মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেন। তাঁহার মতকে Eclecticism বলা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান

মতের সহিত তাঁহার মতের এই পার্থক্য। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদাদি শাস্ত্রে সকল ধর্ম্মভাবের বীজ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সকল ভাব সমান পরিস্ফুট নহে। কোন কোন ভাব পুরাণেতিহাসে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বেদে আছে—"রসো বৈ সঃ" কিন্তু ভগবান্ যে রসস্বরূপ ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট হইয়াছে; তদপেক্ষা আবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলায় তাহার সম্যক্ বিকাশলাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অন্য কেহ ঐ ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আস্বাদন করাইতে পারেন নাই—সেইরূপ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব শাস্ত্রে থাকিতে পারে কিন্তু এই ভাবের জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে কোথায়?

এইটী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব। তিনি কোন নূতন মত প্রচার করেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মমতে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ইতিহাসের নূতন ঘটনা।

অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র একমাত্র প্রমাণ হইলেও সাধারণ মানুষ কখনও কেবল কতকগুলি বাক্যের উপর জীবনের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে না। সেই জন্য বলিতে হয় যে শাস্ত্র যেরূপ সর্ব্ববিধ অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রমাণ, মহাপুরুষগণ সেইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ। শাস্ত্রবাক্য ধরিয়া মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব নিশ্চয় হয় সত্য কিন্তু যখন শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যদি কোন সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, স্বার্থশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রলিখিত সত্য উপলব্ধি করতঃ তাহা সত্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন তাহা হইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইয়া হৃদয়ের বিশ্বাস নূতন বল প্রাপ্ত হয়। জীবন্ত আদর্শের প্রভাব শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা অধিক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে যাইয়া আমরা কাহারও নিন্দা করি নাই। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট সকলেই ভগবানের অবতার। সেই হিসাবে সকলেই এক। কিন্তু এক হইলেও ঐতিহাসিকের

চার্য্যগণ এই অভেদের মধ্যেও একটা ভেদ দেখিতে পান, তাই তাঁহারা নিজ মতকে ভক্তি ভেদাভেদ বাদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইলেও উহা কেবলমাত্র কৃষ্ণাশ্রিত। অনন্তভাবময় ঈশ্বরের শিব, কালী, দুর্গা, প্রভৃতি অন্য যে সকল রূপ ও ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে তাহা ঐ প্রেমের সীমার বাহিরে অবস্থিত। বিশেষতঃ মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা তাঁহার ধর্ম্মে একেবারেই নাই এবং শঙ্করপ্রচারিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদও তিনি স্বীকার করেন নাই। এইটী বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ণতা।

বুদ্ধের পর শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকল মহাপুরুষই যীশুখ্রীষ্টের ও মহম্মদের পর আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁহারা কেহ খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল ধর্ম্মমতকে উপেক্ষা করিতেন না। নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তত্তৎ-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী সাধনপথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সমন্বয় সাধন না করিয়া উভয় ধর্ম্মকে সংমিশ্রিত করিয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। শিখনীতি ও শিখধর্ম্ম এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই এই সংমিশ্রণের বোধ হয় প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ধর্ম্মকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্য ও রামানুজ যখন আবির্ভূত হন তখন ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও শঙ্করাদি সকল আচার্য্যগণই বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শঙ্করের বৌদ্ধবিদ্বেষ লোকবিশ্রুত। এই সকল আচার্য্য-গণের এই বিদ্বেষভাব ও অন্য ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ইঁহাদিগকে চিরকাল সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে পরিগণিত করিয়া রাখিবে।

বেদে যে সকল ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহা গীতাকার সংগ্রহ করিয়া একটী মালা গাঁথিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থে নানা ভাবের সমন্বয় দৃষ্ট হইলেও কতকগুলি ভাব অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ভাব একেবারে প্রকাশ হয় নাই। গীতাকার এই উদার ধর্ম্মমতের উপদেষ্টা ও মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি যে ধর্ম্মশক্তি ভারতে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা লুপ্তপ্রায় হইলে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধ, কুমারিল ও রামানুজ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রচার করিয়া যান। শ্রীচৈতন্য ভক্তিপ্রেমের চরমাদর্শ প্রকটিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমত বিকৃত হইয়া পড়ে এবং ভারতে মুসলমানাধিকার লোপ হইয়া ইংরাজাধিকার প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী হিন্দু ও অন্যান্য জাতির শরীর ও মনের উপর ইংরাজের পাশ্চাত্য ভাবের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। বৈদিকযুগের সময় হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ গৃহ, সমাজ ও রাজ্যশাসনে যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী নীতিসকল ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতর প্রবেশ লাভ করিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্থলে স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তিসাম্য (free competition) প্রাচীন গুরুর পরিবর্ত্তে বেতনভোগী হ্যাট-কোট-চসমাধারী মাষ্টার মহাশয়, পঞ্চায়েতী বিচারের স্থলে আইন আদালত প্রভৃতি নানাপ্রকার নূতন নূতন পরিবর্ত্তন হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিল হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে। ঠাকুরদেবতার পূজায় অশ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে অবিশ্বাস, 'ইয়ং বেঙ্গলগণের' বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা এই সময়ে প্রাচীন মত মানিয়া চলিতেন তাঁহারাও ভিতরে ভিতরে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন। একদিকে সকল বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরদিকে ভণ্ডামী সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা হিন্দুগণের পুতুলপূজা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইতে লাগিলেন। এমন বিপ্লব হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এমন ধর্ম্মের গ্লানি পূর্ব্বে কখনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় নাই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের তুলনায়

এই বিপ্লব সহস্রগুণ অধিক। এই বিপ্লবের সময় মহাত্মা রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া শিক্ষিত হিন্দুর খ্রীষ্টান হইবার ঝোঁক অনেকটা কমাইয়া দিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল হিন্দুর স্থান হইল না। যে সকল নব্যশিক্ষিত হিন্দুসন্তান নিরাকার একেশ্বর উপাসনাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এবং হিন্দুদেবদেবীর পূজার ভিতর সেই একেশ্বরবাদের বিরোধী ভাব দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ডিরোজিওর শিষ্য নব্যশিক্ষিত নাস্তিকগণ, এবং প্রাচীন মতাবলম্বী নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইঁহাদের মতের বিরোধী সুতরাং ইঁহারা লক্ষ্যহীন অবস্থায় যাহা যাহার অভিরুচি তাহাই করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হইলেন—তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার সকলই নবাগত বৈদেশিক ভাবের বিরোধী—তাঁহাদের আশা ভরসা সমস্তই অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ রাজ্যে নিবদ্ধ। সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, অথচ সেই সকল অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিও তৎকালে অত্যন্ত দুর্লভ, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে একজন সাধু মহাত্মা তৎকালে প্রকটিত ছিলেন তাঁহারাও যেন ভয়ে ভয়ে আপনাদের অন্তরে শাস্ত্রলিখিত সত্যগুলি লুক্কায়িত রাখিয়া কোন রকমে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এতাদৃশ শক্তিশালী নহেন যে, ঐ সকল সত্য বিশ্বাসসহকারে অন্যের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের অনুগত ও আস্তিক্যবুদ্ধিশালী অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদের দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রাচীন মতাবলম্বিগণ নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা আদর্শ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে নিজেরাই যেন প্রাচীন বিশ্বাসগুলির উপর সন্দিহান হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহারা কতকটা চিরাগত দৃঢ়সংস্কার

বশতঃ প্রাচীন মতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ঐ সকল মতের উপর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। এই জন্য তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালধর্ম্মানুসারে যেন ভণ্ড হইয়া পড়িতেছিলেন।

কেবল যে হিন্দুসমাজের এইরূপ অবস্থা তাহা নহে। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও বহুদিন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অনাবির্ভাব বশতঃ নাস্তিকভাব প্রসারিত হইতেছিল। তাঁহারাও নিজ নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে বলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ও প্রাচীন পুরোহিতদিগের শক্তির লোপ এই নাস্তিকতার মূলকারণ। আমাদের বিশ্বাস এই যে, পূর্ব্বকালের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের অভাবই ইহার প্রধান কারণ, কারণ যাহাই হউক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এই ঘনীভূত ও সর্ব্বব্যাপী নাস্তিকতার তুলনায় প্রাচীনকালের ধর্ম্মবিপ্লব সূর্য্যের ক্ষণিক-আবরণ-সম্ভূত ছায়ার ন্যায় অতি তুচ্ছ।

ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লবের কাহিনী পাঠ করা যায়, তাহা দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব সমগ্র জগতে সকল ধর্ম্মে, সর্ব্বসম্প্রদায়ে, সকল জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা পাইতেছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ কেহই ইহার সর্ব্বগ্রাসী শক্তির বাহিরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সকলেই ইহার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া—"Eat, drink, and be merry" অর্থাৎ 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। এই নাস্তিকতা জড়-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারসমূহের দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী হইবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছিল। ধর্ম্ম আর বুঝি রহিল না—বেদ বেদান্ত, কোরাণ বাইবেল বুঝি চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যায়—ঈশ্বর, উপাসনা, দেবতা যাগযজ্ঞ বুঝি বা একেবারে

লোপ পায়, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, মঠ হয়ত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলের হৃদয়েই এই আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অন্তরের ব্যথা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া শ্রীভগবানের চরণে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভু কোথায় তুমি, যদি থাক রক্ষা কর।

হিন্দুর পরব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, বৌদ্ধের বুদ্ধ খ্রীষ্টানের পরম-পিতা আবার মায়ার অন্তরালে বিভূতি গোপন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মময় মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন -ধর্ম্মজগতে আবার বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তিনি সাধনা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, "সকল ধর্ম্মই সত্য—ঈশ্বরে পৌঁছি-বার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র"। বেদ, কোরাণ, বাইবেল সকল শাস্ত্রই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

মূর্খতাদ্বারা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইল, অপরোক্ষ প্রত্যক্ষকে পরাস্ত করিল, বৈরাগ্য সংসারকে জয় করিল, যোগজশক্তির নিকট জড়শক্তি মস্তক অবনত করিল—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী জগদ্‌গুরুকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারত জগতের সমক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল; নুতন পুরাতনের দ্বারা বিজিত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিপ্লবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম জগতে প্রকাশ করিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এই প্রকার উদার ভাববোধক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মহাপুরুষ ঐ ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই বাক্য সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবপ্রকাশক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ঐ বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মত জনসমাজে গৃহীত হইবার পর ঐরূপ অর্থ কল্পিত হইতেছে। মহিম্নস্তবকর্ত্তা "নৃণাং গম্যস্ত্বমেকঃ পয়সামর্ণব ইব" বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

শিক্ষার প্রভাবে অন্তঃকরণ প্রসারিতালাভ করিলে সকলেই ঈশ্বর এক বলিয়া স্বীকার করেন। বুদ্ধি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি এবং সাধনা দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি এক নহে। গুরূপদেশ বা শাস্ত্রপাঠজনিত যে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে শাব্দিক জ্ঞান কহে, ইহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন কোন সাধক স্বমতে সাধন করিয়া নিজ উপাস্যদেবতার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বদেবদেবীরূপে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সাধু মহাপুরুষ অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ শাক্তমতে সাধন করিয়া জগন্মাতা কালীর সাকার নিরাকার উভয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "কালী-কৃষ্ণ-শিব-রাম সকল আমার এলোকেশী"। ইহাও খুব উদার ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলা যায় না। ইহার নাম নিজ ইষ্ট দেবতায় সকল দেবতার দর্শন ; এইরূপ দর্শনফলে নিজ ইষ্ট দেবতার পূর্ণত্বজ্ঞান মাত্র লাভ হইয়া থাকে। কালীকে কৃষ্ণরূপে দেখা, এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপেই দেখা স্বতন্ত্র কথা। পূর্ব্বোক্ত দর্শনে সাধকের মাতৃ-ভাবের উপাসনা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ঐ ভাবের অনুগত করিয়া কৃষ্ণাশ্রিত মধুর ভাবের উপলব্ধি হয় ; শেষোক্ত ভাবে মধুর ভাবটী প্রধান হইয়া অবিমিশ্রিতরূপে অনুভূত হয়।

শ্রীরামপ্রসাদ কখনও বৈষ্ণবমতে সাধনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। তিনি কালীকে কৃষ্ণরূপে এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এইটুকু পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের অননুভূত-পূর্ব্বত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ভগবান্ এক কিন্তু তাঁহার ভাব অনন্ত, নাম অনন্ত, রূপ অর্থাৎ মূর্ত্তিও অনন্ত। এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী ভাব, নাম ও রূপ লইয়া গঠিত হইয়াছে এই সকল বিভিন্ন ভাব-নাম রূপের উপলব্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই জন্য সকল মতের সাধন-প্রণালী এক হইতে পারে না। বৈষ্ণবমতের সাধনপ্রণালী অবলম্বন

করিলে কখনও কালীভাবের উপলব্ধি হইতে পারে না। শাক্তমতে সাধনা দ্বারা কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ কালীমূর্ত্তিকে সর্ব্ব দেবদেবীময় ভাবিতে পারিলে তবেই কালীভাবে সিদ্ধ হওয়া যায়। সেইরূপ বৈষ্ণবমতে সাধনা করিয়া কৃষ্ণদর্শনের পর ঐ কৃষ্ণকেই সকল দেব-দেবীর আশ্রয় বলিয়া জ্ঞান হইলে তবেই কৃষ্ণসাধন সম্পূর্ণ হইবে। কারণ, সাধক যতক্ষণ নিজ ইষ্টদেবতাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু ইহাকে সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় বলিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাতে প্রত্যেক ভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না—অন্য সমুদয় ভাবগুলিকে নিজ ভাবের অধীন ও অনুগত করিয়া লওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সাধনা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক মতের ঈশ্বরীয় ভাব স্বতন্ত্র ও মুখ্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইটী ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার উদারভাব কেবল যে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নানাপ্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়সাধন করিয়াছে তাহা নহে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত যে মহম্মদীয় ধর্ম্মের বাহ্যিক আচারব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই মুসলমানধর্ম্মকেও ভ্রাতার ন্যায় আপনার করিয়া লইয়াছে। খ্রীষ্টানভাবের সকল তত্ত্বও তিনি গভীর সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগপথ অবলম্বনে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার কাহিনী অতি আশ্চর্য্য। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক তাহা তাঁহার জীবনচরিতে পাঠ করিতে পারেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব। জগতে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচলিত রহিয়াছে, সকল মতের সাধনাতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাপ্রকার ধর্ম্মমত মিশ্রিত করিয়া কোন নূতন ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন নাই। এইরূপ করিলে তিনি নানকের ন্যায় একটী সঙ্কর মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেন। তাঁহার মতকে Eclecticism বলা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান

মতের সহিত তাঁহার মতের এই পার্থক্য। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদাদি শাস্ত্রে সকল ধর্ম্মভাবের বীজ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সকল ভাব সমান পরিস্ফুট নহে। কোন কোন ভাব পুরাণেতিহাসে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বেদে আছে—"রসো বৈ সঃ" কিন্তু ভগবান্ যে রসস্বরূপ ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট হইয়াছে; তদপেক্ষা আবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলায় তাহার সম্যক্ বিকাশলাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অন্য কেহ ঐ ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আস্বাদন করাইতে পারেন নাই—সেইরূপ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব শাস্ত্রে থাকিতে পারে কিন্তু এই ভাবের জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে কোথায়?

এইটী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব। তিনি কোন নূতন মত প্রচার করেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মমতে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ইতিহাসের নূতন ঘটনা।

অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র একমাত্র প্রমাণ হইলেও সাধারণ মানুষ কখনও কেবল কতকগুলি বাক্যের উপর জীবনের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে না। সেই জন্য বলিতে হয় যে শাস্ত্র যেরূপ সর্ব্ববিধ অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রমাণ, মহাপুরুষগণ সেইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ। শাস্ত্রবাক্য ধরিয়া মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব নিশ্চয় হয় সত্য কিন্তু যখন শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যদি কোন সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, স্বার্থশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রলিখিত সত্য উপলব্ধি করতঃ তাহা সত্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন তাহা হইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইয় হৃদয়ের বিশ্বাস নূতন বল প্রাপ্ত হয়। জীবন্ত আদর্শের প্রভাব শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা অধিক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে যাইয়া আমরা কাহারও নিন্দা করি নাই। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট সকলেই ভগবানের অবতার। সেই হিসাবে সকলেই এক। কিন্তু এক হইলেও ঐতিহাসিকের

দৃষ্টিতে সকলের ভাব ও কর্ম্ম সমান নহে। শ্রীকৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে আদর্শ গৃহী ও আদর্শ রাজারূপে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু, বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু বাল্যকাল হইতেই সংসারের উপর বিরক্ত এবং সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইঁহারা আদর্শ সন্ন্যাসী। এই জন্য কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্কর সাধারণ জ্ঞানে পৃথক পৃথক আদর্শরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যতক্ষণ নামরূপ-জনিত ভেদজ্ঞান দূর হইয়া তত্ত্বজ্ঞান না হয় ততক্ষণ সকলেই পৃথক; তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সকলের মৌলিক একত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেইজন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে মহাপুরুষগণ এক ভগবানের পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে ভাব ও কর্ম্মের ভিন্নতার জন্য তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক আদর্শজ্ঞানে তাঁহাদের পরস্পরের তুলনা ও দোষগুণের বিচার অনিবার্য্য। ইহাতে তাঁহাদের উপর বিশ্বাসভক্তির কোন ত্রুটি হইলে তাহ দূষণীয় সন্দেহ নাই। দোষগুণ বিচারকালে মূলগত একত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই দোষ পরিহার করিতে পারা যায়।

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তবীর হনুমান বলিয়াছেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমল-লোচনঃ॥" ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মধ্যে একত্ব স্বীকার করিয়া নিজ আদর্শে স্থির থাকার নাম ইষ্টনিষ্ঠা।

স্বমহত্ব স্থাপনোদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধন জন্য নিজ আদর্শকে উচ্চস্থান দিয়া অনর্থক অন্য আদর্শের নিন্দা করিলে তাহাকে গোঁড়ামী বা সম্প্রদায়িকতা বলা যায়। ইষ্টনিষ্ঠা এবং গোঁড়ামী সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা কখনও শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা বা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে "গোঁড়ামী, গোঁড়ামী" বলিয়া চীৎকার করেন না।

নুতন সত্যের আলোক অতি অল্প লোকেই সহ্য করিতে পারে। যাহা সত্য বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি তাহাই বলিয়াছি, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহাঁতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কৈবর্ত্তকুলোদ্ভবা ধনাঢ্যা রাণী রাসমণি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাদি কর্ম্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের অন্যতমরূপে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সে প্রভাবের সম্যক্ পরিচয় সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের সকল শিষ্য যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে উদ্ভূতা জনৈক রমণীই এক হিসাবে সেই সমস্ত ব্যাপারটীর মূলকারণস্বরূপ ছিলেন। মানবীয় দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকিলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না থাকিলে পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রচার কার্য্যও হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটী নির্ম্মাণের উপরই এই সমগ্র ব্যাপারটী নির্ভর করিয়াছে। উহাও

আবার নীচবংশোদ্ভবা জনৈক ধনাঢ্যা রমণীর ভক্তির ফলস্বরূপ ছিল। স্বামিজী স্বয়ংই আমাদিগের মনে পড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, এদেশ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে-বদ্ধপরিকর হিন্দু রাজগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইলে এই জিনিসটী কদাপি ঘটিতে পারিত না। ইহা হইতেই তিনি ভারতে একচ্ছত্রী রাজগণের জাতিভেদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার গুরুত্ব অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি তাঁহার সময়ে একজন বীরহৃদয়া রমণী ছিলেন। কিরূপে তিনি কলিকাতার ধীবরদিগকে অন্যায্য করভার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বামীকে সরকার যে বিপুল অর্থ দাবী করিয়াছিলেন তাহা দিতে সম্মত করাইয়া, তৎপরে নদীতে যাহাতে বিদেশীয়দিগের জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ হয়, তজ্জন্য জেদ করিয়া বসিলেন। সুসমৃদ্ধ গড়ের মাঠে তাঁহার যে সকল রাস্তা ছিল, সেই সকল রাস্তা দিয়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা কেন দেব-প্রতিমাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না, ইহা লইয়া তিনি ঐরূপ আর এক তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। তিনি এক প্রকার বলিয়াই ছিলেন যে, যদি ইংরাজেরা ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম পছন্দ না করেন, তাহা হইলে যে রাস্তা দিয়া মিছিল বাহির হয় তাহার আপত্তিজনক অংশগুলিতে দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর তুলিয়া দিলেই হইল—উহাতে আর বেশী হাঙ্গামা কি আছে? আর সেইরূপ করাও হইল—উহা ফল হইল এই যে, কলিকাতার "রতন রো" নামক চমৎকার রাজপথটী মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। পতিবিয়োগের কিছুদিন পরেই. তাঁহাকে তাঁহার ব্যাঙ্কারদিগের নিকট যে বিপুল অর্থ জমিয়াছিল তাহা নিজ হস্তে উঠাইয়া লইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তিনি উহা নিজে খাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কার্য্যটী কঠিন হইলেও তিনি উহা অসীম বুদ্ধি ও দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তদবধি নিজের সমস্ত কার্য্য নিজেই পরিচালনা করিতেন। অনেক দিন পরে তাঁহার একটী বড় মোকদ্দমায় তিনি কৌন্‌সুলীর দ্বারা যে সকল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ

উত্তর প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতার প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে চলিত কথার ন্যায় হইয়া গিয়াছে।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন আশপাশের সকল লোক এই মহা সাধককে ধর্ম্মোন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছে, তখন তিনিই ইঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই তাঁহাকে কোনরূপ কাজ কর্ম্ম না করিয়াও বরাবর বৃত্তি ও বাসস্থান ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে মথুরবাবু তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন। রাণী রাসমণি প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-বিষয়িণী প্রতিভা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত সেই প্রথম ধারণাই বলবতী রাখিতে পারিয়াছিলেন।

তথাপি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরের ব্রাহ্মণকুমাররূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, জনৈক নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ এবং তদুদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করিয়াছে—একথা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা-দিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজাদি কার্য্যে সাহায্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদৌ সম্মত হইলেন না। শুনা যায়, সকল কার্য্য চুকিয়া যাইলে এবং সমাগত লোকজন চলিয়া গেলে তিনি সেই রাত্রে বাজার হইতে একমুঠা ছোলা ভাজা কিনিয়া সমস্ত দিন উপবাসের পর তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

পরে তিনি কালীবাটীতে যে পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এই ঘটনাটী নিশ্চয়ই তাহার অর্থকে গভীরতর করিয়া দিতেছে। তিনি কদাচ ভ্রমবশতঃ কৈবর্ত্তবংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি জগতে তাঁহার কার্য্য কি তাহা জানিতে পারেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, বাল্যে পল্লীগ্রামে তিনি যে কঠোর আচার-

নিষ্ঠতায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা ঐ কার্য্যের পোষক না হইয়া বরং প্রতিকূল ছিল। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, তাঁহার সমগ্র জীবন, তিনি যে সকল মানবের ধর্ম্মরাজ্যে সামাজিকপদ-নির্ব্বিশেষে সমান প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন, এই কথাই ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের আচার্য্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন তৎসম্বন্ধে মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধনই উহার জীবনের ব্রত। খেতড়ীর রাজাকে পাঠাইবার জন্য যখন তিনি আমেরিকায় ফনোগ্রাফ সম্মুখে কয়েকটী কথা কহেন, তখন আপনা হইতে এই বিষয়টীই তাঁহার মনে আসিয়াছিল। বিদেশে যখনই তিনি আপনাকে অন্য সময় অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন এবং নিকটে কোন গুরুভ্রাতা না থাকিতেন, তখনই ঐ চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিত, এবং তিনি সমীপস্থ শিষ্যকে বলিতেন, "কখনও ভুলিও না, 'স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি-সাধন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র!"

একথা সত্য যে, সমাজে যখন নানা দলের সৃষ্টি হইতে থাকে, সেই সময়েই তাহার শক্তির সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয় এবং স্বামিজী এই কথাটী খুব চিন্তা করিতেন যে, যাহা একবার কোন্ নির্দ্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর জীবনসঞ্চার করিতে বা অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। তাঁহার মতে 'নির্দ্দিষ্ট আকারপ্রাপ্ত' ও 'মৃত' ইহারা—একার্থক শব্দ। যে সমাজ চিরকালের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যেন যাহার বৃদ্ধিকাল অতীত হইয়াছে এমন একটী বৃক্ষের ন্যায়। উহা হইতে যদি আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, সে কেবল মিথ্যা ভাবুকতামাত্র হইবে, আর স্বামিজী ভাবুকতাকে স্বার্থপরতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কারণ উহা 'ইন্দ্রিয়ের অসংযমজনিত উচ্ছ্বাস মাত্র।'

স্বামিজী জাতিভেদ ব্যবস্থাটীর সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন, বরং সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন। উহাকে মানবজীবনেরই একটী অনিবার্য্য

ব্যাপার বলিয়া দেখিতে পাওয়ায়, তিনি উহাকে শুধু হিন্দুধর্ম্মেরই একটী বিশেষ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। জনৈক ইংরাজকে ভদ্রলোকদের সম্মুখে, তিনি যে এক সময়ে মহীশূরে গোবধ করিতেন একথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়াই স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "লোকের স্বজাতির মতামতই তাহাকে ধর্ম্মপথে রাখিবার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়।" তারপর তিনি দুই চারি কথায় এই দুই প্রকার আদর্শের পার্থক্যের বর্ণনা করিলেন:—এক প্রকার আদর্শ শিষ্ট ও দুষ্টের মধ্যে, অথবা ধার্ম্মিক ও নাস্তিকের মধ্যে কি প্রভেদ তাহাই নির্দ্দেশ করে, আবার অপর এক প্রকার সূক্ষ্মতর নৈতিক আদর্শ আছে, যাহা ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মন দেয়—যাহা আমাদিগের মধ্যে আমাদের সমানপদস্থ অল্পসংখ্যক মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু এই প্রকারের মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে। সন্ন্যাসী জীবনকে শুধু স্বাক্ষিস্বরূপে দেখিয়া যাইবেন, উহাতে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। অনেক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার নিকট এমন সব প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাহা গ্রহণ করিলে তিনি উহাদের অন্যতমের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সে সকলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক—তাহাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে। তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই তৎসম্বন্ধে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এপর্য্যন্ত উহার অতি সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহাকে তিনি অসতী বিধবার পাপাচরণ বলিয়া অভিহিত করিতেন তৎপ্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। তিনি প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, "আর যাহা হয় হউক, ঐটী যেন কদাপি না হয়!" বৈধব্যের শ্বেতবাস, তাঁহার নিকট, যাহা

কিছু পবিত্র ও সত্য, তাহারই চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে কোন শিক্ষাপ্রণালী এই সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না। যাহারা চঞ্চল, বিলাসী এবং জাতীয়তাভ্রষ্ট, শত বাহ্য পরিপাট্য সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার মতে শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি দেখিতেন যে, কোন আধুনিকভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীন কালের ন্যায় একান্ত নির্ভর ও পরম ভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন এবং শ্বশুর-গৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীনকালসুলভ নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন, তাহা হইলেই তিনি, তাঁহার নিকট, "আদর্শ হিন্দু পত্নী" বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক-দেখান ব্যাপার নহে। আর যে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষাপদবাচ্যই নহে।

ভাবী আদর্শ রমণীর গুণাবলীর সূচনা যদি দৈবাৎ কোথাও মিলিয়া যায়, তিনি সর্ব্বদাই তাহার সন্ধানে থাকিতেন। তিনি ভাবিতেন—কতকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইবেই, এবং তৎসঙ্গে অধিক বয়সে বিবাহ ও হয়ত কতকটা নিজের পছন্দ মত পতিনির্ব্বাচন—এ দুইটীও আসিবেই। সম্ভবতঃ ইহাই অন্য সকল উপায় অপেক্ষা বাল্যবৈধব্য-জনিত সমস্যাসমূহের প্রকৃষ্টতর সমাধান করিবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন বাল্যবিবাহ প্রথার উৎপত্তি হয়, তখন সমাজ উহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছিলেন। বিবাহ বিলম্বে হইলে অপর যে সকল দোষের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ঐ উপায়ে তাঁহারা সেইগুলিকে পরিহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণীকে তিনি একেবারে প্রাচীনকালের ধ্যান-শক্তিবর্জ্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মভাব খোয়াইয়া নহে। তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাই আদর্শশিক্ষা হইবে, যাহাতে

সমগ্র সমাজশরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে। আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে উহা প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীতকালের সমুদয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ করিতে সহায়তা করিবে।

অতীতকালের প্রত্যেক জ্বলন্ত উদাহরণটী পৃথকভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছে। রাজপুত-ইতিহাস জাতীয় আদর্শ নারীজীবনের তেজ ও সাহসে ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু ঐ অত্যুষ্ণ দ্রব ধাতুকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। ভারতে যত নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রাণী অহল্যা বাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। একজন ভারতীয় সাধুর পক্ষে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার লোকহিতকর কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া ঐরূপ ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি ভাবী নারীগণের মহত্ত্ব তাঁহার মহত্ত্বের ঠিক প্রতিরূপমাত্র হইবে না ; ইহা তাহাকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আগামী যুগের স্ত্রীগণের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে। পবিত্র শান্তি ও স্বাধীনতার আধারভূতা সাবিত্রী যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই আদর্শ অবস্থা। কিন্তু ভবিষ্যতে নারীগণকে ইহার সহিত মলয়মারুতের ন্যায় কোমলতা ও মাধুর্য্যেরও বিকাশ দেখাইতে হইবে।

নারীগণকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে হইবে, উহার হ্রাস হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম, বা বালিকাবিদ্যালয় ও কলেজের তিনি যে কোন প্ল্যান বা কল্পনা করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদ্বর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত স্থানের ব্যবস্থা থাকিত। তিনি বলিতেন—যাঁহারা তথায় বাস করিবেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যান-সংরক্ষণ এবং পশুচর্য্যা—এগুলি নিত্যকর্ত্তব্যের মধ্যে হওয়া চাই। ধর্ম্ম এবং সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম মধ্যেই যাহার সমধিক বিকাশ দেখা যায়, সেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ—এই নূতন ধরণের ব্যাপার-গুলির অস্থিমজ্জাস্বরূপ হইবে; ইহাদিগেরই আশ্রয়ে ঐ গুলি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। আর এবম্বিধ বিদ্যালয়সকল শীতঋতুর অবসানে তীর্থ-

যাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয় মাস্‌কাল হিমালয়ে থাকিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিবে। এইরূপে এমন এক শ্রেণীর নারী সৃষ্টি হইবে, যাহারা ধর্ম্মরাজ্যে "বাশি-বাজুকদিগেরই"* সদৃশ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহারাই নারীগণের সমস্যার সমাধান করিবে। তাহাদের অন্য কোন গৃহ থাকিবে না; যেখানে তাহারা কাজ করিবে, তাহাই তাহাদের গৃহ হইবে; ধর্ম্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের অপর কোন বন্ধন থাকিবে না; এবং গুরু, স্বদেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ এই তিনের প্রতি ব্যতীত অপর কোন প্রীতি থাকিবে না। তাঁহার কল্পনা কতকটা এইরূপই ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন, এবং তিনি এইরূপেই উঁহা-দিগকে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীতে, তিনি এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন—উহা বল (Strength)। কিন্তু বল কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তিনি কি কঠোর ভাবে বিচার করিতেন! নিজেকে জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস—এ দুয়ের কোনটীর তিনি প্রশংসা করিতেন না। সেই প্রাচীনকালের মৌন, মাধুর্য্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত চরিত্র-সমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না। সেই সঙ্গে আবার বর্ত্তমান যুগে ভারতে চিন্তা ও জ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও সমান অধিকার আছে। সত্যে লিঙ্গবিচার চলে না। যাহাতে আত্মা ও মনের উপর শরীরের

*Bashi-Bazouks—ইহারা খালিফদিগের শরীর-রক্ষক ছিল। বহুকাল যাবৎ এইরূপ প্রথা ছিল যে, যে সকল সৈনিককে তুর্কী গার্ডদলে ভর্ত্তি করা হইত, তাহাদিগকে শৈশবে সকল দেশ ও জাতির মধ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লালনপালন করা হইত। এইরূপে তাহাদের ধর্ম্মে যারপরনাই অনুরাগ ছিল, এবং দেশের ও রাজার সেবাই পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনস্বরূপ ছিল। সমগ্র ইউরোপে তাহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মিশরে নেপোলিয়ন তাহাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন।

বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহে, এরূপ কোন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতিকে তিনি আদৌ সহিতে পারিতেন না। যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্রমনের রমণীসুলভ দুর্ব্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন; এবং আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক এইরূপ উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসার্হ হইবেন।

তিনি স্বভাবতঃই বিধবাগণের মধ্য হইতে প্রথম শিক্ষয়িত্রী-দল সংগৃহীত হইবে, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য দেশের মঠাধিকারিণীদিগের অনুরূপ হইবেন। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও তিনি কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প করেন নাই। তিনি শুধু বলিতেন, 'জাগো! জাগো!' সঙ্কল্পসকল কালে আপনা হইতেই পরিপুষ্ট এবং কার্য্যে পরিণত হয়।"—এগুলি তাঁহারই কথা। তথাপি উপকরণ উপস্থিত হইলে—উহা যেখান হইতেই আসুক না কেন—তিনি উহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। কেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক দৃঢ় ও সরল চরিত্র এবং বুদ্ধি সহায়ে সত্যপথে থাকিয়া আপনাকে উচ্চতম আদর্শের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিতে পারিবেন না —এ বিষয়ে তিনি কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। অসৎকর্ম্ম হেতু মনের উপর বোঝা থাকিলেও তাহা অকপটতা দ্বারা দূর করা চলিবে। নারীগণের উন্নতিবিধায়ক আন্দোলন সম্বন্ধে যিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, এরূপ এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, "সকল উচ্চ উদ্দেশ্যের স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা চাই।" স্বামিজীও স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, এবং ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ করিতেন না। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতাবিকাশের কল্পনা করিতেন, তাহা আন্দোলন, হৈচৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলা— এসকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে। উহা পরোক্ষভাবে, নীরবে এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি সাধিত হওয়া চাই। প্রথমে নারীগণকে সমাজের আদর্শগুলি ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণশালিনী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদেশ ও সুযোগগুলি অধিক

পরিমাণে বুঝিতে থাকিবেন। ঐ সকল নিদেশ পালন করিয়া এবং ঐ সকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয় ভাবাপন্ন হইবেন, এবং উন্নতির এরূপ উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বৈকালী।

(শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ)

এ শীতল, এ বৈকালী—
সাঁঝের জুড়ান ফুল, দিনের নির্ম্মালি,
এ পূজা তোমার লাগিবে কি ভাল, ওগো ভীমা, ওগো কালী ?
দশনে তোমার কেবলি আলোক,
নয়নে সর্ব্ব-দহনপুলক,
লেলিহ রসনা, হে দিক্‌বসনা, আছে চিতানল জ্বালি !

তুমি জীবনের চাহ বলিদান,
বুকের শোণিত করিবারে পান
রক্ত প্রভায়, ওগো মনোজবা, সাজান বরণডালি।
যত বলি আজ পড়েছে মণ্ডপতলে
বর্ণ তাহার বিস্তারে রূপ অস্তাচলে,
যত জবাফুলে নয়নের জলে, দিয়েছ চরণমূলে
রাঙা আকাশের মেঘের ফেণায় চলেছে দুলে,
তারি পরপারে শর্ব্বরী আসে তিমির ঢালি,
শিশিরে ভিজান রজনীগন্ধার বহিয়া ডালি।

আমার দিনের স্বর্ণ কারণে মন্ত্র পড়িনি তোর ?
কক্ষে বক্ষে চম্পা অশোকে গাঁথিনি কুসুমডোর ?
বুকের তপ্ত অলক্তে রাঙা ক'রিনি চরণদ্বয় ?
পুঞ্জে পুঞ্জে মরেনি কি জবা তব মন্দিরময় ?
চিতানলে যত আছিল চেতনা, ভরিয়া নিয়েছি বুক,
যে ধুমে অশ্রুসজল আজিও আশার আগন্তুক !

দিনের তপ্ত মদিরার ধারা নিঃশেষ একেবারে,
শেষ বুদ্বুদ হয়ে গেছে লয় অতলের পারাবারে,
বক্ষের শোণ গুপ্ত প্রবাহ ফল্গুর মত আজ,
কঙ্কাল তনু, প্রাণ বহে তবু একথা মানিতে লাজ,
মৃতকল্পে অর্ঘ্য লবে না, মা, তোমার পুরোহিত,
তার চেয়ে ভাল, মনোমন্থিত নম্র এ নবনীত,
এই পাকাফল, নারিকেল জল, শীতলের এই থালি,
সন্ধ্যা শান্তিজলেতে জীয়ান বিকালের এ শেফালি।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-বেদান্তাম্বুজভাস্করম্।
নমামি যুগকর্ত্তারং আর্ত্তনাথং বীরেশ্বরম্॥

যে মহাপুরুষ জন্মদ্বারা সলিলাম্বরা, শুভ্রতুষার কিরীটিনী ভারত-ভূমিকে গৌরবান্বিতা—অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা বিশ্বকে বিস্মিত—সমাধিপূত অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকের ভাস্বরজ্যোতিতে ঐহিকতা, সঙ্কীর্ণতা, জড়বাদ এবং তাহার ফলস্বরূপ কামকাঞ্চনের সান্দ্রতিমির অপসারিত—তপঃসম্ভূত অমিত তেজের দীপ্ত প্রভায় ধর্ম্মজগৎ উদ্ভাসিত—উন্মার্গগামী, সদাচারভ্রষ্ট, ইহলোকসর্ব্বস্ব

ভ্রান্ত, মূঢ়, বিশ্বমানবের অশেষ কল্যাণকামনায় মহান্ যুগাদর্শকে স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জগৎগুরু আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই আজ অতীতের ঘটনা। কিন্তু পরবর্ত্তী বংশধরগণের আলোচনার জন্য তিনি যে অমূল্য জীবনী রাখিয়া গিয়াছেন, যদিও তাহা আলোচনা করিতে গিয়া বহু মনীষীর প্রতিভাশালী মস্তিষ্ক ভক্তি ও বিস্ময়ে স্বীয় অযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছে তথাপি আমাদিগকে ঐ অলোকসামান্য চরিত্র আলোচনা করিতেই হইবে, কারণ উহা ব্যতীত বর্ত্তমান জাতীয় জীবনসমস্যার মীমাংসা হইবার আর অন্য উপায় নাই।

কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের তদানীন্তন অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্তের ঔরসে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর গর্ভে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারের অন্যান্য বালকগণের মতই তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত General Assembly Institution এ প্রেরিত হন। তাঁহার বালসুলভ চপলতার মধ্য দিয়া প্রৌঢ়ের পরিণত মনের বহুদর্শিতা এবং অলৌকিক ঘটনাবলী ফুটিয়া না উঠিলেও, সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা তাঁহার চরিত্রে বহু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার যুক্তিপ্রবণ মন বিনা বিচারে কিম্বা সন্তোষজনক মীমাংসা ব্যতিরেকে দেশাচার ও লোকাচারসম্মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মগুলি কিছুতেই মানিতে চাহিত না—সময় সময় তাঁহার জননীকে ঐ সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিব্রত হইতে হইত। স্বামিজী বাল্যকালে অতি অশান্ত ছিলেন। যখন তাঁহাকে শাসনবাক্য প্রয়োগে সংযত করা অসম্ভব হইত তখন তদীয় জননী এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহাকে প্রশান্ত করিতেন—"শিব" "শিব" বলিয়া তাঁহার মাথায় কিছু জল ঢালিয়া দিলেই মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় এই উদ্ধত বালক শান্ত হইয়া বসিতেন। পৌত্রকামনায় স্বামিজীর পিতামহী কাশীর ৺বীরেশ্বর সমীপে

হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাঁহার কিছুকাল পরেই স্বামিজীর জন্ম হয়। তাই তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল বীরেশ্বর। আশুতোষ বিল্বপত্র ও সলিলধারায় অভিষিক্ত হইলেই তুষ্ট হন এই বিশ্বাসেই তাঁহার জননী যে ঐ প্রকার অদ্ভুত উপায়ে সন্তানকে শান্ত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। এমন কি সময়ে সময়ে বালকের ঔদ্ধত্যে বিচলিত হইয়া "মহাদেব নিজে না এসে কোত্থেকে একটা ভূত পাঠিয়েছেন"—এবম্প্রকার মন্তব্যও প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার খেলিবার সামগ্রীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছিল একটী শিবমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটির সম্মুখে বসিয়া থাকিতে থাকিতে বালক নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে এমন গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে আসন ত্যাগ করিতে বা চঞ্চল হইতে দেখা যাইত না। বাটীস্থ জনৈক বৃদ্ধা মহিলা তাঁহার অবসরকাল রামায়ণ, মহাভারতাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। বালক নরেন্দ্র-নাথকে অনেক সময়ে এই বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। পুরাণোক্ত উপাখ্যানাবলী যে এই বালকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুদূর অতীত যুগের ধর্ম্মবীরগণের পূত চরিতাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিশুহৃদয়ে না জানি কি ভাবতরঙ্গ উঠিত, যাহাতে তিনি স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডের পর দণ্ড মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। ইহা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিন পিতার বৃদ্ধ শকটচালকের নিকট বসিয়া পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে এই বৃদ্ধ একদিন বিবাহিত জীবনের অশান্তিসঙ্কুলতার এমন একটী জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করে যে, বালক নরেন্দ্র তাহাতে ঐ বয়সেই বিবাহের উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া যান। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি ভিক্ষার্থে কদাচিৎ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাদিগকে আশাতীত ভিক্ষায় পরিতুষ্ট করিতেন। দরিদ্র, অনাথ, রোগী ইত্যাদির যন্ত্রণা ও অভাবদর্শনে তিনি বড়ই

ব্যথিত হইতেন এবং তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে না পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

এইরূপে কালক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলেজে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি, পদক ইত্যাদি লাভ করিবার বাসনা তাঁহার মনে কদাচ স্থান পায় নাই। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থানে তাঁহার মন এতদপেক্ষা অনেক উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিত। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার উদার ও পবিত্র চরিত্র সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং এই কালে তিনি তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণকে নৈতিক চরিত্রগঠন ও শারীরিক বলচর্চ্চায় প্রোৎসাহিত করিতেন এবং তদুদ্দেশ্যে সমিতি ইত্যাদিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সতর কি আঠার বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি যদিও তিনি অধ্যবসায়সহকারে পাঠ করিতেন, তথাপি তাঁহার মন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারিত না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মন যে সত্যলাভের আকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়াছিল এপর্য্যন্ত জগতের কোন গ্রন্থই সে পিপাসাকে তৃপ্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের অন্তরালে এমন কোন মহান্ শক্তিমান্ পুরুষ আছেন কিনা, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জড়সমষ্টি পরিচালিত হইতেছে? এই মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি?—এবম্বিধ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্যপূর্ণ সমস্যাসকল পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মানস-পটে উদিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিত। জড়বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের আলোচিত দর্শনশাস্ত্রসমূহ যুক্তি ও বিচার সহায়ে তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া তাহা অধিকতর জটিল করিয়াছিল মাত্র; স্বামিজীর জন্মলব্ধ অমানব প্রতিভা অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিল কিন্তু তথাপি উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি এতৎসমূহের আলোচনাতেই নিযুক্ত রহিলেন। বিভিন্ন দার্শনিক সত্যসমূহ আলোচনায় সময় সময় তাঁহার

সহপাঠী অথবা অধ্যাপকগণের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইত। উহা ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত যেখানে যুক্তিবিচার কল্পনা আর অগ্রসর হইতে পারিত না; কাজেই সেই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিত না।

এই সময় বাগ্মীপ্রবর বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের প্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। স্বামিজীও এই সময়ে কতিপয় বন্ধুর সহিত একত্রে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং দ্বৈতভাবে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা আধ্যাত্মিক পিপাসা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলেও চরম সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। উৎকৃষ্টতর মতবাদমাত্র অথবা প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইত্যাদিতে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতিলিপ্সু মন পরিতৃপ্ত হইল না। কাজেই যখনই কোন ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্ম বা ঈশ্বরসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, স্বামিজী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" আধ্যাত্মিক তত্ত্বব্যাখ্যাতা ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্ত্তার উদ্গ্রীব মুখমণ্ডলের দিকে বিস্মিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া হাঁ কিম্বা না এতদুভয়ের কোনটীই উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অথবা চর্ব্বিতচর্ব্বণলব্ধ সামান্য জ্ঞানে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। ফলে, প্রত্যক্ষদর্শী একজনও মিলিল না, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আবৃত্তিকারী অথবা পরধর্ম্মছিদ্রান্বেষী জনকতক ব্যক্তির দর্শনলাভ করিলেন মাত্র। ধর্ম্মজগতের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তিনি প্রায় নাস্তিকবৎ হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, ধর্ম্মপ্রচারকগণের তাদৃশ হঠকারিতা কিম্বা পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবল স্রোত কিছুতেই তাঁহার সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে উন্মূলিত করিতে পারিল না। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন—

আবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন তর্ক উপস্থিত হইলে স্বামিজী পাশ্চাত্য সংশয়-বাদী দার্শনিকগণের যুক্তিসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এমনভাবে প্রকাশ করিতেন যে, প্রতিপক্ষকে নিরস্ত হইতে হইত। যদিও এইকালে তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ইত্যাদিতে যোগদান করিতেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণ মন ত্যাগের ও জ্বলন্ত ধর্ম্মবুদ্ধির অভাববোধে ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় তৃপ্তিলাভ করিত না।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার সত্য জানিবার ইচ্ছা ত তৃপ্ত হইলই না বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল মাত্র। নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে বুঝিয়াছিলেন যে তর্কবিতর্ক দ্বারা এই সমস্যা কখনই মীমাংসা হইবার নহে; বুঝিয়াছিলেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এমন এক ব্যক্তির চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন যিনি ঐ সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এই জীবনেই সত্যকে লাভ করিতে হইবে অথবা ঐ চেষ্টায় প্রাণপাত করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় তিনি এবম্প্রকার তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন—যিনি স্বীয় জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন—যিনি জগৎকারণ সেই ভূমাকে জানিয়াছেন—যাঁহার জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি অপরকেও জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত করিতে সক্ষম?

একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণগর্ব্বে গর্ব্বিত 'শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য মনীষিগণের পদানুগ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ - অপরদিকে ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত মোহান্ধগণ লোকাচার ও দেশাচারকেই ধর্ম্মসাধনের মুখ্য উপায় ধরিয়া লইয়া তদনুষ্ঠানপরায়ণ, একদিকে বেদাদি শাস্ত্রনিচয় তথাকথিত পণ্ডিত-গণের বিকৃতব্যাখ্যাকলুষিত—অপরদিকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় জড়-বাদিগণের স্বকপোলকল্পিত কল্পনাসমষ্টিমাত্র, একদিকে কালবশে সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ পরস্পরের আদর্শে ঘৃণা পোষণ করাকেই

স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠার পরিচায়ক মনে করিয়া সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত—অপরদিকে সুযোগ বুঝিয়া বিদেশাগত ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্ব স্ব মত প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত, একদিকে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্মমতসমূহকে কেবলমাত্র ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করতঃ অপরাপর মতসমূহকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণ করিতে নিরত—অপরদিকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুগণ সত্য কি নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এইরূপ সময়ে নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত উপলব্ধিসমূহ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়" সর্ব্বভাবসমন্বিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইলেন। এই অলৌকিক দেবমানব যুবক নরেন্দ্রনাথকে কি প্রকারে আচার্য্য বিবেকানন্দরূপে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও অলোকসামান্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে তদীয় মানসদুহিতা ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য লেখনীও সময়ে সময়ে ভাবাবেগে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছে, যাঁহার পূত চরিতকাহিনীসকল তাঁহার কৃতবিদ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যমণ্ডলী সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সম্যক্ প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ হন নাই—বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষ হইতে যে মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী সংবাদপত্রে প্রবন্ধে, সভা সমিতিতে, পুস্তকে বহুবার আলোচিত হইয়াও চির নূতনই রহিয়াছে—যাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্ত্তাসমন্বিত অপূর্ব্ব উপদেশাবলীর অধিকাংশ পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষিত হইয়াও আজ পর্য্যন্ত জগতের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে, সেই জগদ্বরেণ্য আচার্য্যের চরিত্র ও উপদেশাবলীর সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে এবম্প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করা ব্যর্থচেষ্টা মাত্র। তবে "লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষগণের পবিত্র চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের প্রভূত কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে"—এই মহাপুরুষবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে নরেন্দ্রনাথ শুনিতে পাইলেন যে, কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে রাণী রাসমণির দেবালয়ে এক অদ্ভুতচরিত্র পুরুষ বাস করেন, যিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বালকবোধ্য ভাষায় গল্পে, উপমায় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। কেবল তাহাই নহে, এই ব্যক্তির দেবচরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ধর্ম্মপিপাসুর আধ্যাত্মিক তৃষা তৃপ্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার আজন্ম সত্যানুসন্ধিৎসু মন এই দেবমানবের সন্দর্শনলাভে কৃতার্থ হইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদিন সত্যসত্যই প্রাণের ব্যাকুলতায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সামান্য ব্যক্তির মত ক্ষুদ্র একখানি বস্ত্র কটিদেশে জড়াইয়া এক সদানন্দময় পুরুষ উপস্থিত জনগণকে লক্ষ্য করিয়া অমৃত-মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ ইহা দর্শন করিয়া যে প্রশ্ন তিনি বহুবার বহু ধর্ম্মাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া এবং তাঁহার বিস্ময়কে শতগুণ বর্দ্ধিত করতঃ সস্মিতবদনে মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, "হাঁ দেখিয়াছি; তোমায় যেমন চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছি এর চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে দেখিয়াছি।" নরেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই পুনরায় তিনি বালকের মত সরলভাবে বলিলেন, "আমি তোমাকেও দেখাইতে পারি যদি তুমি আমি যা বলি সেই রকম আচরণ কর।" নরেন্দ্রনাথ কি উত্তর করিবেন, কি জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। অতঃপর তাঁহাকে ঠাকুর একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে নরেন্! তুই এতদিন কোথায় ছিলি? তুই আসবি বলে আমি অনেক দিন অপেক্ষা কচ্ছি, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ একজন যথার্থ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগীর দেখা পেলুম।" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সহিত চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন;

তিনি কিন্তু ঠাকুরের এই ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত ধারণা লইয়াই বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতেই তিনি যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেন, যাহা তাঁহাকে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এই পাগল পূজা-রীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিত। ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুবককে কালে জগতের শত শত ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারীকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। নিজ জীবনে প্রকটিত 'যত মত তত পথ'রূপ সার্ব্বভৌমিক মৌলিক আদর্শপ্রচার-কার্য্যে নরেন্দ্রনাথই সমধিক উপযুক্ত অধিকারী, ইহা বুঝিয়া তিনি অতঃপর এই আজন্মত্যাগী বিবেকবৈরাগ্যপ্রবণ যুবককে বেদান্তোক্ত সাধনমার্গেই পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার বিশেষ কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা নরেন্দ্রনাথ নিজে বিশ্বাস করিতেন না। একদা কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, "কেশবের মধ্যে একটা শক্তি আছে ; নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে।" ইহা শুনিয়া সাধারণ মানব হয়ত অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইত ; কিন্তু নরেন্দ্র-নাথ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "বলেন কি মহা-শয়! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন, আর কোথায় একটা স্কুলের ছোঁড়া নরেন্দ্র, লোক শুনে আপনাকে পাগল বল্‌বে।" ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা কি করবো বল্, মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বল্‌ছি।"

নরেন্দ্রনাথ চিরকাল যুক্তিবাদী, সন্তোষজনক যুক্তি ব্যতীত কিছুই মানিতে চাহিতেন না, অপরকেও মানিতে বলিতেন না—সর্ব্বোপরি, প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম, তিনি এই বাক্যের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্তই দেখিতে পাই-তেন—বহুবার শুনিয়াও তিনি একথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু পরে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক মতসমূহের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় থাকা নিবন্ধন তিনি, অনেক সময়ে ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত বাক্যালাপ, ঈশ্বরীয় রূপদর্শন প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের ভুল বলিয়া উল্লেখ করিতেন, এবং নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর যে সাকারভাবে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। একদিন ঠাকুর কামারহাটীর ব্রাহ্মণী গোপালভাবে সিদ্ধা গোপালের মার সহিত স্বামিজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং স্বামিজীকে গোপালের মার সাধক-জীবনের অপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিবার জন্য আদেশ করিলেন। ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া গোপালের মা সাশ্রুনয়নে ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে তাঁহার অদ্ভুত দর্শনের কথাসকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই প্রথম দিন ঠাকুরের দেহ হইতে গোপালরূপী অপূর্ব্ব বালকের নির্গমন, তাঁহার সহিত গমন এবং একাদিক্রমে ছয় মাস তাঁহার সহিত লীলাভিনয়, আহারের জন্য আবদার—এই সকল শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তিতর্ক ভাসিয়া গেল। কঠোর নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ এই লীলাভিনয় শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোপালের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আমি ত লেখাপড়া জানি না, তোমরা সব জ্ঞানী, আমার এসব কি সত্য?" নরেন্দ্রনাথের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তাঁহার মন তখন বাক্যমনাতীত ভূমাপুরুষের অপূর্ব্বলীলায় ডুবিয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়া কত দিনের কত প্রমাণপ্রয়োগে এবং অবশেষে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ সাকার ভাবের সাধনায় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। একদিকে অসীম গুরুভক্তি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক প্রেমে কৃতার্থ ও তৃপ্ত, অপরদিকে প্রবল জ্ঞানপিপাসা—একাধারে এই জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় আমরা নরেন্দ্রনাথের সাধকজীবনে দেখিতে পাই।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছেন।

এই সময়ে আবার পিতৃবিয়োগনিবন্ধন সাংসারিক নানা প্রকার অভাব অসুবিধা তাঁহাকে যারপর নাই বিব্রত এবং ব্যথিত করিয়া তুলিল। নরেন্দ্রনাথ এই সাংসারিক বিপদ ও ঝঞ্ঝাটে এই সময় দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন—ভক্তের বেদনা ঠাকুর যেন নিজের বুকে অনুভব করিলেন। সাংসারিক অভাবপূরণের জন্য নরেন্দ্রনাথকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইতেছে, কিন্তু কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নরেন্দ্র দুঃখকাহিনীসমূহ ঠাকুরের নিকট নিবেদনকরতঃ যাহাতে একটা উপায় হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে শ্রীমন্দিরে যাইয়া জগন্মাতার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, "তুই যা চাইবি মায়ের ইচ্ছায় তাহাই পাইবি।" নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর আদেশে শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগতিক দুঃখে দৈন্যে বিচলিত হইলেও, পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্যের কামনা কখনও তাহাতে স্থান পায় নাই।

নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন মায়ের ভুবনমোহনরূপে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তরমূর্ত্তি নয়—জীবন্ত প্রতিমা বরাভয়কর বিস্তার করিয়া অসীম অনুকম্পাভরে স্নেহকরুণ হাস্য করিতেছেন। মায়ের কোমলকঠোর বিরুদ্ধভাবদ্বয়সমন্বিত অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে তাঁহার প্রাণমন তৃপ্ত হইল। নরেন্দ্রনাথ দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান ভক্তি প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন "কি চাইলি?" নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। এমন কত দিনের কত ঘটনা, কোনটা ছাড়িয়া কোনটার উল্লেখ করিব! লোকলোচনের অন্তরালে কি অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে গড়িতেছিলেন, তাহা বর্ণনা

করার শক্তি লেখকের নাই। অদ্ভুত ত্যাগীকুলচূড়ামণি সাধক—ততোধিক অদ্ভুত তাঁহার আচার্য্যদেব!

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর পীড়িত,—কাশীপুরে একটী বাগানবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আনীত হইয়াছেন। ত্যাগী বালক ভক্তগণ সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সেবানিরত। নিজ শক্তি শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তিনি যে লীলা সাঙ্গ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সময় একদিন আইন পরীক্ষার নির্দ্ধারিত ফির টাকা জমা দিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ভাবান্তর হইল—অনিত্যের জন্য অযথা আগ্রহ ও শক্তিক্ষয় করিতেছেন বলিয়া হৃদয়ে অসীম বেদনা পাইলেন। অদ্ভুত তীব্র বৈরাগ্যের তাড়নায় উন্মত্তবৎ নরেন্দ্রনাথ একবস্ত্রে নগ্নপদে ছুটিয়া কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সেই দিন হইতে ঠাকুরের অনন্ত করুণা নিঃশেষে অনুভব করিয়া সাধনভজন ও প্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই রজনীযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া সাধনভজন করিতেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া অনন্যমানসে সত্য-স্বরূপকে লাভ করিবার অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণনাতীত! একদিন স্বামিজীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। পরম্পর জানিতে পারা গেল, তিনি তপস্যা করিবার জন্য গৈরিক বস্ত্র-ধারণকরতঃ বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়াছেন। তথায় কিছুদিন কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ যাত্রায় স্বামিজী যেন বুঝিতে পারিলেন, যে অতৃপ্ত পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন এই দেবমানবের অহেতুক কৃপা ব্যতীত সে পিপাসা তৃপ্ত হইতে পারে না। এইবার নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন; সত্য-লাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ তাঁহাকে পরিবারবর্গের অশেষ কষ্ট-সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি উদাসীন করিয়া রাখিল। আহারনিদ্রাদি

বৈধিক ধর্ম্মবিহান হইয়া তিনি ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চা এবং প্রভুর সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদ্ভুত দৃঢ়-নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরু-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষচরিত সমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া মুক্তির নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন; কামকাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তাঁহাদের জপ তপ, সাধন ভজন যা কিছু সবই পরহিতায়, নিজের মুক্তি কিংবা অপর কিছুর কামনায় নহে, এবং তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে বা স্পর্শাদি সহায়ে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন পশুতুল্য মানবহৃদয়কেও দেবভাবে পরিপূরিত করিয়া ধর্ম্মশক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম ছিলেন। স্বামিজীর জীবনে যে এইগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

এক দিন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন। এমন সময় অনুভব করিলেন যে, স্পর্শমাত্রে অপরের মনোরাজ্যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া ধর্ম্মভাববিশেষ সঞ্চার করিবার শক্তি তাঁহার প্রবুদ্ধ হইয়াছে। বালসুলভ চপলতা-বশতঃ তিনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা পরীক্ষা করিতে গিয়া, তাঁহার ধর্ম্মজীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করতঃ শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "না জমতেই খরচ ? আর ওর কি অনিষ্টটা কল্লি বল দিকি ?" তৎপর তিনি সহসা কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই, এই কথা তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এই কালে স্বামিজী যে অসাধারণ অধ্যবসায়, গভীর শ্রদ্ধা ও প্রবল সত্যানুরাগসম্পন্ন হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা উপস্থিত অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদাই অন্যান্য ভক্তগুলার নিকট তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে না; অথচ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ঐ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিতেছিলেন না।

নীরব গভীর রাত্রি। কাশীপুরের উদ্যানবাটীকার দ্বিতল কক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর রোগশয্যায় শায়িত। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। আজ নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, যে কোন উপায়েই হউক নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিবেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে ঠাকুরের কৃপায় সকলই সম্ভব হইতে পারে। সামান্যমাত্র কামনা থাকিলে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে না, তাই ভগবান আজ ভাবী জগদ্‌গুরুর অসীম ত্যাগশক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "নরেন, তুই কি চাস্?" সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সর্ব্বদা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে চাই।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "ও ত ছোট কথা, তোকে কালে সমগ্র জগতে ধর্ম্মদান কর্ত্তে হবে।" ঐ কথা স্বামিজীর মনঃপুত হইল না, তিনি পুনঃ পুনঃ ব্যাকুলভাবে সমাধি-লাভের আশায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সে সমস্ত কথার কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় বলিলেন, "সাধন কর্‌বার সময় আমার অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয়েছিল, তা কোন দিন কোন কাজে লাগেনি, তুই নিবি? কালে তোর অনেক কাজে লাগিবে।" স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, ওতে ভগবানলাভের কোন সুবিধা হবে কি?" ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, "না তা হবে না বটে; কিন্তু ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাক্‌বে না।" কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ত্যাগিশ্রেষ্ঠ নরদেব উত্তর করিলেন, "তবে মশায়, ওতে আমার দরকার নাই।" পরীক্ষা শেষ হইল—নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক ত্যাগশক্তি দর্শনে আনন্দে ঠাকুর বিজয়ী বীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার নির্বিকল্প সমাধি লাভ হউক।" ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক সত্যসমূহ তাঁহার

সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল, দেশকালনিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজ বোধস্বরূপ আত্মা স্ব মহিমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন; নামরূপের গণ্ডী ভেদ করিয়া নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মহারা হইলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া স্বামিজী নিশ্চল, পাষাণবৎ হইয়া ঐ অবস্থায় যাপন করিলেন, তার পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইলেও একটা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায় অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব।" এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্ব্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনুভব করিলেন, জগতের দুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত মোহভ্রান্ত জীবকুলকে স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া উক্ত অমৃত পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে এবং ভারতের অতীত যুগের ঋষিকুলের ন্যায় তাঁহাকেও জলদমন্দ্রে গাহিতে হইবে,—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

এদিকে ঠাকুরের গলরোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভক্তগণ বুঝিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর শীঘ্রই লীলা সাঙ্গ করিবেন। ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্রনাথের সহিত ২।৩ ঘণ্টা কাল রাত্রিতে একাকী যাপন করিতেন। কেন করিতেন, তাহা অদ্যাপি সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, তবে আমরা শ্রুত আছি, এই সময়ে ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণসঙ্ঘ পরিচালন বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার উপদেশাদি প্রদান করিতেন।

এই কালে অন্যান্য বালক ভক্তগণকে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও যে দিন চিন্‌তে পার্‌বে যে আমি কে, সে দিন আর ওর দেহ থাক্‌বে না; এখন সে কথা চাবি দেওয়া রইল, ওর শরীর-মন সহায়ে জগদম্বা অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।" নরেন্দ্রনাথ সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক ঋষি, জীবোদ্ধারের জন্য সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া

আসিয়াছিলেন, ইহাও ঠাকুর ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন। কখনও "শুকদেব", কখনও "শঙ্কর", কখনও বা "নারদ" বলিয়াও অভিহিত করিতেন। এ সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর মধ্যে ঋষির সমাধি-তৃষ্ণা, শুকের মায়া-রাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভক্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল; তাই ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া এক একবার এক এক নামে অভিহিত করিতেন এবং বলিতেন, 'এত বড় আধার আর আসে নাই।'

একদিন কাশীপুর বাগানের খরচপত্রাদির হিসাব লইয়া ত্যাগী বালক ভক্তগণের সহিত গৃহী ভক্তগণের মনোমালিন্যও উপস্থিত হয়। নিরন্তর সেবানিরত ভক্তগণ ঐ ঘটনায় গৃহী ভক্তগণের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সব নিবেদন করিয়া অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, "কারও সাহায্য নেবার দরকার নেই, আমরা ভিক্ষা করে তোমার চিকিৎসা চালাব।" ঠাকুর সজলনয়নে স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "ওরে আমি কি ধনদৌলত চাই? তোরাই আমার সব, তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি সেইখানেই যাব।" ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইলেন যে, যেখানে ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য সেইখানেই থাকিতে তিনি ভালবাসেন! লীলাময় ঠাকুরের পূত জীবনী আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ ও উপদেশাবলী আলোচনা করিলেই ঠাকুরের লীলার কিয়দংশ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে।

যে শক্তি যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহার সমষ্টিস্বরূপ ছিলেন, বহুবার শুনিয়াও এবং বুঝিয়াও স্বামিজী তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। দেহত্যাগের দুই দিন পূর্ব্বে ঠাকুর রোগশয্যায় নিদ্রিত, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ; এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে ঠাকুর যদি নিজে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, তবেই বিশ্বাস করিব,

নচেৎ নহে। অন্তর্যামী ঠাকুর চক্ষু মেলিয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিলেন; দৃঢ় অথচ করুণাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "নরেন এখনও তোর বিশ্বাস হইল না! যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়!" এইবার স্বামিজীর সকল সন্দেহ দূর হইল। তাই তিনি উত্তরকালে জলদমন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্ব্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাম্,
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥

—পত্রাবলী, ২য় ভাগ।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক-দর্শন] [এরিষ্টটল।

শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(Logic—ন্যায় শাস্ত্র।)

দর্শন বলিতে কি বুঝায়, সে কথা এস্থলে একবার স্মরণ করা দরকার। প্রাচীন আর্য্যঋষিরা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া সকল জিনিষের মূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রশ্নও তাই ক্ষুদ্র ছিল না। তাঁহারা এমন এক বস্তু জানিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাকে জানিলে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান জন্মে। প্রাচীন কালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে তত্ত্ব পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের নিকট সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না; তবে একেবারেই যে সে তত্ত্ব তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, একথা মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। জ্ঞানবিশেষ

অপেক্ষা জ্ঞানসামান্তের যে মর্য্যাদা অধিক সে কথা সক্রেটীস প্রথম প্রচার করেন ; প্লেটো সেইটীকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ হইতে জাতি, জাতি হইতে পরতর জাতি, পরতর হইতে পরতম জাতিতে উপনীত হওয়ার প্রণালী অবলম্বনে মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। কেননা, মূলতত্ত্ব তাঁর মতে জ্ঞানস্বরূপ—কল্যাণস্বরূপ। দার্শনিক পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতে পারিবেন, ইহার উপর আর কোন গূঢ়তর তত্ত্বের পরিচয় দর্শন শাস্ত্রে মিলিবে না। কেহ কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন, তিনি সচ্চিদানন্দ—কই প্লেটো ত আনন্দস্বরূপের বিশেষ কোন পরিচয় দেন না, তবে কি বুঝিব সেটী তাঁহার অনুভূতিগম্য হয় নাই? প্রথমদৃষ্টিতে আমাদেরও তাহাই মনে হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে, ওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না—কারণ, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনায় অমরা দেখিয়াছি আনন্দস্বরূপ প্লেটোর উপলব্ধির বিষয় না হইলে তিনি কখনও সৌন্দর্য্যস্বরূপকে মূলপদার্থের সহিত একপ্রকার অভিন্ন মনে করিতেন না। অপর পক্ষে কল্যাণস্বরূপ বিচার কালে সুখদুঃখাতীত আনন্দস্বরূপের পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে প্লেটোর স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়। পরন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে তিনি মূল সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না, যে তত্ত্ব আর্য্যঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সে তত্ত্ব প্লেটো বা অপর কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সুতরাং বুঝা গেল, দর্শনের উদ্দেশ্য মূলতত্ত্ব নির্ণয়। বিশেষ পদার্থ বিজ্ঞান বা দর্শনের বিষয় নয়। ইহা প্লেটো বুঝিয়াছিলেন এবং প্লেটো-শিষ্য (কোন কোন ঐতিহাসিক এই বাক্যে দোষ দেখিলেও আমরা তবু বলিব) এরিষ্টটলও তাহাই বুঝিয়াছিলেন—Science could be only of generals.

কোন কোন পাঠক হয়ত মনে করিবেন, এরিষ্টটলের দর্শন আলোচনায় এসকল অবান্তর কথার প্রয়োজন কি? প্রাচীন ঋষিরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—প্লেটোই বা কি বুঝিয়াছিলেন সে সকল কথার অবতারণার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে, একটু প্রণিধান করিলেই বোধগম্য হইবে।

পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের সামান্যমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, এরিষ্টটলই ন্যায়ের স্থাপনকর্ত্তা। ন্যায় শাস্ত্রের কার্য্য কি?—প্রতিপাদন করা। কি প্রতিপাদন করা? —সত্যাসত্য নির্ণয় করা। এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে একটী প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিতে হয়—তাহাকে ইংরাজি ভাষায় Syllogism বা নিগমনমূলক যুক্তির প্রয়োগপ্রণালী বলে। এই প্রণালী কিরূপ, একটী উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক।

Major premise (সাধ্যাবয়ব)—মানুষমাত্রেই চেতন।

Minor premise (পক্ষাবয়ব)—রাম একটী মানুষ।

Conclusion (নিগমনাবয়ব)—সুতরাং রাম চেতন।

ইহাই হইল এ প্রণালী। এখানে প্রশ্ন উঠিবে, ইহা ত অবরোহণ প্রণালী—ইহার দ্বারা মূল সিদ্ধান্তে পৌছিব কিরূপে? কথাটী ঠিক। নিগমনমূলক যুক্তির বলে ব্যাপক পদার্থ হইতে তদন্তর্গত ক্ষুদ্র বা বিশেষ পদার্থে উপনীত হওয়াই সম্ভব। পরন্তু বিশেষ হইতে জাতি বা পরজাতি হইতে পরতর জাতি ক্রমে আরোহণ প্রণালী অবলম্বনে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নির্গমনমূলক যুক্তির কার্য্য নয়। তবে এরিষ্টটলের বিশেষত্ব কোথায়?

উপরে যে উদাহরণটী দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাই-তেছে, যেটী সিদ্ধান্ত হইল সেটী সাধ্যাবয়বের উপর একান্ত নির্ভর করে। সেটী যদি ভ্রমশূন্য না হয় তবে সিদ্ধান্তে ভ্রম থাকিবেই থাকিবে। তাবৎ সিদ্ধান্তের পক্ষে এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। মনুষ্য মাত্রেই চেতন —ইহাকে আবার প্রতিপাদনের বিষয় করা যাইতে পারে কিন্তু সেটী করিতে হইলেই মনুষ্যকে তদপেক্ষা এমন একটী ব্যাপকতর পদার্থের

অন্তর্গত (যথা প্রাণী) করিয়া লইতে হইবে—যাহার চৈতন্য বিদ্যমান। এই প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যাহা প্রতিপাদ্য অথবা ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়, নিগমনাবয়ব মাত্রেই ব্যাপকতর সাধ্যাবয়বের অপেক্ষা রাখে এবং সেই সাধ্যাবয়বকে আবার প্রকারান্তরে প্রতিপাদ্যের বিষয় করা সম্ভব তখন উহা সাধ্যাবয়বটী আর সাধ্যাবয়ব রহিবে না, তখন একটী নিগমনাবয়ব হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার সাধ্যাবয়ব হইবে—প্রাণী মাত্রেই চেতন। প্রণালী হইবে এইরূপ—প্রাণী মাত্রেই চেতন, মনুষ্য প্রাণী, সুতরাং মনুষ্য চেতন।

এখন আর একটী প্রশ্ন উঠে, এই যে প্রণালী ইহার মূল কোথায়? মূল নিরপেক্ষানুভূতি (Immediate knowledge.) নিরপেক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধ বলিব কেন? কারণ ইহাই যুক্তির মৌলিক নিয়ম—চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপে প্রবাহিত হইতে পারে না। যাহার উপর বা যে সাধ্যাবয়বের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি-প্রণালী সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইবে সেটী যদি প্রতিপাদ্য হয়, তাহা হইলে সেটী আর মূল সাধ্যাবয়ব রহিল না। মূল সাধ্যাবয়ব যেটী হইবে সেইটীকে আর প্রতিপন্ন করা অর্থাৎ যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। মূল সাধ্যাবয়ব আর মূলতত্ত্ব একই কথা। কোন দার্শনিক এরিষ্টটলের ন্যায়দর্শনকে কেবলমাত্র প্রমাণ-প্রয়োগ-প্রণালী-বিষয়ক বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, এরিষ্টটলের ন্যায়দর্শনকে ঐ আখ্যা প্রদান করিলে তাঁহার মর্য্যাদাহানি করা হয়। মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান ঐ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—যুক্তির প্রয়োগপ্রণালী বিচার করা গৌণ উদ্দেশ্য।

প্লেটো-দর্শন আলোচনাকালে অনেকেই মনে করিবেন, এবং সে কথা প্রথমে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, প্লেটো দুইটী পৃথক জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—একটী ভাবজগৎ বা জাতি, অপরটী প্রত্যক্ষ জগৎ বা বিশেষ এবং উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ প্লেটো উহাদের সম্বন্ধবিচার কার্য্য অসম্পূর্ণই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই বলিয়া সে সম্বন্ধের আভাষ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনে পাওয়া যায় না এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। সেই আভাষের কথা আমরা প্লেটো-দর্শনালোচনায় অল্পবিস্তর উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধের সম্যক্ বিচারে এরিষ্টটলই প্রথম প্রবৃত্ত হন এবং তিনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই প্রত্যক্ষ জগৎ সেই ভাবজগতের সহিত গভীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ--নিগমনাবয়ব যেমন সাধ্যাবয়বের সহিত অচ্ছেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ সেইরূপ বিশেষ পদার্থমাত্রেই জাতির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

এতক্ষণে বুঝা গেল, ন্যায়দর্শন বলিতে কি বুঝায় সে কথা বিচার করা আমাদের কেন প্রথমেই প্রয়োজন হইয়াছিল। এরিষ্টটলের মতে এই যুক্তিপ্রণালী অজ্ঞাত থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে মূলসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইল তাহাতে কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন, এরিষ্টটলের মতামত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইল না। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষ পদার্থের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া দর্শনশাস্ত্র ও তদন্তর্গত ন্যায়শাস্ত্র গঠিত করিয়াছিলেন। এমন কি, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ভাবজগৎকে কাল্পনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া বাস্তব-জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন করাই তাঁর (এরিষ্টটলের) উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে কথা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্লেটো যে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যাহা স্থির করিয়াছিলেন, সেই দুইটী বিষয়ে এরিষ্টটলের মতানৈক্য ছিল না, এটী সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। সাধারণ বিষয়ের জ্ঞানলাভই দর্শনের উদ্দেশ্য, এই কথা এরিষ্ট-টলের মতানুযায়ী হইলে ভাবজগৎকে উপেক্ষা করা চলে না, অস্বীকার করা ত দূরের কথা। পক্ষান্তরে উহাকেই প্রত্যক্ষ জগতের মূলভিত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

সৎকথা।

যিনি ভগবানকে চান তিনি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাপুরুষগণকেও মান্‌বেন। কারণ এঁরা হ'লেন মহা মহা জ্ঞানী—ভগবানের দর্শন লাভ করেছেন। এঁদের মেনে চল্‌লে, শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌লে, হিংসা দ্বেষ চলে যাবে, দুঃখ দূর হবে এবং ভগবানকে বুঝ্‌তে পারবে।

*　　*　　*

যার যা ভোগ আছে ভুগ্‌বেই, বাধা দিলে কি হবে? মাঝে থেকে অপরের বিষনজরে পড়া। ভগবানকে নিয়ে পড়ে থাক, তাহলেই কল্যাণ হবে।

*

যার হবার তার হবেই। যে ভগবানকে চায়—সে তাঁকে ডাক্‌বেই, যে চায় না, সে কেন ডাক্‌বে?

*　　*　　*

লেখা পড়া শিখে, ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে শিক্ষালাভ না কর্‌লে, লেখা পড়া সমস্তই বৃথা।

*　　*　　*

উদ্দেশ্যহীন জীবন অতি খারাপ। মানুষের একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উদ্দেশ্য না থাক্‌লে উন্নতি হয় না। লক্ষ্য স্থির করে একটা কাজে জোর করে লেগে থাক্‌তে হয়। তবে যাঁর উদ্দেশ্য যত মহৎ, তিনি তত বড়।

*　　*　　*

সংসারে ছেলে মেয়ে, ধন দৌলত সব আছে, অথচ যাঁর ভগবানের অভাব বোধ হয়, তিনিই ভাগ্যবান্ পুরুষ।

*　　*　　*

ভগবানের মায়া বুঝা কঠিন। ক্ষুদ্রজীব হয়ত মনে করে—

লাফিয়ে গাছে উঠি, চন্দ্র সূর্য্য ডিঙ্গিয়ে যাই। কিন্তু তারা বুঝে না, ভগবানের দয়া ব্যতীত কিছু হয় না। তাই ত জীবের এত দুর্দ্দশা। তাঁকে ছেড়ে কি কোন বড় কাজ হয়?

* * *

যে ভয় করে, সংশয় করে তার কি সংসারে, কি ধর্ম্মজগতে কোথাও উন্নতি হয় না। এতে মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যিনি সত্য লাভের জন্য জগৎ আছে কি না আছে গ্রাহ্য না করে অগ্রসর হন, তিনিই বীর, তিনিই শ্রেয় লাভ করেন।

* * *

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, মুক্তিদাতা, কর্ত্তা, বিধাতা, তিনিও সংসারে জন্মগ্রহণ করে পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণ করেছিলেন। হে জীব, তোমরাও পিতামাতাকে ভক্তি কর, পূজা কর। যে পুত্র ঐরূপ করে সেই ভাগ্যবান।

* * *

খাওয়া পরার কষ্ট না হলেই হল। অর্থ বেশী হলে ভগবানের স্মরণ মননে বাধা উপস্থিত হয়। দু'চার জন এমন ভাগ্যবানও থাকেন যাঁরা বুঝতে পারেন অর্থই অনর্থ ঘটায়। আর অর্থ দিয়ে পরিবার বল, ভাই বল, বন্ধু বল তাদের কিছুতেই মন যোগাতে পারবে না। অর্থের আকাঙ্ক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল।

* * *

গুরুবাক্যে সংশয় করলে কখনও ধর্ম্ম হয় না। একজনের উপর নির্ভর করা কি কম কথা? সুখ আসুক, দুঃখ আসুক গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে চল্‌তে হবে—তবেই মঙ্গল।

* * *

চরিত্রহীন হলে কি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা যায়? ভগবান্ বল্‌ছেন, "হে জীব, সৎ হও, পবিত্র হও, চরিত্রবান্ হও, তবে তুমি আমাকে বুঝ্‌তে পারবে।" চরিত্রহীন হলে শাস্ত্র পুরাণাদির কথা বুঝ্‌তে পারা যায় না—সেই জন্য লোকে ওসব গল্প গুজব মনে করে। তবে সাধন

ভজন, তপস্যাদি কর্‌লে ঐ সকলই আবার সত্য, প্রত্যক্ষ বলে মনে হবে।

* * *

মতামত মানুষে করে। মতামতের ভিতর ভগবান্ নাই।

* * *

যে ঠিক ঠিক সাধু হবে তার কোন স্বার্থ থাক্‌বে না। ভগবানের প্রতি কি করে ভক্তি শ্রদ্ধা হবে এইটুকু মাত্র স্বার্থ তার মধ্যে থাকে। সংসারের ঝঞ্ঝাট তার ভাল লাগে না, শান্তি পাবার জন্যই সাধু হয়।

* * *

পাশ করে ভাল চাকুরী না জুটলে যেমন সমস্তই বৃথা তেমনি আবার লেখা পড়া শিখে যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না হয় তার লেখা পড়া সমস্ত বৃথা।

* * *

যেখানে মেয়েদের ব্যাপার সেইখানেই গোলমাল; সেইজন্য সাধু ভক্ত, যারা ভগবান্ লাভ কর্‌তে চায়, তারা ঐ সব থেকে দূরে থাক্‌বে।

* * *

সকলের ভেতর ভগবান্ আছেন। তোমার ভিতরও কি ভগবান্ নাই? আমরা বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। তিনি বলেছেন, আমি হচ্ছি পূর্ণ, আর সব আমার অংশ।

*

সৎ লোকের সহিত সৎ আলাপ কর্‌লে ভগবান্ খুসী হন। তাতে সৎবুদ্ধি হয়। বদ্ লোকের সহিত—অর্থাৎ ভগবানে অবিশ্বাসী লোকের সহিত আলাপ কর্‌তে নেই, তাতে অসৎ বুদ্ধি জন্মায়। তাঁকে ভুলে যেতে হয়।

* * *

যেমন করেই হোক, সৎ হতেই হবে, তা যে ধর্ম্ম পালন করেই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

যার ধর্ম্মভয় আছে, ভগবানকে ভয় করে, সে ত সৎলোক, কটা লোক ঐরূপ হয়।

* * *

মায়া দুই রকম—সৎ ও অসৎ। সৎ মায়া কেমন?—এতে জগৎ মিথ্যা, ভগবান্ সত্য, তিনি সত্যস্বরূপ বলে বোধ হয়। কি করে ভগবানের স্মরণ মনন কর্‌বে, কি করে তাঁর পূজা কর্‌বে, এই তার চিন্তা হয়।

অসৎ মায়া কেমন?—ভগবান্ মিথ্যা, জগৎ সত্য বলে মনে হয়। অসৎ মায়াতে জীব কষ্ট পায়।

সমালোচনা।

ধম্মপদ—(মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ)। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২০১নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২৲ টাকা।

হিন্দু আমরা সচরাচর পুরাণ এবং বেদান্তাদি দার্শনিক গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের যে সমালোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের একটা ধারণা করিয়া থাকি, কিন্তু এ ধারণা যে অতি অসম্পূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, কোন্ ধর্ম্ম বা দার্শনিক সম্প্রদায়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে গেলে তত্তৎসম্প্রদায় নিজেরা নিজেদের যে বর্ণনা করেন, তাহা না শুনিয়া বিরুদ্ধবাদীর (তিনি যতই উদারভাবাপন্ন হউন না কেন) কথায় তাহার সঠিক ধারণা হয় না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে হইলে উহার মূলগ্রন্থের সহিত আমাদের

পরিচিত হওয়া অতি প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতে একদিন কত নূতন নূতন সৎকার্য্যের সূচনা হইয়াছিল, যাহার ফলে ভারতীয় সভ্যতা কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার তত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ নানা পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া চর্চ্চা করিতেছেন, আর আমরা আমাদের দেশের এত বড় একটা জিনিষকে এতদিন ধরিয়া অতিশয় অবহেলা করিয়া আসিতেছি—ইহা কি আমাদের পক্ষে অতিশয় লজ্জা ও নিন্দার বিষয় নহে ?

শ্রীযুত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে পালিভাষায় রচিত অসাম্প্রদায়িক নীতিভাবপূর্ণ ধম্মপদ গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া আমাদের এই কলঙ্ক কিয়ৎপরিমাণে মোচন করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমরা কয়জন তাঁহার প্রদর্শিত পথে অন্যান্য বৌদ্ধ পালি গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি ? এ কার্য্য যতদূর কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তত কঠিন নহে। পালিভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য—যিনি সামান্য সংস্কৃত জানেন, তিনিই একটু চেষ্টা করিলেই পালি বুঝিতে পারেন। যাঁহারা চারুবাবুর ধম্মপদখানি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন।

যাহা হউক, হিন্দুর গীতার ন্যায়, সমগ্র বৌদ্ধদের শুধু তাহাই নহে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর,—উহা পরম আদরের গ্রন্থ- এই ধম্মপদের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। বিশেষতঃ, এ সংস্করণে ইহার অন্তর্গত সমুদয় শ্লোকগুলির একটী বর্ণানুক্রমিক সূচী সংযোজিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক শ্লোক কোন স্থানে কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকায়, পুস্তকখানির মূল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ফুটনোটে এবং পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি সাক্ষাৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের উক্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্র ত্রিপিটক সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামক তিন পিটকের মধ্যে ইহা

সূত্র পিটকের অন্তর্গত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় ইহার একটী উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। এই সংস্করণে ঐ টীকার অর্থের বিশেষ ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর হইয়াছে। গ্রন্থ-প্রারম্ভে বিখ্যাত পালিভাষাবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কৃত একটী উৎকৃষ্ট ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত অংশটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই সংস্করণটী যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা নিঃসঙ্কোচে প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠককে এই গ্রন্থ এক একখানি গৃহে রাখিয়া পাঠ করিতে বলি।

সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের একটী অনুরোধ—আমরা ইহার কয়েকটী শ্লোক বেশ করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি—আগামী সংস্করণে আর একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিলে ভাল হয়। অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যে এইরূপ সম্পাদন—তার উপর গ্রন্থক্রেতৃবর্গের তাদৃশ প্রাচুর্য্য না থাকায় উপযুক্তমত অর্থব্যয়ের অসামর্থ্য—ইত্যাদি কারণে ইচ্ছা থাকিলেও বাঙ্গালা গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিসম্পাদন এক কঠিন ব্যাপার, ইহা আমরা জানি। তথাপি আমরা প্রার্থনা করি, তৃতীয় সংস্করণটী শীঘ্র বিক্রীত হইয়া যাউক এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ চতুর্থ সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হউক।

ঋগ্বেদসংহিতা—মূল সায়নভাষ্য এবং উহাদের বঙ্গানুবাদসহিত বেদোদ্বোধিনী সমিতি, ১১২ নং, হাউজকটরা, পাথরগলি, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ৷৷৹ আনা। ১২ খণ্ড ৫৲ টাকা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম দুই খণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলাম - এক্ষণে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডেই সায়নভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত-প্রকরণ শেষ হইয়াছে এবং মন্ত্র আরম্ভ

হইয়াছে। প্রথমে মন্ত্র, পরে পদপাঠ, অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, মন্ত্রের অর্থ, বেদোদ্বোধিনী নাম্নী সরল সংস্কৃত টীকা, সায়নভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে বৈদিক দুরূহ শব্দের টিপ্পনী, মধ্যে মধ্যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ও বিভিন্ন নিরুক্তকারগণের মত ও স্থানে স্থানে নিরুক্তকারের বিশেষ ব্যাখ্যা—এই ভাবে প্রতি মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইতেছে। মোট কথা, যাহাতে বিশদরূপে বেদের তাৎপর্য্যগ্রহ হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ বিস্তৃতভাবে বেদের মূল ও ভাষ্যের অনুবাদ কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই

বঙ্গভাষার বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা এরূপ বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিতেছে এবং বঙ্গভাষাভাষীর জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে। অন্যূন একশত খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। আমরা জানি, কয়েক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই সৎকার্য্যের উদ্যোক্তা। কয়েকজন সহৃদয় ধনী এক এক খণ্ডের মুদ্রণভার লওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ-প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। যাহাতে অর্থসাহায্যাভাবে গ্রন্থ-প্রকাশকার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায়ই বন্ধ না হইয়া যায়, তজ্জন্য দেশের ধনিবর্গের অগ্রসর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এক একজন যদি এক এক খণ্ডের প্রকাশার্থ ২০০৲ টাকা মাত্র দেন, তবে এ কার্য্য অতি সহজ হইয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ও অন্যান্য বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে বদ্ধপরিকর সাহিত্যসমিতিসমূহ এবং সনাতনধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত বঙ্গীয় ধর্ম্মমণ্ডলী সমুদয়েরও এই কার্য্যে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

বেদোদ্বোধিনী সমিতি শুধু বেদ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বাঙ্গালীর ছেলেরা যাহাতে বেদ বুঝিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা কয়েকটীকে বেদ পড়াইতেও আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা বাঙ্গালাদেশে যেখানেই কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা আছে, তথায়ই বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অবিলম্বে আরব্ধ হউক। কেবল দর্শন, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ন্যায়ের চর্চ্চায় সংস্কৃত শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। হিন্দুর সকল জ্ঞানের মূল এই বেদ। বেদ আয়ত্ত না হইলে হিন্দু-

ধর্ম্মের মূল ভিত্তিই বুঝা যায় না। হিন্দুসমাজের ক্রমপরিণাম বুঝিতে হইলে, পুরাণের মূল জানিতে হইলে, স্মৃতিসমূহের শ্রুতিমূলকতা বুঝিতে হইলে বেদাধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। আমাদের দৃঢ় ধারণা, বঙ্গদেশে লুপ্ত বৈদিক জ্ঞানের পুনঃপ্রচার হইতে আরম্ভ হইলে বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মসমাজসমূহে বিপুল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অতএব যাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান জড়তা ভাঙ্গিয়া উহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে বেদপ্রচার উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্গদেশে বেদপ্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা স্বামিজীকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা নানারূপে করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বামিজীর বিশেষ অভিপ্রেত এই বেদ-প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করা বাঞ্ছনীয় নহে কি?

দুঃখের বিষয়, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বেদ লইয়া সারাজীবন কাটাইয়া গেলেন কিন্তু যাহাদের ইহা নিজেদের জিনিষ তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের দেশের লোকে এই বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইলে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মেমোরিয়াল।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বিগত ১১ই ডিসেম্বরের দরবার-বক্তৃতাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উল্লেখ করিয়া এমন কতকগুলি উক্তির প্রচার করেন যাহাতে অনেকস্থলে লোকের মনে মিশন সম্বন্ধে অনর্থক সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ কথা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে সাধারণের ঐরূপ ভ্রম নিরসন হইতে পারে তাহা প্রার্থনা করিয়া বিগত ২২শে জানুয়ারী তারিখে

উক্ত গভর্ণর সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পাঠাইয়াছিলেন :—

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতাতে দেশের জনহিতকর ও লোক-সেবাব্রতী মণ্ডলীদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট উল্লেখ করায় যে সম্মান ও উৎসাহ দান করা হইয়াছে তজ্জন্য মিশন তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু গভর্ণর বাহাদুরের সকল কথাগুলির যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মিশন যে সরকার বাহাদুরের সন্দেহভাজন হইয়া উঠিয়াছেন—অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং অনেক স্থলেই মিশনের কার্য্যের জন্য অর্থাদি দান বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে মিশনের পরিচালিত সৎকার্য্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ মিশনের অন্তর্ভুক্তগণের—(তালিকা অনুসারে ৭৮ জন সাধু সভ্য, ১২১ জন গৃহস্থ সভ্য ও ২ জন এসোসিয়েট্‌ সভ্য) সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান্‌ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহই রাজনীতিক বা অপর অপরাধে দোষী নহেন এমন কি কোনও অবৈধ আন্দোলনাদিরও প্রশ্রয়দাতা নহেন। অপরপক্ষে মিশনে যোগদান করিবার পূর্ব্বে কাহারও জীবনে কোনও দোষের সংস্পর্শ ছিল, কিন্তু এখন নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত যদিও বা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মিশন কেন, কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় এরূপ প্রবেশার্থীকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে তাহাদের জীবন মহৎ সঙ্কল্প ও সাধনার দ্বারা মিশনের আদর্শে গড়িয়া উঠে, সে চেষ্টায় মিশন কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

বক্তৃতার যে অংশে লাট বাহাদুর বলেন যে, অসৎ ও ক্রূরকর্ম্মা রাজনীতিক ষড়যন্ত্রকারিগণ রামকৃষ্ণ মিশন বা ঐরূপ কোনও সৎ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত মণ্ডলীর নাম গ্রহণ ও তাহার সহিত সংযোগ স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে এবং সুকুমারমতি যুবকগণকে বিপথে লইয়া যায়—সেই অংশ লইয়াই লোকে সন্দেহবহুল অর্থ করিয়া বসিয়াছে এবং মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষিগণেরও মনে দ্বিধার সঞ্চার হইয়াছে। পূর্ব্বে

যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মিশনের প্রকৃত সভ্যগণের মধ্যে কাহারও উপর রাজনীতিক অভিযোগ আনা যায় না। কখনও কখনও দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতিতে আর্ত্তসেবা কার্য্যে বিশেষ বিস্তার ঘটিলে মিশনকে বাহিরের লোকের মধ্য হইতেও স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করিতে হয়। মিশনের সহিত এই সকল সেবকের সংযোগ নিতান্ত সাময়িক এবং মিশনের কোনও কার্য্যে ইহাদের স্ব-কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এ অবস্থায় তাহাদের কোনও স্বতন্ত্র ও গুপ্ত আচরণের দ্বারা তাহারা যদি পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া থাকে তবে সে সন্দেহের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে দায়ী ভাবা উচিত নহে। এই সকল সাময়িক সেবকগ্রহণ সম্বন্ধে মিশনের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আরও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করার সুযোগ ও সুবিধা অত্যন্ত অল্প। প্রথমতঃ, মিশন যে আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন ও প্রচার করেন, তাহার সহিত কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের কোনও সম্পর্ক নাই—ইহা মিশন হইতে পরিচালিত সাময়িক পত্রাদি অথবা মিশন হইতে প্রকাশিত বিবিধ পুস্তকাদি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এমন কি ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে এ সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট মিশন একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মিশনের শাসন ও পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে কতিপয় পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকায় বাহিরের কোনও লোকের পক্ষে অথবা নূতন কোনও সভ্যের পক্ষে মিশনের কার্য্যের মধ্যে হঠাৎ কোনও নূতন উদ্দেশ্য বা প্রণালীর সন্নিবেশ বা প্রবর্ত্তন করা একেবারে অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্র সর্ব্বদাই সরকারী ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্যে সর্ব্ব-প্রকার সুবিধা ও সাহায্য করিয়া থাকেন।

কোনও সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠানের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নাম

সংযুক্ত থাকিলেই উহা যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃত্বাধীনে, ইহা ভাবা সঙ্গত নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে এ দেশের একজন মহাপুরুষ ছিলেন, অতএব সকলেরই নিজ নিজ সদনুষ্ঠানে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিবার অধিকার আছে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন যেরূপ আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহা তাহার রেজিষ্ট্রীকৃত নিয়মাবলীতে ও রিপোর্টাদিতে স্পষ্টই প্রকাশিত রহিয়াছে। এ সমস্তই আবেদনের সহিত দাখিল করা হইল। বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রতি গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সহায়তার দৃষ্টান্ত এই স্থলে উল্লিখিত হইল।

পরিশেষে যাহাতে ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর বাহাদুর যে কোনও ভাবেই হউক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সাধারণের পূর্ব্বোক্ত দ্বিধা ও সন্দেহের নিরসন করিয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইল। এবং মিশন সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আবেদনে সন্নিবেশিত করা হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ জানিবার থাকিলে সাক্ষাতে বা পত্রাদিদ্বারা মিশনের কর্তৃপক্ষ তাহা সরকার বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিতে প্রস্তুত, ইহাও জ্ঞাপন করা হইল।

এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে লর্ড কারমাইকেল মিশনের সেক্রেটারীকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লর্ড কারমাইকেলের পত্র।

গবর্ণরের ক্যাম্প।
বেঙ্গল, ২৬শে মার্চ্চ ১৯১৭।

মহাশয়,

আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব কিরূপে হইল, উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

কি, এ বিষয় আমাকে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কিছু দিন পূর্ব্বে মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে যে মেমোরিয়াল পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে মিশন যে সৎকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, বিগত ডিসেম্বরের দরবারে মিশন সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা যে কোনওরূপে তাহার সঙ্কোচজনিত ক্ষতির কারণ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। মিশন ও মিশনের সভ্যগণের উপর অভিযোগ আনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা আমি জানি, আপনিও বুঝিয়াছেন। আমি জানি, মিশনের কাজ সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক-অভিপ্রায়-শূন্য এবং ইহার জনসমাজের সেবা-কার্য্য সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই। আমি যাহা জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এই—লোকহিতৈষণা ও লোকসেবার যে সব কার্য্যে মিশন ব্রতী, বিপ্লবকারীদের একদল সেইরূপ কার্য্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজেদের গর্হিত দুরভিসন্ধির আবরণরূপে অবলম্বন করে,—অভিপ্রায়, মিশনের সহিত তুল্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদিগকে নিজেদের দলে আকৃষ্ট করা এবং সেই আদর্শকে স্বাভিপ্রায়সিদ্ধির অনুকূলে বিকৃত করা। এইরূপ অসদভিপ্রায়ে মিশনের নাম ও সুযশ অকুণ্ঠিতভাবে স্বকার্য্যসাধনে নিয়োজিত করা হইতেছে।

প্রকৃত রামকৃষ্ণ মিশনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহার সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কেবল মিশনের নামের যে অযথা ব্যবহার করা হইয়াছে, আমার ইচ্ছা উহা নিবারণ করা। আশা করি, দ্বিধাহীন দুষ্কৃতকারীদের এই অন্যায় আচরণ হইতে সাবধান থাকিবার পক্ষে আমার কথিত বাক্যগুলি মিশনের সাহায্যে আসিবে। ইতি—

ভবদীয়

কারমাইকেল।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্থানীয় ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র পল্লিবাসিগণকে সেবা করিবার জন্য একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে। মঠেরই জনৈক সন্ন্যাসী আগত রোগিগণকে অবস্থামত ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

মঠের আশপাশের পল্লীসমূহ অতীব অস্বাস্থ্যকর; উহাদের প্রত্যেকটীকে এক একটী ম্যালেরিয়ার ডিপো বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অথচ গঙ্গার ধারে চটকল প্রভৃতি থাকায় গরীব শ্রমজীবীদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য ঐ সকল পল্লীতে বাস করিতে হয়। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া পীড়িত হইলে ঔষধাদির জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। সেই জন্য ঔষধাভাবে প্রায়ই সামান্য ব্যাধি পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে। ইহাদের এই অভাব মোচন করিতে হইলে অনেকগুলি দাতব্য ঔষধালয়ের প্রয়োজন। যাঁহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় জানেন তাঁহারাই আমাদের এই মত সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই।

এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া প্রথমতঃ মঠ হইতে জানা শুনা দুই চার জনকে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের ব্যবহারের সামান্য ঔষধ হইতেই চিকিৎসা করা হইত। কিন্তু এইরূপে দুই চারি জন করিয়া ঔষধপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে—উহাদের জন্য দাতব্য ঔষধালয়রূপে একটী স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে রোগীর সংখ্যা কত এবং বৎসর বৎসর উহাদের সংখ্যা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা ইং ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালের সংখ্যা তুলনায় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে। ১৯১০ সালে ৭৩১ জনকে ঔষধ দেওয়া হয় এবং ১৯১৬ সালে ১০,৪৭০ জন ঔষধ লইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৪০ জন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এরূপ গরীবও থাকে যাহাদিগকে পথ্যাদিও

দিতে হয়। বর্ত্তমানে ঘুসুরি, বালী প্রভৃতি ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত পল্লী হইতেও ঔষধ লইতে আসে। লোকের একটা ধারণাই হইয়া গিয়াছে যে, সাধুদের নিকট হইতে ঔষধ লইলে তাহারা শীঘ্র আরাম হইয়া যাইবে। ইহাও সংখ্যাবৃদ্ধির একটী কারণ।

যাহা হউক এতাবৎ কলিকাতার সুবিখ্যাত, দানশীল মেসার্স বটকৃষ্ণপাল এণ্ড কোং বিনামূল্যে সকল প্রকার ঔষধাদি দান করিয়া আতুরের সেবায় সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও পূর্ব্ববৎ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু রোগীর সংখ্যা যেরূপ বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে একব্যক্তির পক্ষে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। আর এরূপ কার্য্যের স্থায়িত্ব সাধারণ সহানুভূতি ব্যতীত অসম্ভব। সেইজন্য আমরা এই সদনুষ্ঠানের জন্য পরদুঃখকাতর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

অর্থ, ঔষধ কিম্বা কোনরূপ পথ্য হউক, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ আঃ বেলুড়, হাওড়া, এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

গ্রীষ্ম-সম্মেলন, দার্জ্জিলিং :—গ্রীষ্মকালে য়ুরোপ ও আমেরিকার স্থানে স্থানে সাময়িক বিদ্যালয় ও বিদ্বৎ-সম্মেলনাদি স্থাপন ও সংগঠনপূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা হইয়া থাকে। এ বৎসর ইহাদের আদর্শে ২১শে মে হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে একটি গ্রীষ্ম-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া সমাজের সকল শ্রেণীর লোক,—য়ুরোপীয়, ভারতবর্ষীয়, সরকারী, বে-সরকারী কর্ম্মচারিগণ মহিলা ও পুরুষ স্বীয় স্বীয় গুরু কর্ম্মভার হইতে অবকাশ ও স্বাধীনতা ভোগ করেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য এই যে, সেই সময়টুকুর মধ্যে তাঁহারা শিল্প, কলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের নানা সমস্যা ও অভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানা-

দিতে যোগদান করতঃ এই দেশের অবস্থা বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নানা সমস্যার প্রতি নূতন নূতন তত্ত্বদৃষ্টির প্রয়োগ করিতে উৎসাহিত করা এবং নানা কর্ম্মীর কর্ম্মের মধ্যে একই সাধারণ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করাও এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। দেশের চিন্তা ও সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ায় এবং পরস্পরের অভাব উদ্দেশ্যাদির সহিত পরিচিত হওয়ার অতি অল্পই সুযোগ ঘটে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে যাহাতে তাঁহাদের চিন্তার আদান প্রদান হয় সে জন্য তাঁহাদিগকে একস্থানে সমাবেশ করাও এই সম্মেলনের আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। ভারতীয় মানবজীবনের বিচিত্র প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিয়া জীব-তত্ত্ব (Biology) সম্বন্ধে এবং ভারতীয় সহর ও পল্লীর প্রয়োজনাদি লক্ষ্য করিয়া পৌরনীতিশাস্ত্র (civics) সম্বন্ধে অধ্যাপক গেডীস (Prof-Geddes) পর্য্যায়-ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষা-সংস্থান, শাসনতন্ত্র ও ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি মানবজীবনের সমস্ত সাধনার পক্ষে জীবতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের তথা চরিত্রনীতি ও মনুস্তত্ত্বের জ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিবেন। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার পি, সি, রায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিদ্বদ্বৃন্দ এই সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূচনা করিবেন। বক্তাগণ কেহই এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না, তবে এই সম্মেলনের সমাবেশসূত্রে যে ব্যয় হইবে, আশা করা যায় যে তাহা সভ্যগণের প্রদত্ত অর্থ হইতে সঙ্কুলান হইয়া যাইবে। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভ্যগণের ফি উপর্য্যুক্ত সময়ের জন্য ১০৲ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য অর্দ্ধ-মূল্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে অর্থাভাবে ও অসময়ে উহা বন্ধ করিতে না হয় এজন্য পূর্ব্ব হইতেই একটি 'গ্যারাণ্টি ফণ্ড' স্থাপন করা হইয়াছে—ইহা হইতে অর্থ

গ্রহণের প্রয়োজন না ঘটিতেও পারে। সকলকে এই সম্মেলনে যোগদান করিতে আমরা আহ্বান করিতেছি। এই কার্য্যে যিনি যেরূপ সহায়তা করিতে বা পরামর্শ দিতে চান অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা নিম্নলিখিত সম্পাদকবর্গের নিকট পাঠাইবেন।—অধ্যাপক এস্, সি, মহলানবীশ, ডীন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা। স্বামী সারদানন্দ ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা। ডব্লিউ, আর, গুর্লে, আই, সি, এস, সি, আই, ই, গভর্ণমেণ্ট হাউস্, কলিকাতা।

অস্থায়ী অনরারী সেক্রেটরী মিসেস পি, ব্যানার্জ্জি ও মিসেস পি, গেডীস, ৪৬ নং ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

গরীব ছাত্রদিগকে এবং অসহায় ও দুস্থ পরিবারগণকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে একটী স্থায়ী "দরিদ্র-ভাণ্ডার" (Poor-fund) আছে। উহা হইতে অনেককেই তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সাহায্য করা হয়। দুরবস্থার সময় দু'চার টাকা যাহা তাহাদের দেওয়া হয় তাহাতেই তাহারা যে কিরূপ আনন্দিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ফণ্ডে অতি সামান্য অর্থই সঞ্চিত থাকে বলিয়া দুরবস্থার কথা শুনিলেও সময় সময় সাহায্য করা যায় না। সেইজন্য আমরা সাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যদি মাঝে মাঝে দুই এক টাকা উক্ত ফণ্ডে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র দানেও অনেকের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ।

(সিষ্টার নিবেদিতা।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের জাতীয় জীবনধারা যে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে এই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করায় স্বামিজীর স্বাধীন চিন্তার যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোন বিষয়ে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহার নিকট কোন প্রথার নূতন আকারটী সর্ব্বদাই পুরাতন পবিত্র সংস্কারসমূহের দ্বারা পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার মতে, দেবী সরস্বতীর চিত্র অঙ্কিত করাই "তাঁহাকে পূজা করা"। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করাই "রোগ ও ময়লারূপ দানবদ্বয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা"। প্রাচীনকালের ভক্তিপূর্ব্বক গোসেবা হইতে ইহাই পরিচয় পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি সরবরাহ করা, পশুগণের জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা করা ও সকল প্রকারে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করা ইত্যাদি ভাব পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির যতদূর সম্ভব অনুশীলন করাকে তিনি ধ্যানধারণাদির শক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে অধ্যয়নই তপস্যা, এবং হিন্দুদিগের ধ্যানপরায়ণতা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদৃষ্টিলাভের একটী উপায়। সকল কার্য্যই এক প্রকারের ত্যাগ। গৃহ ও পরিবারবর্গেরও প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেও সর্ব্বদা মহত্তর ও বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

তিনি সানন্দে দেখাইয়া দিতেন যে, হিন্দুগণের নিকট সকল

লিখিত শব্দই সমান পবিত্র,—সংস্কৃতও যেমন, ইংরাজী ও পারসিক শব্দও ঠিক তেমনি। কিন্তু তিনি বিদেশী আদবকায়দা ও বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার বাহ্য চাকচিক্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সমালোচনা শুধু বাহিরের ব্যাপারগুলিকেই নূতন করিয়া সাজাইতে চায়, তাঁহাতে তিনি কর্ণপাত করিতেই পারিতেন না। যখন তিনি দুইটী সমাজের মধ্যে তুলনা করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বদা দেখাইয়া দিতেন যে, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আদর্শকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কি আধুনিক, কি মধ্যযুগে এই লক্ষ্যসাধনে কে কতটা পরিমাণে সফলকাম হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তিনি তাহাদের সাফল্য ও অকৃতকার্য্যতার বিচার করিতেন।

সর্ব্বোপরি তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে ধারণা এরূপ ছিল যে, তিনি বক্তা ও যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে এই দুই জনের মধ্যে এতটুকু ভেদ রাখিতে দিতেন না। কাহারও সম্বন্ধে "তাহারা" বলিয়া উল্লেখ করাই তাঁহার নিকট ঘৃণার কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইত। তিনি যাহাদিগের ত্রুটী বা দোষ দেখান হইতেছে, সর্ব্বদা তাহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিতেন, তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি জগৎকে সত্য সত্যই ঈশ্বর ও সয়তান নামক দুই পৃথক ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া কল্পনা করা চলিত, তাহা হইলে তিনি নিজে ঈশ্বরের সেনাপতি আর্কেঞ্জেল মাইকেলের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, যাঁহার উপর তিনি বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই সদাপরাজিত সয়তানেরই পক্ষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই ভাবটী, তিনি শিক্ষা দিতে বা সাহায্য করিতে সমর্থ, এই আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ছিল না—পরন্তু উহা শুধু কেহ চিরদিনের মত যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহারই অংশ গ্রহণ করিবার আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্প-প্রসূত। কেহ কোথাও জন্মের মত যে দারুণ কষ্টে পতিত হইয়াছে, তাহারই সবটুকু নিজে গ্রহণ করিয়া, তিনি বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

তাঁহার প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে কোন কোনখানিতে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দয়ারূপ ভিত্তির উপরেও নরসেবাব্রতকে ঠিক ঠিক দাঁড় করান যায় না। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বলা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। তিনি ওরূপ পৃষ্ঠপোষকতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, দয়া তাহাকেই বলে, যাহা অপরকে জীবজ্ঞানে সাহায্য করে; কিন্তু প্রেম সকলকে আত্মা জ্ঞান করিয়া সেবা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রেমই পূজাস্বরূপ এবং এই পূজাই ঈশ্বরদর্শনে পরিণত হয়। "সুতরাং অদ্বৈতীর পক্ষে প্রেমই একমাত্র কার্য্যপ্রবৃত্তির হেতু।" কোন উচ্চ সেবার ভারপ্রাপ্তির সহিত আর কোন উচ্চাধিকারই তুলিত হইতে পারে না। একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন, "যিনি কাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই স্বষ্টান্তঃকরণে গমন করিবেন; যাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে, তিনি নহেন।" পুরোহিতগণকে যেমন বাহ্যান্তর শুদ্ধি করিয়া উৎসুক-ভাবে অথচ সসম্ভ্রমে এবং সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও অবিচলিত থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া পূজাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষারূপ পবিত্র কার্য্যের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কার্য্যে সেইরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী, মহারাষ্ট্র মহিলা মাতাজী মহারাণীর কথাগুলি স্বামিজী মনে রাখিয়াছিলেন এবং প্রায়ই উহাদের উল্লেখ করিতেন। যে ছোট ছোট মেয়েগুলিকে তিনি পড়াইতেন তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী আমার কোন সহায় নাই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীগুলিকে পূজা করি; তাহারাই আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে।"

নিম্নশ্রেণীর লোকশিক্ষার প্রতি স্বামিজী যে ভাব পোষণ করিতেন তাহাতে ঐরূপ এক প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সেবার ভাবই প্রকাশ পাইত। তাঁহার মতে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীসমূহের যেমন বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের অধিকার আছে, তাঁহাদের এই নিম্নশ্রেণীর

ভ্রাতৃগণেরও ঐ বিষয়ে ঠিক তেমনি অধিকার আছে। এইটী পাইলেই তাহারা স্বাধীনভাবে ভিতর হইতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ণীত করিয়া লইবে। তাঁহার পুরোবর্ত্তী এই কার্য্যটী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তভাবে চিন্তা করিয়া তিনি শুধু, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ভারতে যত মহাপুরুষ প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। যে যুগে ঔপনিষদিক জ্ঞান শুধু আর্য্যদিগেরই বিশেষ অধিকার বলিয়া গণ্য হইত, ভগবান্ তথাগত সেই যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ত্যাগদ্বারা নির্ব্বাণ-লাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন। যে দেশে এবং যে কালে সিদ্ধ আচার্য্যগণের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত হইত, আচার্য্য রামানুজ সেই দেশে এবং সেই সময়ে কাঞ্চীনগরীর গোপুরে আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র সকল প্যারিয়া বা চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। এখন ভারতে আধুনিক যুগের অভ্যুদয় কাল; এখন ভারতবাসিগণ ঐহিক জ্ঞান (secular knowledge) দ্বারা মানুষ হইতে শিখিবে। সুতরাং কিরূপে ইতর লোকদিগের মধ্যে ঐহিক জ্ঞানের বিস্তার করা যাইতে পারে তাহাই স্বভাবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন হইয়াছিল।

অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতে পুনরায় ঐহিক সম্পদের অভ্যুদয় করিতে হইলে সমগ্র জাতিটীর শক্তি ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর তিনি বেশ জানিতেন যে, ঐহিক সম্পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন, "যে ঈশ্বর আমাকে ইহ জীবনে এক টুকরা রুটী দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিবেন, একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না!" সম্ভবতঃ তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, এক মাত্র জ্ঞানবিস্তার দ্বারাই সমগ্র দেশটী সে যে মহান্ চিন্তা ও ধর্ম্মোৎকর্ষের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। যাহাই হউক না কেন, কেবল ইতর-

সাধারণের সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধ স্থাপনের এক বিরাট আন্দোলন উত্থাপিত করিলেই উচ্চশ্রেণীসমূহের ধমনীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে লোকে নেতৃত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটীকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা সুমার্জ্জিত যে কাণ্ডজ্ঞানকে লোকে প্রতিভা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে যেমন সম্ভবপর, সামান্য দোকানদার বা হলচালনাকারী কৃষকের মধ্যেও ঠিক তেমনি সম্ভবপর। যদি সাহস ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে তাস্তিয়া ভীল কোথায় থাকিত? তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাইবার পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বলা মানবের ক্ষমতাতীত।

তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের শ্রমজীবিকুলকে শিক্ষা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য্য, অপর কাহারও নহে। বিদেশী লোকের দ্বারা বিদেশজাত জ্ঞানের প্রচলন হইলে তাহাতে যে কি অশেষ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নিকট লুক্কাইত ছিল না। তাঁহার প্রকাশিত পত্রাবলীতে তিনি যে ক্রমাগত ছাত্রগণকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন, ফটোগ্রাফ এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়ণিক পরীক্ষার উপযোগী কিছু কিছু উপকরণ এই সকলের সাহায্যে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিতে বলিতেছেন, তাহার অর্থই এই। আবার, সাধুরা যখন ভিক্ষা উপলক্ষে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত মিশেন, সেই সময় তাঁহারা যেন কিছু কিছু ঐহিক শিক্ষাও উহাদিগকে প্রদান করেন, একথাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এইগুলি নব শিক্ষার সহায়ক ও প্ররোচনা মাত্র হইবে। সেই আসল শিক্ষার জন্য প্রত্যেককে একাকী বা দলবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, একটী বৃহৎ জাতিকে তাহাদের বোধসীমার বাহিরে একটী চিন্তা ও

জ্ঞানরাজ্য রহিয়াছে, প্রথমে এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই নূতন শিক্ষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রথম সোপান। সুতরাং স্বামিজীর এইপ্রকার নানা কল্পনা করা খুবই সঙ্গত হইয়াছিল।

কিন্তু তিনি নিজে যে আচার্য্যোচিত কার্য্যের সূত্রপাত ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুধার্ত্ত বা পীড়িতদিগের কোন বিশেষ প্রকারের সেবারূপে প্রকাশ পাইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগনিবারণকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবকদল প্রেরণ করিয়া পল্লী নগরাদির স্বাস্থ্যরক্ষার যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, এবং যাহা অদ্যাবধি তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন, তাহা আরম্ভ করিবার উপযোগী অর্থ স্বামিজীই সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশে যে কয় বৎসর ছিলেন, "ভারতের অন্ত্যজদিগের সেবাকার্য্যে যাহারা ব্রতী হইতে সক্ষম, সর্ব্বদা এমন সেবকগণের সন্ধানে থাকিতেন, এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্রাহ্মণশিষ্যদিগকে নীচজাতীয় কলেরারোগীদিগের সেবা করিতে দেখিয়া তিনি যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলেন, এমন আর কিছুতেই হন নাই। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে বুদ্ধের সময় যাহা ঘটিয়াছিল আমরা এখন আবার তাহাই দেখিতে পাইতেছি!" তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার প্রেম ও দয়ার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানপ্রতিম, কাশীস্থ ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটীর প্রতি এক বিশেষ প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়েও কম আকৃষ্ট হইত না। এ গুলির সহিত তাঁহার তেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধ না থাকিলেও ইহারা আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারই ছিল। যে সকল মাসিক পত্রের সহিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের হিতাহিত, এবং মুর্শিদাবাদের অনাথাশ্রম হইতে যে শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা—এগুলি তাঁহার চক্ষে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিক পত্রগুলি অনেক সময় একাধারে এক প্রকার জঙ্গম স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা

একদিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি লোকের মনোভাব ব্যক্ত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। স্বামিজী উঁহাদের এই শিক্ষা-সংক্রান্ত উপকারিতা যেন সহজসংস্কার-প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণপরিচালিত মাসিকপত্র-গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয় ত এক পৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের কল্পনা জল্পনা স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় যুগসন্ধিকালের (Transition) সাধারণ লোকের মনের গতি কোন দিকে, তাহারও একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আপাত-বিসংবাদী সত্য ব্যাপারটী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া স্বামিজী নিজেই বলিয়াছিলেন, "হিন্দুরা মনে করে যে, ধ্যানের দ্বারাই জ্ঞান লাভ হইবে; এটী তাহাদের পক্ষে বেশ খাটে—যখন বিষয়টী গণিত শাস্ত্র হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূগোলের বেলায়ও তাহারা স্বাভাবিক সংস্কারবশে ঐ উপায় অবলম্বনেই প্রবৃত্ত হয়; ঐ উপায়ে যে ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না; তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভাবিক দয়াপ্রবৃত্তি শুধু যে ভারত-বাসিগণের কথাই চিন্তা করিত, তাহা নহে। যে সকল লোক মনে করে যে, ব্যবসায় যত অধিক মূলধন লইয়া হইবে, ততই তাহা ভাল হইবে,—তিনি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া বরং যাহাদের অল্প জমির চাষ আছে, অথবা যাহারা অল্প পুঁজিতে কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্ব্বদা তাহাদিগকেই সমর্থন করিতেন। উহা তাঁহার প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, যে, এক্ষণে যে দয়া দাক্ষিণ্যের যুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার প্রধান কার্য্যই হইবে—শ্রমজীবী বা "শূদ্র"দিগের সমস্যার সমাধান করা। যখন তিনি পাশ্চাত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তিনি যে তথাকার আপাতপ্রতীয়মান অধিকারসাম্য দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারি। পরে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি উহার পশ্চাতে যে ধনীদিগের স্বার্থপরতা ও বিশেষাধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে তাহা বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং একজনকে চুপে চুপে বলিয়াওছিলেন যে, এখন পাশ্চাত্য জীবন তাঁহার নিকট "নরক" বলিয়া বোধ হইতেছে। পরিপক্ক বয়সের বহুদর্শিতার ফলে তিনি যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্য যে কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেশ অপেক্ষা চীন দেশই মানবীয় নীতিজ্ঞানের আদর্শ ধারণার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। তথাপি, সমগ্র জগতের লোকদিগের নিকটই আগামী যুগ যে ইতর সাধারণের বা শূদ্রজাতির কল্যাণের কারণ হইবে, এবিষয়ে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে শূদ্রজাতির সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সঙ্ক্ষোভ, কি ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়া উহা সঙ্ঘটিত হইবে। তিনি যেন ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিতে করিতেই কথা বলিতেছিলেন,—তাঁহার কণ্ঠস্বর ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় আরও লোকের কানে বাজিতেছিল; কিন্তু যদিও শ্রোতা উৎসুকভাবে শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি স্বামিজী নির্ব্বাক হইয়াই রহিলেন, এবং আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটা বিপর্য্যয় ও ভয়ের যুগে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্য্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তিপূজার এরূপ এক মহান্ উদ্বোধন ধ্বনিত হইয়াছে। জগন্মাতাই একাধারে এই সকল বিপরীত ভাবের সমন্বয়স্থল। তিনি ভাল মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই বিকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্য স্থান তিনিই। স্বামিজী যখনই মাতৃপ্রণাম মন্ত্রগুলি সুরসংযোগে আবৃত্তি করিতেন, তখনই আমরা একটী মাত্র কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহুযন্ত্রোত্থিত মৃদু নিনাদের ন্যায় ঐতিহাসিক নাটকের এই মহাসমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাই। তিনি আবৃত্তি করিতেন—

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥"*

তৎপরে যেমন উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতগণের এক সাধারণ আশা ও ভয়ে সম্মিলন, সেনাসমূহের সগর্ব্ব পদসঞ্চার, এবং জাতিনিবহের সংক্ষোভ মানসকর্ণে উচ্চতর ও স্পষ্টতরভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল, অমনি সে সকলকে ছাড়াইয়া এই মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল—

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥"†
"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"‡

* যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি; হে দেবি! বিশ্বকে প্রতিপালন কর।—চণ্ডী।

† তুমি সকলের গুণত্রয় প্রকাশকারিণী প্রকৃতি, তুমি প্রখর রাত্রি, মরণরূপ রাত্রি এবং দারুণ মোহরাত্রি।—চণ্ডী।

‡ সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে শিবে, হে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকারিণি, হে শরণাগত-রক্ষয়িত্রি, হে ত্রিনয়নি, গৌরি, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।—চণ্ডী।

বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন।*

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

ইতিপূর্ব্বে বিবেকানন্দ সমিতি আমাকে বহুবার বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিষয়টী বড়ই গুরুতর বিশেষতঃ, বৌদ্ধদর্শন এত বহু-বিস্তৃত ও জটিল যে, তাহার সম্যক্ আলোচনা ও পরিচয় প্রদান নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে—বেদান্ত দর্শনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সাধারণ সমক্ষে একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা একটা বা দুইটা বক্তৃতায় সম্ভব হইবে না ইহা ভাবিয়া এত দিন নিরস্ত ছিলাম। বৌদ্ধদর্শন ও তাহার ইতিহাস এদেশে যতই আলোচিত হউক না কেন, বিষয়টি এখনও এত গভীর ও এত জটিল রহিয়াছে যে, তাহার ঠিক ঠিক আলোচনার সময় এখনও এদেশে আসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একটি বহু প্রাচীন বটবৃক্ষের শাখা প্রশাখা নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া যেমন মূলকাণ্ডটিকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং অনেক দিন পরে কোন্‌টি তাহার আসল মূলকাণ্ড তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়, বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসও অনেকটা সেইরূপ। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর হইতে তৎপ্রচারিত মতের গতিস্থিতি, উন্নতি অবনতি, এত বিচিত্র ও বিস্তৃতভাবে হইয়াছিল যে, অল্প সময়ে তাহা সম্যক্ নিরূপণ করা একান্ত অসম্ভব। ভাসা ভাসা অনুসন্ধানের ফলে এত অল্প সময়ে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ভারতের তদানীন্তন অবস্থাও বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। ভারতবাসীর তাৎকালিক সভ্যতার রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতির জ্ঞান থাকিলে আমরা বুঝিব, ভগবান্ বুদ্ধ ভারতের কি কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ সভ্য জাতির চিন্তাস্রোত সাধারণতঃ তিনটি

* বিগত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিটিউসনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

প্রণালীর মধ্য দিয়া লক্ষিত ও প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, যথা—(১) দর্শন (২) সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি (৩) নৈতিক অনুরাগ।

(১) বিজ্ঞান (Science) দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানের চরম বিকাশ ও পরিণতি বিজ্ঞানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় (Intellectual aspirations)।

(২) শিল্প, সঙ্গীত, ও সাহিত্য প্রভৃতিতে দেশবাসীর সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় (Æsthetic culture)।

(৩) সর্ব্বশেষে নৈতিক উন্নতিতে অর্থাৎ অনুরাগে—ভক্তিতে (devotional aspirations) প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। যে জাতিসমূহে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের তিন বিষয়ে উন্নতি লক্ষিত না হয়, তাহাদের সভ্যতা অপূর্ণ বুঝিতে হইবে। মোটের উপর একত্রে ঐসবগুলির উল্লেখ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির সম্যক্ অনুশীলনে ও পূর্ণতালাভেই মানবের ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। বৈশেষিক দর্শনে এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই একটি সূত্র লিখিত হইয়াছে, যথা—"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ স ধর্ম্মঃ।" যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি ও প্রসারণ ঐ সকল মার্গেই হইয়াছিল—তাহার বহু প্রমাণ প্রাচীনতম হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আপাততঃ বৌদ্ধদর্শনের বিষয় জানিবার তিনটি উপায় আছে—প্রথম, সংস্কৃত পুরাণ; দ্বিতীয়, পালিগ্রন্থাদি; তৃতীয়, পাশ্চাত্য মনীষিগণের অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার ফলে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিষয়ক নানা তথ্য। আমরা এই সব গ্রন্থাদি হইতে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থাদিতেও বৌদ্ধগণের বিষয় উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণু পুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বিষ্ণু পুরাণে, পদ্ম পুরাণে ও ভাগবতাদি গ্রন্থে সাধারণভাবে ইহাই লিখিত হইয়াছে যে,

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর অসুরদের মোহিত করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হন। আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্যে সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক ও বৈভাসিক প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত হিন্দু গ্রন্থ হইতে এই জাতীয় কতকগুলি উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পালি গ্রন্থাদি—বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দুইশত বৎসর পর মহাদেব নামক জনৈক ভিক্ষু একটি বিরাট বৌদ্ধ ভিক্ষু সভা আহ্বান করিয়া তথাগতের উপদেশসমূহ একত্রিত করেন। তৎকাল-প্রচলিত পালি ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছিল। কালের বিচিত্র প্রভাবে বৌদ্ধভিক্ষুগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও মতভেদ বশতঃ সেই সময় হইতে অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থাপনের সূচনা আরম্ভ হয়। কালে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আঠারটি হইয়াছিল। এই আঠারটি অর্থাৎ মহাসাঙ্ঘিক ও স্থেরাবাদ প্রভৃতি মতগুলিকে হীনযান বলে। তাহা ছাড়া পশ্চিম ভারতে যে সকল মত পরে প্রচারিত হয় তাহা মহাযান নামে প্রচলিত হয়।

হীনযান—ঔপনিষদ জ্ঞানমার্গের ন্যায়। হীনযানের উপাসকগণ নিজের কল্যাণের জন্য নিজেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। সংযম ও ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পর প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মোন্নতি বা নির্ব্বাণ লাভ করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা এইরূপ মতই প্রচার করিতেন। মহাযান—প্রথম হইতে সাধক নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ভাবিয়া একজন মহাপুরুষের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না, এইরূপ ভাবিয়া অপর কোন সমধিক গুণশালী পুরুষের উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের শিক্ষা অনেকটা ভক্তিবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বৌদ্ধদর্শনের প্রধান শাখা হীনযান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাসাঙ্ঘিক মত ও স্থবিরবাদ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—নির্ব্বাণের জন্য এবং মানবের সকল প্রকার অভ্যুদয়ের জন্য অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের তাৎকালিক প্রাচীনগ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতার শেষভাগের মন্ত্রগুলি দেখিয়া সম্যক্ ধারণা হয় যে, আর্য্যঋষিরা প্রশ্ন করিতেছেন, 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুতআবভূব'—এই নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল প্রপঞ্চ কোথা হইতে আসিল? অবশ্য এই বিকারধর্ম্মী প্রপঞ্চ কখনই নিত্য হইতে পারে না। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোনও অপরিবর্ত্তনীয় অবিকারী বা সৎপদার্থ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। ঋষিদিগের এই চিন্তা পরে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের যুগে ক্রমে অধিকারীভেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার পারম্পর্য্য একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বা উপাসনা পদ্ধতি ঋগ্বেদ-সংহিতার কোনঅংশেই পরিস্ফুট-ভাবে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদ-সংহিতায় আরম্ভ হইয়া এই সকল চিন্তাগুলি যেন ক্রমে উপনিষদে আসিয়া অধিকতরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, এইরূপ একটা ক্রমবিকাশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম-বস্তুর জন্য ঋকে যে অনুসন্ধান প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, সে সংশয়, প্রশ্ন প্রভৃতি উপনিষদে যেন নিবৃত্ত হইয়া সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইল বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্বের কথা। ইহার পর আর একটি বিষয় আমরা দেখিতে পাই—এই অনুসন্ধানের যুগে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মের প্রাধান্যই প্রচার করিতেন। কর্ম্মবাদ বহুপূর্ব্বে ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। পারলৌকিক অভ্যুদয়ের জন্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞাদির নানা প্রকার বর্ণনা ঐ যুগে উল্লিখিত আছে।

দেবতাগণের হোমের জন্য আহবনীয় ও গার্হপত্য, পিতৃগণের জন্য দক্ষিণাগ্নি, পাকাদি কার্য্যের জন্য আবসথ্য ও সভাগৃহের হিমাদি নিবারণের জন্য সভ্য অগ্নি ব্যবহৃত হইত। এই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডে স্থাপিত হইত। ব্রাহ্মণগণই এই সমস্ত অগ্নি কিরূপে প্রজ্বালিত করিতে হয়, তাহা দ্বারা কিরূপে ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় ও পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়, তাহার বিস্তৃতভাবে ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নরপতি হইতে সামান্য প্রজার উপর পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাব

ও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কল্পসূত্রের দ্বারা আরও প্রকটিত হয় যে, এই ব্রাহ্মণগণই বৈরাগ্যের অধিকারী ছিলেন—ত্যাগ, শান্তি, আত্মবিচার ও চিরনিবৃত্তির পথে চলিবার অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণগণই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতি কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণের নিদেশানুযায়ী চলিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এইরূপ একটি জাতির আধ্যাত্মিক প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ। একারণ একটা পরিবর্ত্তন অবশম্ভাবী হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বত্র অধ্যাত্মরাজ্যের একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব দেখা গেল। বৌদ্ধ প্রাধান্যের পূর্ব্বে এইরূপ অপর কয়েকটী সম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়। সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীর নাম জৈন। অনেকেই ইহাকে বেদবাহ্য পৃথক্ মত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। জৈনেরা সকলের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির বার্ত্তা প্রচারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অচেলক এই জৈন সম্প্রদায়ের একটি শাখা। তাঁহারা বস্ত্রাদিকে দেহের বন্ধন বিবেচনা করিয়া তাহাও ত্যাগ করিতে বলিতেন; তাঁহারাই এখন দিগম্বর জৈন বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। আজীবক সম্প্রদায়, মংখালিয়া, গোখালী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বেদবাহ্য সম্প্রদায়ের নানা শাখাও দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মতও প্রচার করিত যে, মানবের কোন কর্ত্তব্য নাই অকর্ত্তব্যও নাই, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুই নাই। প্রকৃতিশক্তি মানবকে যেমন চালাইবে সে সেইরূপই চলিবে। বেদবিরুদ্ধ এইরূপ নানাপ্রকার মতবাদ জিন প্রভৃতি তীর্থঙ্কর দ্বারা ভারতে বৌদ্ধমত প্রচারের পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপে ভারতে স্বাধীন মতবাদের প্রচারের প্রভাবে অনেক ভ্রান্ত মতও সত্যের নামে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়—সত্যের আংশিক আভাস মাত্রই ইহা দ্বারা পাওয়া যাইত। ক্রমে এই সকল ধর্ম্মের অনেক অবনতি ও হীনাবস্থা ঘটিল। মীমাংসাবার্ত্তিকে কুমারিলভট্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রসঙ্গে অতি কঠোর উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ'। আজ কাল কিন্তু আর সে নিন্দার যুগ নাই। ঐতিহাসিক সত্যের

প্রতিষ্ঠার প্রভাবে এখন আর ঐরূপ নিন্দা করা চলে না। ভারতের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ যে মহাত্মার জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, শিক্ষা ও নীতিকে উপেক্ষা করিলে আমরাই সভ্য সমাজের সমক্ষে একদেশদর্শী বলিয়া ঘৃণিত হইব। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান ভাণ্ডার বেদান্ত দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের মহমিলনের যুগ আসিয়াছে। এতদুভয়ের মিল কোথায় তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজগত উন্নতি হওয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

পরদুঃখে কাতর হইয়া এবং সেই দুঃখের নিরাকরণ কিরূপে হয় সেই উপায়ের উদ্ভাবনের জন্য বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রকার বিলাস ও ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরার্থে এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ভারতে ইহার পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই।

প্রথমে নিজের মঙ্গল বা ইষ্ট কিরূপে হইবে তাহা অপরের উপদেশ দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বীয় বিবেকদ্বারা বুঝিব—অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না—নিজের মুক্তি নিজে সাধন করিব সুতরাং বিবেক কিসে নির্ম্মল ও প্রখর হয় তাহার চেষ্টা করা মানবের উচিত—ইহাই বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ।

বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে কোন অবতার পুরুষের জীবনে এই ভূতদয়ার এমন আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য নৈরঞ্জনা তীরে অনবরত সাতদিন সাতরাত (মতান্তরে অধিক সময়) চিন্তার পর যখন নির্ব্বাণের প্রশস্ত পথ তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যখন তিনি পরাশান্তি লাভ করিলেন, তখন সেই আনন্দে বিভোর হইয়াও তিনি জীবদুঃখ ভুলেন নাই। মার্জ্জিত বিবেকের বাণী তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। জীবকুল সংসারতাপে দগ্ধ হইয়া নিরন্তর দুঃখ-প্রপীড়িত হইতেছে, এই অমৃতের—কল্যাণের পথ তাহাদিগকেও দেখাও—বুদ্ধত্ব লাভ করিবার উপায় তাহাদিগকেও শুনাও। মুক্তি

নিজের শান্তির জন্য নয়। সংসারে প্রবেশ করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ নর নারীর কল্যাণ সাধন কর। এই বিবেকবাণীর অনুসরণে তিনি ৪২ বৎসর কাল ভারতের সর্ব্বত্র মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তাঁহারই সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ সেবাব্রতধারী ভিক্ষুসম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতবহির্ভূত নানাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই অমৃতময়ী বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীনতম যুগে হিন্দু সন্ন্যাসিগণ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় নিঃসঙ্গ হইয়া তপোবনে ও বিজন প্রদেশে শুচি হইয়া একাকী সংসারের বহুদূরে বাস করিতেন। ত্যাগ, সংযম বা সমাধির সমস্ত ফল নিজেরাই পৃথক্‌ভাবে ভোগ করিতেন। জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত না হইলে এই মুক্তির বার্ত্তা প্রায় তাঁহারা কাহাকেও বলিতেন না। অপর পক্ষে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ অসংসারী হইয়াও গৃহস্থের নিকট প্রাণ ধারণোপযোগী ভিক্ষালাভের ব্যপদেশে নরনারীর, এমন কি, পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবকুলের কল্যাণসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। তথাগতের শিক্ষা ছিল, ব্যাধি দুই প্রকার—দৈহিক এবং মানসিক। স্থূল দেহের ব্যাধির উপশমের জন্য বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ব্যবস্থা এবং আরোগ্য বিধান করিয়া থাকেন কিন্তু সূক্ষ্ম মানব মনের কাম ক্রোধাদিরূপ বৈকল্য হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে হইলে সংযম, ত্যাগ ও নিবৃত্তিমার্গের শিক্ষা বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। গৃহস্থের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য নানা উপায়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রথম ভাবনা সন্ন্যাসিকুলের মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেব হইতেই ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসিসঙ্ঘ স্থাপনের শিক্ষা ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার উপদেশ তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরে বহুদূরে প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমবিভক্ত প্রাচীন আর্য্য সমাজে তথাগতের অদ্ভুত হৃদয়বত্তার ছায়া পড়িয়া আর্য্য সভ্যতাকে আরও গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল—বর্ত্তমানকালে তাহা অস্বীকার করা চলে না। ইহার নিদর্শন প্রাচীন ভারতের

শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে এখনও প্রচুর ভাবে দেখা যায়।

প্রাচীন ইতিহাসাদিতে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে রাজা অশোকের চেষ্টায় অমিতাভের নীতিমূলক উপদেশ একত্রিত করা হইয়াছিল। তিনি ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার স্থাপন ও ভারতের নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতেন।

এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের অসাধারণ আত্ম-ত্যাগ ও অলৌকিক নিঃস্বার্থপরতা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য জাতির মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। কেন আত্মরক্ষা করিব? পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিগণের কল্যাণসাধনের সুযোগ লাভ করিব, এই হেতুই আমি আত্মরক্ষা করিব এইরূপ হিতৈষণা প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুগণ আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইতেন—প্রাণ ধারণের অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহারা রাখিতেন না। বিপন্ন বা অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও তাঁহারা হিংসা করিতেন না। স্বর্গ বা ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্তির জন্য কোন কার্য্যই সকামভাবে তাঁহারা করিতেন না। ভিক্ষুজীবনের চরম উদ্দেশ্য অপর প্রাণীর ব্যথা নিবারণ করা। এই অদ্ভুত হৃদয়-বত্তা ও করুণার ভাব খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ জগতের সমক্ষে কেবল প্রচার দ্বারা নয়, তাঁহাদের অদ্ভুত ত্যাগ-শীল জীবনের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, তোমার মঙ্গল করিলে তুমি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি প্রেম-সম্পন্ন হইবে। কৃতজ্ঞতা মানবপ্রকৃতির একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। উপকারীর নিকট বাধ্য হওয়ায় নূতনত্ব আর কি আছে কিন্তু তুমি যদি অপকারীর প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে পার—যদি লাঞ্ছিত পীড়িত হইয়াও অত্যাচারীর উপকার করিতে সমর্থ হও, তবেই বুঝিব তুমি তথাগতের উপদেশ ধারণ করিতে পারিয়াছ। ভিক্ষুদিগের শিক্ষার ইহাই সার মর্ম্ম।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবন অপূর্ব্ব ত্যাগের আদর্শে

নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাঁহাদিগের জাতীয় জীবন বর্ত্তমান কালে নানা কারণে কোন কোন অংশে অবোধ্য হইলেও স্বার্থত্যাগে তাঁহারা যে জগতে অতুলনীয় ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। পরার্থে আত্মোৎসর্গ এবং অপরের জন্য নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা আমরা শ্রীবুদ্ধদেব হইতে শিক্ষা পাইয়াছি। ভিক্ষুপ্রধান অসঙ্গ, নাগার্জ্জুন ও বসুমিত্রের আত্মত্যাগের কাহিনী প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের বহু তথ্যপূর্ণ বৌদ্ধগ্রন্থাবলীতে লক্ষিত হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণতা এবং বিদ্বেষের যুগ ভারত হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করুক। এই উদার যুগে আমাদিগের পূজ্য পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি, তাঁহাদিগের অমূল্য উপদেশরাজি বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না—অপরের বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাহাতে আমরা ভবিষ্যতে আরও মহান্ ও গৌরবান্বিত হইতে পারি তাহার জন্য সতত তৎপর ও যত্নশীল হইতে হইবে।

একটী প্রশ্ন।

(জনৈক ব্রহ্মচারী)

যাঁরা একটু আধটু ধর্ম্মালোচনা করেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে, ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন মনে উঠে তাদের মধ্যে কতকগুলির সহজেই যুক্তিতর্কের দ্বারা মীমাংসা হয়ে যায়; কিন্তু আর কতকগুলি প্রশ্ন আছে যে গুলির মীমাংসা করতে গেলে ঘুরে ফিরে একটী প্রশ্নেতে এসে দাঁড়ায়—সেটী হচ্চে, 'এক কি করে বহু হলেন।' এই ছোট্ট প্রশ্নটীর আর জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন—বাপু ও নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন? সৃষ্টি কেন হল?—এক কি করে বহু হলেন? এ সব কূটকচালে প্রশ্নে

তোমার লাভ কি? আম বাগানে ঢুকে, বাগানে কত গাছ আছে, কার বাগান কত খরচ পড়েছে—এ সব প্রশ্ন করে তোমার লাভ কি? তুমি আম পাড় আর খাও। অথবা আরও বেশী বিরক্ত করলে হয়ত বল্‌বেন, "বাপু হে, যে সভায় সৃষ্টির কথা ঠিক হয় আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম না।" কতকগুলি লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে বটে কিন্তু সকলে এ উত্তরে বেশ তৃপ্ত হয় না। তাই তিনি এক থাক উপরে উঠে বল্‌লেন—আচ্ছা, উত্তর দেবার আগে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এক যে বাস্তবিকই বহু হয়েছেন তার প্রমাণ কি? সংসারে আমরা এক দেখ্‌তে পাচ্চি না; বহু দেখ্‌ছি। বহুর মধ্যে যে এক রয়েছেন এটা আমরা শাস্ত্র বা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের কাছ থেকে জান্‌ছি মাত্র। সুতরাং তাঁদের কথায় সত্যাসত্য নির্ণয় কর্‌তে হলে তাঁদের প্রদর্শিত রাস্তা দিয়ে চল্‌তে হবে। তাঁরা ত বল্‌ছেন না যে আমরাই কেবল দেখ্‌ছি—তোমরা দেখ্‌তে পাবে না। তাঁরা বল্‌ছেন, এখন তোমরা স্বপ্ন দেখ্‌ছ। যে দিন স্বপ্ন ভাঙ্গবে—যে দিন এই সুদীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠ্‌বে সেই দিন বুঝ্‌বে যে, বাস্তবিক বহু নেই—বহু কখনও ছিল না—এক কখনও বহু হয় নাই। বহুজ্ঞান স্বপ্ন—ভ্রম মাত্র।

প্রশ্ন—স্বপ্ন যে মিথ্যা তার প্রমাণ কি?

উত্তর—প্রমাণ এই যে, স্বপ্নদৃশ্য পদার্থগুলো বাইরে থাকে না, দেহের মধ্যেই থাকে। কিন্তু দেহের মধ্যের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। সুতরাং স্বপ্নে যে হাতী, পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতি দেখা যায় তা এতটুকু শরীরের মধ্যে থাক্‌তেই পারে না। কাজে কাজেই সেগুলো মিথ্যা—মনের কল্পনামাত্র।

প্রঃ—স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ যে বাইরে থাকে না, তার প্রমাণ কি?

উঃ—মনে কর একজন ছাত্র পরীক্ষা দেবে। সে একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লে যে, সে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। আরও শত শত পরিচিত অপরিচিত ছেলেরা এসেছে। ঘণ্টা বাজ্‌ল—সকলে নিজের নিজের জায়গায় বস্‌ল—প্রশ্নপত্র এলো—উত্তর

লেখা চল্‌তে লাগ্‌লো ইত্যাদি, ইত্যাদি। ছেলেটী যখন ঘুম থেকে উঠ্‌ল, তখন সে বুঝ্‌তে পার্‌ল যে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। বাস্তবিক তার স্থুল শরীর বা সূক্ষ্মশরীর কোথাও যায় নাই। পরীক্ষা-ঘটিত ব্যাপারগুলি আদৌ ঘটে নাই। যে পরীক্ষার্থী, তার মনে পরীক্ষার চিন্তা খুবই স্বাভাবিক—নিদ্রাবস্থায় মনে সেই সমস্ত চিন্তা উঠেছে মাত্র। তার মনই স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই আকার ধারণ করেছে। সুতরাং স্বপ্নদৃশ্য ব্যাপার যে বাইরে থাকে না তা একটু চিন্তা কর্‌লেই অনায়াসে বুঝ্‌তে পারা যায়।

প্রঃ—আচ্ছা, স্বীকার কর্‌লাম যে স্বপ্নটা মিথ্যা—মনের কল্পনা-মাত্র। কিন্তু জাগ্রদ্দশাটাও যে স্বপ্নের মত মিথ্যা তা কেমন করে বলি?

উঃ—স্বপ্নে আর জাগ্রতে তফাৎ কি? স্বপ্নাবস্থায় যেমন তুমি এবং তোমার জগৎ থাকে জাগ্রদবস্থায়ও ঠিক তাই। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছ ততক্ষণ স্বপ্নের তুমি ও তোমার জগৎই সত্য বলে মনে হয়—এ জগতের কথা একেবারে ভুল হয়ে যায়। আবার যখন জেগে উঠ্‌লে তখন এ জগৎটাই সত্য বলে মনে হয়—স্বপ্নটা মিথ্যা বলে ধারণা হয়। কিন্তু এটাও যে একটা স্বপ্ন নয় তা কে বল্‌লে? দেখ, গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব দুটোতেই সমান। স্বপ্নে আমরা যা দেখি তার মাথা নেই মুণ্ডু নেই অথচ স্বপ্নাবস্থায় সেগুলো কেমন কার্য্যকারণ ভাবে বদ্ধ (relevent) বলে মনে হয়! সেই-রূপ জাগ্রদবস্থায় আমরা যা কিছু দেখছি সমস্তই বেশ সুশৃঙ্খল, অর্থযুক্ত ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে জড়িত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু এ আমাদের বুদ্ধি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন রয়েছে বলে। যাঁদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়েছে—তাঁরা এ জগতেও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় আদৌ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখ্‌তে পান না। স্বপ্নাবস্থার ন্যায় এখানেও সমস্তই বিশৃঙ্খল। বীজ একটী সসীম জিনিষ—বৃক্ষও একটী সসীম জিনিষ। সুতরাং বীজ ও বৃক্ষের সহযোগে একটী অসীম প্রবাহ কখনও হতে পারে না। কতকগুলো সসীম রাশি যোগ করে যে কখনও একটী

অসীম শ্রেণী (Infinite series) হতে পারে না, আধুনিক গণিত-শাস্ত্রই তার প্রমাণ। সুতরাং জগৎ যে প্রবাহাকারে নিত্য—এটা একটা মস্ত ভুল। অতএব সাদৃশ্য (Analogy) ও বিচার উভয় দিক্ থেকেই জগৎটা যে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা তা দেখা গেল।

আর এক দিক্ থেকে দেখা যাক। যে জিনিষটা কিছুক্ষণ আগে ছিল না এবং কিছুক্ষণ পরে থাক্‌বে না—সেটা বর্ত্তমানেও নেই। যেমন মরীচিকা। মরুভূমিতে যখন জলভ্রম হয় তখনও জল নেই এবং ভ্রম হবার আগে বা ভ্রম দূর হবার পরে ত থাকেই না। সেই-রূপ সমুদয় জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ আদি ও অন্তবিশিষ্ট—দেশ-কাল-নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমানে তাদের যে অস্তিত্ব বোধ হচ্ছে সেটাও ঐ মরীচিকার মত ভ্রমমাত্র।

প্রঃ—স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎটাও মিথ্যা বলা হয়েছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, জাগ্রৎ অবস্থায় ক্ষিধে পেলে খেলেই তা দূর হয় কিন্তু স্বপ্নে তা হয় না।

উঃ—স্বপ্নে এক পেট খেলেও ঘুম ভাঙ্‌লে যেমন ক্ষিধে তেমনি থাকে একথা সত্য বটে। কিন্তু জেগে এক পেট খেয়েও ঘুমুবা-মাত্রও ত কেউ কেউ আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত মনে করে। সুতরাং, স্বপ্নটা যে মিথ্যা সে বিষয়ে যেমন আমরা সন্দেহ করি না, সেইরূপ জাগ্রৎটাও যে মিথ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। দুটোই এক রকমের মিথ্যা।

জাগ্রদবস্থার সঙ্গে স্বপ্নাবস্থার অদ্ভুত মিল রয়েছে। স্বপ্নে আমাদের দুরকমের অনুভূতি হয়—ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্বিষয়ের অনুভূতি এবং মনে মনে কল্পনাপ্রসূত অনুভূতি। জাগ্রদবস্থায়ও আমাদের ঠিক ঐ দুই রকমের অনুভূতি হয় চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা বহির্জ্জগতের রূপ, রস, গন্ধাদির অনুভূতি এবং মনে মনে কল্পনা দ্বারা অনুভূতি। দুই অবস্থাতেই আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি—আর কল্পনাজাত অনুভূতিকে মিথ্যা বলে থাকি। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে যেমন দেখ্‌তে পাই যে, স্বপ্নাবস্থায় দুরকম অনুভূতিই সম্পূর্ণ মিথ্যা,

সেই রকম জাগ্রদবস্থার উভয় প্রকার অনুভূতিও সর্ব্বৈব মিথ্যা। তবুও আমরা জাগ্রৎটাকে ভুল বল্‌তে চাই না। উহার মিথ্যাত্ব চিন্তা কর্‌তে চাই না। তার কারণ আমরা জগৎকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে চাই—উহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সম্ভোগ কর্‌তে চাই। তাই আমরা মায়াবাদের নাম শুন্‌লে চমকে উঠি. 'নেতি নেতি' মার্গ শুষ্ক জ্ঞানীর পথ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করি। তাই আমরা ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ কর্‌তে চাই।

"ভাঙ্গ বীণা, প্রেমসুধাপান, দূর কর নারীমায়া" দূর কর দুর্ব্বলতা। সাহসের সহিত বল এ জগৎ স্বপ্নবৎ। পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা এই সত্য ধারণা কর্‌বার চেষ্টা কর। এই রকম কর্‌তে কর্‌তে এক দিন নিশ্চয়ই ঘুম ভাঙ্গ্‌বে—তোমার স্বপ্ন ছুটে যাবে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক দর্শন।] [এরিস্টটল।

শ্রীকানাইলাল পাল এম, এ, বি, এল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্লেটোর বিজ্ঞানবাদ বা ভাববাদ (Idealism) ও এরিষ্টটলের বাস্তববাদ (Realism) মূলতঃ একই। মূল সত্য প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সেটীকে আর মূল বলা যায় না, সেটী সাধ্য বস্তু হইয়া পড়ে। সাধ্য হইয়া পড়িলে তাহার সিদ্ধি অপরের উপর নির্ভর করিবে এবং যেটীর উপর নির্ভর করিবে তাহাই সে স্থলে মূল পদবাচ্য হইবে। এরিষ্টটল ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সে কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। সুতরাং মূলতঃ উভয়ের

মধ্যে (এরিষ্টটল ও প্লেটোর মধ্যে) কোন অনৈক্য নাই—একথা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মূলসত্য ব্যাপকতম পদার্থ হওয়া চাই, নচেৎ সেটী আবার মূল পদবাচ্য হইবে না। নিগমন-মূলক যুক্তির প্রয়োগে ব্যাপকতর, ব্যাপক ও ব্যাপ্য যাবতীয় পদার্থের সম্বন্ধ ও পরিচয় পাওয়া যায়। নিগমন-মূলক যুক্তির প্রণালী কিরূপ, সে কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পাঠকবর্গ হয়ত এইখানে প্রশ্ন করিতে পারেন, মূল সত্য যদি স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণের বিষয় নয় তবে ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? এবং পাশ্চাত্য ন্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া এরিষ্টটলই বা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন কিরূপে? কথাটী প্রণিধানযোগ্য। উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, মূল সত্য প্রমাণগম্য নয় একথা ন্যায়শাস্ত্রই বলিতে সক্ষম। যিনি বিশুদ্ধ যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে বিচার করিতে সক্ষম, তিনিই শেষে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের সর্ব্ব প্রথমে একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখি, এরিষ্টটল ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করিয়া প্রথমেই ইহার আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান সকল জ্ঞানের মূল, সুতরাং যাবতীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতে হইলে প্রথমেই ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে।

বিচারপ্রণালী নিয়মসঙ্গত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। সক্রেটীসের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতে কেহ এই নিয়মের মর্য্যাদা সম্যক্ অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ। সন্দেহই আমাদিগকে প্রথমতঃ দার্শনিক চিন্তায় ব্রতী করে। যাহার মনে সন্দেহ উদয় হইলে সেটী দূর না করিয়া এড়াইয়া যাইতে দেয় তাহার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন একটী বস্তু দেখিলাম, সেটী কি সম্যক্ জানা থাকিলে কোন প্রশ্নের বা সন্দেহের কারণ থাকে না। কিন্তু আমি যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি বা অনুভব করিতেছি, তাহাই যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা

কে বলিল? যে বস্তু প্রকৃত যাহা, সেটীকে তৎরূপে জানাই সত্য জ্ঞান, সেটীকে অন্যরূপে জানা মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তি। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা সত্য, রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা মিথ্যা। জ্ঞান ও বস্তুর সম্বন্ধ লইয়াই 'সত্য' 'মিথ্যা' পদ প্রযুক্ত হয়। যাহা সৎ তাহারই অস্তিত্ব জ্ঞান অথবা যাহা সৎ নয় তাহার অনস্তিত্ব জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান এবং যাহা সৎ তাহার অনস্তিত্ব জ্ঞান অথবা যাহা সৎ নয় তাহার অস্তিত্ব জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বলা হয় (Affirming non-existence of the existent or existence of the non-existent is falsehood but affirming existence of the existent and non-existence of the non-existent is truth)। সম্মুখে রজ্জু রহিয়াছে, রজ্জু সৎ - সেই সৎ বস্তু রজ্জুকে দেখিয়া তাহারই অস্তিত্ব জানাই সত্য জ্ঞান। সম্মুখে রজ্জু রহিয়াছে, রজ্জু সৎ—তাহার অনস্তিত্ব অর্থাৎ সর্পের অস্তিত্ব জানা মিথ্যা জ্ঞান। এরিষ্টটলের উক্তি অনুসারে এই বাস্তব ও চিন্তার সম্বন্ধ বিচারই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায় সেই কার্য্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যাউক।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বস্তু মাত্রেরই একটী না একটী সংজ্ঞা আছে; সেই সংজ্ঞা আবার সেই বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হয়। সংজ্ঞা বলিলেই কতকগুলি, অন্ততঃ একটী গুণকে বুঝাইবেই বুঝাইবে। যে স্থলে কতকগুলি গুণকে বুঝায়, সেখানেও তাহাদের মধ্যে একটীরই বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতাকে লক্ষ্য করে। এই যে গুণ বা ধর্ম্ম এগুলি আমাদের চিন্তার বিষয় এবং তৎসাহায্যে আমরা বস্তুর সত্তা অর্থাৎ বাস্তবিক সেটী কি, ইহাই আমরা স্থির করিতে অগ্রসর হই। এইবার দেখা যাউক, কোন একটী বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে কি ভাবে আমরা সেটীকে গ্রহণ করি। প্রথমেই সেটী একটী 'বস্তু' (Substance) বা 'দ্রব্য'—ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তার পর সেটীর 'সংখ্যা' (Quantity) বা 'পরিমাণ' আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তার পর তাহার 'গুণের' (Quality)

পরিচয় প্রাপ্ত হই। 'সংখ্যা' বা 'পরিমাণ' জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'সম্বন্ধ' (Relation) জ্ঞানের উদয় হয়। যদি কাহারও 'সংখ্যা' জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'সম্বন্ধ' জ্ঞানের উদয় না হয় তবে 'গুণ' জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হওয়া অনিবার্য্য। 'দেশ' (Space) ও 'কালের' (Time) সম্বন্ধ লইয়াই 'সম্বন্ধ'; পার্থিব বস্তু মাত্রেই 'দেশ' ও 'কালে' বর্ত্তমান—এমন কোন বস্তু নাই, যেটী কোন 'কালে' বা কোন 'দেশে' অবর্ত্তমান। বর্ত্তমান বলিলে 'কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান' (Position) একথা তাহার পরই মনে হয়। 'দেশ' ও 'কালের' সহিত 'দ্রব্যের' সম্বন্ধ লইয়া বস্তুর 'অবস্থান' (Position) নির্দ্দিষ্ট হয়। অপর পক্ষে 'গুণের' সহিত 'দ্রব্যের' সম্বন্ধ লইয়া কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বা 'অধিকার' (Possession) জ্ঞান জন্মে। এবং ঐ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ যাহা দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহাকে 'ক্রিয়া' (Action) বলে, এবং সেই 'ক্রিয়া' যাহার উপর সংঘটিত হয় সেই বস্তু ক্রিয়ার 'আশ্রয়' (Position) বলিয়া গণ্য হয়। 'অধিকার' (Possession), 'ক্রিয়া' (Action) ও 'আশ্রয়' (Position) এই তিনটীর পরিচয় আর একটু বিশদভাবে দেওয়া প্রয়োজন। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি বর্ত্তমান, অগ্নি দাহিকা শক্তির 'অধিকারী', সুতরাং দাহিকা শক্তি অগ্নির 'অধিকারিত্বে' (Possession) বা অধিকারে। এই 'অধিকার' জ্ঞান 'দ্রব্য' ও তাহার 'গুণের' সম্বন্ধ ছাড়া কখনও উদয় হয় না। অগ্নি দহন করে; দহন-কার্য্য অগ্নির 'ক্রিয়া'-বিশেষ (Action); যদি কল্পনা করা যায়—অগ্নি আছে, আর কিছুই নাই, তাহা হইলে অগ্নির দহনরূপ কার্য্যের বা ক্রিয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। অগ্নি ও অগ্নি ছাড়া অপর একটী বস্তুর সম্বন্ধ হইতে 'ক্রিয়ার' প্রকাশ হয়। এস্থলে দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নিতে বর্ত্তমান তেমনি অপর বস্তুতে দাহ্য হইবার শক্তি বা গুণও বর্ত্তমান থাকা চাই। দাহিকা শক্তির বিকাশ হইতে হইলে অগ্নি ও অগ্নি ভিন্ন অপর বস্তু থাকা চাই। ইহাই হইল ক্রিয়ার নিয়ম। অগ্নি পুড়াইতেছে, কাষ্ঠ পুড়িতেছে—একটী 'বিষয়' অপরটী 'আশ্রয়'। একটী

'অধিকারী' অপরটী 'আশ্রয়ী'। "'গুণের' ব্যক্তাবস্থা 'ক্রিয়া' ; 'ক্রিয়া', 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' অবলম্বন না করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না।

কোন একটী বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে আমরা চিন্তাবলে তাহাকে এই দশটী প্রকরণ-সাহায্যে গ্রহণ করি।

* ভাষার সাহায্যে আমরা মনোভাব প্রকাশ করি, সুতরাং ভাষার সহিত চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা দরকার। যে ভাষায় আমি যে ভাব প্রকাশ করি, অপরেও যদি তাহাই করে, তবেই ভাষার সার্থকতা। কর্তৃকারক, 'দ্রব্যকে' বুঝায় ; 'পরিমাণ', 'গুণ' ও 'সম্বন্ধ', বিশেষণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়, ক্রিয়ার বিশেষণ, 'দেশ' ও 'কালকে' জ্ঞাপন করে। ক্রিয়া ও ক্রিয়া সম্বন্ধমূলক 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত হয়।

ক্যাটিগরিস্ De. Categories পুস্তকে দশবিধ প্রকরণের উল্লেখ আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী পুস্তকে 'অবস্থান' (Position) ও 'অধিকারিত্ব' (Possession) এই দুইটীকে অপরের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'দেশ' ও 'কাল' দ্বারা 'অবস্থানের' জ্ঞান জন্মায়, সুতরাং 'অবস্থানের' পৃথক একটী স্থান প্রদান করার প্রয়োজন থাকে না। 'গুণ', 'গুণীতে' বা 'দ্রব্যে' বর্ত্তমান, 'দ্রব্য', 'গুণের' 'অধিকারী' ; 'গুণ' বলিতেই এই 'অধিকারিত্বকে' বুঝায় ; সেই কারণ এই 'অধিকারিত্ব'ও শেষে প্রকরণশ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

বুঝা গেল (১) 'দ্রব্য' (Substance) (২) 'দেশে' (Space) ও (৩) 'কালে' (Time) বর্ত্তমান ; 'দ্রব্য' মাত্রেই (৪) 'গুণ' (Quality) সম্বলিত এবং তাহার (৫) 'পরিমাণ' (Quantity) আছে এবং সেই 'দ্রব্যের' (৬) 'ক্রিয়া' কখনও অব্যক্ত কখনও ব্যক্ত। 'ক্রিয়া' ব্যক্তাবস্থায় 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত এই ক্রিয়ার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' উভয়েই 'দ্রব্যের' অন্তর্গত সুতরাং ক্রিয়ার বিষয় ও আশ্রয়কে পৃথক ভাবে উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। ক্রিয়ার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'কে প্রকরণ-শ্রেণী হইতে বাদ দিলে আমরা ষট্‌প্রকরণ প্রাপ্ত হই। ন্যায়ের ষট্ পদার্থ এ স্থলে স্বতঃই স্মরণ-

পথে উদিত হয়। এ স্থলে উভয়ের মধ্যে ঐক্য বা অনৈক্য বিচার স্থগিত থাকুক।

Metaphysics (তত্ত্ববিজ্ঞান) গ্রন্থে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এরিষ্টটল পরিশেষে আটটী প্রকরণকে তিনটীতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। বিচার-বুদ্ধির ক্রমবিকাশে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদার্থকে তিনটী প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যথা—'দ্রব্য', 'গুণ' ও 'সম্বন্ধ'। সম্বন্ধ বলিতেই 'দেশ' ও 'কালের' সম্বন্ধ বুঝায়, সুতরাং 'দেশ' ও 'কালকে' পৃথকরূপে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। 'গুণের' ব্যক্তাবস্থা লইয়াই 'ক্রিয়া' এবং 'ক্রিয়ার' প্রকাশের জন্য 'বিষয়' ও 'আশ্রয়ের' অবলম্বন আবশ্যক; সুতরাং 'ক্রিয়া', 'অধিকার' ও 'আশ্রয়' এগুলিকে গুণের অন্তর্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'পরিমাণ' জ্ঞান দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে, সুতরাং 'পরিমাণ'কেও পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

'দ্রব্যের' সহিত গুণের সম্বন্ধ লইয়াই জগৎ, সুতরাং চিন্তা-প্রণালীর মূলে তিনটী মাত্র প্রকরণ হইলেই যথেষ্ট। যে 'দ্রব্যের' সহিত যে 'গুণের' নিত্য সম্বন্ধ, সেইটীই তাহার 'স্বরূপ' শক্তি (essence) বা গুণ, আর যেটীর সহিত সে সম্বন্ধ নাই সেটী আগন্তুক মাত্র উপলক্ষণ (accident)। প্রত্যেক ত্রিকোণের (triangle) কোণগুলির সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি, এটী ত্রিকোণের স্বরূপ-গত গুণ। এই ত্রিকোণটীর তিনটী ভুজ সমান বা সমান নয় এই গুণ ইহার পক্ষে আগন্তুক মাত্র।

কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই প্রকরণ সাহায্যে আমাদের সে কার্য্য সাধিত হয়; সুতরাং এরিষ্টটল প্রথমেই ঐ প্রকরণের পরিচয় প্রদান করিয়া সংজ্ঞা নির্দ্দেশে অগ্রসর হন। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে যে 'দ্রব্যের' সহিত যে 'গুণের' নিত্য সম্বন্ধ, আমাদের তাহাই স্থির করিতে হইবে। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে বাক্যের সাহায্যেই তাহা হওয়া সম্ভব। ত্রিকোণ মাত্রেরই কোণ-সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি; ত্রিকোণের এই

যে গুণ, ইহার দ্বারাই ত্রিকোণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সম্ভব। ঐ বাক্যই সুতরাং সংজ্ঞানির্দ্দেশের উপায় মাত্র। এই বাক্য হয় অন্বয়ী (affirmative) অথবা ব্যতিরেকী (negative); অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যই হয় সত্য' অথবা মিথ্যা। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে দ্রব্যের সহিত গুণের নিত্য সম্বন্ধকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তবেই সেটী অভ্রান্ত হইবে, নচেৎ তাহা সংজ্ঞা নামেরই যোগ্য হইবে না। সংজ্ঞা-প্রকাশক যে বাক্য তাহা সত্যই হইবে, কিন্তু বাক্য মাত্রই সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। উদাহরণ-সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। রাম হয় খঞ্জ; এস্থলে 'রাম' এই সংজ্ঞা দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে সেখানে কোন ভ্রম নাই, 'খঞ্জ' বলিতে যাহা বুঝায় সেখানেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাম খঞ্জ না হইতে পারে এবং রাম খঞ্জ না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে খঞ্জ বলায় ঐ বাক্য মিথ্যা বাক্য হইল। রামের সহিত খঞ্জত্ব সম্বন্ধ নিত্য নয় সুতরাং উহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। একটী বাক্য হয় সত্য হইবে না হয় মিথ্যা হইবে। একটী বাক্য একাধারে সত্য ও মিথ্যা হইতে পারে না। রাম যদি খঞ্জ হয়, তবে রাম খঞ্জ নয়, এ কথা আর বলা যায় না। যুক্তির এই যে মৌলিক নিয়ম 'বিরোধ নিয়ম' (Law of contradiction) এরিষ্টটলই প্রথমে প্রচার করেন। কোন দ্রব্য বা বস্তু সম্বন্ধে কোন গুণ হয় বর্ত্তমান থাকিবে না হয় অবর্ত্তমান থাকিবে, বিরোধ নিয়ম হইতেই এই মধ্যাভাব নিয়ম (Law of excluded middle) সিদ্ধ হয়। এই যে মৌলিক নিয়ম, ইহা অনুমানসাপেক্ষ নয়; ইহা না মানিলে যুক্তি-বিচার অসম্ভব। এই নিয়মের সত্যতা, মৌলিকতা স্বতঃসিদ্ধ—এরিষ্টটল এই কথাই প্রচার করেন। নিগমন-মূলক যুক্তিরও ইহাই মূল নিয়ম। পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(ক) মনুষ্যমাত্রেই মর;
রাম একজন মনুষ্য;
সুতরাং রাম মর।

মানুষ—এটী একটী উদ্দেশ্য (subject)। মর—এটী বিধেয় (Predicate)। মানুষ মাত্রেই মর—এটী সাধ্যাবয়ব (major premise)। রাম—এটী একটী উদ্দেশ্য। মনুষ্য—বিধেয়। রাম একটী মনুষ্য—এটী পক্ষাবয়ব (minor premise)। রাম—এটী উদ্দেশ্য, মর—এটী বিধেয়। রাম মর এটী—অনুমান (conclusion)।

এইটী হইল নিগমন-মূলক যুক্তির প্রণালী।

আমি জানিতাম 'মনুষ্য মাত্রেই মর' আর জানিতাম রাম একটী মানুষ', এখন কিরূপে অনুমান করিলাম 'রামও মর'? না, হেতু (middle term) সাহায্যে। সেই 'হেতু' এখানে মনুষ্য। এই 'হেতু' উপরের লিখিত (ক) উদাহরণে সাধ্যাবয়বে উদ্দেশ্যপদ ও পক্ষাবয়বে বিধেয়পদ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই 'হেতু' সাধ্যাবয়বে ও পক্ষাবয়বে উভয় স্থলে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হইতে পারে।

উভয় স্থলেই বিধেয়। যথা—

(খ) রাম একজন মনুষ্য -শ্যাম একজন মনুষ্য।

উভয় স্থলেই উদ্দেশ্য। যথা—

(গ) মনুষ্য মাত্রেই চিন্তাশীল।

মনুষ্য মাত্রেই দুই হস্তবিশিষ্ট।

এখানে (ক) উদাহরণে 'হেতুর' সাহায্যে আমরা অনুমান করিতে সমর্থ হই এবং সাধ্যাবয়বের বা পক্ষাবয়বের প্রত্যেকটীর উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কোন অনৈক্য না থাকে তাহা হইলে আমাদের অনুমানও সত্য হইবে। পরন্তু (খ) ও (গ) উদাহরণে পক্ষাবয়ব ও সাধ্যাবয়বকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যকে হেতু ধরিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। ঐরূপ অনুমান যে ভ্রান্ত হইবে সেটী সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে (খ) উদাহরণটী বিচার করিয়া দেখা যাউক—এই উদাহরণের সাধ্যাবয়ব হইতে জানিতে পারি, মনুষ্য বলিতে যে জাতি বুঝায়, রাম তদন্তর্গত ব্যক্তি-বিশেষ শ্যামও তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এক জাতির অন্তর্ভুক্ত দুইটী বিশেষ পদার্থ কখনও 'একাত্মক' (identical) হইতে পারে না।

সুতরাং 'রাম হয় শ্যাম' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। (গ) উদাহরণটী গ্রহণ করিলে দেখা যায়, একই জাতির দুইটী বিশেষ গুণ আছে কিন্তু সেই বিশেষ গুণ একাত্মক হইবে কিরূপে? তাহা হইলে 'দুই হস্তবিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই চিন্তাশীল' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। পরন্তু এমনও প্রাণী আছে যাহারা দুই হস্তবিশিষ্ট অথচ চিন্তাশীল নয়। এই উদাহরণ-সাহায্যে বুঝা গেল, সাধ্যাবয়বের যেটী উদ্দেশ্য পদ সেইটা যদি পক্ষাবয়বের বিধেয় পদ হয়, তবেই আমাদের অনুমান যুক্তিযুক্ত হয় নচেৎ যথাযথ অনুমান সম্ভব হয় না; এবং প্রত্যেক অবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্বন্ধ যদি বাস্তব হয় অর্থাৎ কাল্পনিক না হয় তবেই আমাদের অনুমানও সত্য হইবে। আমরা এই বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা আগামী বারে লিপিবদ্ধ করিয়া তত্ত্ববিদ্যালোচনায় (Metaphysics) ব্যাপৃত হইব।

(ক্রমশঃ)

স্বামীবিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী।

(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে আছে—"এক সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতলে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'দেখ্ 'তপস্যাপ্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যার পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার ঐসকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐসকল প্রদান করি, কারণ মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐসকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে ঐসকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি—কি বলিস্?'

ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্দ্র দৈবশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়নগোচর করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশ্বাস করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। অবিশ্বাস না করিলেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে ঐ সকল বিভূতি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে দিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভবিষয়ে সহায়তা হইবে কি?' ঠাকুর বলিলেন, 'সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বরলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।' নরেন্দ্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বরলাভই হউক, পরে ঐ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতি সকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই—এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি—তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে যে।' ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভূতি সকল সত্য সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন অথবা তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্তভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় বলা সাধ্যাতীত কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন একথা আমাদিগের জানা আছে।"

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম বিরল নহে। যখন ভগবান্ শ্রীঈশার চল্লিশ দিন অনাহারে ও কঠোর তপস্যার পর সয়তান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজ্যাদি নানা ভোগ-সুখ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তখন ঈশা প্রলোভনবেশী সয়তানকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Get thee hence, Satan, for it is written Thou shalt worship the Lord, Thy God and Him only shalt Thou serve." শ্রীবুদ্ধের কঠোর সাধনকালে যখন মার মায়ার মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল তখন তিনিও বজ্রগম্ভীর

স্বরে বলিয়াছিলেন, "দূর হও মার, আমি তোমাকে চিনিয়াছি।" ইঁহারা প্রলোভনকে প্রলোভনরূপে জানিয়া সত্যলাভের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর জীবনের এই ঘটনা, এই প্রত্যাখান, এই কঠোর পরীক্ষা কত বীরত্বব্যঞ্জক, কত মহৎ, কত বৈরাগ্যপূর্ণ। এখানে যিনি তাঁহার জীবনের আদর্শদেবতা, যিনি তাঁহার জীবনের ধ্রুবজ্যোতি, যাঁহাকে তিনি প্রাণে প্রাণে বলিয়াছিলেন, "প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর! কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।"—যখন সেই পরমযোগেশ্বর মহাপুরুষ ঐ বিভূতিসকল তাঁহাকে প্রদান করিতে চাহিতেছেন তখন স্বামিজী—তাহা ঈশ্বরলাভের সহায়তা করিবে না জানিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই ঘটনাটী পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় ঈশ্বরলাভ ভিন্ন আর যত কিছু তাঁহার নিকট সব তুচ্ছ! ত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগের কি জ্বলন্ত উদাহরণ! যখন স্বামিজী সেই মহা-সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া বেদমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সমন্বয়-বাণী ও প্রেমের বার্ত্তা জগতে প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন তখন এই অদ্ভুত ত্যাগিরাজ—এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যবান্ তেজোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসী তাঁহার কোন সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥" আবার যখন তিনি সেই চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় সেই সুদূর প্রতীচ্য-ভূখণ্ড আমেরিকা প্রদেশে—যখন সকল প্রকার গৌরব প্রতিষ্ঠা ও জয়শ্রী তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে তখন সেই কৌপিনধারী নির্ভীক যুবক সন্ন্যাসী যোগীরাজ নীলকণ্ঠ শঙ্করের ন্যায় সে দিকে দৃকপাত না করিয়া বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে শান্তি ও অভয় বাণী প্রচার করিতেছেন! কামকাঞ্চনাসক্ত জীবকে ত্যাগ ও পবিত্রতার মন্ত্রে আহ্বান করিতেছেন! অনন্ত নরক-ভয়-প্রপীড়িত জনগণকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, "হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমাদিগকে কে বলে পাপী। (Sinner? It is a

sin to call a man so) পাপী ? মানুষকে পাপী বলাই মহাপাতক ? জানি না পূর্ব্বে কেহ মানবকে ঐরূপ ভাবে অমৃত-আস্বাদনে আহ্বান করিয়াছেন কি না! "আত্মার মহিমায় মহিমানিত হও। শান্তি—ভোগে নহে, ত্যাগে। জড়ের পূজায় মৃত্যু, চৈতন্যের উপাসনায় অমরত্ব। হে ভোগমুগ্ধ, ভোগকে ছাড়িয়া ত্যাগকে আশ্রয় কর; নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মায়াময় সংসারকে ত্যাগ করিয়া সেই অবিনশ্বর সনাতন সত্যকে আশ্রয় কর।"—ইহাই স্বামিজী প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজীর এই মেঘমন্দ্রস্বর, শান্তির এই অপূর্ব্ব নির্ঘোষ—তখন সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল। জানি না সেই মহাবাণী আবার প্রতিধ্বনিত হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিকে এই মহাকল্যাণকর পথে পরিচালিত করিবে কি না? কিন্তু যদি না করে তবে পাশ্চাত্য জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

আর এই পুণ্যভূমি ভারতে—যেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, যেখানে ধর্ম্মসংস্থাপক অবতার পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন—যেখানে যুগ-যুগান্ত হইতে বিশ্বের মহাসত্য নরজীবনে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে—যেখানে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম, অপূর্ব্ব দর্শন এবং অপূর্ব্ব সভ্যতা ভারতকে পবিত্রতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছে, সেই ভারতে যখন সনাতন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন পাশ্চাত্য-জাতির অনুকরণলোলুপ, হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত, অনাচারী উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগলিপ্সু কপটিগণের প্রাধান্য হইয়াছিল, যখন ধর্ম্ম কেবল সম্প্রদায়-বিদ্বেষে ও বহিরাচরণে, পাণ্ডিত্য কেবল বিজাতীয় গ্রন্থের চর্ব্বিতচর্ব্বণে, বীরত্ব যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিমানের পদলেহনে—তখন এই স্বেচ্ছাচারী জড়বুদ্ধি জড়-বিদ্যাভিলাষী আর্য্য সন্তানের মধ্যে নিরক্ষর সরল দরিদ্র ব্রাহ্মণ—ভাগীরথী বেষ্টিত পঞ্চবটীমূলে ভারতের—জগতের উদ্ধারকল্পে যে মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন—বিশ্বের পাবনরূপে মহান্ সত্যের আদর্শস্বরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ ভাগবত তনু ধারণ করিয়াছিলেন—স্বামিজী

জলদগম্ভীর স্বরে ভারতের সেই সনাতন আদর্শকে জগতে লোক-চক্ষুর সমক্ষে স্থাপিত করিয়া সম্প্রদায়দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ সমন্বয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি জ্বলন্ত ভাষায় ভারতবাসীকে বলিয়া গিয়াছেন—

"বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছিলেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্র যামাগতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোন অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতনসমূহ গোষ্পদের তুল্য।

"—সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলা প্রায়।

"পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

"এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ

শ্রীযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব! ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর।"

অন্যত্র, স্বামিজী তাঁহার কোন শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, "বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র ইহাতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত, কিন্তু উহাতে আবার গোঁড়ামী আসিবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রোধ হইবার আশঙ্কা আছে। জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু উহাতে আশঙ্কা, পাছে উহা শুষ্ক বাদবিতণ্ডায় দাঁড়ায়।

"ভক্তি খুব বড় জিনিষ, কিন্তু উহা হইতে নিরর্থক ভাবুকতা আসিয়া আসল জিনিষটাই নষ্ট হইবার যথেষ্ট ভয় আছে।

"এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এইরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল।"

"ভগবান যদিও সর্ব্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জান্‌তে পারি কেবল মানব চরিত্রের মধ্য দিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই, সুতরাং আমাদের তাঁকেই কেন্দ্রস্বরূপ করে তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। অবশ্য যে তাঁকে যে ভাবে নিক্‌, তাতে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ পুরুষ বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক—যার যা খুসি—সে তাঁকে সেই ভাবে নিক।"

তমাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে জাগ্রত করিবার জন্য তিনি আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে রজোগুণের বিকাশ হয় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতে পৈত্রিক শক্তি বিদ্যমান; যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহা পুনস্ফুরণ হইবে।"

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে? স্বামিজী বলিতেছেন—"তবে হইবে কি? যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না, যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার

হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, * * * সেই আত্মনির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা। চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে এই রজোগুণই আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। কেন না স্বামিজী আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,"অপর দিকে তালপত্র-বহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম। সত্ত্ব প্রায় নিত্য। রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণ প্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।" তমোগুণ-সমুদ্রে নিমগ্ন ভারত রজোগুণের মধ্যে দিয় সত্ত্বে উপনীত হইবে—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তির সঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্ম বিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয় জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয় জন? সে মহাবীরত্ব কয় জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয় জনের ভাগ্যে ঘটে যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমা চিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?"

আধুনিক ভারতের ইংরাজীশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মূলকারণ হিন্দু ধর্ম্মকে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা মনে করেন, আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি সমাজনীতি বা রাজনীতির উপর স্থাপিত হইলে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। কিন্তু স্বামিজী এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,

"হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দু ধর্ম্ম তো শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা—সহানুভূতির অভাব হৃদয়ের অভাব।"

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না; ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্য্যাদাহীন দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, সাহায্য আসিবেই আসিবে।" স্বামিজী দেশের যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতের জন্য এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।

"তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগসঞ্চিত পর্ব্বত-প্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

"তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহা বুঝিলে, কেবল বিশ্বাসী হও।

"আমরা ধনী বা বড় লোককে গ্রাহ্য করি না; হৃদয়শূন্য মস্তিষ্ক-সার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র প্রবন্ধসমূহকেও

গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস! বিশ্বাস! সহানুভূতি! অগ্নিময় বিশ্বাস! অগ্নিময় সহানুভূতি! জয় প্রভু জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত! জয় প্রভু; অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে চাহিও না। এগিয়ে যাও সম্মুখে সম্মুখে! এইরূপে আমরা অগ্রগামী হইব, একজন পড়িবে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।" স্বামিজী অগ্নিময়ী বাণীর দ্বারা আমাদিগকে যে জীবনসংগ্রামের জন্য আহ্বান করিয়া গিয়াছেন,তাহার লক্ষ্য "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" সে সংগ্রামের অস্ত্র সরলতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিশ্বপ্রেম, সে মহারণের ভেরী—অভীঃ অভীঃ অভীঃ, সে সংগ্রামের জয়নাদ—জয় প্রভুর জয়, জয় গুরুমহারাজের জয়, জয় মহামায়ীর জয়! এই সংগ্রাম—পাশবিক নরহত্যা নহে। এই যুদ্ধে ভ্রাতৃরক্তে ভ্রাতৃহস্ত কলুষিত হয় না। এই যুদ্ধে মানুষ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় মহানগরী শ্মশানে পরিণত করে না; চঞ্চল হৃদয়ে অশান্তির আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় না। এই যুদ্ধে মানুষ দেবতা হয়, ভোগসুখকাতর প্রলুব্ধ চিত্ত সংযত হইয়া শান্তি ও আনন্দের বিমল ধারায় অবগাহন করে। এই যুদ্ধে ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান মূর্খকে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে, পুণ্যবান পতিতকে, সাধু অসাধুকে, বলবান দুর্ব্বলকে ভাই বলিয়া—আপনার অভিন্ন দেহ বলিয়া—সেই মহাশক্তির এক সত্তা জানিয়া গাঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করে। ঐ শুন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত মহাসমন্বয় বাণী "হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, কর্ম্মী, আস্তিক নাস্তিক ভ্রাতৃপ্রেমে সম্মিলিত হইয়া সেই মহাসত্যের দিকে অগ্রসর হও।" জগতের সেই শুভমুহূর্ত্তে সেই অপূর্ব্ব সমন্বয়লীলা দেখিয়া বিশ্বাসী মহানন্দ ভোগ করিবে। সে-দিন আসিবেই আসিবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজি হউক কালি হউক শতযুগ পরে হোক্ প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর

নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস সম্পন্ন হও।" স্বামিজী প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব।" জীবের কল্যাণ-যজ্ঞে যিনি স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি ইহা বলিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, "এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতেছেন। সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ, প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত—একজনের সঙ্গে যেন আর একজনের তফাৎ এই, কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের কেবল ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল।" তাই স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছিলেন,—"প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বর দৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্ণু ভেব না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাৎ, কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজা স্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি,—আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে উহা বলিতেই হইবে, কারণ তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি।"

এই দরিদ্র নারায়ণ, আর্ত্ত নারায়ণের সেবার দ্বারাই

দিন দিন চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন। এই জীবন্ত নারায়ণের সেবা জগতে নূতন। ইহা প্রেমের ভিত্তির উপরে স্থাপিত। এই মহাসমন্বয় ও এই মহা প্রেমপূর্ণ সেবাধর্ম্ম সমগ্র জগত প্লাবিত করিবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌ দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর।" আসুন এই পবিত্র পুণ্য প্রবাহে আমরা নিমজ্জিত হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হই। আর যেন সরল পবিত্র মনে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, "কার্য্যে আমাদের অধিকার—ফল প্রভুর হস্তে।" কেবল আমরা বলি, "হে ওজঃস্বরূপ আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ, আমাদিগকে বীর্য্যবান কর; হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বলবান কর।"

শঙ্করদেব। *

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

ইদানীং ব্রহ্মপুত্রোপত্যকায় প্রায় ঊনবিংশ লক্ষ হিন্দুর বাস। এতন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ লক্ষই বৈষ্ণব মতাবলম্বী। বৈষ্ণবগণ মহাপুরুষীয়া, দামোদরীয়া, মোয়ামারিয়া, হরিদেব পন্থী, গোপালদেব পন্থী, চৈতন্য পন্থী প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এতৎ-প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রসারণশীলতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রভাবে অদ্যাপি বহু পার্ব্বত্য জাতি সুবিশাল হিন্দুসমাজের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ-কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। আজিও হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত অনার্য্যগণ আচারবান্‌ হইয়া গোস্বামী প্রভুগণের "শরণীয়া"

* আসামে ইঁহাকে "হঙ্করদেব" বলে কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম শঙ্করদেব। আসাম অঞ্চলে 'শ' ও 'স' অনেকটা 'হ'রূপে উচ্চারিত হয়।

অর্থাৎ শরণাপন্ন হইলে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই আচারবান্ অনার্য্যগণ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ হইতে উদার ব্যবহার প্রাপ্ত ও ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট উন্নত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, আসামে হিন্দু সমাজ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। আসামে এই যে পূর্ণমাত্রায় বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যে মহাত্মা তাহার মূলীভূত কারণ—যিনি আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহার পবিত্র স্মৃতি আজও আসামের অণুপরমাণুর সহিত বিজড়িত, যাঁহার সুলেখনী দ্বারা অসমীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত, যিনি ভগবদবতার-রূপে সম্পূজিত, যাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ কালে আজিও আসাম-বাসীর বক্ষ গৌরবে স্ফীত, হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে উদ্বেলিত ও মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত হয়—সেই ভক্তকুলচূড়ামণি মহাপুরুষ শঙ্কর-দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শঙ্করদেব আসামের সুবিখ্যাত 'শিরোমণি ভূঞা' চণ্ডীবরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বা বৃদ্ধ প্রপৌত্র। চণ্ডীবর * এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কমতেশ্বর † দুর্ল্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য হইতে আনীত হন। চণ্ডীবর ও তৎপিতা লম্বাদেব প্রথমতঃ লেঙামাগুরী নামক স্থানে উপনিবেশিত হন। কালে চণ্ডীবর কোন কারণবশতঃ রাজরোষ-বহ্নিতে পতিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; কিন্তু পরে কোন কার্য্য দ্বারা কমতেশ্বরের প্রীত্যুৎপাদন করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। দুর্ল্লভনারায়ণ এই কার্য্যে তাঁহার প্রতি এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি চণ্ডীবরকে 'দেবীদাস' নাম প্রদানপূর্ব্বক 'শিরোমণি ভূঞা' অর্থাৎ ভূঞাশ্রেষ্ঠ ‡ পদে বরণ করিয়া সম্মানিত

* ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

† আসামেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশীয় প্রথম রাজা নীলধ্বজ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া স্বীয় রাজ্যের পশ্চিমাংশে কমতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

‡ নেপাল ও বঙ্গের ন্যায় আসামেও বারভূঞা প্রথা প্রচলিত ছিল।

করেন। অবশেষে চণ্ডীবর টেম্বুয়ানি বরদোয়ায় বাস স্থাপন করেন।

চণ্ডীবরের প্রপৌত্র কুসুমবর সুদীর্ঘকাল পুত্রহীন থাকায় পুত্র-লাভাকাঙ্ক্ষায় দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন ও পুত্র-কামনায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বনগঞাগিরির জন্মের পূর্ব্বেই প্রথমা স্ত্রী সত্যসন্ধ্যার গর্ভে একটী পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্ররত্নই সুপ্রথিতযশা শঙ্করদেব।

১৩৭১ শকের * কার্ত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে বৃহস্পতিবার নিশীথ-কালে শঙ্করদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অপরূপ রূপচ্ছটায় ও জ্যোতির্ম্ময় দেহপ্রভায় সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ ভাস্করদেব গগনমণ্ডল হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা সূতিকাগৃহ উদ্ভাসিত করিয়াছেন। শঙ্করের জন্মবার্ত্তা ঘোষিত করিয়া মেঘমালা মৃদুগর্জ্জন ও অশ্বসমূহ হ্রেষারব করিয়া উঠিল। পুত্রের জন্মসংবাদে কুসুমবরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নবজাত তনয়ের লাবণ্যমণ্ডিতানন সন্দর্শন করিয়া কুসুমবরের হৃদয়তন্ত্রী যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সুরে বাজিয়া উঠিল—হৃদয়সলিলে আনন্দলহরী ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্নানান্তে বিশুদ্ধ হইয়া কুসুমবর স্বীয় কুলোচিত দানাদি কার্য্য সমাধা করিলেন। দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া কহিলেন, "এই শিশুর ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। কালে এই শিশু ঐশীশক্তিবলে নামধর্ম্মের প্রবল প্রেমবন্যা প্রবাহিত করিয়া সহস্র সহস্র জীবের মুক্তির কারণ হইবেন।"

অতি শৈশবে শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়। † তাঁহার মাতাও

* শঙ্করদেবের জন্ম ও মৃত্যুর সময় লইয়া বহু মতভেদ বর্ত্তমান। ইদানীং অনেকেই ১৩৭১ শক শঙ্করদেবের জন্ম শক ও ১৪৯০ শক তাঁহার মৃত্যু শক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

† শঙ্করের জনক ও জননীর মৃত্যুসময় নির্দ্ধারণে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ-ভূষণ ও অন্যান্য কতিপয় শঙ্কর-চরিতাখ্যায়কের মতে তাঁহার মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ

অনতিবিলম্বে পতির অনুগামিনী হন। বালক শঙ্করের লালন-পালনের ভার তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহীর স্কন্ধে পতিত হইল। বাল্য-কালে শঙ্কর নিরতিশয় চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। প্রায় দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি মা সরস্বতীর সহিত সর্ব্বসম্পর্ক-বিহীন ছিলেন। একদিন শঙ্কর অন্নভোজনে নিরত রহিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমাদিগের এই মহদ্বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তোমার এত বর্ষ বয়ঃক্রম হওয়া সত্বেও, তুমি বিদ্যাশিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; আমার বোধ হয় তুমি মূর্খ হইয়া অশেষ দুর্গতিভাজন ও এই পবিত্র বংশের গ্লানির কারণ হইবে।" বৃদ্ধা পিতামহীর এই বাক্যগুলি শঙ্করের অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি বিদ্যালাভ করিবার জন্য অন্তরে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্কর মহেন্দ্র কন্দলির নিকট পাঠারম্ভ করিলেন। শীঘ্রই পাঠাভ্যাসে তাঁহার আশ্চর্য্যজনক অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হইল। তিনি তাঁহার সতীর্থগণকে শীঘ্রই অতিক্রম করিয়া গেলেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ সমাপন করিয়া শঙ্কর পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎকাল যোগাভ্যাস করিয়া তাহাতেও অপূর্ব্ব সিদ্ধিসমূহ লাভ করিলেন।

মহেন্দ্র কন্দলির নিকট পাঠকালে সঙ্ঘটিত শঙ্করের উজ্জ্বল ভবিষ্য-দ্যোতক এক ঘটনাকাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, এক দিবস পাঠান্তর ছাত্রগণ পাঠশালাগৃহ হইতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল, কিন্তু শঙ্কর পাঠশালাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ-কালান্তর তাঁহার অঙ্গোপরি রৌদ্র নিপতিত হইলে একটী সর্প স্বীয় ফণা বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি ছায়া প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল;

তদীয় প্রথম বিবাহের পর সংঘটিত হয়; কিন্তু তদীয় অন্যতম চরিতাখ্যায়ক দৈত্যারি ঠাকুরের মতে অতি শৈশবে শঙ্কর মাতৃপিতৃহীন হন। মহাপুরুষীয় সমাজে এই শেষোক্ত মতই প্রচলিত।

কিন্তু এই সময়ে মহেন্দ্র কন্দলি তথায় উপনীত হওয়ায় সর্প ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার দিবস হইতে মহেন্দ্র শঙ্করদেবকে সবিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন।

শঙ্কর ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শঙ্কর-জনক কুসুমবর বরদোয়া হইতে আলিপুখরীতে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতিবর্গের পরামর্শে শঙ্কর পুনরায় বরদোয়ায় বসবাস করেন। শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন শঙ্কর ক্রমে ক্রমে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন ও ক্রমশঃ তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে লাগিলেন। শঙ্করের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে পিতামহীদ্বয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহারা সূর্য্যাবতী নাম্নী জনৈকা বহু রূপ-গুণাদিবিভূষিতা কন্যার সহিত তাঁহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। কতিপয় বৎসর নবদম্পতী সুখে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদিগের মনু নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। মনুর জন্মের অব্যবহিত পরেই সূর্য্যাবতী ইহলোক ত্যাগ করেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে শঙ্করদেব যথাকালে তাঁহাকে হরি নামক জনৈক কায়স্থ-কুলোদ্ভব যুবকের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধা করিলেন।

শঙ্করদেবের হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই তীর্থভ্রমণাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী সূর্য্যাবতীর স্নেহডোরের আকর্ষণে প্রবাসী বেশে সুদূর বিদেশে তীর্থপর্য্যটন-চিকীর্ষা কিয়ৎকালের জন্য ত্যাগ করেন। এক্ষণে সংসারের এক মাত্র দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করায়, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিলীন প্রায় তীর্থপর্য্যটনাকাঙ্ক্ষা পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। নির্ব্বেদপ্রাপ্ত শঙ্কর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনগঞ্জা-গিরিকে জামাতা হরির গৃহে রাখিয়া সপ্তদশ সংখ্যক সঙ্গি সমভি-ব্যাহারে তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন।

দ্বাদশ বর্ষ তীর্থভ্রমণান্তর শঙ্করদেব স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন। এই পবিত্র স্থানে দিবসত্রয় অবস্থিতি করিয়া স্বীয় সুগভীর পাণ্ডিত্যে পাণ্ডাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অধিকাংশ সঙ্গীদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া অন্যান্য তীর্থদর্শনমানসে গমন করিলেন। গয়া, কাশী প্রভৃতি বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তীর্থ পর্য্যটনে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে তিনি স্বদেশে পুনরাগমন করেন।

শঙ্করদেব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর বৃদ্ধা পিতামহী, ভ্রাতা বনগঞ্জাগিরি, জামাতা হরি প্রমুখ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধববর্গ উল্লসিতহৃদয়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্করদেব হরিনাম ও কীর্ত্তনে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালান্তর পিতামহী প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধানুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। অতঃপর তদীয় পিতামহীর দেহত্যাগ হইয়াছিল। পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধানার্থ তিনি যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

শঙ্করদেব গৃহে গৃহে সুধাময় হরিনাম বিতরণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাছারীদিগের উপর্য্যুপরি উপদ্রবে তাঁহার বরদোয়ায় বাস করা অসম্ভব হইল। তিনি আত্মীয়কুটুম্বাদির সহিত ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ গাংমৌ গ্রামে আবাসগৃহ ও নামঘরাদি* নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রমানন্দ ঠাকুরের জন্ম হয়। জনৈকা দাসীপ্রমুখাৎ পুত্রের জন্মসংবাদ অবগত হইয়া শঙ্কর সুবিষাদে গাহিয়াছিলেনঃ—

পায়ে পড়ি হরি, করোঁ হো কাতরি, প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয়বিষধর বিষে জরজর, জীবন না রহে আর॥
অথির ধন জন, অথির জীবন, অথির এহ সংসার।
পুত্র পরিবার, সবহি অসার, করবো কা হেরি সার॥
কমলদলজল চিত্ত চঞ্চল, থির নোহে তিল এক।
নাহি ভবভয়, ভোগ পরিহরি, পরম্পদ পরতেক॥

---

* আসামে বৈষ্ণবগণ নামঘরে সমবেত হইয়া নামকীর্ত্তনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

কহতু শঙ্কর, এ দুঃখসাগর, পার করা হৃষিকেশ।
তুহু গতি মতি, দেহু শ্রীপতি তত্ত্বপথ উপদেশ॥

গাংমৌ অবস্থান কালে শঙ্করদেবের দ্বিতীয় পুত্র হরিচরণ, তৃতীয় পুত্র কমললোচন ও সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা রুক্মিণীর জন্ম হয়।

গাংমৌ অবস্থিতির পর তিনি ধুঞাহাটে বসবাস করেন। এই স্থলে বহুলোক তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। গয়াপাণি নামক জনৈক ধনীসন্তান তীর্থযাত্রামানসে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, কিন্তু সেখানে ৺জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শঙ্করের সুনাম শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে গয়াপাণি

তত্রৈব গঙ্গাযমুনা চ তত্র গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥

—এই শ্লোকটীর যথোচিত ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইলে শঙ্করদেব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্ট ভাষায় কহিলেন :—

কৃষ্ণের উদার কথার প্রসঙ্গ
যথাত হোয়ে নিশ্চয়।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ
নিবাস তথা করয়॥

শঙ্করদেবের কথিত শ্লোকার্থ শুনিয়া গয়াপাণি শ্রীক্ষেত্রের স্বপ্নের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইলেন। ইনি অবশেষে শঙ্করচরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গয়াপাণির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া রামদাস রাখা হইল।

অতঃপর শঙ্কর-মাধব-সম্মিলন। মহাপুরুষ মাধবদেব উত্তরকালে 'মহাপুরুষীয়া' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। * ইনি পূর্ব্ব-জীবনে ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদা কোন কারণবশতঃ মাধব দেবী-পূজায় একজোড়া শ্বেত ছাগ মানস করেন। দেবীপূজায় ছাগ-

* শঙ্করদেব স্বয়ং কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তৎশিষ্য মাধবদেব মহাপুরুষীয়" ও দামোদরদেব "দামোদরীয়া" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

বলির বৈধতাসম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি গয়াপাণির (পূর্ব্বোল্লিখিত শঙ্কর-শিষ্য রামদাস) বিস্তর বাদানুবাদ হয়। গয়াপাণি মাধবকে শঙ্করের নিকট লইয়া যান। শঙ্কর ও মাধবে ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল; অবশেষে মাধবদেব পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক শঙ্করদেবকে স্বীয় গুরুত্বে বরণ করেন। শঙ্করদেব মাধবের ন্যায় ক্ষম ব্যক্তিকে সহায়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অসমীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে শঙ্করদেবের নিম্নেই মাধবদেবের স্থান।

আসাম সুপ্রাচীন কাল হইতেই তন্ত্রশাস্ত্রের বীজভূমি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্করদেবের সময়ে আসামে শাক্তধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। শঙ্করদেব এই তন্ত্রপ্রধান দেশে নাম-ধর্ম্ম প্রচার এবং গীতাদির আলোচনা করিতে লাগিলেন। অব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মপ্রচার সন্দর্শন করিয়া তৎকালীন আসাম-শাক্তজগতের শীর্ষস্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ ঈর্ষাপরবশে তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই প্রতিবন্ধকসমূহ শঙ্করের অমঙ্গলকর না হইয়া বরং ইষ্টজনক হইয়া তাঁহার অসাধারণ শক্তি-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। নানা বিপৎপাতের মধ্য দিয়াই মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে। শঙ্করদেবেরও তাহাই হইল। শনৈঃ শনৈঃ ব্রাহ্মণগণ একে একে শঙ্করের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। শঙ্কর মহোল্লাসে নাম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক শোচনীয় ঘটনায় শঙ্করদেব হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। নিষ্ঠুর অহমরাজ বিনাপরাধে তাঁহার জামাতা হরিকে নিহত করেন। কথিত আছে, হরির স্কন্ধচ্যুত মস্তক ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া রামনামোচ্চারণ করিয়াছিল। মাধবপ্রমুখাৎ এই দুঃসংবাদ অবগত হইয়া শঙ্করদেব বিমর্ষ হৃদয়ে অত্যাচারী অহমরাজের রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি সপরিবারে কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে কামরূপেশ্বর মহারাজ

নরনারায়ণের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কামরূপ রাজ্যে প্রথমতঃ কপলা নামক স্থানে ছয়মাস কাল অবস্থান করিয়া তৎপরে তিনি পালন্দী গমন করেন। এই স্থলে সুবিখ্যাত ভক্ত নারায়ণ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। উত্তরকালে ভক্ত নারায়ণদেবের শান্ত-শীতল শুদ্ধ চরিত্রের অমল বিভা ও যশঃপ্রভা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অসমীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইনি ভক্তরাজ প্রহ্লাদের অবতাররূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অতঃপর কুমারকুচিতে এক বর্ষকাল বাস করিয়া শঙ্কর পাটবাউসীতে গমন করেন। এই স্থানে সত্র * স্থাপিত হইলে পর, চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমে ক্রমে ভক্তসমাগম হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেব দামোদর আগমন করিলেন। ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শঙ্করদেবের অসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম সন্দর্শনে ইনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এক দিবস দামোদরদেব ভক্তি-পূত-চিত্তে শঙ্করদেবকে প্রণিপাত করিয়া তৎসমীপে "শরণ" প্রার্থনা করিলেন। দামোদর জাত্যংশে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, শঙ্করদেব তাঁহাকে "শরণ" দিতে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধানুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, তিনি অবশেষে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই শঙ্করশিষ্য দেব দামোদরই উত্তরকালে "দামোদরীয়া" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

অল্পকাল মধ্যেই শঙ্করদেবের গুণগীতি মহারাজ নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ চিলারায় বা শুক্লধ্বজের কর্ণে পৌঁছিল। যুবরাজ শঙ্করদর্শনমানসে ব্যাকুলচিত্তে লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বধামে আনয়ন করিলেন। শুক্লধ্বজের নিকট হইতে শঙ্করদেবের অশেষ গুণগরিমা শ্রবণে মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবিধ শাস্ত্রালাপ-জনিত অশেষ আনন্দ উপভোগ করিলেন। শঙ্কর-গুণগ্রাম-বিমোহিত নরনারায়ণ তাঁহাকে পাটবাউসীর 'বরভূঞার' পদ ও তাঁতীকুচির শাসনাধিকার প্রদান করিলেন।

* বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের আখড়ার অনুরূপ।

শুক্লধ্বজ ও তৎপত্নী ভুবনেশ্বরী শঙ্করের নিকট "শরণ" লইলেন। এইরূপে শঙ্করদেব প্রকৃত গুণগ্রাহী নৃপতি কর্ত্তৃক বহু সম্মান-বিভূষিত হইয়া পাটবাউসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আলমোড়া।

৯ই জুলাই, ১৮৯৭।

প্রিয় ভগ্নি—

তোমার পত্রখানি পড়ে উহার ভিতরে একটী নৈরাশ্যব্যঞ্জক-ভাব ফল্গুনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হ'লাম, আর উহার কারণটা কি তাও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। প্রথমেই তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছ তার জন্য তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ। তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমি রাজা অজিতসিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিলে না কাজেই যাওয়া ঘট্‌ল না। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে জান্‌তে পার্‌লে আমি খুব খুসী হব। তিনিও, তোমাদের যার সঙ্গেই হোক্ না কেন দেখা হ'লে, খুব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খণ্ডিতাংশ (cutting) পেয়েছি; তাতে দেখ্‌লাম মার্কিণ রমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি-সমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—আরও তাতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে!—আমার জাত থাক্‌লে ত—আমি যে সন্ন্যাসী।

জাত ত কোন রকম যায়ই নি, বরং আমি পাশ্চাত্য দেশে যাবার দরুণ সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধভাব ছিল তা এক রকম নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত কর্‌তে হয় তা হলে ভারতের অর্দ্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত কর্‌তে হবে। তা ত হয়ই নি বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে আমার যে জাতি ছিল সেই জাতিভুক্ত প্রধান রাজা আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটী সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। এ ত গেল তাঁদের তরফ থেকে—আমাদের দিক থেকে ধর্‌লে আমরা ত সন্ন্যাসী—নারায়ণ ভারতে আমরা সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্রে খাই না—আমরা যে দেবতা, তারা যে মর্ত্ত্যলোক—উহাতে আমাদের মর্য্যাদাহানি। আর প্রিয় মেরি, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজো করেছে—আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরূপ কারও হয়নি।

এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হয় যে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হয়—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এইরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরীভায়াদের রীতিমত গাত্রদাহ হয়েছে। কিন্তু এখানে তাদের পোঁছে কে? তাঁদের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেই সম্বন্ধেই আমাদের খেয়াল নেই।

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী ভায়াদের সম্বন্ধে এবং ইংলিস চর্চ্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীদলের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার সেই চার্চ্চমাগীদের সম্বন্ধে এবং তাদের পরকুৎসা রটনার সম্বন্ধেও আমায় কিছু বল্‌তেও হয়েছিল।

মিশনরী-ভায়ারা এখানে আমার প্রচারকার্য্যের বিলোপ সাধনের জন্য এইটীকেই সমগ্র মার্কিণ রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে ঢাক

পেটাচ্ছে—তারা বেশ জানে শুধু অদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্লে যুক্তরাজ্যের লোকেরা খুসীই হবে। প্রিয় মেরি, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি—তারা আমাদের মা বোনের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাসী হিদেন আমাদের উপর খৃশ্চান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করেন তা ধৌত করতে পৃথিবীর সমুদয় মহাসমুদ্রের জলেও কুলোয় না—আর আমরা তাদের কি অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা করলে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্য্যের সহিত তা সহ্য করতে শিখুক, তার পর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটী একটী মনোবিজ্ঞানসম্মত সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে যারা সর্ব্বদা অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘা সহ্য করতে পারে না। আর তার পর তাদের আমি কি ধার ধারি! তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেট্রা এবং আর কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে! কে আমার ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত করবার সাহায্য করতে এসেছিল! আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মার্কিণেরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ হয়—তার জন্য আমেরিকায় আমার সমুদয় শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে, এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি!

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছমাস কাজ করেছি—একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব উঠেনি—সে নিন্দা-রটনাও একজন মার্কিণ রমণীর কাজ—এই কথা জানতে পেরে ত আমার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ ত কোন রকম হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিস চার্চ্চের পাদরি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম এবং নিশ্চিত আরও পাব। ওখানকার একটা সমিতি আমার কার্য্যের প্রসার লক্ষ্য করে আসছে এবং উহার জন্য সাহায্যের জোগাড় করছে। তথাকার চার জন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আস্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এর পর যখন যাব শত শত লোক আরও প্রস্তুত হবে। প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু ভয় কোরো না। মার্কিণেরা বড়—কেবল ইউরোপের হোটেলওয়ালা ও বস্ত্রবিক্রেতাদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। জগৎটাতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, ইয়াঙ্কিরা চট্‌লেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। যাই হোক্ না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করিনি। আপনা আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মস্তিষ্কের ভিতর ঘুর্‌ছিল—ভারতবাসী সাধারণ জনগণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তো যদি তুমি দেখ্‌তে, আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভিতর কেমন কাজ কর্‌ছে। কলেরাক্রান্ত পারিয়ার মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তার সেবাশুশ্রূষা কর্‌ছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে, আর প্রভু আমায় তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা কি আমি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত' বালক। ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বুঝ্‌বে কি করে। কি, আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার বুঝেছি, আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব—আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌তে হয়েছে—কারণ, নিজের প্রতি আমার সেটা কর্ত্তব্য ছিল। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন

অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমি যে যন্ত্রটা প্রস্তুত করলাম তা বেশ মজবুত, কাজের উপযোগী হয়েছে; আর এটা নিশ্চিত জেনে—অন্ততঃ ভারতে লোকের কল্যাণের জন্য এমন একটী যন্ত্র বসিয়ে গেলাম কোন শক্তি যাকে হঠাতে পারবে না—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো, পরে কি হবে সে সম্বন্ধে আর ভাবব না আর আমি প্রার্থনা করি যে, আমি বার বার জন্ম গ্রহণ করে সহস্র দুঃখ সহ্য করি, যেন ঐ সকল জন্মে একমাত্র যে ঈশ্বর বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের—সর্ব্বোপরি পতিত, দুঃখী, পাপীতাপীরূপী আমার ঈশ্বরের—সকল জাতির দরিদ্র, দুঃস্থরূপী আমার ঈশ্বরের পূজা করিতে পারি—ইহারাই আমার বিশেষ উপাস্য।

"যিনি তোমার ভিতরে, যিনি তোমার বাহিরে, যিনি প্রত্যেক হস্তের দ্বারা কার্য্য করছেন ও প্রত্যেক চরণের দ্বারা যিনি চলছেন, তুমি যাঁর দেহস্বরূপ, তুমি তাঁর পূজা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"যিনি উচ্চ ও নীচস্বরূপ, যিনি সাধু ও পাপীস্বরূপ, যিনি দেবতা ও কীটস্বরূপ, সেই প্রত্যক্ষ সত্যস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের গোচর সর্ব্বব্যাপী পুরুষের উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"যাঁহার পূর্ব্বজন্ম নাই, যাঁহার পরজন্ম নাই, যাঁহার বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাঁহাতে আমরা সর্ব্বদা অবস্থিত থেকে অখণ্ডত্ব লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁহারই উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।"

আমার সময় অল্প, এখন আমার যাহা কিছু বলবার আছে কিছু না চেপে বলে যেতে হবে। ওতে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগে বা কেউ বিরক্ত হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বেরুক না কেন কিছুতেই ভয় পেও না। কারণ, যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে,

তা বিবেকানন্দ নহে—তা প্রভু স্বয়ং। কিসে ভাল হয়, তিনি ভাল বোঝেন। যদি আমাকে জগৎকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হয় তা হলে ত আমার দ্বারা জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ, দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, তারা চিরকাল লোকের উপর প্রভুত্ব কর্‌ছে এবং জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়ই রয়েছে। যে কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগ্‌বে; সভ্য যাঁরা তাঁরা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাসি হাস্‌বেন, আর যাঁরা সভ্য নন তাঁরা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চীৎকার কর্‌বে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে। পৃথিবীর কীট এরাও এক দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। অজ্ঞান বালকেরাও এক দিন জ্ঞানালোকে আলোকিত হবে। মার্কিণেরা অভ্যুদয়ের নূতন সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের বন্যা শত শত বার আমার দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যা বালকপ্রকৃতির জাতিরা বুঝ্‌তে এখন অক্ষম। আমরা জেনেছি এ সবই মিছে, এই বীভৎস জগৎটা মায়া মাত্র—ত্যাগ কর, ত্যাগ করে সুখী হও। কামকাঞ্চনের ভাব ত্যাগ কর—অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ, টাকা কড়ি এইগুলি মূর্ত্তিমান পিশাচস্বরূপ। সাংসারিক প্রেম যা কিছু, সব দেহ থেকেই প্রসূত—নিশ্চিত জেনো ঐ প্রেম দেহগত, তা ছাড়া আর কিছু নয়। কামকাঞ্চন-সম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও—ঐগুলি যেমন চলে যাবে অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে, আধ্যাত্মিক সত্য সব সাক্ষাৎকার কর্‌বে, তখন আত্মা তাঁর অনন্ত শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হবে। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য ইংলণ্ডে যাই। আমার কেবল একটী ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি।

তোমারই

চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

প্রাদেশিক সম্মিলনে

"বাঙ্গলার কথা"।

("ভারতের সাধনার" লেখক)

(১)

প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স এতদিনে প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়াছে, এবং ইংরাজীশিক্ষিতের পলিটিক্যাল এজিটেশন সেখানে আজ বাঙ্গলার কথায় পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য "উদ্বোধনে" আজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের আলোচনা উপস্থিত না করিয়া থাকা গেল না।

"বাঙ্গলার কথা" এই আখ্যা লাভ করিয়া সভাপতির অভিভাষণটী মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড পাইয়াছি। এই অভিভাষণ পড়িতে পড়িতে আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছিল। ইহারই বিষয় আজ কিছু লিখিব।

বহু পুরাকাল হইতে আমাদের দেশেও একটা বিশাল জীবনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা—আজকালকার শিক্ষিত সমাজ—সে জীবনের সন্ধান বড় বেশী পাই নাই, কেন না ইস্কুলের কেতাবে, সংবাদপত্রে, বিলাতের আমদানি হাজার হাজার পুস্তকে, সে জীবনের সন্ধান একরূপ দেয় না বলিলেও চলে। আর মহামহিম রাজ-সরকারকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে একটী নূতন জীবনজাল শতেক বৎসর ধরিয়া আমরা গড়িয়া তুলিতেছি, তাহাও ঐ সনাতন জীবন-প্রবাহে জলরাশির উপর তৈলধারার মত ভাসিয়া চলিয়াছে, কিছুতেই মিশিয়া যাইতে পারে নাই। যদি বল, জলের সহিত তেলের মিশিতেই হইবে, তবে তোমার সে চেষ্টা, সে পুরুষকারের কে সমর্থন করিবে?

কিন্তু সেই চেষ্টা ও পুরুষকারের ক্ষণিক উদ্দীপনায় আমাদের

কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স এতদিন ডগ্‌মা্‌ করিত। পাশ্চাত্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বদেশপ্রেম রাজসরকাররূপ কর্ম্মযন্ত্রকে নিয়মিত করিয়া, ঐ যন্ত্র হইতে দেশের লোকের সর্ব্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করাইয়া লয়। ইহার নাম পলিটিক্স। আমাদের দেশে এই পলিটিক্সের অনুকরণে, জলরাশিতে তৈলবৎ ভাসমান শিক্ষিতসমাজ হইতে কয়েকশত প্রতিনিধি আপনাদের আপনারা নির্ব্বাচিত করিয়া লন, তাহারপর ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত রাজসরকারের অভিমুখে তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম ছুটিয়া যায়, কেন না সেই রাজসরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার লাভ করা পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রথম সোপান। সেই ক্ষমতা লাভ করিলে তবে ত রাজসরকাররূপ যন্ত্র হইতে দেশের সকল রকম কল্যাণের ব্যবস্থা আদায় করা যাইবে!

রাজসরকারের দিকে স্বদেশপ্রেমের এই অনিবার্য্য গতিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের অন্ধ অনুকরণ। যখন এই আবেগময়ী গতি রাজ-সরকারের দ্বারে দ্বারে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় তখন ঐ গতির অনিবার্য্যতার অনুপাতে এনার্কিজ্‌মের উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

এবারকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় স্বদেশ-প্রেমের এই অন্ধগতিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, রাজসরকারের দিক হইতে যুগযুগান্তের প্রজাসাধারণের দিকে ছুটিয়া আসিবার জন্য আমাদের স্বদেশপ্রেমকে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পক্ষে এ বড় সামান্য কৃতিত্ব নহে। এনার্কিজ্‌মের জড় মারিবার পক্ষে এর চেয়ে বড় চাল আর কি হইতে পারে? সভাপতি মহাশয়ও এক জায়গায় বলিয়াছেন, "আমার মনে হয় এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজবিদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্যের ফল।"

এতকাল কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী দেশের

যুবককে রাজসরকারের দিকে ধাবিত করিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত দেশের কাজ দিতে পারে নাই। তাহার আশা-ভরসা, তাহার চিন্তা-সাধনা, তাহার বাদ-প্রতিবাদ, তাহার রোষ আস্ফালন, তাহার আদর-অভ্যর্থনা, তাহার সমস্ত হৃদয়াবেগের সম্মুখে সে রাজসরকারকেই দেখিতে পাইয়াছে। কিন্তু এ কি বিলাতের রাজসরকার যে সমস্ত দেশের জীবন, সমস্ত দেশের ইতিহাস, সেই রাজসরকারে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই কল্যাণময়ী মূর্ত্তিকে যে দিকে নাড়িয়া বসাইতেছ সেইদিকেই ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে শিক্ষায় ব্যবসা বাণিজ্যে — লোককল্যাণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে? বিলাতে দেশের কাজ এ ভাবে নিশ্চয়ই হইতে পারে, আমাদের দেশে হইতে পারে না। আর হইতে পারে না বলিয়াই পলিটিক্যাল এজিটেশনের সমুদ্র-মন্থনে গরলই বেশী উঠিতেছে, অমৃতের কোনও সন্ধান নাই।

আমাদের দেশে বহু বহু শতাব্দী হইতে দেশের কাজ দেশের লোকেই করিয়া আসিয়াছে, রাজসরকার তাহার তত্ত্বাবধায়ক। গ্রামে গ্রামে লোকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নিজের হাতে করিয়া নিজের ভাবে সংসার পালন করিয়াছে, নিজের ভাবে ভবপার হইবার তরণী প্রস্তুত করিয়াছে। রাজা রাজরাজড়ার বিবাদ বিসম্বাদের অবসরে কেবল তত্ত্বাবধান করিয়াছেন—তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম, নিজেদের কাজ করে কিনা – এবং সেই ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্ন অপসারণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বাবধান, এই বিঘ্নাপসারণের জন্য রাজা প্রজার নিকট কর আদায় করিয়াছেন। সে কর রাজার জমির ভাড়া নয়, রাজার কাজের মজুরি।

আর এই যে দেশের লোকের ধর্ম্ম ও কাজ, তাহার ব্যবস্থা-বিধানও রাজা দিতেন না, দিতেন ব্রাহ্মণ অথবা অভাবপক্ষে সন্ন্যাসী। ফলে সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনের যে সাধনা, তাহাও যথাকালে পরমার্থসাধনায় পৌঁছিয়া দিতে পারিত; পরমার্থরূপ একই লক্ষ্যের সাধনে আর সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিত। প্রাচীন

ভারতের দেশের কাজের এই যে প্রকৃতি, তাহা সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় গোড়াতেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, "আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্য্যন্ত, আমাদের সকল ভাব সকল ভাবনা সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে তাহার বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।"

যে দেশে দেশের কাজের মূলপ্রকৃতি এইরূপ, সে দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে সে কথাও সভাপতির অভিভাষণে উত্থাপিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "এই যে মিলন যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটী সত্যের দিক দিয়া দেখা যায়। আর একটা দিক দিয়াও দেখা যায়—সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া।" * *

"শুধু জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটী জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে।"

আর শাসনবিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া "বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটী স্বতন্ত্র জাতি নিজ

নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইলেও এই দুইটী শাসনবিভাগের উপরদিকে একটা একছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসনবিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসনবিভাগ তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ, গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব।"

সভাপতি মহাশয়ের এই মন্তব্য আমরা অনুমোদন করি, কিন্তু কথাটা অন্য রকমে এবং আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়। ইংরাজের জাতিত্ব বা nationalism আধুনিক জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আমাদের জাতিত্ব এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। আমাদের জাতিত্ব আমাদের অতীতের ঘটনাপারম্পর্য্যে নিহিত রহিয়াছে, আমাদের জাতির আদর্শ-পুরুষদের জীবনে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের জাতিত্ব বা nationalism আমাদের ইতিহাসের তাৎপর্য্য, আমাদের ইতিহাসের মর্ম্মকথা। সেই মর্ম্মকথাকে আজ ব্যক্ত করিতে হইবে। যে গভীর ব্যঞ্জনা সহযোগে সমগ্র ভারতে সমগ্র উচ্চ চিন্তা ও সাধনাকে ইতিহাস চিরকাল একই ছাঁচে ঢালিয়া আসিয়াছে, সেই জাতিত্বের ব্যঞ্জনাকে আজ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের দেশের কাজের যে আজ ইহাই একটী প্রধান লক্ষ্য, কেন না আধুনিক যুগে জাতিত্বের, nationalismএর, অভিব্যক্তিই জীবনযাত্রায় পণের কড়ি। এ পণ না দিলে কোনও দেশই বাঁচিতে পারিবে কিনা বিষম সন্দেহ।

এই জাতিত্ব আমাদের ব্যক্ত করিতে হইবে, আর ইংরাজের জাতিত্ব ইংরাজ ব্যক্ত করিয়াছে। এই দুইটী জাতিত্ব বা nationalismএ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ত আছেই, তার উপর অবস্থারও প্রভেদ রহিয়াছে। উভয়ে প্রকৃতিতে বিলক্ষণ কেন, আগে তাহা অল্প কথায় বুঝিয়া দেখা যাক। একটা মানুষের মনুষ্যত্বে যেমন বিশেষ কোনও লক্ষ্যকে সে তাহার পরমপুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং অন্যান্য সমস্ত

সাধনার বিষয়কে সে সেই মূল লক্ষ্যসাধনের অনুকূলে ও সহায়রূপে গ্রহণ করে, তেমনি একটা জাতি বা nationএর জাতিত্বে একটা পরমার্থ বা পরম প্রয়োজন (supreme governing end) থাকে এবং সে অন্যান্য জাতীয় প্রয়োজন বা তাহাদের সাধনাকে সেই পরম প্রয়োজনের অনুকূলে ও সহায়রূপে নিয়ন্ত্রিত করে। এই যে একটা দেশে সমষ্টিজীবনের সমস্ত প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গিভাবাত্মক সাধনা ও স্থিতি ইহাকেই জাতিত্ব বা nationalism বলে।

এখন ইংরাজের জাতিত্ব ও আমাদের জাতিত্বের প্রভেদ এই যে, যে পরম প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজের জাতিত্ব বা nationalism গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের ইতিহাস সে প্রয়োজনকে কখনও কার্য্যক্ষেত্রে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং করিবেও না, অতএব আমাদের জাতিত্ব সেরূপ পরম প্রয়োজনের সাধনাকে কেন্দ্র-রূপে লাভ করিয়া কখনও গড়িয়া উঠিবে না বা আত্মপ্রকাশ করিবে না। জাতিত্ব বা nationalismএ যে প্রয়োজনের সাধনা কেন্দ্র-স্থানীয়, সেই প্রয়োজনটী অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনের সার্থকতা, মূল্য, সাধনপ্রণালী প্রভৃতি নিরূপিত করে। এই জন্য পরম প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র জাতিত্বের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনের সাধনায় সেই বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ থাকে। ইংরাজ পার্থিব জীবনের উৎকর্ষকে জাতীয় জীবনে পরমপুরুষার্থ, পরম প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, কিন্তু ভারত যখনই একটা সমষ্টিভূত জীবন গড়িতে গিয়াছে, তখনই পরমার্থ বলিতে অন্য কিছু বুঝিয়াছে, পার্থিব জীবনকে একটা উপায় মাত্র বিবেচনা করিয়া অমৃতত্ব বা অপরিণামী জীবনকেই পরম পুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ ও ভারতের জাতিত্বের মধ্যে এই মৌলিক বৈলক্ষণ্য রহিয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে উভয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও উভয়ের জাতিত্বের মিলন কতদূর সংঘটিত হইতে পারে।

ইংরাজের জাতিত্বের মত ভারতের জাতিত্বও যদি Political

nationalism হয় অর্থাৎ উভয়েরই স্বদেশধর্ম্ম যদি রাজনীতি-মূলক হয়, তবে মিলন অসম্ভব। অষ্ট্রেলিয়া-ক্যানডার দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে খাটে না; ইংরাজী প্রবাদে বলে,—জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়। জীবনের মূলভাবে, শিক্ষায় দীক্ষায়, আত্মগৌরবে, ইতিহাসের এক বনিয়াদের মাহাত্ম্যে, রক্তে-মাংসে, নিতান্ত আপনার না হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড় স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি আর একটা অপ্রতিষ্ঠ জাতিকে আপনার সহিত এক করিয়া লইতে পারে না, কেন না একটা আলাদা ইতিহাস ও মূলভাব লইয়া যে জাতিটা বাঁচিয়াছে ও বাঁচিতেছে,—তাহাকে বিশ্বাস কি? আজ তাহাকে রাজনীতির মিলনসূত্রে বাঁধিয়া যথেষ্ট রাজনীতিক ক্ষমতা দিলে, সেই রাজনীতিক ক্ষমতারই স্বভাবধর্ম্মে কাল যে সে সেই মিলনসূত্র ছিঁড়িয়া স্বাধীন হইবে না তাহার প্রমাণ কি? তাই বলিতেছি যে রাজনীতিসূত্রে ইংরাজের সমকক্ষ একটা জাতিত্ব বা nationality লইয়া ভারত একদিন ইংরাজের সহিত মিলনে আবদ্ধ হইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। ভারতের ধাতেও সে দুরাশা নাই।

তবে রাজনীতিক সাম্যসূত্রে মিলন অসম্ভব হইলেও আরও গভীরতর আদানপ্রদানের যোগসূত্রে মিলন নিশ্চয়ই সম্ভব। যে পরম প্রয়োজনের সাধনা, যে আদর্শ লইয়া আমাদের দেশ বাঁচিয়া আছে ও গৌরবময় জাতিত্ব লাভ করিতে আজও বাঁচিয়া থাকিবে, সেই আদর্শসূত্রেই কেবল অন্যান্য দেশ ও জাতির সহিত তাহার অকৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে। এ দুনিয়ায় প্রাণের কথা লইয়াই মানুষে মানুষে স্থায়ী সৌহৃদ্য হয়, স্বার্থপরতার মিলনসূত্র কয়দিন টিকে? রাজনীতি বা পলিটিক্স কি আজ ইউরোপের আন্তর্জাতিক মিলন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? সেইজন্য ভারত ইংরাজের সহিত আরও গভীরতর যোগসূত্রে মিলিত হইতে চাহে। ইংরাজ আজ ভারতের রাজা, তাহার সে রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক। কেবল ভারতলক্ষ্মী ইংরাজকে যে রাজটীকা দিয়াছেন, ইংরাজ সেই রাজ-টীকার মর্য্যাদা রক্ষা করুক, তাহা হইলেই ভারতে তাহার সিংহাসন

অচল থাকিবে। ভারতে রাজার ধর্ম্ম—ভারতীয় সর্ব্ববিধ সাধনায় "তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নাপসারণ"। যিনি সেই রাজার ধর্ম্ম ভারতে পালন করিবেন, ভারতে তাঁহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভারতের রাজনীতি মানে ঐ রাজার 'ধর্ম্ম ; 'ইংরাজের রাজনীতির অর্থ প্রজাশক্তির দ্বারা রাজৈশ্বর্য্য ও রাজপ্রতিপত্তির সম্ভোগ। এই ইংরাজের রাজনীতির উপর দাঁড়াইয়া ইংরাজ ও আমাদের শিক্ষিত সমাজের বিবাদ বাঁধিয়াছে। আজ উভয়কেই ইংরাজের রাজনীতি হইতে ভারতের রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবেই সকলপক্ষে কল্যাণ ও শান্তি।

ভারতীয় রাজধর্ম্ম যদি ইংরাজ পালন করেন, তবে একদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে ও অপরদিকে আমাদের জাতিত্ব নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের nationalism রাজনীতি বা রাজনীতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়া বর্দ্ধিত হয় নাই, হইতেও চাহে না এবং পারে না। পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই ঐ জাতিধর্ম্মের কেন্দ্র-স্থানীয় এবং সেই কেন্দ্রীভূত প্রয়োজনের অনুরোধেই আর সমস্ত জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের সাধনা। এ অবস্থায় রাজধর্ম্মরূপ প্রয়োজনের সাধনা যদি ইংরাজের উপরই সংন্যস্ত থাকে, তবে আমাদের জাতিত্বের অভিব্যক্তিতে ক্ষতি কি ? বরং আধুনিক জগতে রাজশক্তিতে রাজশক্তিতে যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবর্ত্তে ভারতকে সাক্ষাৎভাবে যদি ঝাঁপ দিতে হইত, তাহা হইলে তাহার বিশিষ্ট জাতিত্বের সাধনা যে শুধু বিকৃত হইত তাহা নহে, সে সাধনার বিলোপ হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। আমাদের রাজশক্তি ইংরাজের হাতে থাকায়, আজ দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যে বাঁচিয়াও আমরা জগতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ততার পরিণাম দূর হইতে দেখিয়া প্রকৃত জাতীয় জীবনের শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছি।

অতএব ভারতে ইংরাজ রাজা ও আমরা প্রজা বলিয়া আমাদের প্রকৃত জাতিত্বের বিকাশে কোনও বিঘ্ন ঘটিতেছে না, কেবল বিঘ্ন

ঘটে যদি ইংরাজ ভারতীয় রাজধর্ম্ম পালন না করেন ও আমরা ভারতীয় প্রজাধর্ম্ম পালন না করি। ভারতীয় প্রজাধর্ম্ম কি তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভারতের প্রজা একরূপ সম্পূর্ণভাবেই গ্রামে বাস করে, আপনার গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, ক্ষেত্রে ক্ষুধার অন্ন জন্মায়, নদী পুষ্করিণী কূপে তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা করে, লজ্জানিবারণের বস্ত্র বুনে, ঘরের তৈজসপত্র নির্ম্মাণ করে, এবং দানধ্যানে, ধর্ম্মকর্ম্মে আর সমস্ত প্রয়োজন সাধনার সার্থকতা লাভ করে। ভারতীয় প্রজার এই সরল জীবন-কাণ্ড আরও কত মহত্তর সাধনায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হয় বটে, কিন্তু জীবনের আসল মূলসূত্রটী ভারতীয় প্রজা কখনও হারায় না—দেশের কাজ দেশের লোকে করিবে তাহার জন্য রাজার দ্বারস্থ হইতে হইবে না; আর সেই দেশের কাজ করাইবেন ধর্ম্মাচার্য্যগণ; রাজা কেবল সকলের স্বধর্ম্ম ও কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নাপসারণ করিবেন। এই তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নপসারণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ব্যবস্থা সরঞ্জাম ইংরাজরাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শাসনকার্য্যে আসল ভাবেই ভুল রহিয়া গিয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজ ইংরাজের রাজনীতির দাবী করিয়া ও অপরদিকে ভারতীয় প্রজা-ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া রাজা-প্রজার সম্বন্ধটাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এখনও সময় আছে। এখনও আমরা নিজেরা ভারতীয় প্রজাধর্ম্মে আগে ফিরিয়া, পরে ভারতীয় রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিবার জন্য ইংরাজ রাজসরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। কারণ এক-মাত্র এই পথেই ইংলণ্ড ও ভারতের স্থায়ী মিলন সম্ভবপর, একমাত্র এই পথেই ভারতীয় প্রজাসাধারণ এক অখণ্ড দেশ এবং সেই দেশের এক ব্যাপক জাতীয় সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের জাতি-ত্বকে জগতে ব্যাক্ত করিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভারতীয় রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই অপূর্ব্ব জাতিত্বের অভিব্যক্তির যদি সহায় হয়, তবে সে কি তাহার স্বাভাবিক গৌরব!

এবার কথায় কথায় আলোচনা বাড়িয়া গেল। আগামীবারে সভাপতি মহাশয় যে কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার অভিভাষনের মূল সূত্রগুলির বিচার হইল। সেই মূল সূত্রগুলি প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালীতে যথাযথ প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার বিষয়। সভাপতি মহাশয় যে সুরলয়ে তাঁহার "বাঙ্গলার কথা" বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিলাম। আমরা দেখিলাম, সে সুরলয় দুইটী কথায় ব্যক্ত হয়, ১ম, দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে; রাজাকে দিয়া উহা করাইবার জন্য আর্জ্জি পেশ করা দেশের কাজ নহে। ২য়, আমাদের একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে; সেই জাতিত্ব বজায় রাখিয়া ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ইংরাজী ১৯১৪ সালে তমলুকে একটী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রম হইতে স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসিগণকে নানাভাবে সেবা করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে কার্য্যব্যপদেশে আগত আশ্রয়হীন গরীব জনসাধারণ পীড়িত হইয়া পড়িলে, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আশ্রমে আনিয়া ঔষধ-পথ্যাদির দ্বারা সেবা করা হয়; বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সেবা করা হয়, এমন কি কাহাকে কাহাকেও আশ্রমে রাখা হয়।

স্থানীয় আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চরণ বসু মহাশয় আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড জমি দান করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঐ স্থানের উপর একটী পাকা বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতিতে উক্ত কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহার অনেক কাজ বাকী আছে। আশা করি উহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না।
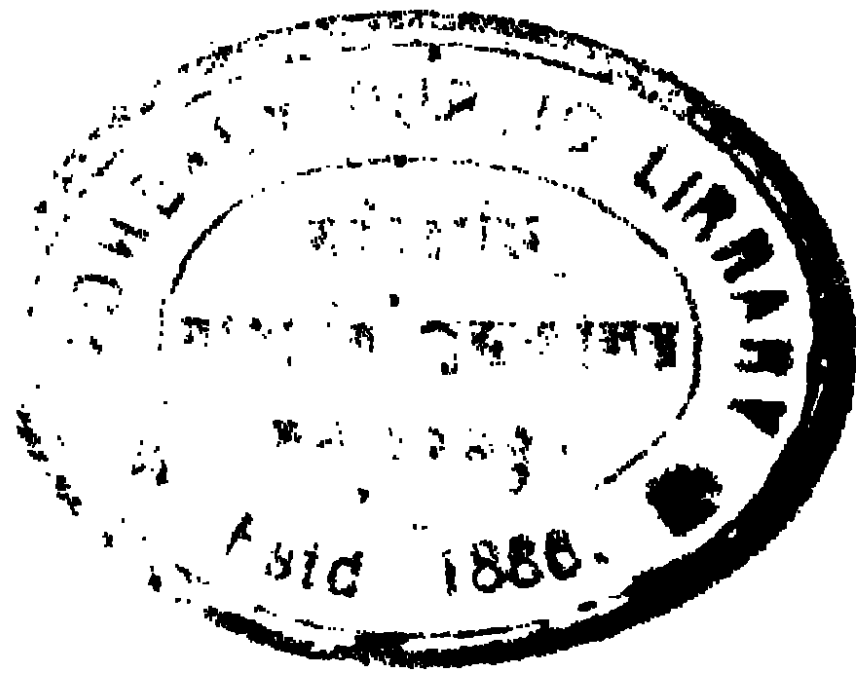
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের ভক্তসংঘ ও নরেন্দ্রনাথ।

(স্বামী সারদানন্দ)

ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কথা বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল এবং তাহাকে কৃপা করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল; অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না!"

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র তখন সাংসারিক অভাব-অনাটনের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত এবং রাখাল কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও আসিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আজ (উত্তর দক্ষিণাদি কোন দিক দেখাইয়া) ঐ দিক হইতে এখানকার একজন আসিতেছে" এইরূপে পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিতেন। কেহ বা উপস্থিত হইবামাত্র "তুমি এখানকার লোক" বলিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম

সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার সহিত একান্তে ধর্ম্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাগত সমসংস্কারসম্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে তদ্বিষয়ের সুযোগ করিয়া দিতেন। আবার, কাহারও গৃহে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক যাহাতে তাঁহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন তদ্বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

ঐ সকল ভক্তের আগমন মাত্র অথবা আসিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্ব্বক ধ্যান করিতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্ম্মসংস্কারসকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্যজ্যোতি মাত্রের অথবা দেব দেবীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-সমূহের দর্শন, কাহার গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, কাহার হৃদ্‌গ্রন্থি সকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহার ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাষ আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তারকের মনে ঐরূপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিসকল এক-দিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্ব্বিকল্প

অবস্থায় উপনীত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপে স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠি বিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্ব্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েক জনকে তিনি ঐরূপে কৃপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাহাদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণব বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্তঃসংস্কার নিরীক্ষণপূর্ব্বক শক্ত্যুপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণুমন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রদান করিতেন।

ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণপূর্ব্বক তাহার মনের গতি উচ্চ পথে পরিচালিত করিয়া দিবার কথা শাস্ত্রগ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের ত কথাই নাই—বেশ্যা লম্পটাদি দুষ্কৃতকারীদিগের জীবনও ঐরূপে মহাপুরুষদিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনেই ঐ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ঐরূপ থাকিলে কি হইবে ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্য্যকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্য্যন্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশ্বাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রসূত মানসিক

দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানবসাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিশ্বাস দূর করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্ত্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐ বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্য-প্রমুখ মহাপুরুষ সকলের সমশ্রেণীভুক্ত লোকোত্তর-পুরুষ এবিষয় উহা দেখিয়া কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত বৈষ্ণব অথবা অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষ প্রকার ভাবের লোক বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ অশেষ প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে তাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ স্বীকারে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সামান্য বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি, সকল ধর্ম্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতি-সম্পন্ন। ঐরূপ ধারণাবশতঃ তাঁহার উপর তাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার, তাঁহার সঙ্গগুণে এবং শিক্ষাদীক্ষা প্রভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীসমূহ একে একে অতিক্রমপূর্ব্বক উদারভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাঁহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু বৈষ্ণববংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসারে

থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং যথেষ্ট ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইঁহার হৃদয়ে অভিমান কখনও স্থান পায় না। ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ইনি প্রাতে পূজা পাঠে চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিতেন শ্রবণ করিয়াছি। অহিংসাধর্ম্ম-পালনে তিনি এতদূর যত্নবান্ ছিলেন যে, কীট পতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়াই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম—এখানকার লোক; শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে হরিপ্রেমের বন্যা আনিয়া কিরূপে মহাপ্রভু দেশের আবালবৃদ্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন দলের মধ্যে ইঁহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম!"

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বল্পকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান্ হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদনপূর্ব্বক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয় তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপূর্ব্বক তিনি সর্ব্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহুব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্ম্মপালনসম্বন্ধী মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে, অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক

উপাসনাকালেও মশকাদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না, মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্ম্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল, সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম্ম, মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবন রক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে, অতএব দুই চারিটা মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালনে মনের এতকালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ নির্ম্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐবিষয় জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য সকলের ন্যায় তাঁহাকে কোন দিন মশকাদি মারিতে দেখিয়াছি কি?— মনে হইল না; স্মৃতির আলোকে যতদূর দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাঁহাকে অহিংসাব্রতপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, দূর্ব্বাদলশ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অনুভবপূর্ব্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন—তৃণরাজীমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতন্য এত সুস্পষ্ট এবং পবিত্রভাবে তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল। স্থির করিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রতারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, মন পবিত্র হইবে।

"দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, 'বালিসটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার

ব্যাঘাত করে, সে জন্য মারিয়া ফেলিতেছি।' জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না; ঠাকুরের কথায় এবং কার্য্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই তিন বৎসর কাল ইঁহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি, দিনে আসিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তিন চারি দিন ঐরূপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু এক দিনও ইঁহাকে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই—ঐরূপ কেমন করিয়া হইল? তখন নিজ অন্তরেই ঐবিষয়ের মীমাংসা উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্ব্বে ইঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইঁহার উপরেই হয়ত অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরম কারুণিক ঠাকুর সে জন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্ব্বে কখনও করেন নাই!"

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্য অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্ব্বক শান্তি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকেও তিনি সস্নেহে গ্রহণপূর্ব্বক কাহাকেও উপদেশ দানে আবার কাহাকেও বা দিব্যাবেশে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐরূপে যত দিন যাইতে ছিল ততই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসংঘ স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনে তিনি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "ষোল আনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে, স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই; এখন হইতে চেষ্টা করিলে ইহারা ষোলআনা মন ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে—ঐজন্যই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ!" সুযোগ দেখিলেই ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে লইয়া যাইয়া যোগধ্যানাদি ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সকলের এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপদেশ

করিতেন। অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং শান্তদাস্যাদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইষ্টদেবতার সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা ও করুণা স্বল্প ছিল। উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বসকলের অভ্যাস ও অনুশীলনে তাহাদিগের অনেকের সময় ও সামর্থ্য নাই দেখিয়াই তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন ভোগবাসনা ধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তি মার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাভে ধন্য হইতে পারে এইরূপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাস দাসীদিগের ন্যায় মমতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। "দুই একটি সন্তান জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় স্ত্রী পুরুষের সংসারে থাকা কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন নিত্য সত্য পথে থাকিয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন, পূজা, জপ, ও সংকীর্ত্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল করিতেও অসমর্থ বুঝিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া নাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিতেন। সাধারণ নরনারীগণকে একত্রে উপদেশ কালে আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি—কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্ত্তন করিলেই

জীব উদ্ধার হইবে; কলির 'জীব' অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু, স্বল্পশক্তি—সে জন্যই ধর্ম্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার, যোগধ্যানাদি কঠোর সাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হয় এজন্য কখন কখন বলিতেন, "যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে ত ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ, ঐ জন্যই ত সে সংসারের সকল কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে—তাহার ঐরূপ করায় বাহাদুরী বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্তু যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ-মনন করে ঈশ্বর তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন - ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্বে এই ব্যক্তি যে, আমাকে এতটুকুও ডাকিতে পারিয়াছে ইহা স্বল্প বাহাদুরী নহে, এই ব্যক্তি বীর ভক্ত।'

নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদিগের ত কথাই নাই পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটি, অথবা, শ্রীভগবানের কার্য্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল; এই কয়েক জনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট।" অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের অলৌকিক কার্য্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম্মগ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন অন্য কেহই তদ্রূপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের কথাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই ত, ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি,

কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ রহিয়াছে তাহা ত বুঝিতে পারি নাই! দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ একটি কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি—

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দ্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তাও চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সার মর্ম্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্ব জীবে দয়া" (প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব্ব জীবে দয়া' পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকেই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন

করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায় সংসারের সকল কাজ উহাকে অবলম্বনে করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐকথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃত-কৃতার্থ হইবে একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও

থাকিতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্ব্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব !"

লোকোত্তর ঠাকুর ঐরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়নপূর্ব্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার কথা তখন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐ সকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাঁহার এক পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান প্রণালী।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

স্বামিজী একবার গাজীপুরের পওহারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কার্য্যে সফলতার রহস্য কি ?" এবং উত্তর পাইয়াছিলেন, "জৌন সাধন তৌন সিদ্ধি"—যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি, অর্থাৎ সাধন বা উপায়গুলিকে সাধ্য বা উদ্দেশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে।

এই উক্তিটীর প্রকৃত অর্থ লোকে কালেভদ্রে ক্ষণেকের জন্য বুঝিতে পারে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, সাধকের সমস্ত

শক্তি উপায়গুলির উপরেই কেন্দ্রীভূত, হওয়া চাই—যেন উহারাই উদ্দেশ্য, তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন উদ্দেশ্যই নাই, সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে—তাহা হইলে উহা গীতার সেই মহতী শিক্ষারই প্রকারান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে নহে।

আমাদের আচার্য্যদেব তদীয় শিষ্যগণকে এই আদর্শটীর অভ্যাসে অনুপ্রাণিত করিবার রহস্য অদ্ভুত রকমে জানিতেন। তিনি অনুভব করিতেন যে, যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের জন্য কার্য্য করেন, তবে তাঁহাকে উহা ভারতীয় প্রণালীতেই করিতে হইবে। কেন তিনি ঐরূপ ভাবিতেন, তাহার কারণ তিনিই জানিতেন, এবং হয়ত প্রত্যেক ভারতবাসীই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ঐ বিষয়ে একদিকে যেমন তিনি কোন্‌গুলি মুখ্য ও কোন্‌গুলি গৌণ অঙ্গ তাহার ঠিক রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে অতি সামান্য খুঁটি-নাটী ব্যাপারগুলিকেও বাদ দিতেন না। যে সকল খাদ্য শাস্ত্র-সম্মত, শুধু তাহাই আহার করা, এবং হাতে করিয়া গ্রাস উঠান, মেজেয় বসা ও ঘুমান, হিন্দু আচার সকল পালন করা, এবং হিন্দু-চক্ষে যে সকল আচরণ সু বা কু বলিয়া গণ্য তাঁহাদিগকে সেইমত সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা,—এই গুলির প্রত্যেকটী তাঁহার মতে সেই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করিবার উপায়স্বরূপ, যদ্দারা অতঃপর বিদেশীয় লোকগণ জীবনের বড় বড় সমস্যার ভারতীয় সমাধান আপনা হইতেই ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত হইবেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপারও, যেমন সাবানের পরিবর্ত্তে বেসন ও লেবুর রস ব্যবহার করা—এগুলিকেও তিনি প্রণিধান-যোগ্য ও করণীয় বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, বিভিন্ন সম্প্র-দায়ের যে সকল চিরপোষিত ধারণা অমার্জ্জিত বলিয়াও বোধ হইবে তাহাদিগকেও বুঝিতে ও আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বামিজী ভিতরে ভিতরে জানিতেন যে, হয় ত এমন দিন আসিবে,

যখন লোকে তাঁহারই মত ঐ সকল ধারণার পারে যাইবে ; কিন্তু কোন একটা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার পারে যাওয়া, এবং দৃষ্টিহীনতা প্রযুক্ত উহাকে উড়াইয়া দেওয়া বা ঘৃণা করা—এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ!

কোন একটী প্রথা শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শটীকে দেখাইয়া দিবার স্বামিজীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আজি পর্য্যন্ত আমরা ফুঁ দিয়া আলো নিবানকে মহা অপবিত্র ও অসভ্যজনোচিত কার্য্য ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি ; আবার শাড়ীপরা ও ঘোমটা দেওয়ার অর্থ—অভিমান ও হামবড়াইয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা নম্র-মধুরভাবে সকলকে মানিয়া চলা। এই সকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের সর্ব্ব-সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহা পাশ্চাত্যবাসী আমরা হয় ত আদৌ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না। এই ঘোমটা দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী সদানন্দ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "কখনও উহা টানিয়া দিতে ভুলিও না! মনে রাখিও, ঐ শ্বেত অবগুণ্ঠনের মধ্যেই আদর্শ সাধু-জীবনের অর্দ্ধাংশ নিহিত রহিয়াছে!"

এই সকল বিষয়ে স্বামিজী শিষ্যগণকে যাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক পথ বলিয়া জানিতেন, সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেন। যদি তাঁহাদিগকে ভারতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রথমে নিম্নস্তরের শিক্ষাদান প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতেই হইবে ; এবং এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান গুণ—জগৎকে ছাত্রদিগের চক্ষে দৃষ্টি করা—তা এক মুহূর্ত্তের জন্য হয়, সেও স্বীকার। শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রত্যেক নিয়মটী এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। যাঁহারা জগৎকে একেবারেই ছাত্র-দিগের চক্ষে দেখিতে জানেন না, অথবা তাহাদিগকে কোন্ অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে জ্ঞাত নহেন, তাঁহা-দিগের মুখে 'জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে,' 'সহজ হইতে জটিল ব্যাপারে,' 'স্থূল হইতে সূক্ষ্মে' এইগুলি, এবং 'শিক্ষা' শব্দটী পর্য্যন্ত

কেবল কথার কথা মাত্র। ছাত্রের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিকূলে তাহাকে শিক্ষা দিতে গেলে হিতের পরিবর্ত্তে কেবল অহিতই সাধিত হইবে।

স্বামিজীর শিক্ষার মধ্যে তাঁহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ধারণাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটী ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটু ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখনই তিনি কোন নূতন ভাব বুঝিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই তিনি উক্ত মতাবলম্বীদিগের আহার, পরিচ্ছদ, ভাষা এবং চালচলন নিজে গ্রহণ করিতেন। তিনি মাত্র কয়েকটী ধর্ম্মমত সম্বন্ধেই তাহাদিগের সদৃশ হইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন মহান্ আচার্য্য এইরূপ ব্যাপার সকলেও শিষ্যগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ না রাখিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি একটু একটু করিয়া উদ্দেশ্যটী উদ্ঘাটন করিতেন এবং সর্ব্বদাই শিষ্য যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারই সহায়ে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতেন। একথা সত্য যে, তিনি সর্ব্বদাই আপনার এবং অপর সকলের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যটী বিশুদ্ধ কি না তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেন, এবং যাহাতে উহাতে অণুমাত্র স্বার্থ প্রবেশ করিতে না পায়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি না, কারণ আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না। কে জানে কাল আমি কি হইয়া যাইতে পারি?" কিন্তু, যেমন তিনি একবার বলিয়াছিলেন ইহাও সত্য যে, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল—এমন কি ভুলের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যও তিনি ঐরূপ করিতে পারিতেন না। যখন ভুল হইয়া গিয়াছে, তখনই তিনি উহার কারণ প্রদর্শন করিতেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাস আমি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায়

নানা শ্রেণীর দেশীয় ও ইউরোপীয় লোকদিগের বাটীতে ভোজন করিতাম। ইহাতে স্বামিজী অশান্তি বোধ করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার মন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুজীবনের অত্যধিক সরলতা দেখিয়া বাঁকিয়া বসিতে পারে। একথাও তিনি নিঃসন্দেহ ভাবিয়াছিলেন যে, লোকের মন স্বভাবতঃই আজন্মসঞ্চিত সংস্কারসমূহের দ্বারা পুনরায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে। তিনি পাশ্চাত্য দেশে একটী বিরাট্ ধর্ম্মান্দোলনকে, জনৈক অতিরিক্তসুরুচিসম্পন্না স্ত্রীলোকের তুচ্ছ সামাজিক প্রতিপত্তিলালসা হেতু ধূলিসাৎ হইতে দেখিয়াছিলেন। তথাপি তিনি এ বিষয়ে আমাকে কিছুমাত্র বাধা দেন নাই, যদিও তাঁহার মুখের একটী আদেশবাক্যই যে কোন সময়ে উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ইহা যে তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না, তাহাও তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই। বরং কেহ নিজের কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার কর্ণগোচর করিলে তিনি তাহা আদ্যোপান্ত আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি সাধারণভাবে রাজসিক আহার বিহার সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা উহাতে গুরুতর অনিষ্ট হইবে, এরূপও বলিয়া দিতেন;—যে সকল আমরা তখন বুঝিতেই পারিতাম না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থবিশিষ্ট যে সকল বিভিন্ন জাতি রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে সমন্বয়দৃষ্টিতে ধারণা করা যে আমার পক্ষে বাস্তবিকই অতি প্রয়োজনীয়, সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের ইচ্ছাই বলবতী রাখিলেন এবং আমাকে স্বাধীনভাবে এই বিষয়ে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে দিলেন।

যখন আমরা ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছি, সেই সময়ে জাহাজে তিনি নিজ সঙ্কল্পিত আদর্শের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। স্ত্রীশিক্ষাকার্য্যের ভবিষ্যৎ আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা করা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে এবং রীতিমত নির্জ্জন বাস করিতে হইবে। তোমার চিন্তা, তোমার অভাব, তোমার ধারণা, তোমার অভ্যাস—এগুলিকে তোমার

হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। তোমার জীবন ভিতরে বাহিরে ঠিক ঠিক নিষ্ঠাবতী, হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণীর মত হওয়া চাই। ইহার সাধনোপায় তুমি আপনা হইতেই জানিতে পারিবে, শুধু যদি তুমি উহা মনে প্রাণে কামনা কর। কিন্তু তোমাকে তোমার অতীতের কথা একেবারে ভুলিতে হইবে এবং অপরেও যাহাতে উহা ভুলিয়া যায়, তাহা করিতে হইবে। তোমাকে উহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের আপাত-প্রতীয়মান শত ভোগপ্রিয়তা ও নিরঙ্কুশতা সত্ত্বেও কোন সন্ন্যাসীই তাঁহার ন্যায় মনেপ্রাণে সন্ন্যাস-জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি এই সেবাব্রতীর বেলায় তিনি তাহাকে এক মঠের চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতবাসিগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিতে দিয়াছিলেন। আমার নিকট সময়ে সময়ে ইহাই তাঁহার জীবনে প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে সকল লোকের সহিত তাহাদের নিজ নিজ ভাবটী বজায় রাখিয়া কথা কহিতে হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি কল্পনা সহায়ে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, হয়ত ভবিষ্যতে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায় সকলের একটী শাখা গৈরিকপরিধায়ী নগ্নপদ, এবং অতি কঠোর ব্রতধারী হইয়া সকল ধর্ম্মই যে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, সর্ব্বদা এই চরম সত্যের ঘোষণা করিতে বদ্ধপরিকর থাকিবে!

যাহাই হউক এই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করার ব্যাপারটীতে তিনি শুধু কায়মনোবাক্যে উহা কামনা করাকেই একমাত্র আদর্শ পন্থা বলিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। একটীর পর একটী করিয়া তিনি হিন্দু আচার ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটী সম্বন্ধে, ইউরোপে সচরাচর প্রথম কর্ম্মশিক্ষার্থীদিগকে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই দিতে থাকিলেন। এইরূপেই তিনি পাশ্চাত্য আদবকায়দার সদা অস্থির ভাব ও সকল বিষয় জোর দিয়া বলা—যাহা প্রাচ্যবাসীর

নিকট এত অমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়—এই দুইটী অভ্যাসকে দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কষ্ট বা প্রশংসা বা বিস্ময়—মনে কোনরূপ ভাব উদয় হইবামাত্র তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইত। ইহাকে অধর্ম্ম বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ ইহা কুশিক্ষার ফল। প্রাচ্যমানব সকলের নিকট আশা করেন যে, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে অনুভব করুন, কিন্তু ভাব চাপিয়া রাখুন। দিবারাত্র কোন কিছু কৌতুহলোদ্দীপক বা সুন্দর বস্তু চক্ষে পড়িলেই তাহাকে দেখাইয়া দেওয়াকে তিনি চিন্তার নিভৃতভাব এবং স্বচ্ছন্দ গতিকে অন্যায় বাধা দেওয়া বলিয়া মনে করেন। তথাপি প্রাচ্যবাসী আদবকায়দার যে শান্ত শিষ্ট ভাবটী পছন্দ করেন, তাহা যে শুধু একটা নিষ্ক্রিয় জড় অবস্থা নহে, তাহার নিদর্শন জনৈক সাধুর প্রত্যুত্তর হইতে পাওয়া যায়। এক রাজা তাঁহাকে "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" বারম্বার এই প্রশ্ন করিতেছিলেন। তদুত্তরে সাধু বলিলেন, "রাজা, এতক্ষণ যে তাহাই আমি তোমাকে বলিতে-ছিলাম। কারণ, মৌনই তাঁহার স্বরূপ!"

এ বিষয়টীতে স্বামিজী নাছোড়বান্দা ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় শিষ্যগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সংযমের আদেশ দিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাবোচ্ছ্বাসের নাম-গন্ধ মাত্র না রাখিয়া আত্মানুভূতির চেষ্টা কর।"

একবার শরৎকালের এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৃক্ষ হইতে জীর্ণপত্র-সমূহ পড়িতে দেখিয়া, দৃশ্যটীতে কবিত্ব আছে তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু বলিলেন যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়জগতের সামান্য একটী ঘটনা হইতে যে মানসিক উত্তেজনার উদ্ভব, তাহা ছেলেমানুষী মাত্র, এবং অশোভন। তিনি আরও বলিলেন যে, সকল পাশ্চাত্য মানবকে অনুভূতি ও ভাবোচ্ছ্বাস—এই দুইটী জিনিসকে পৃথক্ রাখিবার মহাশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। "বৃক্ষপত্রগুলির পতন লক্ষ্য করিয়া যাও, কিন্তু ঐ দৃশ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা পরে কোন সময়ে নিজের ভিতর হইতে সংগ্রহ কর।"

ইহা আর কিছুই নহে—ইউরোপে যাহাকে শান্ত সংযত হওয়া বলে এবং যে মতবাদ তত্রত্য মঠসমূহে প্রচলিত, অবিকল তাহাই। ইহা আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশেরও এক সূক্ষ্ম উপায় কি না, কে বলিতে পারে? ইহাতে কি এক প্রকারের কবিত্বের সূচনা করিয়া দিতেছে, যাহা জগৎকে এক বিরাট প্রতীক বলিয়া মনে করে, অথচ বিচার বুদ্ধিকে সযত্নে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে বহু উর্দ্ধে স্থান প্রদান করে।

প্রশ্নটাকে শুধু সৎশিক্ষা ও সংযমাভ্যাসের রাজ্যের বাহিরে লইয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াও স্বামিজী উহাকে সমভাবে সত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিচারপ্রসূত সুখলিপ্সাকেও ভয়ঙ্কর বন্ধন বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে ঐভাবে বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, যাঁহারা আদর্শের রাজ্যেই মাতিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে এই একটী ভয় আছে যে, তাঁহারা নিজে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, মাত্র তাহাকেই আদর্শ জ্ঞান করিতে পারেন। ইহা শবের উপর এক রাশ ফুল চাপা দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং কার্য্যে পরিণত করিলে, উহার অর্থ দাঁড়ায়—শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, ইতর সাধারণের পক্ষ পরিত্যাগ এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে আরব্ধ কার্য্যের বিনাশ। কেবল তাহারাই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে, যাহারা প্রলোভনের অতীত, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শুদ্ধ ভাবটীকেই অনুসরণ করে।

ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "সাবধান! ভাল খাওয়া, ভাল পরা—এ সবে মন দিতে পাইবে না। সংসারের বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিলে চলিবে না। এ সকল একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে—সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহা ভাবুকতা মাত্র—ইন্দ্রিয়ের অসংযমজনিত উচ্ছ্বাস। ইহা বিচিত্র বর্ণ, মনোহর দৃশ্য ও শব্দ এবং অন্যান্য সংস্কারানুযায়ী নানা আকারে মানুষের নিকট আসিয়া থাকে। ইহাকে দূর করিয়া

দাও। ইহাকে ঘৃণা করিতে শিখ। ইহা একেবারে বিষ!"

এইরূপে হিন্দু গৃহস্থালীর সাধারণ দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি স্বামিজীর মুখে রাশি রাশি গভীরতর তথ্যের উদ্বোধক হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি কেবল হিন্দুমনেরই সহজবোধ্য। তিনি নিজে আশৈশব সাধুদিগের মঠাদি পরিচালনা বিষয়ে জানিতে উৎসুক ছিলেন। এক সময়ে তিনি একখানি "ঈশা-অনুসরণ" (Imitation of Christ) পুস্তক পাইয়াছিলেন; তাহার মুখবন্ধে উক্ত গ্রন্থের আনুমানিক রচয়িতা জেয়াঁ-দ্য-জার্স (Jean de Gerson) যে মঠভুক্ত ছিলেন তাহার এবং তদনুসৃত নিয়মাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই মুখবন্ধটী স্বামিজীর কল্পনায় পুস্তকখানির রত্নস্বরূপ ছিল। উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না; ক্রমে উহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল এবং তাঁহার বাল্যের স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া গেল। অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তিনি নিজেই ভাগীরথীতটে অপর এক সন্ন্যাসীসঙ্ঘের স্থাপনা করিতেছেন, এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার শৈশবের ঐ বিষয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ ভবিষ্যতেরই পূর্ব্ব ছায়াপাত মাত্র।

তথাপি তিনি যে নিয়মানুবর্ত্তিতা কোন পাশ্চাত্য শিষ্যের নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিতেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বা বিদ্যালয়ের কঠোর শাসনের আনুগত্য নহে; উহা হিন্দু বিধবাদিগের পরিবারের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে নিজের নিয়মগুলি পালন করিয়া যাওয়ার ন্যায়। চরিত্রবতী রমণীর আদর্শ বলিতে তিনি "নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণী" বুঝিতেন। তিনি কি আনন্দের সহিত ঐ কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত।

এই বিষয়টীর আলোচনা করিতে করিতে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমার ছাত্রীবৃন্দের জন্য কতকগুলি নিয়ম কর এবং তোমার মতামতগুলিও স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ কর। আর যদি সুবিধা হয় একটু উদারভাবেরও উহাতে স্থান করিয়া লইও। কিন্তু মনে রাখিও যে,

সমগ্র জগতে পাঁচ ছয় জনের অধিক লোক কখনও একসঙ্গে এই ভাবটী লইবার জন্য উপযুক্ত নহে! ইহাতে সম্প্রদায়েরও ব্যবস্থা থাকিবে, আবার সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যাইবারও পথ থাকিবে। তোমাকে নিজের সহায়কদিগকে নিজেই তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। নিয়ম কর, কিন্তু এরূপভাবে করিও, যেন যাহারা উহাদিগের সহায়তা ব্যতীত কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহারা উহাদিগকে অনায়াসে ভঙ্গ করিতে পারে। আমাদের মৌলিকত্ব এই হইবে যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, অথচ শাসনও পূর্ণভাবে বজায় থাকিবে। সন্ন্যাসীর সঙ্ঘেও ইহা করা যাইতে পারে। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমি সর্ব্বদাই খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই—তাহাতেই বুঝি উহা সম্ভবপর।"

এইখানে তিনি সহসা এই বিষয়টী পরিত্যাগ করিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিলেন। উহা সকল সময়েই তাঁহার প্রীতিকর ছিল, এবং তিনি উহা সকল সময়েই বাস্তব ঘটনার সহিত মিলে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিলেন, "দুইটী বিভিন্ন জাতি একত্র সম্মিলিত হয়, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে একটী বলশালী নূতন জাতির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এই নূতন জাতিটী আপনাকে অপরের সহিত সংমিশ্রণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, এবং এইখানেই জাতিভেদের সূত্রপাত। দেখ না, যেমন আপেল। ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি, তাহারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্কর-সঙ্ঘটনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু একবার ঐরূপ হইবার পর আমরা ঐ বিশেষ জাতিটীকে বরাবর পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।"

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা যে বহু পূর্ব্বকালে, এমন কি আর্য্যগণের পাঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্ব্বেও সভ্য-জাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। রামায়ণে বল, মহাভারতে বল, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বল, জাতকে বল, জৈন অঙ্গ গ্রন্থে বল, সব যায়গায় পোষা হাতীর কথা শুনা যায়। কিন্তু এই পোষ-মানানোটা বাঙ্গালাদেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ-মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাঁকড়া চুল রাখিত, চামড়া পরিত, এবং হাতীর সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। সে জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতী পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে বাঙ্গালাদেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে তিনটী জাতির নাম পাওয়া যায়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরাজীতে যাহাকে Caste বলে তাহা নহে—কিন্তু Ethnic race। একটীর নাম বঙ্গ, একটীর নাম বগধ এবং আর একটীর নাম চের। দ্রবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রবিড় জাতির যে একটা খুব বড় অংশ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুরে অনেক অর্দ্ধ সভ্যজাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাসগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছিল ; কিন্তু কতকাল পূর্ব্বে, সে কথা তাহারা বলিতে পারে না। কোন কোন Anthropologist বলেন, বঙ্গ বা

বং নামে এক দ্রবিড় জাতি বাঙ্গালাদেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনও বাঙ্গালা দেশে আছে। রাঢ়ের বাগ্দীরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়—তাহা বাঙ্গালা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ-প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোন কোন বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তর বঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত্ত এই তিনটী জাতি ছিল। বেদের আর্য্যগণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্য্যাদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জ্জিলিং ও কাঠমুণ্ডের মধ্যে পর্ব্বতময় দেশে বাস করে। নেপালীরা তাহাদিগকে "কিরান্তী" বলে। মালদহের পুঁড়রা পৌণ্ড্রগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতি প্রাচীন-কাল হইতে উত্তর বঙ্গের একটী প্রধান নগর ছিল। কৈবর্ত্তরা উত্তর-বঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লাল সেন কৈবর্ত্তদিগকে ভাগ করিয়া এক দলকে উত্তর বঙ্গে রাখেন এবং আর এক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনও ঐ দুই স্থলে কৈবর্ত্তের সংখ্যা অধিক। সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাঙ্গালায় যত জাতি (Caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্ত্তের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় এই সকল জাতি বাস করিত। ইহারা কতক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল; কারণ, জৈন-দিগের প্রায় সকল তীর্থঙ্করই বাঙ্গালাদেশে বিশেষতঃ রাঢ়ে বহু দিন বাস, তপস্যা ও সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক আপন আপন ধর্ম্মের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ বাঙ্গালীদিগের মত। বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম দুইটী সাংখ্যদর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলের আশ্রম বাঙ্গালাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনও 'কপিল মুনি' বলিয়া একটী স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটী আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্য পণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ বিষয় নূতন প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে "অশিষ্ট" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্যমত নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েকজন "শিষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি, সাংখ্য ও কাপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং যাহারা কাপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অত নীচ। এমন কি ব্রাহ্মণদের সহিত কাপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙ্গালীদের উপর আর্য্য ঋষিদিগের এবং তাহাদের বংশধরদিগের অনুগ্রহ বড়ই বেশী। তাঁহারা বলেন তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙ্গালীকে বসিতে দিবে না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালাদেশ আর্য্যদের দেশ ছিল না। তবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজী হন না তাঁহাদের উপকারার্থ

এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের অধিকার কালে রাজসাহী অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়। ইহার এক'শত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা। তবে কোন কোন পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০।১২ শত বৎসরের পূর্ব্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালায় ঐকালে ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাঙ্গালায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে। আদিশূরের কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় না—সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোনও রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচজন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুঁথিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গশাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা বাঙ্গালায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিক-ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনৌজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাতশত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই

ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না ইতিপূর্ব্বে তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাতশত ঘর অকর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু বাঙ্গালা দেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্ম্মও ছিল এবং সে ধর্ম্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হুয়েনসাং ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে তখন একলক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন—অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়ীতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়ীতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়ীতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে বাড়ীতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটী যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্ততঃ একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ এক কোটী বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—দেশটা বৌদ্ধধর্ম্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা মূল স্থান, বাঙ্গালা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। তিনি নির্ব্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বাঙ্গালার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে।" সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিত কালে শুধু যে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল এমত

নহে কিন্তু বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাঙ্গালাদেশে খুব বড় বড় দুইটী নগর ছিল—একটী পোণ্ড্রবর্দ্ধন এবং আর একটী তাম্রলিপ্তি, প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ তামিল দিগের সহর। ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এই জন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। তাহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বানিজ্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোক রাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে ডালটী এখন দুই তিন মাইল ব্যাপী অশ্বথ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হুয়েনসাঙের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে সকল জাতি বাঙ্গালায় বাস করিত—কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত্ত, বঙ্গ, মগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল—পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেই জন্যই বাঙ্গালায় হেলে কৈবর্ত্ত ও জেলে কৈবর্ত্ত বলিয়া দুইটা জাতি হইয়াছিল। এক দলে বৌদ্ধ দীক্ষা পাইত আর এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাহারা যে বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা দীক্ষা না পাইলেও কেবল মাত্র "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" "ধম্মং শরণং গচ্ছামি" সজ্ঞং শরণং গচ্ছামি" বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দীক্ষা না দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাহারা হিন্দুধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহুসংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোনও ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইত। কেননা তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়ই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পায় তবে এখনও তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটু তফাৎ ছিল—ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা অর্থাৎ অর্থটী যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল "অস্মাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারী বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ব্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহ-স্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েক জন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে কৈবর্ত্ত সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোট ছোট রাজা ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোন ধর্ম্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয় পরাজয় এই সকলের জন্য সব রকমের দেবতার মানত করিতেন, মহাভারতের পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণ-দের বাড়ী যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণ-দিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু শিব প্রভৃতির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, ঐসঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" "ধম্মং শরণং গচ্ছামি" "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিতেন, সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক্ সম্ভোজন* করাইতেন, স্তূপ নির্ম্মাণ করাইতেন, বিহার নির্ম্মাণ করাইতেন, বুদ্ধ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া—তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনও দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় খুব ছিল। যাহারা বাঙ্গলা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাজন মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা বড়ই দার্শনিক মত কিনা—একেবারে সাংখ্যবাদ

* এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানর নাম সঙ্ঘ-ভোজন আর নিকটবর্ত্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানর নাম সম্যক্ সম্ভোজন।

ভাঙ্গিয়া অদ্বয় বাদে উপস্থিত কিনা—তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—মহাযান মতে এই তিনটী জিনিষ সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধি-সত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সঙ্ঘ হইলেন বোধিসত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরাণী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। একটা সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার—তিনি হইলেন বোধিসত্ব। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের অপেক্ষা বোধিসত্বের পূজা বেশী বেশী হইতে লাগিল। কারণ, নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিয়া কি হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল—অনেকগুলি বোধিসত্ব ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্ত্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা ইহঁাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর,—বর্ত্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্ত্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশী। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার যো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদির মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড় মুস্কিল হইল—কারণ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ হইল! সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্ত্তি সমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্ত্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গী আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাঙ্ক মূর্ত্তির উপাসনা—এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি পূজা, যুগলাঙ্ক মূর্ত্তির উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধো-পাসনা। বৌদ্ধধর্ম্মে গোড়ায় যে কঠোরতা, কাঠিন্য ছিল এখন তাহা

বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্ব্বাণের পথ পাইল—ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম্ম। সহজিয়া ধর্ম্মের অর্থ ভগবান্ বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ শক্তির সন্তানসম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্ত্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্ম্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর ঠাকুরাণীর সহজিয়া—তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙ্গালী একেবারে অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানীস্থানের খিলিজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙ্গিয়া দিল—দেবমূর্ত্তি, বিশেষতঃ যুগলাঢ্য মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া দিল—সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড় বড় বিহারে যে সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহারাই ঐ ধর্ম্মের অস্থি ও মজ্জা স্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরও নাশ হইল।

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্ব্বে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্‌সাস্ লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ-সংখ্যা তখন সব্ শুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ

হয় না। এত দিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখন তাঁহারা হঠিতেন কখন বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহুসংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধমন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবী ও ফকীর তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশী সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্য্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগ্দী, কৈবর্ত্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রচার-ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরী দিতে হয়। তাহারা বাঙ্গালার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচটী মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্দ্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিল ইহা অল্প বাহাদুরীর কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্ম্মরূপী এক ধর্ম্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্ম্মরূপ ইহা আর কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্ম্মের যেমন চারিটী পা ও গলা—

এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটা অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটী ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে আর একটী ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন—এইরূপে স্তূপটী পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্ম্মরূপী ধর্ম্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটী করিয়া শক্তি ছিল, ধর্ম্মঠাকুরেরও তেমন একটী শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলী, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী, এই সকল ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্ম্মঠাকুর আজও যে বাচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বারশত পাঁঠা পড়ে। ধর্ম্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোন না কোন রোগের ঔষধ দেন। বড়ালের ধর্ম্মঠাকুর 'ক্ষুদিরাম' রক্তামাশয়ের ঔষধ দেন। সোঁয়াগাছির ধর্ম্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈঁচীর নিকটে অচলরায় পিত্তফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয় জাতি। ধর্ম্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শূয়রের মাংস পাওয়া যায় কি না। লাউসেন বলিলেন "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্ম্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাঙ্গালাদেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ পরিণাম।

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধোৎসব-সভায় পঠিত।

নওচন্দী।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)

ময়রাষ্ট্র বা মীরাটের অন্তর্গত সহরসংলগ্ন ও সূর্য্যকুণ্ড নামক সরোবরের অনতিদূরস্থ বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রতিবৎসর একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। ইহা নওচন্দীর মেলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দেশীয় অশ্ব বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং স্থানীয় ও চতুর্দ্দিকের দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের সমাবেশ হয়। এই সূত্রে বহু দূর দূরান্তর হইতে বহুলোকের জনতা ও বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক, নাচ তামাসায় কয়েক দিনের জন্য স্থানটি আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। হোলাকা বা হোলী জ্বালিবার ঠিক নয়রাত্রি পরে এই মেলার আরম্ভ হয় বলিয়া সাধারণতঃ ইহা নওচন্দী নামে অভিহিত। এই মেলাস্থল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একটি তীর্থক্ষেত্র। কারণ, এখানে প্রসিদ্ধ পীর বালেমিঞার দরগা অবস্থিত এবং তাহারই সন্নিকটে চণ্ডীদেবীর মন্দির। আজ কয়েক বৎসরের কথা, আমরা প্রদর্শনীয় নানা স্থান ও নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলাম এবং পীরস্থান দর্শন করিয়া চণ্ডীদেবীর মন্দির-মণ্ডপে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। ক্ষণকাল পরে মন্দিরের পূজারী ঠাকুরের সহিত আলাপ হইল। দরগার সন্নিকটে চণ্ডীদেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি নওচন্দীর পূর্ব্ব কাহিনী যেরূপ বর্ণন করিলেন তাহাতে বুঝিলাম, জনৈক প্রতাপান্বিত হিন্দুর কুমারী-কন্যার নাম ছিল নওচন্দী। বহ্রাইচ, বারাবাঙ্কী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বালেমিঞার দরগা বলিয়া যে পীরস্থান দেখা যায়, তাহা গাজীমিঞা সৈয়দ্ সলারের পিতা বালেমিঞার কবর। এক ব্যক্তির বহুস্থানে সমাধি বিদ্যমান থাকা ভারতে নূতন নহে। কথিত আছে, বালেমিঞা

যে যে স্থানে প্রকট ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার কোন না কোন স্মারক বস্তুর সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার নিবাসভূমি বহ্রাইচেই সমাধিস্থ হন। তাঁহার সময়ে সূর্য্যকুণ্ডের কিছু দূরে এক 'জিন' বা 'দেও' বাস করিতেন। পূর্ব্বে হিন্দুর ধর্ম্মবীর অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'দেও' বা 'জিন' নামে অভিহিত হইতেন। নওচন্দী উক্ত জিনেরই কন্যা ছিলেন। এই জিনের সহিত ফকীর বালেমিঞার যুদ্ধ হয়।* প্রবলতর ঐশীশক্তিসম্পন্ন অদ্ভুৎকর্ম্মা বালেমিঞা হিন্দু জিনের সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করেন + এবং জিনের প্রাণ বধ ও রাজ্য নাশ করিয়া জেহাদের ঢক্কানাদ করিতে থাকেন।

পিতৃরাজ্য উৎসন্ন, পিতৃরক্তে কলঙ্কিত এবং নরশোণিতে প্লাবিত হইতে দেখিয়া বালিকা নওচন্দী বালেমিঞার নিকট আত্মবলি দিতে উপস্থিত হন। ফকীর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করি না।" কিন্তু অনাথা বালিকার নয়নজল তাঁহার হৃদয় দ্রব করিল। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই। আমি এমন কোন উপায় করিয়া দিব যাহাতে তোমার অন্নচিন্তা ত থাকিবেই না অধিকন্তু তোমার নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইবে।" বালেমিঞা তখন নিজের একটি অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান প্রদর্শনীক্ষেত্রের মধ্যস্থলে তাহার কবর দেন। এই কবর একটি বিখ্যাত দরগায় পরিণত হয়। বালেমিঞা বলেন, এই স্থানে যে যাহা মানত করিয়া

* মীরাটে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে এক সন্ন্যাসী ও এক ফকীর একত্র একটি মন্দিরমধ্যে সম্প্রীতির সহিত বাস করিতেন। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। এমন কি একটি ব্যাঘ্র উভয়েরই বাহনস্বরূপ সর্ব্বদা নিকটে থাকিত। তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয়ে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেন।

+ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মীরাট জাটদিগের দ্বারা অধিকৃত এবং হিন্দু দেবমন্দিরাদিতে পূর্ণ ছিল। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়। ১১৯১ অব্দে মহম্মদ ঘোরী ইহা জয় করিয়া প্রায় সমস্ত হিন্দুমন্দির মসজিদে পরিণত করেন।

পূজা দিবে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ পুরুষের এই বাণী শুনিয়া দরিদ্র ও নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ তদবধি রেউড়ী, ভেলীগুড়, নূতন বস্ত্র প্রভৃতি উপচারে এখানে পূজা দিতে আরম্ভ করে। নওচন্দীর তাহাতেই দিনপাত হইতে থাকে। কথিত আছে, এই পুণ্যবতী বালিকা ভগবদ্ভক্তি ও নির্ম্মল চরিত্র প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুমারী অবস্থাতেই তাঁহার জীবনের অবসান হয়। বালেমিঞার দরগার সন্নিকটে উদ্যানমধ্যস্থ এই মন্দির—যাহা চণ্ডীদেবীর মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ—অনেকের মতে নওচন্দীর মৃত্যুর পর স্থাপিত। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী সিন্দূর-বিলেপিতা দেবীমূর্ত্তি কাহার মতে নব-চণ্ডী এবং কাহার মতে সেই জিনকন্যা ব্রহ্মচারিণী নওচন্দীর স্মারক-মূর্ত্তি। পূজারীঠাকুর বলেন, এই দেবীমূর্ত্তি মন্দিরতল ভেদ করিয়া উত্থিতা হইয়াছেন।

পীরের দরগা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তথায় পীরজী বলিয়া এক মুসলমান সাধু আছেন। তিনি একটি 'নাগরা' অর্থাৎ বৃহৎ ঢক্কা বাজাইতে থাকেন এবং স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব মানসিক মত পূজা দিলে পর, পীরজী তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দেন। পার্শ্বেই মন্দিরমধ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢোল, কাঁসি বাজে—পূজা হয়—গান হয়—তাস পাশাও চলে; আবার তাহারই মধ্যে পূজারী যাত্রিগণকে পূজার মন্ত্র পড়াইয়া দেবীর প্রসাদসহ বিদায় দেন। এইরূপে দরগা ও মন্দিরে বারমাসই হিন্দু-মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে এবং অনাথা বালিকার নাম সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। হিন্দু 'দেও' ও মুসলমান পীরের এই কাহিনী আজি গল্পে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূতশীলা নওচন্দীর স্মৃতি লোকসমাজে চিরজাগ্রৎ হইয়া আছে। চরিত্র এমনই অমৃত।

শঙ্করদেব।

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর শঙ্করদেব আর একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পাটবাউসিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। শঙ্করদেব প্রত্যাগমন করিলে পর, কতিপয় ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের তীর্থ-ভ্রমণেতিহাস শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আগমন করেন। শঙ্করদেব স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবিশেষ উপদেশচ্ছলে কহিলেন ঃ—

সর্ব্ব তীর্থ শিরোমণি নামধর্ম্ম সার।
নামের কিঙ্কর তীর্থ যত ব্রতাচার॥
জানিয়া ব্রাহ্মণ নাম-ধর্ম্ম করিয়ো।
নামের প্রসাদে তোরা বৈকুণ্ঠে চলিয়ো॥

এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র হইতে নানা শ্লোকোদ্ধৃত করিয়া শঙ্করবাক্যের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিতে বহু প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু শঙ্করদেব অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ তর্কে পরাস্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাজ নরনারায়ণকে উত্তেজিত করিতে কোনরূপ চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। তাঁহাদিগের বিদ্বেষভাবাপন্ন মিথ্যাভিযোগে অবশেষে নারায়ণ শঙ্করদেবকে বন্দী করিয়া আনিতে চর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যুবরাজ শুক্লধ্বজের কৌশলে চরগণ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিল। শঙ্করদেব শুক্লধ্বজের নিকট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত প্রকাশ্য বিচারার্থ রাজসভায় আহ্বান করিলেন। তদনুসারে কয়েক দিবস

শঙ্করদেব ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তর্ক চলিল। অবশেষে শঙ্করদেবই বিজয়ী হইলেন। মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-উপহার স্বরূপে বহু ধনরত্ন প্রদানপূর্ব্বক 'অশেষ মানের হারে ভূষিত' করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। ভক্ত এবং বন্ধুবর্গ শঙ্করের জয়বার্ত্তা শ্রবণে মহোল্লাসে নিমজ্জিত হইলেন।

শঙ্করদেব পাটবাউসীতে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া মহোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি মহারাজ নরনারায়ণের রাজধানী বেহার নগরে গমন করেন। যুবরাজ শুক্লধ্বজ ও তৎপত্নী ভুবনেশ্বরীদেবী সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর-শুভাগমন-সংবাদে নরনারায়ণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আদেশে শঙ্করদেবের জন্য রাজবাসে একটী নামঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। নরনারায়ণ তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া মহাসম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজানুগ্রহ এক্ষণে শঙ্করদেবের প্রতি অনুকূল হওয়ায়, বিরুদ্ধচারিগণ আর বড় মস্তকোত্তলন করিতে পারিল না। তিনি নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম-সুধা পান ও দান করিতে লাগিলেন; প্রায় প্রতি দিবসই রাজসভায় সুমধুর কৃষ্ণকথা কহিয়া রাজা, প্রজা ও সভাসদ্‌বৃন্দকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

যতই দিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল, মহারাজ নরনারায়ণ ততই শঙ্করদেবের প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। নরনারায়ণ অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শঙ্করদেব রাজা, স্ত্রীলোক ও যাজক ব্রাহ্মণের গুরুপদে বৃত হইতেন না। সেই জন্য প্রথমে মহারাজের অনুরোধ পালনে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অবশেষে নরনারায়ণের সনির্ব্বন্ধানুরোধে তাঁহাকে অগত্যা দীক্ষিত করিতে সম্মত হন; কিন্তু উক্ত কার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বেই তিনি পদ্মাসীনাবস্থায় দেহত্যাগ করেন। এইরূপে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ শঙ্করদেব,—হরিনাম-ধ্বনিতে আসাম-গগন প্রকম্পিত করিয়া, অতুল প্রতাপশালী সুরম্য হর্ম্ম-নিবাসী নৃপতির সৌধমালা হইতে সামান্য জীর্ণ পর্ণকুটীরবাসী

দরিদ্রের গৃহ পর্য্যন্ত হরিনামের প্রবল প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া ১৪৯০ শকের ভাদ্রমাসে মহানগর বেহারে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, দিবা দেড় প্রহরকালে, এই নশ্বর ধরা হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের ন্যায় অসমীয় সাহিত্যও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট হইতে স্বীয় বিকাশ-লাভে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য যেরূপ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবিগণের ও রামপ্রসাদাদি কালী-ভক্তদিগের প্রেম-ভক্তিপূর্ণ গীতি ও কবিতা দ্বারা সমলঙ্কৃত, মহা-রাষ্ট্রীয় সাহিত্য যেরূপে তুকারামাদি সাধু, ভক্ত ও জীবন্মুক্ত মহা-পুরুষদিগের 'অভঙ্গাদি' দ্বারা সংবর্দ্ধিত, হিন্দী সাহিত্য যেরূপ তুলসীদাসাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও তামিল যেরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ তিরু-বল্লিয়ারের সুমধুর সঙ্গীত ও মনোহর পদাবলী দ্বারা ঝঙ্কৃত,' অসমীয় সাহিত্যও তদ্রূপ ধর্ম্মবীর শঙ্কর ও তৎশিষ্যপ্রশিষ্যাদি দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত, উন্নীত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। শঙ্করদেব অসাধারণ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় ব্যঞ্জন বর্ণ শিক্ষা সমাপ্তির অনতিপরেই তিনি যেরূপ সুন্দর কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিলে বস্তুতঃই আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইতে হয়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ঐ কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।—

করতল কমল কমলদল নয়ন।
ভবদব দহন গহন বন শয়ন॥
নপর নপর পর সতরত গময়।
সভয় সভয় ভয়মপহর সততয়॥
খরতর বরশর হত দশ বদন।
খগচর নগধর ফণধর শয়ন॥
জগদঘ মপহর ভবভয় তরণ।
পরপদলয় কমলজ নয়ন॥

একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের নিকট শরণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি কদাচ ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষাগুরু হইতেন না। তাই ব্রাহ্মণদিগকে 'শরণ' প্রদান করিবার একটী নবোপায় উদ্ভাবিত করিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধাবলম্বনে তিনি 'গোপী-উদ্ধব-সংবাদ' নামক একটী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ শাস্ত্রগ্রন্থটী ব্রাহ্মণদিগের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে 'শরণ' প্রদান করিলেন। এই 'গোপী-উদ্ধব-সংবাদ' শঙ্করদেবের রচিত প্রথম গ্রন্থ। দেশ মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মর্ম্মের বহুল প্রচার কামনায় শঙ্করদেব বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ব্রজভাষার সহিত সংমিশ্রিত আসামী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। তিনি বহু কীর্ত্তন, গীত ও ভটিমা রচিত ও প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অসমীয় সাহিত্যের নবজীবন প্রভাতে শঙ্করদেব তরুণ তপনের ন্যায় সমুদিত হইয়া, বীণাপাণির মন্দিরে স্বীয় সুমনোহর গ্রন্থরাজি অর্ঘ্য প্রদান করিয়া, অসমীয় সাহিত্যের প্রকৃত জনকের বরণীয় ও মহনীয় পদে সমাসীন হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ যখন প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমতরঙ্গে প্লাবিত, প্রায় ঠিক সেই সময়েই আসাম গগন প্রকম্পিত করিয়া শঙ্করদেব নামমহিমা উচ্চে বিঘোষিত করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনে যেরূপ কতকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কতকটা বৈসাদৃশ্যও বর্ত্তমান। চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেব উভয়েই স্ব স্ব মতানুবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া পরিগৃহীত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন; উভয়েরই জীবনের ব্রত—বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ। কিন্তু চৈতন্যদেব জাত্যংশে ব্রাহ্মণ, শঙ্করদেব কায়স্থ, চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র, শঙ্করদেব ধনজন-শ্রীসম্পন্ন শিরোমণি ভূঞার গৃহে জাত।

অসমীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদেবের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শঙ্করদেবের নাম অতি বিরল। যে দুই এক স্থলে দৃষ্ট হয়, তথায়ও উহা আসামের শঙ্করদেবকেই নির্দ্দেশ

করিতেছে কি না নিশ্চিত করিয়া বলা যায়না। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষ মহোদয় তদীয় 'অমিয় নিমাই চরিত' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অসমীয় ধর্ম্ম-প্রচারক শঙ্করদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে কিয়ৎকাল শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত চৈতন্যদেবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত তাঁহার ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির মতবিরোধ হওয়ায়, তিনি শান্তিপুর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার না করিয়া শুধু তাঁহার ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করেন। অসমীয় লেখকগণ কিন্তু শঙ্করদেব কর্ত্তৃক 'শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার' সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় তদীয় অক্ষয়কীর্ত্তি 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, 'মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "শুনিতে পাই, শঙ্করদেব সাকার দেবতার উপাসক ছিলেন না; প্রতিমা পূজার, এমন কি প্রতিমা দর্শনেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'অন্য দেবীদেব, না করিও সেব, না খাইবা প্রসাদ তার। গৃহে না পশিবা, মুক্তিকো না চাহিবা, ভক্তি হবে ব্যভিচার॥" শঙ্করদেব প্রতিমা পূজার বিরোধী হইলেও, তিনি যে সাকার মতের বিরোধী ছিলেন এরূপ বলা যায় না; বরং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া প্রণীত 'শ্রীশঙ্করদেব আরু মাধবদেব' গ্রন্থোদ্ধৃত কথোপকথন হইতে প্রতীত হইবে যে তিনি সাকার-মতেরই পোষক ছিলেন। একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রমত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, "পরব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার কোন রূপ হইতে পারে না।" শঙ্করদেব তদুত্তরে বলিলেন, "পরব্রহ্ম নিরাকার বটে, কিন্তু জীবের পরিত্রাণ হেতু ব্রহ্মই আকার ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ব্রহ্ম সাকার হইয়া অবতাররূপে প্রকাশিত হন। * * * আকার বিহীনকো চিন্তা করিবার উপায় নাই দেখিয়াই পরব্রহ্ম

আকার ধারণ করেন।"* . শঙ্করদেব একস্থলে বলিয়াছেন, "মুখে বোল। রাম, হৃদয়ে ধরা রূপ"। ইহা হইতেই প্রতীত হয় যে বিগ্রহসেবা নিষিদ্ধ হইলেও, হৃদয়ে ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করা শঙ্করদেবের অননুমোদিত নহে। আমাদিগের মধ্যেও মূর্ত্ত্যাদির অভাবে ঘটস্থাপন করিয়া হৃদয়ে দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করার প্রথা প্রচলিত আছে।

তিনি কৃষ্ণ ও রাম প্রভৃতি অবতারের অর্চ্চনা ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর পূজা দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কদাপি পূর্ব্বোক্ত দেবদেবীদিগের ও তৎপূজকদিগের নিন্দাবাদ করেন নাই। মহারাজ নরনারায়ণের সভায় এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রবৃত্তিমার্গে গমনকারিগণকে এবং তাঁহাদিগের পূজিত ও অর্চ্চিত দেবতা সকলকে নিবৃত্তিমার্গগামিগণ কখনও নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না, কেবল কৃষ্ণকেই অর্চ্চনা ও ভক্তি করিবে।"*

শ্রীচৈতন্যদেবের 'রুক্মিণী হরণ' অভিনয় হইতেই বঙ্গে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচারই যাত্রার মহান্ উদ্দেশ্য। শঙ্করদেবও আসামে 'ভাওনা' নামে একরূপ নাটক প্রস্তুত করেন। ইহার উদ্দেশ্য আমোদপ্রিয় সাধারণলোকদিগকে আমোদের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

শঙ্করদেব পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই স্বীয় শিষ্যপর্য্যায়ভুক্ত করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপে যবন হরিদাসকে শিষ্য করিয়াছিলেন, আসামের শঙ্করদেবও তেমনি চান্দসাই নামক জনৈক মুসলমানকে নিজ শিষ্যগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন। এই মুসলমান শিষ্য শঙ্করদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক ছিলেন। গারো, ভোটাদি পার্ব্বত্য জাতীয় বহু ব্যক্তিও শঙ্করদেবের

* লক্ষ্মী বাবুর পুস্তক হইতে অনূদিত।

নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মাধবদেব তাই গাহিয়াছেন,—

"পারো ভোট যতনে হরির নাম লয়।
হেনয় হরির নাম সজ্জনে নিন্দয়॥"

হাজারিবাগের দেবস্থান ও কোল জাতি।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন)

দেহ ক্ষণস্থায়ী, তথাপি মানব অমরত্ব চায়। চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার এই ইচ্ছাই মানবকে তাহার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইবার প্রবৃত্তি দেয়—স্মৃতিরূপে সে নিত্য বিদ্যমান থাকিতে চায়। এই স্মৃতি-রক্ষা করিবার অদ্ভুত চেষ্টাই মানবজাতির ইতিহাস।

এই স্মৃতিরক্ষাকার্য্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারত এই জগৎকে পরিবর্ত্তন ও পরিণামশীল দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, চঞ্চলতায় কখনও অমরত্বে থাকিতে পারে না। কারণ, যাহা অমর তাহাই নিত্য, আর যাহা নিত্য তাহা বহু হইতে পারে না। এই বহুত্বের ইতিহাস রাখিবার চেষ্টা ভারত কখনও বিশেষভাবে করে নাই। পরন্তু যে সকল ভাব নিত্যত্বের দ্যোতক-স্বরূপ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে ভারতের সমস্ত যত্ন, ভারতের সমস্ত শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই আজ আমরা ভারতে যত তীর্থ, যত দেবমন্দির, যত চিন্ময়ভাব-প্রকাশক দেবদেবীর বিগ্রহ দেখিতে পাই, জগতের আর কুত্রাপি তত দেখিতে পাই না। কতবার এই সব তীর্থ বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতবার ঐ সব দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইয়াছে, কিন্তু আবার ততবারই তীর্থ সব জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার ততবারই গগনস্পর্শী বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরে পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কেন এমন

হইয়াছে ? ভাঙ্গা জিনিষকে গড়িয়া তুলে, পাথরে ভাব দেখে—এই জাতি কি সত্যই পাতুল ? না,সে বুঝিয়াছে যে, তীর্থ, মন্দির ও পাষাণমূর্ত্তি সমস্তই শাশ্বত ভাবরাশির বহির্বিকাশের চেষ্টার উৎকৃষ্টতম ফলস্বরূপ।

এই তীর্থদর্শন হিন্দুর এক প্রবল নেশা। বোধ হয়, যখন রেল বা জাহাজ হয় নাই তখন এই নেশা আরও অধিক ছিল। দুর্লভ জিনিষকে পাইবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক ও একবার পাইলে তাহাকে কৃপণের ধনের মত আকড়াইয়া রাখিতে চায়। এখন তীর্থ দর্শন সুগম হইয়াছে। তাই সেই ইচ্ছার প্রবল টান আজ আমাদের কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন আমরা বহু তীর্থের নামও জানি না—সন্ধানও রাখি না।

হাজারিবাগ ছোট নাগপুরের দ্বিতীয় সহর। ছোট নাগপুরে যে বহুতীর্থ বর্ত্তমান তাহা আমরা অনেকে জানি না। বিশেষতঃ, এই স্থানের তীর্থগুলি যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ইহা ত আমার অশ্রুত-পূর্ব্বই ছিল।

বিগত ৺শারদীয়া পূজার সময় আমাকে হাজারিবাগে যাইতে হইয়াছিল। ই, আই, রেলওয়ের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে হাজারিবাগ-রোড ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে হাজারিবাগ বেশী দূর নহে। মেলে হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছান যায়। ষ্টেশনে নামিয়া হাজারিবাগে যাইবার জন্য মোটর পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ প্রায় ৪২ মাইল হইবে। পথের দৃশ্য অতি মনোহর। হাজারিবাগ একটী মালভূমির উপর অবস্থিত এবং অতি স্বাস্থ্যকর স্থান; কিন্তু ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। এ অঞ্চলে কয়লা ও অভ্রের খনি আছে।

হাজারিবাগে অনেকগুলি শিবমন্দির। অনেক মন্দিরেই দেবাদিদেবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। সহরে একটী শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। দর্শনে যাইলাম। সেবক একজন বাঙ্গালী গৃহস্থ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই মূর্ত্তি বাঙ্গালীরই স্থাপিত। মূর্ত্তিটী আকারে মানুষ-প্রমাণ—"শবারূঢ়াং

মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং" মূর্ত্তি। শনি মঙ্গলবারে মায়ের নিকট অল্পবিস্তর ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। দেবী তাঁহার সেবকের বাটীর বহির্ভাগে একটী প্রশস্ত ঘরে উত্তরাস্য হইয়া দণ্ডায়মানা। সেবকের নিকট শুনিলাম, দেবী তাঁহাদেরই বংশের ঠাকুর। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ সাধনোদ্দেশ্যে ঐ দেশে আসিয়া বাস করেন এবং সিদ্ধ হন। দেবীমূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থান ভাল লাগায় তিনি সপরিবারে ঐখানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের যে বংশ তালিকা ও বিবরণ আছে তাহা হইতেই এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।* হাজারিবাগের জনসাধারণেরও ঐরূপ বিশ্বাস। বর্ত্তমান সেবকটী সুপণ্ডিত। এখন সাধারণে ঐখানে দেবীর উদ্দেশ্যে বলি ও পূজা প্রদান করেন এবং উহা এখন সিদ্ধপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার সময় হাজারিবাগের সমস্ত বাঙ্গালী মিলিয়া চাঁদা করিয়া ৺দুর্গোৎসব করেন। বারোয়ারী তলায় ৺দশভুজার মূর্ত্তি আনিয়া সমারোহে দেবীর পূজা করা হয়। শুনিলাম, পূর্ব্বে ঐ বারোয়ারীতে যাত্রাদি হইত। ৫।৭ বৎসর হইল যাত্রাদি বন্ধ হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে এখন ঐ স্থানে 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জনসাধারণ সকলেই ঐ উৎসবে যোগদান করিত। শুনিলাম, কোন কোন বিশিষ্ট বেহারী ও পদস্থ কর্ম্মচারীর প্ররোচনায় এখন দলাদলি হইয়াছে। ফলে বেহারীরা এখন স্বতন্ত্রভাবে ৺দশভুজার আর এক মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেখানে উৎসবের কোন আয়োজন দেখিলাম না।

সহরের উত্তর দিকে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে নৃসিংহস্থান নামে এক অতি মনোরম উদ্যান বা কুঞ্জবাটী আছে। পদব্রজে ঐ স্থান যাইতে হয়। পথে দুইটী নদী পড়ে। সেই নদী দুইটীর জন্যই গো যান বা অন্য কোন যানে তথায় যাওয়া যায় না। পথে নদী আছে শুনিয়া গামছা সঙ্গে লইয়া গেঞ্জি মাত্র পরিয়া নগ্নপদে চলিলাম। প্রথম নদীতে সাঁকো আছে। তখন সাঁকোর উপরে

১ ফুট মাত্র জল উঠিয়াছে, কিন্তু বেগ এত অধিক যে বিশেষ সাবধানতার সহিত পার হইতে হয়। দ্বিতীয় নদীতে সাঁকো নাই, নদীর জলও বেশী, এবং অপেক্ষাকৃত গভীর কিন্তু বেগ কম। নদীদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল ৩।৪ মাস পরে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যাহা হউক, প্রথম নদী পার হইয়া উত্তরমুখে খানিক দূর যাইয়া, এক স্থানে সামান্য পশ্চিম-মুখে বাঁকিয়া চলিতে চলিতে দ্বিতীয় নদীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। স্থানে স্থানে প্রায় গলাজল ভাঙ্গিয়া পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। দূর হইতে বৃক্ষাদিপূর্ণ সমতল ক্ষেত্রের শোভা দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইল। নদীর পরপারে একটী ছোট পাহাড়—তাহাতে আরও শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নৃসিংহস্থানে যখন পৌঁছিলাম, তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয় হয়। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই আসিয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম। পাষাণ-বিগ্রহটী নাতিবৃহৎ। সেবক একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ—অতি অল্পেই তুষ্ট। তাঁহার মুখে শুনিলাম, উহা সিদ্ধ স্থান—দেবতা কল্পতরু—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আরও শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ঐ বিগ্রহটীও একজন বঙ্গদেশবাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত। সেবাভার পশ্চিমাঞ্চলের কোন ব্রাহ্মণবংশের উপর পড়ে। বর্ত্তমান সেবকটী আর অধিক কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না, মাত্র বলিলেন যে বিগ্রহটী সহরের শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মূর্ত্তির সমসময়ে বা আরও পূর্ব্বে স্থাপিত।

বিগ্রহটী দক্ষিণাস্য। ইহার আশে পাশে অনেক পাথরের মূর্ত্তি। সবই একটী ছোট ঘরে স্থাপিত। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। অনেকটা স্থান জুড়িয়া মন্দিরের সীমানা। এই সুন্দর স্থানটী তপস্যার বেশ উপযোগী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেখানে থাকিবার যে কোন বন্দোবস্ত আছে, তাহা বলিয়া বোধ হইল না। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, ঐ স্থানে রাত্রিবাসের কোন উপায় নাই। তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। ঐ স্থানে আমি আন্দাজ বেলা ১২টার সময় পৌঁছিয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় পাণ্ডাঠাকুর আমাকে প্রায় ১ মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশমত পথে আসিয়া ছোট ছোট খানা টপ্‌কাইয়া যখন নদীর নিকট পড়িলাম, দেখিলাম সেখানে নদীর জল খুব কম, হাঁটু পর্য্যন্ত—তাহাও স্থানে স্থানে।

হাজারিবাগে দুইটী পুরাতন জাতির বাস—উঁরাও (Oraons) বা কোল এবং মুণ্ডা। উভয় জাতিই অতি সরল প্রকৃতি, সদাতুষ্ট, কঠোর পরিশ্রমী ও দৃঢ়কায়। ইহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, অতি দীর্ঘ পথ হাঁটিতেও কুণ্ঠিত নহে। তবে ইহারা অতি দরিদ্র। পেট ভরিয়া অন্ন কাহারও জুটে কি না সন্দেহ। ইহারা চাঁদিনী রাত্রিতে আমোদপ্রমোদ করে ও নেশা করিয়া নৃত্য গীত করিয়া মাদল বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে; তাহারা এই সব আনন্দে অপরের সহিত কখন মিলিত হয় না কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্টও করে না। মুণ্ডারা শুনিয়াছি, অপেক্ষাকৃত দুৰ্দ্ধর্ষ। ইহারা বীরত্বের আদর বিশেষভাবে করে। কোলেরা ধর্ম্মদেবতার পূজা করে—পার্ব্বতী বা সীতাদেবীর, মহাদেবের, দেবীমাইয়ার, চণ্ডীদেবীর ও হনুমানের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস তাহারা শ্রীরামচন্দ্রের কোন ভক্ত সৈন্যদলের বংশধর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে অনার্য্য-জাতি বলেন।

"হরিবংশে লিখিত আছে, মহারাজা সগর অন্যান্য ক্ষত্রিয় জাতির সহিত 'কোলীসর্প' নামক এক জাতিকে আর্য্যসভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহারা আর্য্যেতর জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের কদাকারই ঐ দূরীকরণের হেতু। এই 'কোলীসর্প' জাতি 'কোল' বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান হয়। উঁরাওগণ নিজেদের 'কুরুখ' বলে, যদিও এখন ইহাদের উঁরাও নামটাই বেশী প্রচলিত হইয়াছে। করুষ দেশ মগধের এক অংশ ছিল তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মহাভারতে করুষ দেশের ও করুষগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই করুষদেশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিল, এবং তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। মনুতে

কারুষ বলিয়া এক জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা ব্রাত্যবৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদিগকে 'কুরুখ' জাতির পূর্ব্বপুরুষ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। উঁরাওগণ কৃষিকার্য্যকেই জীবনের অবলম্বন বলিয়া জানে।

'কুরুখ' বা উঁরাওগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহারা প্রথমে বিহারে বাস করিত; তাহার পর তাহারা হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিহার হইতে বিতাড়িত হইয়া রোটাসগড়ে (রোহিতাশ্ব গড়) আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও তাহারা স্থায়ী হইতে পারে নাই; প্রবল মদ্যাসক্তিবশতঃ ইহারা এখান হইতেও বিতাড়িত হয়। রোটাস গড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তাহারা দলে দলে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে আসিয়া দেখে যে, সেই বন্য-প্রদেশ মুণ্ডা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। উঁরাওগণ মুণ্ডাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিল, ফলতঃ উঁরাওগণ অনায়াসে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া মুণ্ডাদিগকে আরও গভীর অরণ্যপ্রদেশে দূর করিয়া দিয়া নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করিল। এ স্বাধীনতাও তাহারা রাখিতে পারে নাই, কারণ, অচিরেই ইহারা ও অবশিষ্ট মুণ্ডারা ছোটনাগপুরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।" *

বলা বাহুল্য, কোলেরা যখন ধর্ম্মদেবতার পূজা করে, তখন ইহাদের মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ইহাদের মধ্যে তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষিত হয়।

তিনটী প্রধান ধর্ম্মতরঙ্গ বঙ্গদেশকে প্লাবিত করে। বঙ্গদেশে যখন বৌদ্ধতরঙ্গ দেখা দেয়, তখন বাঙ্গালী দীপঙ্কর প্রমুখ মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ সমগ্র এসিয়ার গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হন। তন্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তারের ইতিহাস এই বঙ্গদেশে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই পাওয়া যায়। এমন কি শ্রীশ্রীকালিকার ককারাদি স্তোত্র প্রভৃতিতে বঙ্গ বর্ণমালারই পরিচয় প্রদান করে। এই তন্ত্রের প্রভাব জগতের সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অনুপ্রবিষ্ট। মহাপ্রভু প্রচলিত

* মানসী ও মর্ম্মবাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা এখানে বলা অত্যুক্তিমাত্র। উক্ত তিন প্রকার প্রভাবই হাজারিবাগে লক্ষিত হয়। কোলদের 'চাণ্ডী' বা চণ্ডীদেবীর পূজাই তন্ত্রপ্রভাবের পরিচায়ক।

একদিন শুনিলাম যে, প্রায় ৪৮ মাইল দূরে হাজারিবাগ অঞ্চলের একপ্রান্তে রাজরপ্পা নামে এক দুর্গম স্থান আছে। সেখানে দেবী ছিন্নমস্তার পূজা হয়। সে স্থানটী সেখানকার তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। অপর প্রান্তে হুডরু নামক স্থানে ঐ দেবীর ভৈরব—শ্রীশিব অবস্থিত। হুডরুতে যে বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে, সেই প্রপাতের উপরেই দেবদেবের স্থান। হুডরু হাজারিবাগের শেষ সীমা তাহার পর হইতে রাঁচি জেলা আরম্ভ হইয়াছে।

ছিন্নমস্তা দেবীর কথা শুনিয়া সেখানে যাইবার ইচ্ছা হইল এবং ঘটনাক্রমে সুবিধাও হইয়া গেল। জনৈক আত্মীয়ের বিশেষ প্রয়োজনে চিতোরপুর যাওয়া স্থির হইল। চিতোরপুর রাজ-রপ্পা হইতে ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি এ সুযোগ ছাড়িলাম না। আত্মীয়ের মোটরে চিতোরপুর পৌঁছিলাম। তিনি সেই দিনই আবার সহরে ফিরিলেন। ফিরিবার সময় একজন স্থানীয় লোকের বাড়ীতে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সে লোকটীর সহরে যাতায়াত আছে। লোকটী বিনয়ী।

চিতোরপুর ছোট গ্রাম। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মিশনরীদের দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল আছে। গ্রামে একটী স্কুলও আছে। গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশ কোল। অন্যান্য জাতিও আছে। মুসল-মানের সংখ্যাও কম নহে। কৃশ্চান কোলও আছে। হাজারিবাগ হইতে এ স্থানের উচ্চতা কম বলিয়া বোধ হইল। চিতোরপুর আসিতে পথে রাঁচি রোড্ ফেলিয়া ভেড়া নদী পার হইয়া রামগড় নামক গ্রাম হইয়া আসিতে হয়। এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোহর।

যাঁহার অতিথি হইলাম সেই লোকটীকে কোল বলিয়াই মনে হইল। তাঁহার কুটীরের বহির্ভাগে বেড়া দেওয়া স্থানে রাত্রিবাসের মত স্থান করিয়া লওয়া হইল। আমাকে দেখিবার জন্য বহু কোলের

সমাগম হইল। হিন্দিকথা তাহারা বেশ বুঝিতে পারে ও বুঝাইবার মত বলিতেও পারে। সরল শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তাহারা খুব উৎসাহ দিল,. তবে বলিল সে স্থানে যাইতে হইলে প্রাতে যাওয়াই ভাল। বৈকালে যাইলে ফিরিবার সময় রাত্রি হইতে পারে। রাত্রিতে সে পথ নিরাপদ নহে। কোলেরা সকলেই অতিথিবৎসল।

সেই কোল ভদ্রলোকটীর অনুগ্রহে আমি তাঁহাদেরই প্রস্তুত অন্ন, ডাল ও রুটীর দুই দিন ধরিয়া সদ্ব্যবহার করিলাম। দরিদ্র কোলেরা অন্ন কেবল মাত্র লবণ দিয়া আহার করে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কোলেরা ডাল ও সামান্য তরকারী ব্যবহার করে। অন্নই উঁহাদের প্রধান খাদ্য। যে সব কোল সহরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সামান্য সামান্য ব্যবসায় করে, তাহারাই কখন কখন রুটীও খায়।

কোল ব্যবসায়ীরা কখন ঠকায় না। কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দিলে তখনই ফেরৎ দেয়, এক কথায় দর ঠিক হইয়া যায়।

পাহাড়ের রাস্তায় পদব্রজে যাওয়া কষ্টকর। সুতরাং যানের চেষ্টা করিতে হইল। কোলদের সাহায্যে এক অশ্ব মিলিল। যাহার অশ্ব সেও সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। এখানে বলিয়া রাখি যে চিতোশ্বপুর হইতে দেবী দর্শনে যাইতে হইলে যান যোগাড় করা দরকার। নতুবা পথে অত্যন্ত কষ্টের সম্ভাবনা। ২০ বা ২॥০ টাকা দিলেই ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়।

যে ঘোড়া আমি পাইলাম সে অনেকবার রাজরপ্পার পথে যাতায়াত করিয়াছে। ঘোড়াটীও সেখানকার মধ্যে বেশ দ্রুতগামী।

তৃতীয় দিনের প্রাতে, অরুণোদয়ের পরেই, জিনশূন্য অশ্বপৃষ্ঠে কম্বলাসন পাতিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা রেকাবিযুক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাস্তা দিয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিলাম! পাকা স্কুলবাটী পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। ঘোড়া ছুটাইলাম, ঘোড়ার মালিক পিছাইয়া পড়িল। অল্পদূর যাইতে উচ্চ ভূমিতে ক্রমশঃ উঠিতে লাগিলাম—মাঠের আশে

পাশে দূরে দুটী একটী গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল। ছোট ছোট জঙ্গলও নয়নগোচর হইল। তাহার পর পাহাড়ে চড়াই আরম্ভ হইল। এখানে অশ্বটীর প্রভুর সাহায্য আবশ্যক মনে করিলাম। ঘোড়া থামাইয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া বড়ই আরাম বোধ করিলাম। অশ্বের প্রভুটী আসিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে ঘোড়া ঠিক যাইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন দরকার নাই—তবে ধীরে ধীরে যাইলে ভাল হয়।

পাহাড়টী অনেকটা কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায়, আস্তে আস্তে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সুখের বিষয়, খড্ হইতে অনেক দূরে পাহাড়ের পথ—নতুবা অশ্বগুলির খডের ধার দিয়া চলিবার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। পথ ক্রমশঃ বন্ধুর হইতে লাগিল। অরণ্যও ঘোরতর হইতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে আবার দু একস্থানে বৃক্ষলতাদিবিহীন পাথরের উপর দিয়া যাইতে হইল। এখানে পাশে জঙ্গল কম। অল্পদূর যাইয়া পথ ভাল বোধ হইল। ঘোড়া ছুটাইলাম। ঘোড়া সাবধানে দৌড়িল। পর্ব্বতের খুব উচ্চ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল। দূরে নিম্নভূমি দৃষ্ট হইল। সেখানকার পর্ব্বতমালাও ছোট ছোট বোধ হইতে লাগিল। বড় বড় বৃক্ষও যেন পর্ব্বতগাত্রে ঘাসবনের মত মনে হইল। শালবনে পরিপূর্ণ নিম্নভূমি কি সুন্দর! যাঁহারা গিরিডি গিয়াছেন তাঁহারা এ দৃশ্য বুঝিবেন। গিরিডির পথে রেল হইতে যে সকল শালবন দেখা যায়, ইহা তাহা অপেক্ষাও বড়, দিগন্ত বিস্তৃত ও মুগ্ধকর। কি সুন্দর দৃশ্য! মানব মাত্রেরই হৃদয় বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে সুন্দরের কণামাত্রের প্রকাশে বাহিরের এই সৌন্দর্য্য তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনে না জানি উহা কতদূর মুগ্ধ হয়!

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অল্প সময়েই ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুর্গম স্থানেও মধ্যে মধ্যে দু একজন দরিদ্র, ছিন্ন বস্ত্র কাঠুরিয়া দেখিতে পাইলাম। বন নিবিড়-তর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পথ দেখা যায় না। গাছে গাছে পথরোধ হইয়াছে। ডাল ভাঙ্গিয়া বা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া

যাইতে হয়। অন্ধকার বন, দূরে স্থানে স্থানে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় সূর্য্যরশ্মি বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া চোরের মত ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। কিরণে বৃক্ষপত্রসমূহের উপরিভাগ যেন জ্যোতির্ম্ময় বোধ হইতে লাগিল—সেই জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধে চলিয়াছে। এই সামান্য আলোকই এ পথে পথিকের একমাত্র সহায়। পথের একমাত্র সঙ্গী অশ্বের প্রভুর আর সন্ধান পাইলাম না। পরে জানিলাম, সে পথিমধ্যে কোন কাঠুরিয়ার নিকট বসিয়া তামাকু সেবন করিয়া স্বানন্দচিত্তে বিশ্রামলাভ করিতেছিল। সঙ্গীহারা হইলেও উপায় নাই। সুতরাং অশ্বপৃষ্ঠে চলিতে লাগিলাম। ঘোর অন্ধকারে ঘোড়া মাঝে মাঝে থমকাইয়া আবার ধীর মন্থর গতিতে সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঘনান্ধকার অরণ্যের নীরব নির্জ্জনতায় ঝিল্লিরবের মত শব্দ শ্রবণে হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যায়। বাহিরের এই স্বল্প স্তব্ধতাতেই মানব হৃদয় গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়—না জানি সমাধিপথে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলে যে অচঞ্চল ধীর স্থির সত্বার বোধ হইয়া থাকে তাহার অনুভবে ঐ ভাব কত অধিক পরিমাণে আনয়ন করে! কিছু দূর যাইতেই জঙ্গল পাতলা হইল সূর্য্যালোক দেখা যাইতে লাগিল। এতক্ষণে একস্থানে উৎরাই করিতে হইল। পাথর কাটিয়া ধাপের মত করা আছে দেখিলাম। ঘোড়া হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এইবার পিছন হইতে সঙ্গিটীর ডাক্ শুনিলাম, আমি সাড়া দিলাম। সঙ্গিটী আসিলে পথে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়া গল্প করিতে করিতে চলিলাম। সঙ্গিটীর পিঠে কাপড়ে বাঁধা জবা, বিল্ব, চিনি ঠিক্ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে দেবীর জিনিষ তাহারা অতি সাবধানে ও ভয়ে রক্ষা করে। তাহার কাছে শুনিলাম,—যে এবার বর্ষা অধিক দিন স্থায়ী হওয়ায় জঙ্গল এত ঘন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ঐ সময় কাঠুরিয়ারা পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারে নাই। সে আরও বলিল যে, এই বিগত ৺শারদীয়া পূজার সময় বা পূর্ব্বেই জঙ্গল যথাসাধ্য কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল।

তবে এ পথ দিয়া লোক বড় যাতায়াত করে না। সকল বৎসর এ পথ সাফও হয় না! দেবী স্থানে যাইবার আরও দুইটী পথ আছে। একটী এই অরণ্যের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। অপরটী গোযানের পথ—বহু মাইল ঘুরিয়া দেবীস্থানে পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার নবমীর দিনে দেবীস্থানে মেলা হয়। তখন শত সহস্র লোক ঐ দুই পথ দিয়াই যাতায়াত করে। অতি অল্প লোকেই বনের পথে যায়। এবার নবমীর দিন দেবীর নিকট শত শত বলি পড়িয়াছে। এই প্রকার নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। আবার দু একস্থানে ঐরূপ উৎরাই করিতে হইল। এইবার একটী জলা পার হইলাম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে দূর হইতে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ একটানা শব্দ শুনিতে পাইলাম। অতি উৎফুল্ল হইয়া সঙ্গীটী বলিল যে উহা দেবীস্থানের নদীসঙ্গমের শব্দ। অশ্বটীকে একটু দ্রুত চালনা করিলাম। জলা জঙ্গল ভেদ করিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। কি চমৎকার, কি চিত্তরঞ্জন ছবি! দুই নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে দেবীর মন্দির। একটী নদী—নাম ভেড়া নদী—পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ছুটিতেছে। ভেড়া নদীর অপর পারেই উচ্চ পাহাড়—ঘন বনরাজি পর্ব্বতের অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। খরস্রোতা নদী ছুটিয়া আসিতেছে। জলের নীচে ও উপরের উপলখণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, আবর্ত্ত কাটিয়া, ফেনা তুলিয়া, আছাড় পিছাড় খাইয়া নদী ছুটিতেছে। একস্থান অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সেই স্থানের উপরেই মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমদিকে আর একটী নদী প্রবাহিতা—নাম দামোদর। দামোদর অনেক নীচে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে অতি ভীষণবেগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণীপাক খাইয়া সফেন—যেন শত শত ফণা বিস্তার করিতে করিতে হলাহল উদ্গীরণ করিয়া ধাবমানা। দামোদর, ভেড়া নদী অপেক্ষা প্রায় ৩০।৪০ ফুট নিম্নে প্রবাহিতা। ভেড়া নদী যে স্থানে আসিয়া দামোদরের সহিত সংযুক্তা হইয়াছে, সে স্থানের পাথর একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং

ছোটখাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র নদী সূর্য্যালোকে দীপ্ত। হর্ হর্ শব্দে জল আসিয়া দামোদরে পড়িতেছে সে শব্দের বিরাম নাই—তাহারই রবে দিগন্ত মুখরিত। সাগরগর্জ্জনবৎ ঐ রবই দূর হইতে সকলের হৃদয়ে এই স্থানের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করাইয়া দেয়। আর এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী—মহাশক্তিরূপে বিশ্বের ভিতরে ও বাহিরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমানা জীবকল্যাণকারিনী ভীমা ছিন্নমস্তা!!

সেই অরণ্যের দিকে একবার চাহিলাম। সেই আঁধারভাব—ঘন-বৃক্ষছায়ায় যেন কি এক কুহক রচনা করিয়াছে! দূরে—আরও দূরে ঘোর অন্ধকার—দৃষ্টিপথ রুদ্ধ—যেন এক মহা তমসা আর এক কেন্দ্রীভূত তমসার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে!! আঁধারে জন্ম, আঁধারে লয়, তবু তাহাতে হৃদয় আলোড়িত! কৈ বনবিহারী শ্বাপদকুলের নিকট ত মানবদৃষ্টির গোচরীভূত অন্ধকার নাই? কি ইন্দ্রিয়ের ছলনা? কি মোহ! বাসনার অতৃপ্ত ফলে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ—জগতের প্রকাশ। বিলাস লালসার অদম্য তাড়নায় দেহে আত্মবোধ, বিশ্বে ভালবাসা, মহামায়ার এ কি মায়া! এরূপ নির্জ্জন, রুদ্র গম্ভীর-ভাবময় স্থানে কি মানুষ নিজের মোহ বুঝিতে পারে, সর্ব্বলোকপ্রভু বিশ্বসত্ত্বার দিকে কি দৃষ্টি ফিরাইতে পারে? মোহমুগ্ধ মানব কি এইরূপ বিবিক্ত দেশে স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া গর্ব্বিত শির নত করিতে শিখে, এবং স্বরুধিরপায়িনী সর্ব্বশক্তিময়ী জগজ্জননী কি এইরূপ স্থানেই আবির্ভূতা হইয়া অহেতুক করুণায় নিজ সন্তানের অনন্ত বাসনা সংস্কাররূপ মস্তকসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে নূতন জীবন, নূতন দৃষ্টি প্রদান করেন? বিক্ষিপ্তচিত্ত ভ্রান্ত সন্তান কি আপন মাকে এইরূপে চিনিতে পারে?

বৃক্ষতলে বহুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পরে উঠিয়া ভেড়া নদীতে স্নান করিলাম। দামোদরের কথা ত দূরে, প্রপাতের নিকটও যাইবার কোন উপায় নাই। দেবীর মন্দির পাকা ও ছোট, উচ্চতাও বেশী নহে। মন্দিরের চারিদিক বাঁধান—চারিদিকেই বসিবার ও প্রদক্ষিণ করিবার বেশ প্রশস্ত চত্বর। মন্দির দেখিয়া বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই পাকা চত্বরটী খুব বেশী দিনের বলিয়া

মনে হয় না। দেবীর ও তাঁহার পার্শ্বের দুইটী মূর্ত্তি সমস্তই প্রস্তরময়ী। বেলে পাথর বা কতকটা চূণার পাথরের মত বলিয়া অনুমান হয়। পাষাণে কালের প্রভাব পরিস্ফুট মূর্ত্তিগুলির স্থানে স্থানে পোকায় কাটা ছিদ্রের মত ও এক আধ্ স্থানে সামান্য চট উঠার মত দেখিলাম।

দেবী ও তাঁহার সহচরীদ্বয় দক্ষিণাস্যা। তিনজন সেবক দেখিলাম। তিনজনেই বাঙ্গালী। দীর্ঘ প্রবাসে তাঁহাদের চেহারার যে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা নহে। তাঁহাদের একজনের নিকট শুনিলাম, দেবী বহু পুরাতন, কতদিনের বা কত শত বৎসরের তাহা কেহ জানে না। ঐ মূর্ত্তি ঐ স্থানেই পূর্ব্বে ছিল। ঐ স্থান কোন সময়ে বহু বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকের সাধনার স্থান ছিল। প্রবাদ, অনেকে এই গুপ্ত স্থানে আসিয়া সিদ্ধ হন। এইরূপে এই ভাবে কত বৎসর বা কত পুরুষ চলিয়া আসিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে, তাঁহাদেরই একজন পূর্ব্বপুরুষ—ঐ স্থানে সিদ্ধ হইয়া ঐ দেশের জমিদার বা রাজার নিকট যাইয়া দেবীর জন্য পাকা মন্দির প্রস্তুত করাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। রাজা স্বীয় ব্যয়ে মন্দির করিয়া দেন ও ঐ স্থানের নাম সেই অবধি রাজরপ্পা বা রাজরুব্ব হয়। তিনি মন্দিরের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হন, কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চাহেন নাই। ঐখানে থাকিয়া তিনি স্বয়ংই দেবী পূজার ভার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি পরিবারাদি দেখিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিতে লাগিলেন, তখন দেবীর নিত্যপূজার অসুবিধা হইতে লাগিল। সুতরাং রাজা তাঁহাকে ও তাঁহার আদানপ্রদানোপযোগী কয়েক ঘর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আনাইয়া সকলকে ঐ ভেড়া নদীর পর পারের পর্ব্বত হইতে ক্রোশাধিক দূরে তাঁহাদের সকলের জন্য যথেষ্ট বাসের ও চাষের উপযোগী জমি প্রদান করেন। ইহা ১৬৩০ সম্বতের কথা। এখন তাঁহারা রাজা পদম্ (পদ্ম) সিংহের অধীনে। সেই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গালী ভক্তবীরদিগের অধ্যবসায় ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

দেবীর সেবকগণ অতি নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট, সরল ও নির্লোভী।

তাঁহারা প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পর বেলা হইলে আপন আপন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া নদী হাঁটিয়া বা সন্তরণে পার হইয়া দেবীর মন্দিরের দ্বার খোলেন। দিনে দিনে পূজাদি সারিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। সন্ধ্যা পর্য্যন্তও ঐ স্থানে থাকা অসম্ভব—কেহ কখন থাকে নাই। রাজরপ্পার জঙ্গল ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, তাই মন্দিরের কোন স্থানে থাকিবার কোন আয়োজন নাই। তবে ভেড়া নদী পার হইয়া সেবকগণের বাড়ীতে থাকা চলে।

দেবী ও তাঁহার সহচরীদ্বয়ের মূর্ত্তিগুলি সবই ছোট ছোট অর্থাৎ উচ্চতায় আন্দাজ ২ হাত হইবে। সংস্কারবশতঃ আমরা দেবীর রুধিরের ত্রিধারা দেখিবার আশা করি। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন দেখিলাম না। গলা হইতে পাথরের তিনটী ধারা গড়িয়া তাহাতে সিন্দুর লেপিয়া রাখিলেই যেন মূর্ত্তীটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

পূজাদি দর্শন, মন্দির প্রদক্ষিণ, প্রসাদ ধারণ করিয়া আবার সেই গাছতলায় ঘোড়ার পিঠের কম্বল পাতিয়া বসিলাম। সেই দিন কোন বেহারী ভক্ত দেবীর জন্য বলি আনিয়াছিলেন। পূজা-সমাপনান্তে তিনি দেবীর মন্দিরে বসিয়া স্তোত্র গান করিলেন। কি মধুর কণ্ঠ! গান যেন এখনও কাণে লাগিয়া আছে। বেলা একটার সময় সেই পূর্ব্ব পথে, ধীরে ধীরে কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গালার কথা"।

(ভারতের-সাধনার লেখক)

(পূর্ব্বালোচনার পর)

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, সভাপতির অভিভাষণের মূল কথা প্রকৃত দেশের কাজের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করা। আমরা এতকাল পলিটিক্স পড়িয়াছি ও পলিটিক্স করিতে গিয়াছি, দেশের কাজ ভাল করিয়া বুঝিও নাই করিতেও যাই নাই। এই বিষয়

সভাপতি মহাশয়ের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া এবারকার বক্তব্য আরম্ভ করিব :—

'আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা-আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা politics শব্দটা শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিষটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke এর বুলি যাহা স্কুল কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই। Gladstone এর কথামৃত পান করি, আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। Seely র Expansion of England নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্ম্মাণ স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্কবিতর্কের বিষয় বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে

সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।"

আমাদের দেশে বিলাতী পলিটিক্সের আমদানী করিয়া যে বিভ্রাট আমরা ঘটাইয়া তুলিয়াছি, সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ ছিল, আমাদের দেশে সনাতন একটা কিছু পলিটিক্স আছে কি না। কিন্তু সে বিবেচনার অবসর হয় নাই। আমরা ইংরাজী পড়িয়া জীবনের যত বিভাগে "স্বদেশী" ছাড়িয়া "বিদেশী"-র আমদানী করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রাজনৈতিক বিভাগের কথা এত কাল চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আজ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিমহাশয় নিজেই স্বদেশী পলিটিক্সের কথা তুলিয়াছেন।

একটা স্বদেশী পলিটিক্স কি আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সম্পূর্ণ পলিটিক্স বিহীন হইয়া একটা দেশ কি এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে? আর সে ত যে সে বাঁচা নয়? জগতে আর কোনও দেশ এমন বিষম ঘটনা বিপর্য্যয়ের মধ্যে এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, যে পলিটিক্সের ভিত্তির উপর আমাদের দেশ এতকাল বাঁচিয়া ছিল, সে ভিত্তির দৃঢ়তা অতি অসাধারণ, নিতান্তই আশ্চর্য্য। এ হেন স্বদেশী পলিটিক্স যে কি ছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না, আমরাই আবার দেশ উদ্ধার করিতে যাই, দুর্দ্দৈব!!

দেশের স্বচ্ছল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমস্ত পলিটিক্সের কেন্দ্র-স্থানীয় ব্যাপার। এই মূলের ব্যবস্থা আগে নিষ্কণ্টক হইলে, তবেই একটা দেশের পলিটিক্স আর্থিক ও মানসিক উন্নতিরূপ নব নব উদ্যমে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স কি ছিল, ইহার সন্ধান লইতে হইলে দেখিতে হইবে যে আমাদের দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কি ছিল।

সব দেশেই পলিটিক্স এই গ্রাসাচ্ছাদনের এক একটা পাকা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলে, কিন্তু সব দেশেই যে সে ব্যবস্থা একই রকমের হইবে এমন কোনও কথা নাই। পাশ্চাত্য পলিটিক্সে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক হইলেন ষ্টেট্ বা রাজশক্তি। সেখানে রাজ-সরকার চাষাকে চাষ করায়, তাঁতিকে তাঁত বুনায়, কারিগর ও ব্যবসায়ীকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত রাখে। সেখানে চাষার ক্ষেতের কথা, তাঁতির তাঁতের কথা, কারিগরের যন্ত্রাদির কথা, ব্যবসায়ীর ব্যবসার কথা রাজসরকারের মাথায় রাত দিন ঘুরিতেছে, এবং পদে পদে তাহাদের যে সব খুঁটিনাটির দরকার, সে সমস্ত রাজসরকার আইন-কানুন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। দৈবাৎ যদি পাশ্চাত্যের রাজসরকার চক্ষু উল্‌টাইলেন, তবে সমস্ত দেশের কাজে, গ্রাসাচ্ছাদনমূলক সমস্ত ব্যাপারে এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রাজশক্তি অনাময় না থাকিলেই পাশ্চাত্যের প্রজাজীবন বিঘ্ন ও অনিশ্চয়তার লীলাভূমি হইয়া উঠে। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান রাজসরকারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের যদি এইরূপ প্রকৃতি হইত, তবে এ দেশে হাজার হাজার রাজরাজড়ার উত্থানপতন ও ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও দেশের প্রজা এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। এতকাল যে তাহারা নিঃশব্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে ও দেশ এবং দেশের বড় বড় আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান রাজ-সরকারে বা রাজধর্ম্মে কখনও নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল প্রজা-ধর্ম্মে। রাজার নিয়োগে, রাজার প্রেরণায়, দেশের প্রজা আমাদের দেশের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত এতকাল চালায় নাই। সে বন্দোবস্ত এতকাল নির্ভর করিয়াছে প্রজার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর, প্রজাধর্ম্মের উপর। বহু পুরাকাল হইতে আমাদের দেশে কিরূপে এই অদ্ভুত প্রজাধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়া ছিল, কিরূপে আপনার মহিমায় এতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটা ইতিহাসের আলোচনা করা এ স্থানে সম্ভব-

পর নহে। অবসর ঘটে ত পরে সে কথার আলোচনা করিব। কিন্তু এই প্রজাধর্ম্মের মহিমার উপর যে আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স প্রতিষ্ঠিত এবং রাজধর্ম্মের মহিমার উপর পাশ্চাত্য পলিটিক্স প্রতিষ্ঠিত, এই মূল তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে আজ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সে রাজধর্ম্মের যে একটা স্থান নাই, সে কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সে স্থান আমাদের পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান নহে, আমাদের দেশের মরণকাটি বাঁচনকাটি সে স্থানে রক্ষিত হয় নাই। আমাদের দেশে রাজা যদি তাহার রাজধর্ম্ম পালন না করেন, তবে কালে প্রজাধর্ম্মে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, —এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে মারাত্মক বিঘ্নগুলির নিরাসন করিবার জন্য প্রজাধর্ম্ম আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়াছে, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নানারকম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। আসল কথা এই যে, আমাদের দেশের, পলিটিক্সের জীবনকেন্দ্র প্রজারা চিরকালই নিজের হাতে রাখিয়া আসিয়াছে। প্রজাধর্ম্মের এই আত্মনির্ভরের ভিত্তি আর কোনও দেশের পলিটিক্সে দেখা যায় না। এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে প্রজারা যে আত্মনির্ভর প্রকাশ করে, সে আত্মনির্ভরের উদ্দেশ্য রাজার রাজধর্ম্মকে আত্মসাৎ করা; রাজধর্ম্মটী আগেই আশ্রয় না করিলে সে সব দেশের প্রজা প্রজাধর্ম্মের স্থিতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের প্রজা রাজধর্ম্মকে আশ্রয় বা আত্মসাৎ না করিয়াও আপনাদের সনাতন প্রজাধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইখানেই তাহার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যে রাজশক্তির কল্যাণে প্রজাধর্ম্ম বাঁচে, ভারতে আপনার কল্যাণেই প্রজাধর্ম্ম আপনি বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ভারতীয় পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রকৃতিতে ত এই প্রভেদ আছেই, তা'ছাড়া আদর্শেও আকাশপাতাল প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য পলিটিক্সের আদর্শ ঐহিক প্রতিপত্তিকে ক্রমশঃ গগনস্পর্শী করিয়া তোলা, ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ ঐহিক প্রতিপত্তিকে আধ্যাত্মিক

প্রতিষ্ঠার উপর মাথাতুলিতে না দেওয়া। প্রজাশক্তির প্রয়োগে ঐহিক প্রতিপত্তিকে যে দেশ যতই বাড়াইতে চাহিবে, সে ততই বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা অবিসম্বাদী সত্য যে ঐহিক ঐশ্বর্য্যকে যদি স্বেচ্ছামত বাড়িতে দেওয়া হয় তবে দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ অনিবার্য্যরূপে খর্ব্ব হইতে থাকে। কাঞ্চন দেবতার স্বভাবই যে এইরূপ তাহা আধুনিক দেশসমূহ কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে ক্রমশঃ দেখিবার বিষয় বটে, কিন্তু ভারতীয় সমাজস্রষ্টারা এ সত্য বহুকাল পূর্ব্বেই অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে দিলে ভারতীয় প্রজাশক্তির হৃদয়ে ঐহিক সমৃদ্ধির অনুসরণে মাদকতা সঞ্চারিত হইবে, সেইরূপ পলিটিক্সের পথে তাঁহারা দেশের প্রজাধর্ম্মকে দাঁড় করাইয়া যান নাই। কাজে কাজেই ভারতীয় পলিটিক্সের মধ্যে ঐহিক সম্পদ ও শক্তির কোনও উচ্চাশাবীজ নিহিত নাই। এ আশা ভারতীয় প্রজা কখনও পোষণ করিতে শিখে নাই যে একদিন তাহারা রাজশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া এমন রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে যে অপরাপর দেশের রাজৈশ্বর্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এ রকম একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিবার আশা এ দেশের প্রজাসাধারণের মনে না থাকিলেও, আর একরকম একটা বৈশিষ্ট্য এ জগতে লাভ করিবার জন্য ও প্রকাশ করিবার জন্য বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহারা যেন যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া বাঁচিয়া আছে। পরমার্থ সাধনার ক্ষেত্রেই সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও পর্য্যবসান। কোনওরূপ রাজনৈতিক বিশেষত্ব যে এ বিশেষত্বের চেয়ে শ্লাঘনীয় নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের এই জাতীয় লক্ষ্যের ধারণা যতই আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ততই আমরা বুঝিতে পারিব, ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ কিরূপ এবং কেনই বা উহা ঐরূপ। জগতে ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ সংরক্ষণ ও প্রচার করা যাহার জীবনব্রত,

ঘোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিয়া সাধারণ রেষারেষিতে যোগদান করা তাহার শোভা পায় না, তাহার স্বধর্ম্মানুকূলও নহে। সমগ্র মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও আনুকূল্যে জাতীয় জীবন গঠন করা কিরূপে হইতে পারে,—যাহাকে এ শিক্ষা জগতে প্রচার করিতে হইবে, তাহার পক্ষে আধুনিক ভ্রান্ত-জাতীয়তা-মূলক রাজনীতির আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিবেশে অবতীর্ণ হওয়া শুধু বিসদৃশ নহে, অসম্ভব। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়"। শুধু ফাঁকা মুখের কথায় যদি জগতে উচ্চ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করা চলিত, তবে আধুনিক পাশ্চাত্য নেশনদের সে সম্বন্ধে কোনও ত্রুটি ছিল না!

যদি আপত্তি উঠে যে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার আসরে না নামিলে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা, জাতিত্ব বা নেশনত্ব ত দূরের কথা, তবে আবার বলিব যে আমরা যদি আমাদের ভারতীয় পলিটিক্সকে স্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি আমাদের প্রাচীন প্রজাধর্ম্ম আবার ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠে ও ইংরাজের ভারতীয় রাজনীতিকে আমাদের রাজধর্ম্মে পরিণত করে, তাহা হইলে আমরা বাঁচিব ত নিশ্চয়ই, উপরন্তু জগতের আধুনিক রাজনীতির নেপথ্যে যে ভারতীয় জাতিত্ব বা নেশনত্ব সমগ্র ভারতে-তিহাসের একমাত্র তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য, তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত হইবে। এই নেপথ্য আজ নেপথ্যরূপে প্রতিভাত বটে, কিন্তু রাজনীতির আসরে আজ যে আগুণ লাগিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আজ যাহা নেপথ্য কাল তাহা আর নেপথ্য থাকিবে না। যে আসরে বিধাতা আজ স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন, যে আসরের অন্তরালে আমাদের সনাতন জাতিধর্ম্মকে নূতন মহিমায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য বিধাতা ইংরাজ রাজনীতিকে প্রাচীররূপে ব্যবহার করিতেছেন, সে আসরের প্রধান্য জগতের জীবনরঙ্গমঞ্চে আর বেশী দিন টিকিবে না, একথা চক্ষুষ্মানের আর বুঝিতে বাকি নাই। অতএব আজ পাশ্চাত্য পলিটিক্সের

আদর্শে মুগ্ধ না হইয়া ভারতীয় পলিটিক্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের নিকট বিধাতার আহ্বান ঘোষিত হইতেছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রাকা।—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত. গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বসিরহাট হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে একজন প্রথিতনামা কবি। ঘনায়মানা সন্ধ্যার নীলকৃষ্ণাম্বরে ক্রমপরিস্ফুট তারকা খচিত দৈবতকুলের লীলাপ্রাঙ্গণ 'ছয়াপথের' সন্ধান ইনিই একদিন আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আবার আজ সিতোজ্জ্বল গগনপটে অবিরাম মধু-নিস্যন্দী, অনন্ত শোভার আধার, পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের মনোহারিত্ব আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম. করাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। কাব্যামোদী পাঠক কি এ সুযোগ অবহেলা করিবেন? ত্রিযামার প্রথম যাম অতীত হইতেই ইনি যে 'লোকাতীত ভূমির" দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "মলিনার আত্মবিকাশ" ও "রসবিলাস" ভাগে বৈষ্ণব মহাজন ও কবিকুলের পন্থানুবর্ত্তনে মধুর রসের সাধনায় কবি সেই লোকাতীতের দিকেই মুহুর্মুহু অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কবিতা বাঙ্গালীর সাধারণ ধন। চণ্ডী, দুর্গা, কালী, মনসা সাধককুলের জীবন গড়িয়া তুলিয়াই নিরস্ত হয় নাই অপিচ বাঙ্গালীর সাহিত্যে, বাঙ্গালীর সংসারে নিত্য আনন্দের রজতপ্রবাহ ছুটাইয়া দিয়া চলিয়াছে। চৈতন্যদেবের আলোকসামান্য প্রেম ও ভক্তিও তদ্রূপ যুগপৎ সাধক ও সাহিত্য দুয়েরই সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে সাহিত্য মানব জীবনের সমগ্রতা ও অখণ্ডতার উপরই স্থাপিত হওয়া উচিত; সাহিত্যে শুধু ধর্ম্মোপদেশ করা চলে না। সাহিত্যে কল্পনার কল্প-লোক বিস্তারেরও স্থান আছে;

আধুনিক ইউরোপীয় ও তদনুযায়ী বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু কলা-কৌশলের দোহাই দিয়া অনেক আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে প্রত্যক্ষদর্শিত্বের উপর ধর্ম্ম ও সাহিত্য উভয়েরই প্রতিষ্ঠান তাহা কিন্তু চিরকালই নানা ভাবে নানারূপে এমন কি কল্পনার আলোকেও মানবের হৃদ্গত উপাস্য সেই পরম সত্যেরই নীরাজন করিয়া আসিবে, কৌশলের তন্দ্রাবেশ অথবা কষ্টকল্পনার সম্মোহনবিদ্যার সকল প্রভাবই তাহার নিকট ব্যর্থ। কবিতা ও কাব্যের সৃষ্টি লেখক এবং চিন্তাশীল পাঠককে কল্পনার মানসলোক হইতে ধ্যানলোকের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র তখনই, যখন কল্পনা ধীরা ও সংযতা প্রবৃত্তি—স্থিরতটা নিবৃত্তিলগ্না। সংস্কৃত আলঙ্কারিক এই জন্যই কাব্যের 'সদ্যঃপর নিবৃতায়' লক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছেন। 'রাকা'র কবিতাগুলি এইরূপ প্রসাদ-গুণ-সমন্বিত। গীতগোবিন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত পদাবলীর ছন্দে বিরচিত 'রসবিলাস' অংশ কবির অনুকরণ ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক, অন্যত্র কবির চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা ও ভাবের প্রগাঢ়তাও বিশেষ পরিস্ফুট।

প্রতিধ্বনি।

(শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ)

[গ্রীকপুরাণে বলে প্রতিধ্বনি (Echo) একসময় পরমাসুন্দরী দেবী ছিল। তাহার বাক্যের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া দেবেশ্বরী জুনো অবকাশে তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিতেন। কিছুদিন আসিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, প্রতিধ্বনির বাগ্‌বিন্যাস তাঁহার স্বামী জুপিটরকে আকর্ষণ করিবার দুরভিসন্ধি মাত্র। জুনো কৌশলে তাহার বাক্‌শক্তি অপহরণ করিলেন। কেবল কাহারও কথার শেষাংশটীর পুনরুচ্চারণে তাহার ক্ষমতা রহিল। মনোদুঃখে Echo গিরিরন্ধ্রে আত্মগোপন করিল। এই সময় যুবক নারসিসসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে Echo যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না! প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে তাহারই বাক্যশেষের পুনরুচ্চারণে বিরক্ত হইয়া যুবক Echoর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। মনোভঙ্গে Echo গলিয়া গলিয়া শুধু কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আজিও পর্য্যন্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণ করিতেছে।]

নিদাঘের সারাদিন ধ'রে
বন হ'তে বনান্তরে ঘুরে—
সঙ্গী সঙ্গে ছিল যারা
কোথায় গিয়াছে তারা—
বনপ্রান্তে পরিশ্রান্ত যুবা,

কুঞ্জে বাঁধা তরু দেবদার,
আসিয়া শুইল তলে তার।
করুণায় শিলাতল
পাতিয়া দিল অঞ্চল,
পদে সন্ধ্যা, শিরোপরে দিবা।

মুখর পাখীর কলস্বর
পূর্ণ ক'রে দিল বন-ঘর।
অদ্ধস্থ শিশুর চোখে
স্নেহ দৃষ্টি ধ'রে রেখে
বুকের উপর দিয়া হিয়া,

যেন স্বর্ণকিরীটিনী মাতা
প্রাণময়ী দেবী শৈলসুতা
বালকে বিস্মৃতি দিতে
শৈল নির্ঝরিণী হ'তে
আনে গান ঘুম পাড়ানিয়া।

সুষুপ্তি না আসিতে স্বপন
যুবারে করিল আকর্ষণ;
অন্তশ্চক্ষু মেলি-হেরে
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে
বাম করপত্রে মুখখানি—

ভূমে লুটে সোণালি অঞ্চল,
পদপ্রান্তে সুশুভ্র কমল,
শিলায় হেলান দিয়ে
দাঁড়াইয়া আছে চেয়ে
তার পানে সুন্দরীর রাণী।

শুধু দৃষ্টি—পলকবিহীন,
শুধু দৃষ্টি—বচনবিলীন;
রুদ্ধ চারু ওষ্ঠাধরে
যেন যুগ যুগ ধ'রে
লুকাইয়া আছে কত কথা!

ব্যাকুল পিয়াসী চারিধারে
ঘেরে বসে সুন্দর মন্দিরে
উৎসর্গ করিছে ব্যথা,
তথাপি একটি কথা
ছাড়িল না অধর মমতা!

বিশ্বের নীরব অশ্রুজল
তুলিল তুমুল কোলাহল—
প্রচণ্ড স্পন্দন ঘায়
যায়—বক্ষ ভেঙ্গে যায়
তাড়নে জাগিয়া উঠে যুবা।

দুই করে মুছিয়া নয়নে
চাহে সে স্বপন অন্বেষণে।
চেয়ে দেখ চারিধার
কুঞ্জে বাঁধা দেবদার,
তার মাঝে কোথা যেন কেবা।

কোথা হ'তে কেবা যেন এসে
জাগাইয়া ঘুমন্ত পরশে
নিঃশব্দে চলিয়া গেছে,
কুঞ্জ ঘরে লুকায়েছে
আঁধার কবাট দিয়া দ্বারে।

পড়ে আছে সুগন্ধ নিশ্বাস,
ফেলে গেছে বসন বিলাস—
সোণালি অঞ্চল তার
বায়ু লয়ে উপহার
খণ্ডিত ক'রেছে শৈল শিরে।

আত্মরতি ছিল তার সার,
আজন্ম সাথী সে আপনার—
নিত্য এসে তার কাছে
মুগ্ধনেত্র ফিরে গেছে
পদতলে তটিনী রচিয়া।

একান্তে বনান্তে পেয়ে দেখা
প্রতিশোধ নিতে চিত্রলেখা
আজি এক ছবি এঁকে
তৃষিত-তরঙ্গ-মুখে
সুপ্ত হিয়া দিয়াছে ঢালিয়া।

সবে মাত্র আজিকার প্রাতে
এলো সঙ্গী কোন দেশ হ'তে—
কত পরিচয় নিয়ে
মনোমত কথা কয়ে
তাহারে লইয়া এলো সাথে।

গিরি হ'তে গিরিরন্ধ্র কত
মধুগানে হ'ল মুখরিত—
জীবন্ত হাস্যের ধারা
কুঞ্জে কুঞ্জে ঢেলে তারা
অপরাহ্ণে গেল কোন্ পথে।

যুবারে করিতে পরিহাস
তাদেরি কি ছড়ানো বিলাস—
শিলাজলে মিশাইয়া
দীর্ঘশ্বাস সূত্রে দিয়া
রচিল এ সুধাবিন্দু হার ?

সঙ্গোপনে সঙ্গোপনে মিলে
পুষ্পমধু পবন হিল্লোলে,
তড়িত জমাট বেঁধে
আপনি কি এলো সেধে
তিলোত্তমা হয়ে উপহার ?

কে যেন ইঙ্গিত আকর্ষণে
লয়ে তারে গেল কুঞ্জবনে।
সেথা আলো ছায়া সঙ্গে
জড়াজড়ি নৃত্যরঙ্গে
তাহারে করিল আবাহন—

পদশব্দে পদশব্দ কয়,
নিশ্বাসে নিশ্বাস বিনিময়,
কে যেন অনতিদূরে
কাছে গেলে যায় সরে
অঙ্গে দিয়া রঙ্গ আবরণ।

ব্যাকুল হইয়া যুবা ডাকে,
প্রাণময়ী পড়িল বিপাকে !
"কেহ যদি হেথা রও
কথার উত্তর দাও,
বল তুমি নর কিম্বা নারী।"

বক্ষ দেশে ছুটিল তরঙ্গ
মোচড়ি মোচড়ি উঠে অঙ্গ—
বিষাদ বসন প'রে
উত্তর আসিল ফিরে
রন্ধ্র মধ্য হ'তে কথা—"নারী"।

"নারী ?" "নারী।" "সঙ্গে কেহ আছে ?"
"আছে।" শুনে পাখী হাসে গাছে।
চারিধারে চায় যুবা,
কই হেথা আছে কেবা ?
কোথা নারী, কোথা সহচর ?

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার
নেমে এলো স্তূপের আকার।
অন্ধকার অন্ধকারে কয়,
স্তব্ধতার স্তব্ধ বিনিময়—
বুঝিবার গেল অবসর!

পল গেল, দণ্ড গেল, দিন,
বর্ষ হ'ল যুগান্তরে লীন ;
নিত্য নিত্য ধ্বনিছুটে
আনে প্রতিধ্বনি লুটে
"সত্য ক'রে বল কেগো তুমি ?"
আবার পাখীর কলস্বর
পূর্ণ ক'রে দিল বন-স্বর—
চড়ি শুভ্র মনোরথে
প্রভাত আলোকপথে
কথা ফিরে এল—"ওগো তুমি।"

[গ্রীক রূপক ব্যতীত কবিতাটীতে আর একটী উচ্চতর ভাব

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাঁর এক পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান-প্রণালী।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কয়েক দিন পরে আবার ঐ চিন্তাই স্বামিজীর মনে প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমি ভবিষ্যতের যতটুকু দেখিতে পাইতেছি, তাহার শারীরিক ভিত্তি একটী বলশালী ও পৃথক্ নব জাতি ;—ঐরূপ আধার ব্যতীত ঐ প্রকার চিন্তা স্থান পাইতে পারিবে না। সার্ব্বজনীনতা, উদারভাব—এ সকল মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর জগৎ উহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে না!"

নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবাত্মা জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিবার পর যখন উহাতে শ্রান্তি এবং বিরক্তি অনুভব করে তখন সে এই জগতে স্বীয় অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনুসন্ধানের প্রারম্ভে সে বুঝিতে পারে সমস্তই শক্তির খেলা তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ নারীর ভিতর শক্তির বিশেষ বিকাশ দর্শন করিয়া নারীকে শক্তির প্রতীক বলিয়া থাকেন। শক্তির জ্ঞান উপস্থিত হইলে একজন শক্তিমানের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য জীবাত্মা তৎপরে শক্তিমানের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়—তখন সে একজন শক্তিমান পুরুষ যে আছেন ইহা বুঝিতে পারে। কিন্তু তৎক্ষণেই তাহার সন্দেহ হয়, তবে কি আমার শক্তি ও শক্তিমান পুরুষ এই তিন জনের অস্তিত্বই এককালে আছে। তখন সে আপনার নিকট হইতেই উত্তর পায়—না, শুধু তোমারই অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ 'তৎ ত্বমসি' এই জ্ঞান তখন তাহার নিকট উদ্ভাসিত হয়।—উঃ সঃ]

তিনি আবার বলিলেন, "মনে রাখিও—যদি তুমি একখানি জাহাজ দেখিতে কিরূপ তাহা জানিতে চাও, তাহা হইলে উহা ঠিক যেমনটী তেমনই ভাবে উহাকে বর্ণনা করিতে হইবে—উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার, এবং কি কি বস্তুতে উহা গঠিত—এই সকল বিষয়। কোন জাতিকে বুঝিতে হইলেও আমাদিগকে ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। ভারত মূর্ত্তিপূজক দেশ—স্বীকার করি। উহা যেমনটী আছে, ঠিক তেমনই ভাবে উহাকে সাহায্য করিতে হইবে—কোন কিছু বাদ দিলে চলিবে না। যাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা তাহার কোন উপকারই করিতে পারে না।

স্বামিজী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে, ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে। তাঁহার নিজের জীবনে দুইটী বিশিষ্ট সঙ্কল্প ছিল—একটী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্য একটী মঠ নির্ম্মাণ করা, এবং অপরটী স্ত্রীশিক্ষাকল্পে কোন উদ্যমের সূত্রপাত করিয়া যাওয়া। তিনি প্রায়ই বলিতেন, পাঁচশত পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করিতে পঞ্চাশ বৎসর লাগিতে পারে, কিন্তু পাঁচশত স্ত্রীলোকের দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উহা সাধিত হইতে পারে।

শিক্ষা দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইবার উপযোগী বিধবা ও অনাথ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, 'জন্মগত উচ্চ নীচ ভেদকে দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এইটী বিশেষ আবশ্যক যে, যাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হইবে, তাহারা যেন অল্পবয়স্ক হয় এবং গঠিতচরিত্র না হয়। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জন্ম কিছুই নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সব।" কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি বুঝিতেন যে, এবিষয়ে অসহিষ্ণুতা অমার্জ্জনীয়। যদি বার বৎসরে কোন সুফল প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলেই বিশেষ সফলতা লাভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এটী এত গুরুতর কার্য্য যে উহা সম্পাদনে সত্তর বৎসর লাগিলেও তাহা অধিক হইবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি বসিয়া বসিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক নানা

খুঁটিনাটী সম্বন্ধে কথা কহিতেন, একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে অনেক আকাশকুসুম রচনা করিতেন, এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাদরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতেন। হয় ত তাহার কোন অংশটীই যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত হইবে না, তথাপি উহার সবটুকুই নিশ্চিত মহামূল্য। কারণ, উহা হইতে দেখা যায়, তিনি কত স্বাধীনতা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দিক হইতে, কিরূপ ফলকে তিনি সুফল বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও বুঝা যায়।

ইহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, এই সকল প্রস্তাবিত কার্য্য-প্রণালী ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হইবে—ইহার অন্য কারণ না থাকিলেও একটী প্রধান কারণ এই ছিল যে, আমি সেই সময়ে হিন্দুদিগের ধর্ম্মচিন্তাসমূহের আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলাম। এই প্রণালী সকলে পাণ্ডিত্যের দিকে তত লক্ষ্য না রাখিয়া উহাদিগকে সাধুজীবন যাপনের অনুকূল করিবারই বিশেষ চেষ্টা ছিল। কোন্ কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, তদপেক্ষা শিক্ষার প্রকৃতিটীই তাঁহার সমধিক চিন্তার বিষয় ছিল। "আমাদিগের বিদ্যালয় হইতে এমন সব নারী শিক্ষিতা হইবে, যাহারা ভারতের সকল নরনারীর মধ্যে মনীষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে"—একবার মাত্র হঠাৎ এই কথা বলিয়া উঠা ছাড়া, আমার মনেই পড়ে না যে, তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষা প্রস্তাবের ঐহিক দিকটীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি ইহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, কোন শিক্ষা বাস্তবিক তন্নামের উপযুক্ত কি না, তাহা উহার গভীরতা ও কঠোরতা দ্বারা নিরূপিত হইবে। তিনি সে মিথ্যা আদর্শকল্পনায় বিশ্বাস করিতেন না, যাহাতে স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্পতর জ্ঞান বা নিম্নতর সত্যলাভই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

কিরূপ গৃহোচিত স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলে স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যটী খুব উন্নতিশীল অথচ সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে পরিচালিত হইতে পারে—এই সমস্যা তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন

পুরাতন পদ্ধতির নিয়মগুলিকে এমন আকারে প্রকাশ করিতে হইবে, যেন তাহারা বরাবর আধুনিক ভাবাপন্ন লোকদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে।

সামাজিক স্থায়িত্ব ও একতার উপর বিদেশী ভাবসমূহের প্রভাব কিরূপ হইবে, তাহা বিচার না করিয়াই চট্ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করায় যে সকল নৈতিক ও নীতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় কুফল প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষের সামনে ছিল। তিনি স্বাভাবিক সংস্কারবশে জানিতেন যে, যে সকল বন্ধন দ্বারা প্রাচীন সমাজ একতাবদ্ধ ছিল, সেগুলি আধুনিক শিক্ষার আলোকে নূতন করিয়া প্রমাণিত ও পবিত্রতর বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া চাই, নতুবা সে শিক্ষা শুধু ভারতের অধঃপতনেরই সূচনা মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এই পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় যে সহজ ব্যাপার, এ কথা তিনি কদাপি ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই। কিরূপে আধুনিক ভাবগুলিকে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারা যায় এবং প্রাচীন ভাবগুলিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই কঠিন সমস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় ও চিন্তা অধিকার করিত। তিনি ঠিকই দেখিয়াছিলেন যে, যখন এই দুইটীকে জোড়া দিয়া এক করা যাইবে, তখনই জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

কিরূপে হিন্দুজীবনের প্রচলিত ঋণগুলিকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, আধুনিক যুগের দেশ ও ইতিহাসের প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ক সমগ্র ধারণাটীকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঐ পঞ্চ যজ্ঞের* ব্যাপারটী লইয়াই কত কি করা যাইতে পারে! উহাদিগকে কি বড় বড় কাজেই পরিণত করা যাইতে পারে!"

---

* ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো, বলির্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"—মনু।

বিষয়টীর এইরূপ নূতন অর্থ হঠাৎ তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু উহা মন হইতে চলিয়া যায় নাই। তিনি ভাবটীর সূত্র ধরিয়া ক্রমশঃ খুঁটিনাটী ব্যাপারের অবতারণা করিলেন।

"[পিতৃযজ্ঞ], ঐ প্রাচীনকালের পিতৃ-উপাসনা হইতে তোমরা বীরপূজার সৃষ্টি করিতে পার।

"[দেবযজ্ঞ], দেবপূজায় অবশ্য প্রতিমাদির ব্যবহার চাই। কিন্তু তোমরা ঐগুলি বদলাইয়া লইতে পার। মা কালীকে সর্ব্বদাই এক-ভাবে দণ্ডায়মান রাখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ছাত্রীগণকে নূতন নূতন ভাবে মা কালীকে কল্পনা করিবার উৎসাহ দিবে। মা সরস্বতীকে একশত বিভিন্নভাবে ধারণা কর। মেয়েরা নিজের নিজের ভাবগুলি অনুযায়ী মূর্ত্তি গঠন করুক এবং চিত্রাঙ্কণ করুক।

"পূজার ঘরে বেদীর সর্ব্বনিম্ন ধাপে সর্ব্বদা একটী জলপূর্ণ কুম্ভ থাকিবে, এবং তামিলদেশের মত বড় বড় ঘৃতপ্রদীপ সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিবে। এই সঙ্গে যদি দিবারাত্র ভজনপূজাদির বন্দোবস্ত করিতে পার, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা হিন্দুভাবানুকূল আর কি হইতে পারে?

"কিন্তু যে সকল পূজাঙ্গের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহারা যেন বৈদিক হয়। বৈদিকযুগের মত একটী বেদী থাকিবে, তাহাতে পূজাকালে বৈদিক অগ্নি প্রজ্জলিত হইত। আর ছোট ছোট মেয়েদেরও উহাতে উপস্থিত থাকিয়া আহুতি দিতে দিবে। এই অনুষ্ঠানটী সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

"[ভূতযজ্ঞ], নানা রকম জন্তু রাখিবে। গাভী হইতে আরম্ভ করিলে মন্দ হইবে না। কিন্তু অন্যান্য জানোয়ারও-কুকুর, বিড়াল, পাখী প্রভৃতি রাখিবে। ছোট ছোট মেয়েদের উহাদিগকে খাওয়াইবার ও যত্ন লইবার একটা সময় করিয়া দিবে।

"[ব্রহ্মযজ্ঞ] অর্থাৎ বিদ্যা-যজ্ঞ। এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ভারতে প্রত্যেক গ্রন্থই পবিত্র—একথা জান কি? শুধু বেদ নয়, ইংরাজী, মুসলমানী সব গ্রন্থ। সব পবিত্র।

"পুরাতন কলাবিদ্যাসমূহের পুনরুদ্ধার কর। তোমার বালিকাগণকে খোয়া ক্ষীর দিয়া নানারূপ ফলের আকার অনুকরণ করিতে শিখাও। তাহাদিগকে সূক্ষ্ম পারিপাট্যযুক্ত রন্ধন ও সেলাই শিখাও। তাহারা চিত্রাঙ্কন, ফটো তোলা, কাগজের নানারূপ নক্সা কাটা এবং সোণারূপার তারে লতা পাতা তৈয়ারী ও সূচীকার্য্য শিখুক। যাহাতে প্রত্যেকেই এমন কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করে, যদ্দ্বারা প্রয়োজন হইলে তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও।

"[নৃযজ্ঞ] নরসেবার কথা কদাপি বিস্মৃত হইও না! সেবার ভাব হইতে মানবমাত্রকে পূজা করার ভাব ভারতে বীজাকারে আছে, কিন্তু উহা কখনও যথেষ্ট পরিমাণ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। তোমার মেয়েরা উহাকে ফুটাইয়া তুলুক। উহাকে কাব্য ও ললিতকলার অঙ্গরূপে পরিণত কর। হাঁ, প্রত্যহ স্নানের পর এবং আহারের পূর্ব্বে ভিক্ষুকদিগের চরণপূজা করিলে হৃদয় ও হস্তের একসঙ্গে অপূর্ব্ব কার্য্যপরিণতা শিক্ষালাভ হইবে। কোন কোন দিন উহাদিগের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট মেয়েদের—তোমার নিজেরই ছাত্রীগণের—পূজা করিতে পার। অথবা তোমরা অপরের শিশুসন্তানদিগকে চাহিয়া আনিয়া তাহাদিগকে সেবাশুশ্রূষা করিতে ও খাওয়াইতে দাওয়াইতে পার। মাতাজী মহারাণী আমায় কি বলিয়াছিলেন জান?—'স্বামিজী! আমার কোন সহায় সম্বল নাই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীগণকে পূজা করিয়া থাকি; ইহারাই আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে!' দেখিলে, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে তিনি এই সকল কুমারীর ভিতর উমাকেই সেবা করিতেছেন। বিদ্যালয় আরম্ভ করিবার পক্ষে উহা একটী অতি চমৎকার ভাব।"

কিন্তু স্বামিজী এইরূপে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেও, ইহা সকল সময়েই সত্য ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই আদর্শটীকে ধরিবার প্রধান উপায়-

স্বরূপ হইত—উহা লোকের আন্তরিক চেষ্টা মাত্রকেই ঐ আদর্শের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া দিত। উহাই অতি স্থূলবুদ্ধির নিকটেও প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া দিত। আধুনিক ভাবাপন্ন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল অনুষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পুনরাচরিত হইয়াও উহারই প্রভাবে সহসা সমুজ্জ্বল ও মূল্যবান হইয়া উঠিত। এইরূপে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে সকল বীরহৃদয় মনীষী জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি জনৈক ভারতীয় মহাবৈজ্ঞানিকের শ্রদ্ধা দেখিয়া মনে হইল, উহা যেন প্রাচীনকালের আচার্য্যকুল-বন্দনারই, আধুনিক রূপান্তর মাত্র। যে জাতি ব্রহ্মজ্ঞানকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, সে জাতির পক্ষে জ্ঞানের বাহ্যপ্রয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চ্চা একটী অবশ্যম্ভাবী মহত্ত্ব বলিয়াই মনে হইল। নাম যশ ও ধনের প্রতি মনে প্রাণে অনাসক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কর্ম্মী পৌর ও গার্হস্থ জীবন যাপন করিলেও ধর্ম্মের দিক হইতে তিনি সন্ন্যাসীই।

তাঁহার নিজ জীবনের এই যে গুণটীর প্রভাবে আর যাহা কিছু মহৎ ও বীরোচিত, সমস্তই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আদর্শ বিশেষেরই পরিচায়ক বা এক একটী বিশেষ উদাহরণরূপে পরিগণিত হইত, তৎসম্বন্ধে অবশ্য স্বামিজী কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি মনে হয়, ইহাতেই তাঁহার সকল জিনিষকে ধরিবার বুঝিবার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ইঙ্গিতগুলির সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, শিক্ষাব্যাপারে, উহাদিগের সত্যতা দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই বিস্মিত হইয়া থাকি। উহার কারণ আমি কিছুতেই নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। যদিও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহাকে দুঃখদারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং সেই সময়ে তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের Education (শিক্ষা) নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত বিষয়ে আরও জানিতে ইচ্ছুক

হইয়া তিনি তৎসঙ্গে পেষ্টালট্সি* (Pestalozzi) রচিত যতগুলি পুস্তক পাইয়াছিলেন, সে গুলিকেও পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—যদিও উহা লেখা পড়ার ভিতর ছিল না। এই ঘটনাটীও আমার নিকট তাহার শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ গভীর জ্ঞানের যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ মনের ক্রিয়াকলাপকে তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে এত নিপুণ, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পান যে, তাঁহারা শিক্ষাসংক্রান্ত মতামতের আলোচনা ব্যাপারেও অন্য জাতি অপেক্ষা বিস্তর সুবিধা পাইয়া থাকেন। ইহাও ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চিন্তা করার রহস্যটীও তাঁহারা কোন না কোনও দিন আয়ত্ত করিয়া ফেলিবেন। ইতিমধ্যে, ঐরূপ বিশেষ স্থানীয় আদর্শ অবস্থাটী লাভের প্রথম সোপান—প্রচলিত মতামতগুলি হইতেই কি বিপুল উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাই বুঝা। স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনার বিস্তার ও পূর্ণতা সম্পাদন করার ভার ভারতীয় শিক্ষা-চার্য্যগণের উপর রহিয়াছে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে, যখন আমরা তাঁহার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাঁহার ভাবী বংশধরগণের প্রতি সাহস ও আশাবাণী এবং তাঁহার জ্ঞানমাত্রেরই পবিত্রতার নিকট মস্তক নত করা—এই সকলকে একযোগে গ্রহণ করিতে পারিব, তখনই ভারতীয় নারীকুলের জগতের সকল নারীর মধ্যে নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দিন সমাগতপ্রায় বুঝিতে হইবে।

* পেষ্টালট্সি জীবনের কতক অংশ শিক্ষাসম্বন্ধী সমস্যাসমূহ লইয়া অতিবাহিত করেন, এবং ঐ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। ইনি ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ডের জুরিচ্ (Zurich) সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

শঙ্কর-দর্শন।

পূর্ব্বাভাষ।

(শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ)

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে তিনি কবে কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক; কারণ, কাহারও কোনও মতবিষয়ে কিছু বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্বের ও তাঁহার সময়ের সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি ভাল করিয়া অবগত হওয়া চাই। কিন্তু তাহা আমি এ প্রস্তাবে আলোচনা করিব না, কিন্তু তিনি কি ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জানিবার চেষ্টামাত্র করিব। নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশনে আমি শঙ্করের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে শঙ্করের যাহা শঙ্করত্ব, তাঁহার ধর্ম্মমত, তাঁহার দার্শনিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিছু আভাষ দিবার প্রয়াস পাইব। পঞ্চদশী, উপদেশসহস্রী, অদ্বৈতসিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, চিৎসুখী এবং শঙ্করের ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াই শঙ্করদর্শনের আলোচনার সূচনা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ শঙ্করের পরবর্ত্তী কালের এতই ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ যে, সেইগুলি দিয়া শঙ্করের মৌলিকভাবের পরিচয় পাওয়া সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ এবং বেদান্ত-সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ভিত্তি ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন দার্শনিক বিশেষ ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক হইবেন, তাঁহাকেই ভিত্তিস্থানীয় এই গ্রন্থগুলির উপর ভাষ্য লিখিতে হইবে। সেইগুলিকে দর্শনের সহিত এইরূপভাবে সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে, পরস্পরবিরুদ্ধ মত আসিয়া না পড়ে। শঙ্কর, বল্লভ,

রামানুজ, মধ্ব এবং প্রায় সকল ধর্ম্মপ্রচারকই এইরূপ করিয়াছেন। যেমন সংস্কৃতের স্থান প্রাকৃত অধিকার করিলেও, সংস্কৃতের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সেইরূপ কতকগুলি ধর্ম্মব্যাখ্যাতা এই সমস্ত গুরু-উপদেশকদিগের স্থান অধিকার করিয়া নূতন নামে পুরাতন ধর্ম্মই উপদেশ করিয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যদি শঙ্করকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে হয় তাহা হইলে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যসাহায্যেই বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান নামে অভিহিত। ইহাতে বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণাদির মীমাংসার পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যভাণ্ডারের সহিত সূত্রগুলির কি সম্বন্ধ ইহা প্রথমে না বুঝিয়া আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত ভারতীয় সমাজ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যাঁহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বেদপদবাচ্য। বেদের প্রকৃতি-পূজা অনুসন্ধিৎসু-মানব-মনের অভাব-মোচন-বিষয়ে যথেষ্ট নয়। এমন কি বৈদিকযুগে পুরুষসূক্তের ন্যায় মন্ত্রগুলি সত্যরূপ প্রত্যূষের শুভাগমন ঘোষিত করিতেছে। সত্য যেন স্ফুটনোন্মুখ হইয়া কোলাহল করিতেছে। এই সময়ে যে ভাব উদ্বুদ্ধ হইল তাহা বেদের অন্তে উপনিষদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধভাবে ইহাতে সম্প্রবিষ্ট হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদের মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণসমূহ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জগৎসৃষ্টির বহির্ভূত জগদাত্মার জন্য ব্যাকুলতা নিয়মিত পূজা পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে।

তার পর এমন একটী যুগ আসিল যখন আয়াস স্বীকার করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া কেহ কিছু করিতে চাহিত না। এই সহজপ্রণালীর যুগে আবশ্যক বস্তু যোগাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমূহে তখন আর চলিল না—লোকে হাতে তোলা নজিরের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া একেবারে তৈয়ারী 'সূত্রের' সন্ধান পাইল। ঠিক এই সময়ে উপনিষৎসমূহও তুল্যরূপ সাহায্য পাইয়াছিল। এত দিনে জ্ঞানিগণ

জীবনসমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হইয়া ক্রমশঃ দর্শনসমূহ গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে মীমাংসাই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মকাণ্ড যে মীমাংসার আলোচ্য তাহার নাম পূর্ব্বমীমাংসা—সমস্ত জ্ঞানের চরম লক্ষ্য যে মীমাংসার আলোচ্য বিষয় তাহা উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত। এই উভয় মীমাংসায় জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষৎসমূহই ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশে ধর্ম্ম বলিলে শুধু পরমার্থতত্ত্ব বুঝায় না—দর্শন এবং নীতিও তাহার আলোচনার বিষয়ীভূত। সাধারণ লোকের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মনের অন্তস্তম প্রদেশে আলোকজ্যোতিঃ সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়াই তাহাদের জন্য স্মৃতি ও পুরাণরূপ স্বচ্ছ নয়নমণির আবশ্যক হইয়াছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা স্থির করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ন্যূনাধিক ২৯০ খানা গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও উপনিষদ্-ভাষ্যকার জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বলিয়া জনসাধারণের সংস্কার। সকলগুলিই যে তাঁহার রচিত নয়, তাহা অনেক গ্রন্থের ভাষা, শব্দ-বিন্যাস ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিয়া স্বরচিত গ্রন্থের বা কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন কোন দার্শনিক ও কবি শঙ্করাচার্য্যের নামে স্ব স্ব গ্রন্থ চালাইয়া যাইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা ব্যতীত জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের মঠাধিকারী মহান্তগণও শঙ্করাচার্য্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলিও শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন শঙ্করনামা কয়েক জন আচার্য্য, নৃপতি ও পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা একাধিক শঙ্করাচার্য্যের রচিত অনেক-গুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। কয়েকখানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা ও বেদান্তভাষ্য, সনৎসুজাতীয় ভাষ্য, সহস্রনামাধ্যায় ও কেবলাদ্বৈত-বেদান্তবিষয়ক

গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই জগদ্‌গুরু রচনা করেন নাই বলিয়া মাধবাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন।' নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌ভাষ্যও সম্ভবতঃ তাঁহার রচিত নয়, কেন না, তাঁহার বহুপরের বার্ত্তিকগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বাক্য ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করানন্দনামক একব্যক্তি কৌষিতকী প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। ইঁহার ভাষ্যের রচনা-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌ভাষ্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। শঙ্করানন্দ ইহার লেখক হইলেও হইতে পারেন। উপদেশসহস্রী ও দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক শঙ্করের রচিত বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস; কিন্তু এগুলিও শঙ্করের মতের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহার রচনা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। অপরোক্ষানুভূতি, আত্মানাত্মবিবেক, বিবেকচূড়ামণি এবং আত্মবোধ প্রভৃতি কখনও জগদ্‌গুরুর লিখিত নয়। কেন না, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ও উপনিষদ্‌ভাষ্য-নিবদ্ধ শঙ্করের দার্শনিক মতের সহিত এগুলির ঐক্য নাই, শঙ্করের নামে প্রচলিত উপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তগ্রন্থের মধ্যে কতকগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।

স্বরচিত ভাষ্যেই জগদ্‌গুরুর মত সম্পূর্ণ দ্যোতিত হইয়াছে। গীতা, উপনিষদ্ বা বেদান্তভাষ্যের মধ্যে কোন একখানির আলোচনা করিলে তাঁহার মত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। বেদান্তশাস্ত্র ৫৫৬টী সূত্রে গ্রথিত। পরমারাধ্য ভগবান্ বাদরায়ণাচার্য্য ঋষি ইহার কর্ত্তা। জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে মহাভারত-কারকে বুঝাইতে সর্ব্বত্র ব্যাসের নাম করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত-প্রসঙ্গে কেবল বাদরায়ণ নাম ভিন্ন কোথাও ব্যাসের উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি। "বৈয়াসকী ব্রহ্ম-মীমাংসা" এই প্রসিদ্ধ উক্তি হইতে ব্যাস বেদান্তকর্ত্তা বলিয়া সূচিত হইতেছে। বেদান্তদর্শনের সূত্রগুলি অতি কূটার্থময়, ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত বোধগম্য হয় না।

শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতার

নাম লইয়া অনেক গোলমাল। ব্যাসের রচিত বলিয়া এতগুলি গ্রন্থ আছে যে, কোন্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রকার তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। ভাগবতে বেদব্যাস নামে পরিচিত ব্যাসই যদি ব্রহ্মসূত্রকার হন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই পরাশরপুত্র বাদরায়ণ। ব্রহ্মসূত্রে অন্ততঃ সাতবার বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত আছে। ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ব্যাস বা বেদব্যাসের নামে কয়েকটী মতের অবতারণা করিয়াছেন। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্বদা আচার্য্য বলিয়াই দর্শনকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত উল্লেখের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, সূত্রকার ব্যাস ভাগবতের বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন।' সূত্রকার যে নিজেই নিজের নাম সূত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত বা সন্দিগ্ধ হইবার কোনও কারণ নাই। অনেকের মতের সহিত যেখানে ঋষিগণের মতের অনৈক্য সেইখানে অথবা যেখানে তাঁহাদের প্রিয়মত প্রচার করিবার দরকার সেইখানে তাঁহারা নিজ নাম দিয়া থাকেন। ইহাই প্রাচীন প্রথা। আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্রে এইরূপ কতকগুলি ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর যে সূত্রকারকে আচার্য্য অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, কেন না তিনি অন্ততঃ দুইটী স্থানে বলিয়াছেন যে আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যতীত আর কেহই নন। সূত্রকার যে বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কোন কোন পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান-কালে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই এই দর্শনের প্রাচীনতম ভাষ্য বলিয়া প্রখ্যাত। ইঁহার ভাষ্য সর্ব্বত্র সূত্রানুযায়ী।

শঙ্কর তাঁহার উক্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য অনেক সময় নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'ইতি শ্রূয়তে, বা স্মর্য্যতে'; শাস্ত্রের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার উক্তির প্রামাণ্যস্বরূপ তিনি কোন্ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতেন,

তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাবলী একত্র করিলে বুঝা যাইবে, তিনি কোন্ শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকন্তু, এই বর্চনগুলির সাহায্যে সহজেই তাঁহার লিখিত গ্রন্থনিচয়ও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য্য এই ভাষ্যে পুনরুক্তিসমেত ২,৫২৩টী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২,০৬০টী ঔপনিষদিক বচন, ১৫০টী বৈদিক এবং ৩১৩টী বেদেতর গ্রন্থোদ্ধৃত বচন। শঙ্করাচার্য্য মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় বচনের অধুনা প্রচলিত বচন হইতে বিভিন্ন পাঠও দিয়াছেন। পাঠের একটু ইতরবিশেষ করিলে বচনগুলি একাধিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে ঐ শাস্ত্রীয় বচন যে কোন গ্রন্থের, তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

শঙ্কর লিখিতেছেন—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ, তদ্ভেষজম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২), অথচ কাঠকে আছে—"মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চ অবদৎ, তদ্ভিষজমাসীৎ।" মৈত্রেয়ানী সংহিতায় আছে—"আপো বৈ শ্রদ্ধা।" অথচ শঙ্কর দিতেছেন—"শ্রদ্ধা বা আপঃ"। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৬।৮।১)। শতপথ ব্রাহ্মণ—"তরতি সর্ব্বম্ পাপ্মানম্।" (১৩। ৩।১।১)। শঙ্কর—"সর্ব্বম্ পাপ্মানম্ তরতি।" (তৈঃ সং ৫।৩।১২।১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—"সপ্ত বৈ শীর্ষং প্রাণাঃ।" (৩.৩।১) বা পঞ্চব্রাহ্মণ—"সপ্ত শিরসি প্রাণাঃ।" (২২।৪ ৩), শঙ্কর—"সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চান্।" (তৈঃ সং ৫।৩।২।৫) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ বিভিন্ন পাঠের বচনগুলির আকরস্থান বিভিন্ন শাখা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শঙ্কর মাঝে মাঝে অন্যান্য শাখা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই তৈত্তিরীয় শাখা হইতেই বচন দিয়াছেন।

এইবার আমরা শঙ্করদর্শনের যাহা মূলভিত্তি তাহারই একটু আভাষ দিব।

বেদান্তসূত্রভাষ্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য এক "অধ্যাসভাষ্য" লিখিয়া অদ্বৈতমতের মূল ভিত্তি কি তাহা প্রদর্শন

করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয় গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মাৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ।"

আমরা যখন "আমার দেহ", "আমার মন", "আমার হস্ত," প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার করি, তখন আমাদের দেহ, মন ও হস্ত প্রভৃতির অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র "আমি" পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেন না, যদি "আমি" এবং দেহ, মন এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনদেহাদির সহিত সম্বন্ধসূচক "আমার" পদ ব্যবহৃত হইতে পারিত না। এই "আমি"ই দর্শনশাস্ত্রের "চিদাত্মা" এবং দেহ, মন ইত্যাদি "আমি" ভিন্ন অনাত্ম পদার্থ। শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে "উপাধি" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই আমি বা আত্মা 'বিষয়ী' বা "অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য" এবং তদতিরিক্ত যাহা কিছু সমস্তই "বিষয়" বা "যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য"। তমঃ ও প্রকাশ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, সেইরূপ অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ী ও যুষ্মংপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ও পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যেমন যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নয়, সেইরূপ যাহা বিষয়ী তাহা বিষয় নয়। আর যদি স্বীকার করা যায়, বিষয়ীর ভাব বিষয়ের ভাবের বিরোধী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিষয়ীর ধর্ম্মও বিষয়ে বিদ্যমান নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিদাত্মক অস্মদাখ্য বিষয়ীতে যুষ্মদাখ্য বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও, লোকব্যবহারে "মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত" সচরাচর সত্য যে বিষয়ী তাহার সহিত মিথ্যা যে বিষয় তাহার মিথুনীকরণ হইয়া থাকে; ইহা 'নৈসর্গিক'। কাজেই বিষয় ও বিষয়ী 'অত্যন্ত-বিবিক্ত' হইলেও বিষয় ও বিষয়ীকে পৃথক্ না করিয়া লোকব্যবহারে একের ভাব ও ধর্ম্ম অন্যে সহজেই আরোপিত হইয়া

থাকে। সেই জন্যই আমরা "অহমিদং", "মমেদং"—'এই আমি', 'ইহা আমার' এইরূপ বলিয়া থাকি। কখন কখন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, কখন বা দৃষ্টিদোষে একমাত্র চন্দ্রকে দুইটী চন্দ্র দেখা যায়—এইরূপ একবস্তুতে অন্যবস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। এই আরোপের নাম অধ্যাস। বস্তুনিচয়ের এই ভ্রান্তিমান আরোপ এবং চিদাত্মার সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধ অসম্ভব নয়; কেন না, আত্মাও এক হিসাবে বিষয় অর্থাৎ অস্মৎপদবাচ্য বিষয়। এইস্থানে শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, আত্মা অপরোক্ষ বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত বিষয় নয়। তিনি নিজ ভাষ্যে ইহা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—অবিষয় যে প্রত্যগাত্মা তাহাতে বিষয়ধর্ম্মের কিরূপে অধ্যাস হইতে পারে? সকলেই যখন পুরোঽবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তর অধ্যাসিত করিয়া থাকে, তখন আপনি যে প্রত্যগাত্মার কথা বলিতেছেন, তাহা যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহা অবিষয়।

উত্তর—ইহা নিতান্ত অবিষয়ও নয়। কেন না, ইহা অস্মৎ-প্রত্যয় বিষয়। ভাল করিয়া বুঝিলে দেখিবে, ইহা "সাক্ষী" নয়, ইহা কেবল 'কর্ত্তা'; অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মা বিষয়ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া অহংপ্রত্যয়বিষয় হইয়াছে। প্রত্যগাত্মা যে অপরোক্ষ নয়, ইহা দ্বারাই প্রত্যগাত্মার সম্যক্ অর্থ প্রতিভাত হইতেছে। আর যে বিষয়ে বিষয়ান্তর আরোপিত হইবে, তাহা যে আমাদের পুরোভাগে থাকিবেই, এরূপও নয়; যেমন মূর্খলোকেরা আকাশে পৃথিবীর বর্ণ আরোপ করিয়া থাকে। এই প্রকারেই আত্মায় অনাত্মার এবং অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে।

আমরা এই অধ্যাসবশতঃ নানারূপ দুঃখভোগ করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা এই অধ্যাসকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। যতদিন অবিদ্যা-পাশ ছিন্ন না হয় ততদিন দুঃখের শেষ হয় না। মানুষ অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে "মুক্তি" পাইয়া থাকে। অবিদ্যাই যত অনর্থের মূল। বিচার ও শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় দ্বারা অবিদ্যার বারণের

জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ইহাই শঙ্করদর্শনের মূলভিত্তি। ইহাই অবলম্বন করিয়া শঙ্কর নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে শঙ্করের মত স্থাপিত হইতে পারে না।

এই অধ্যাসতত্ত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া শঙ্কর যে মতটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা এই—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥
"ন নিরোধো নচোৎপত্তিঃ ন বদ্ধোর্ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

বৈতথ্যপ্রকরণ—২।৩২

যাহা সত্য তাহা ব্রহ্মই,জগৎ সত্য নহে পরন্তু ইহা মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই, জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত আদৌ নহে। সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ যাহা কিছু সকলই ব্যবহারিক পদার্থ, সাধক সিদ্ধ যাহা কিছু সকলই মায়ার খেলা। কিন্তু তথাপি এই বন্ধের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, মুক্তির সুখময় স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যে উপায় আচার্য্যের অভিমত তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কারণ, জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া আচার্য্য যেমন একটী বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এই উপায় সম্বন্ধেও তিনি একটী বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আচার্য্যের এই সকল সিদ্ধান্তই অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ, এই সকল বিষয়ে আচার্য্যমতের সহিত ভারতীয় অপর দার্শনিকগণ একমত নহেন। আর অপরাপর দার্শনিকগণ জীব বহু ও বিভু বলেন, আচার্য্য কিন্তু জীবকে এক ও অনন্ত বলেন। জগৎ অপরের মতে কূটস্থ নিত্য না হইলেও প্রবাহ-রূপে নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, আচার্য্যমতে জগৎ মিথ্যা—ইহার কোনরূপ নিত্যতা নাই। মুক্তির উপায় আচার্য্যমতে অদ্বৈতাত্মজ্ঞান, অপরের মতে পদার্থজ্ঞান অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম, কিংবা কেবলই কর্ম্ম, অথবা জ্ঞান ও ভক্তি বা উপাসনা উভয়ই। কর্ম্ম এই জ্ঞানোৎপত্তিতে

চিত্তশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া উপায় হয় অর্থাৎ মুক্তির প্রতি পরম্পরায় কারণ হয়, সাক্ষাৎ কারণ হয় না। আর সেই জন্য কর্ম্ম ও উপাসনা শঙ্করের মতে যেমন একমাত্র অবলম্বনীয় নহে, তদ্রূপ একেবারেও উপেক্ষনীয় নহে। কর্ম্ম ও উপাসনা চিত্তের মল অপনয়ন করিয়া তাহাকে একাগ্র করিয়া তুলে মাত্র, মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তির জন্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। ভক্তিপথ শঙ্করমতে উপাসনারই পথ। ভক্ত ও উপাসক একই কথা। অপরাপর দার্শনিকগণ জগতাদির মূলকারণ প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করেন; আচার্য্য শঙ্কর সেই মূলকারণ উক্ত অধ্যাস বা অজ্ঞানকেই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং মুক্ত হইলে অজ্ঞান নাশে মুক্তের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন জগতাদি কিছুই থাকে না, অপরাপর দার্শনিকের মতে কিছু না কিছু থাকে। শঙ্করের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অপরের মতে তাহা সবিশেষ সোপাধিক ত বটেই, তবে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষয়, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ কি না তদ্বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। ইহাই শঙ্কর মতের এক কথায় সার সংক্ষেপ।

এইবার আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, ধর্ম্মোপদেশকরূপে শঙ্করের স্থান কোথায়। বৈদিক ধর্ম্ম বস্তুতঃ কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে দণ্ড ও পুরস্কারের দর্শনই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই বেদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন দার্শনিক ঋষি চরমপন্থা ও অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দর্শনগুলির উৎপত্তি এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি হইতে সঞ্জাত। কোন দর্শনে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা বলা হয় নাই। তবে উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছে যে, সমস্ত সুখ ও আনন্দ জ্ঞানে, কর্ম্মে নয়। তবুও কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড একেবারে বিনষ্ট হইল না। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাতে তিনি নির্ব্বাণ শিক্ষা দিলেন। এই নির্ব্বাণমতই কর্ম্মকাণ্ডকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। কুমারিল

কর্ম্মকাণ্ড পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই ধর্ম্মবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের যে সহায়, তাহাই প্রদর্শন করিলেন। তিনি উপনিষদ্‌কেই মূলমন্ত্র করিলেন, উপনিষদ্‌কে সর্ব্বসমক্ষে ধরিলেন—এ দিকে আবার বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইলেন। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে সম্ভবতঃ বুদ্ধবাণী অগ্রসর হইতে পারে নাই। শঙ্করের উপদেশ তথায় কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, কাজেই সেখানে কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে—সেখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ও শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া এখনও প্রচার করিয়া থাকে।

শঙ্করের দর্শন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সহিত এরূপ ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট যে, শঙ্কর-দর্শন বুঝিতে হইলে ভারতের সমগ্র দর্শন সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

ন্যায়মতাবলম্বিগণ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐগুলির সাহায্যে প্রণিধানবলে পরম বস্তু লাভ করা যাইবে। মনুষ্যের মন ও আত্ম-সম্বলিত এই-জড়-জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা জীব হইতে ঈশ্বর "সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৈশেষিক-গণও এই মত গ্রহণ করিয়া পদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারাও ঈশ্বর স্বীকার করিলেন, কিন্তু পদার্থের স্বাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম নির্ণয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের মতে পদার্থ পরমাণু দিয়া সৃষ্ট—কিন্তু ঈশ্বর-দ্বারা পরিচালিত। গোতম এই প্রকারে আদি কারণতত্ত্ব এবং কণাদ বিজ্ঞানতত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন। এই শাস্ত্রদ্বয় ন্যায়শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক positive side of abstract generalisation (অস্তি) লইয়া ব্যস্ত। চার্ব্বাক negative side(নাস্তি) লইলেন; কিন্তু চার্ব্বাকের মত কেহই গ্রহণ করিল না। চার্ব্বাকের পর সাংখ্যদর্শনের আবির্ভাব হয়। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া

আলোচনা করেন ; প্রকৃতিই সাংখ্যের মতে সৃষ্টির মূল কারণ, তবে এই প্রকৃতি পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। সাংখ্য পুরুষের প্রতি কোন কর্ম্ম আরোপ করে নাই, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। সাংখ্যবাদী বিশ্বাস করেন যে, সাত্বিকভাবাপন্ন হইলেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়া যায়—সাংখ্য-বাদী প্রকৃতির উপর যাইতে পারে না। সাংখ্যমত-প্রচারক কপিল-মুনি নিরীশ্বর বাদ প্রচার করিলেন। পতঞ্জলি মুনি সাংখ্যমতের নিরীশ্বরতা মোচন করিয়া যোগদর্শন প্রচার করেন, তাহাতে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা আছে। মনুষ্য কি করিয়া প্রকৃতির উপরেও উঠিতে পারে তাহারও উপায়সমূহ ইহাতে কথিত আছে। তাহার পর বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন—ইহাই বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্কর এই ব্রহ্মসূত্রগুলির ভাষ্য করিয়াছেন। শঙ্করের দর্শন তাঁহার যুগের ক্রমবিকাশ দ্যোতিত করিতেছে। শঙ্করের মতে জগতের ক্রমবিকাশও স্বীকার্য্য, কিন্তু তজ্জন্য আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মময়—কিন্তু ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্ম জড়িত, কিন্তু ব্রহ্মের উপর প্রকৃতির প্রভাব নাই। সেই অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মের চিন্তনেই বিমল আনন্দ লাভ করা যায়। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই, অনাদি ও অচিন্তনীয়। প্রকৃতি ব্রহ্মের উপর নির্ভর করে এবং পরিবর্ত্তনীয়—কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয়। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে। উপনিষদ্ বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রসূত। শঙ্কর রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করেন ; যেহেতু রজ্জু সর্পের অনুরূপ। সেইরূপ প্রকৃতি ব্রহ্মের অনুরূপ। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্যাস বলে। ব্রহ্মের উপর নামরূপ প্রভৃতি আরোপ করা মায়ার কার্য্য।

আমাদের এই কথাগুলি আলোচনা করিলে শঙ্করের নিজের অবস্থা এবং তাঁহার দর্শনের ভিত্তি কি তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। শঙ্করের যুগে দর্শনের যে বিকাশ হইয়াছিল, সেই বিকাশের যুগের তিনি

যথার্থই অবতার ছিলেন। তিনি সমস্ত দার্শনিক সমস্যা নিজে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক দার্শনিকদিগের অসুবিধার কারণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত জীবন ও দ্রব্যজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উপনিষৎসম্মত নয় এমন কি ন্যায়সঙ্গতও নয়। অধ্যাপক Tyndall যখন British Association এ সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "Two courses and only two are possible. Either let us open our doors to the conception of creative acts, or abandoning them, let us radically change our notions of matter," তখন তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ভূয়োদর্শী ঋষি যে সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছিলেন। মহাত্মা Tyndallএর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'The origination of life is a point lightly touched upon, if at all, by Mr. Darwin and Mr. Spencer.' বর্ত্তমান অবস্থা যখন এইরূপ তখন অতি প্রাচীন কালে কিরূপ হওয়া সম্ভব? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মানবশক্তির নিকট যাহা অসাধ্য, তাহা তিনি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টি ও জীবনসমস্যা কার্য্যতঃ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শঙ্কর সৃষ্টি ও জীবন সমস্যার বিশ্লেষণকল্পে কোন কার্য্যকরী পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে বরাবরই তর্ক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমাদের তাহা আলোচ্য নয়। আমরা ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বই গ্রহণ করিব। শঙ্কর নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করিলে জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কিছুই বুঝাইতে পারা যাইবে না; বরং উহাতে ইহাই বলা হইবে যে, মনুষ্য ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে বা জানিতে সমর্থ নয়। বর্ত্তমান যুগের Mill এর ন্যায় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাপের সত্তার সহিত বিশ্বাতীত, সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণপবিত্র ভগবানের সত্তার মিলন

করা যায় না। Hamilton বা Manselএর ন্যায় তিনি জ্ঞানকে ধর্ম্মজগৎ হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই এবং Spencerএর এক Negative "Unknown"কে এই সৃষ্টির মূলকারণ বা কর্ত্তা বলেন নাই। জড় হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি—জড়বাদীদিগের এই মত খণ্ডন ও প্রতিবাদ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি Leibnitzএর monad বা নিরবয়ব জীবৎপদার্থকে তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। শঙ্করের মতে সম্বন্ধ বলিলে সম্বন্ধের অতীত বুঝায়, কেন্দ্র বলিলে পরিধি বুঝায়, বহিঃ বলিলে অন্তর বুঝায়, বহিঃস্তর বলিলে অন্তঃস্তর বুঝায়, অনন্তকে ভাবিতে গেলে তাঁহাকে সান্ত করিয়া ধারণা করিতে হয়। একমাত্র Hegel ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ অনন্তকে যে ভাবে ধারণা করিতে চান, তাহা অসম্ভব।

কেহ কেহ শঙ্করকে মায়াবাদী বলিয়া দোষারোপ করেন। শঙ্কর 'মায়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে মায়া শব্দের প্রয়োগ অতি বিরল। তিনি মায়াবাদ উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বিবর্ত্তবাদের একটী শাখা (corollary)! তিনি মায়াবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষভাবে ইহার সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপই মায়া, আমাদের ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। ভারতীতীর্থ 'বিবর্ত্তবাদ' ব্যাখ্যায় এই একই কথা বলিয়াছেন। 'দৃগ্ দৃশ্যবিবেকে' (২০) তিনি বলিতেছেন—

"অস্তি ভাতি-প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

অর্থাৎ, অস্তি, ভাতি (জ্ঞান), প্রিয় (সুখ), রূপ ও নাম এই পাঁচটী গুণ—প্রথম তিনটী ব্রহ্ম, শেষ দুইটী জগৎ (মায়া)।

ছান্দোগ্যও এই একই উপদেশ দিয়াছেন—

"যথা হি সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—ইত্যাদি।

অর্থাৎ হে সৌম্য, একটী মৃৎপিণ্ডকে জানিলে মৃৎপিণ্ড হইতে নির্ম্মিত সমস্তই জানিতে পারা যায়, নামগুলি শাব্দবিকৃতি মাত্র—সত্য হইতেছে একমাত্র মৃত্তিকা।

ভগবদ্গীতার উপদেশও এইরূপ—

'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৩।১৯

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥" ১৩,২৯

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ ॥" ৩।৫ ২৫

শঙ্করাচার্য্যও "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে (২।১।১৪) বলিয়াছেন, "অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্য-লক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি যতস্তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্য-মাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎকারণং পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে ॥" এখানে শঙ্কর অনেকটা বাহ্যমায়াবাদের সহিত নিজ মত প্রকাশ করিতেছেন; ইহা সর্পরজ্জু দৃষ্টান্ত, মরীচিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'ব্যতিরেকেনাভাবঃ" এই শব্দ দ্বারা 'অনন্যত্বম্' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে ইহার সহিত বাচস্পতি মিশ্রের অনন্যত্ব শব্দের ব্যাখ্যাও স্মরণ রাখা উচিত। বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোনও ঐক্য নাই; পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্—চিন্তা ও সত্তা অভেদ্য। ইহাই বিবর্ত্তবাদের প্রকৃত অর্থ। গোবিন্দা-নন্দের মতে ইহা শঙ্করের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনন্যত্বের এই প্রকৃত অর্থ জানিয়া বুঝিতে হইবে যে, মায়া কেবল নাম ও রূপের মধ্যেই আবদ্ধ। 'জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ' এই বিপরীত মত গোবিন্দানন্দ স্পষ্টই প্রতিবাদ ও অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাই

পরিণামবাদ। মন হইতে দ্রব্যের পরিণতি হইয়াছে—ন্যায়ের এইরূপ প্রতিলোম রীতি ব্যতিরেকে পরিণামবাদ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বল্লভাচার্য্য এই জড়বাদ ও মায়াবাদ-মত উপেক্ষা করিয়া ইহাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা একটী ক্রমবিকাশ-বাদের ফল। রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের ন্যায় অপরেও মায়া ও ব্রহ্মকে পৃথক্ করেন এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মার এক অংশ বলিয়া মনে করেন। এক্ষণে আমাদের উক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শঙ্করের অপর একটী স্থলের উল্লেখ করিব। শঙ্কর অনন্যত্ব দ্বারা অভেদ ভিন্ন অপর কোন অর্থ যে করেন নাই তাহা সুস্পষ্ট, তবে তিনি জগতের কোন মূল উপাদান কারণে আস্থাবান্ ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই বিষয়টী যদি আমরা স্থির করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা দেখিব, মায়া অর্থে Illusionএর ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভবপর হইবে না। এইরূপে প্রকারান্তরে বিবর্ত্তবাদের মত আপনাকেই আপনি খণ্ডন করিবে। শঙ্করাচার্য্য "ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ" মতের উত্তরে বলেন যে, বাহ্য বিষয়ের অস্থায়িত্ব সপ্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ, কোন চিন্তা করিলেই, চিন্তার বিষয় কিছু থাকিবেই। তিনি বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে বলেন নাই। কেবল চিন্তা ও বস্তু যে অচ্ছেদ্য তাহাই বলিয়াছেন। কেহ যদি স্তম্ভের চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার মনে যে ঐরূপ প্রকৃতই একটা কিছু দৃষ্ট হয়. তাহা নয়, তবে যাহা প্রকৃত তাহার অনুরূপ মাত্র চিন্তিত হয়। চিন্তিত বস্তুকে একেবারে কিছুই নয়, শূন্য বলিলে চলিবে না, কেন না তাহা হইলে কোনরূপ সংস্কার থাকে না।

জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য হেতু বিষয়নাশ হয় না। চিন্তা ও চিন্তিত বস্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের (subject ও object) সম্বন্ধ বিদ্যমান। শঙ্করের এই উক্তি দ্বারা অনন্যত্বের কিরূপ ব্যাখ্যা হয় তাহাই দেখা যাউক। শঙ্কর অনন্যত্ব বলিলে কোন চিন্তার বিষয় যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা

কখনও মায়া ইহতে পারে না। ইহাকেই তিনি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। এইরূপেই মায়াও পুনরায় নাম ও রূপে পরিণত হইয়াছে, এমন কি, মায়াকে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিলে এবং স্বপ্নের আধারতত্ত্ব অবগত হইলে আমাদের ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নয়। যেমন সমস্ত স্বপ্ন (নাম ও রূপ) জাগরিত হইলেও ভ্রম বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের অবস্থায় মায়াকে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। এইরূপে শঙ্করাচার্য্য মায়া বা অবিদ্যা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাই জগতের কারণ। এইবার বিদ্যারণ্যের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মূলাধ্যাস বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মতস্মাৎ সমুত্থিতাঃ।
খং বায়ুবগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যান্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ॥
আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে॥"

ব্রহ্ম হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীর উদয়। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম জগতের আদি এবং জগৎ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই পরস্পরের অধ্যাস বলে। এই খানেই ব্রহ্ম জড়-জগতের যে বিকাশ তাহার মূল কারণ হইতেছেন। ব্রহ্ম সমস্ত চিন্তার অতীত, কিন্তু জড় উহার ব্যতীত নয়। মায়া বা অজ্ঞানতা মধ্যস্থলে থাকিয়া কার্য্য করে এবং ইহাই জাগতিক বিকাশের অংশ। সুতরাং শঙ্করের দর্শন, চিন্তা ও সত্তার অচ্ছেদ্যসম্বন্ধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাই অদ্বৈতবাদের সারতত্ত্ব।

বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত যে মহাপুরুষকে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, বিংশ-শতাব্দীর চিন্তাশীল জগৎ সেই জগদ্‌গুরু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। য়ুরোপ ও আমেরিকায় কেহ কেহ তাঁহার উপদিষ্ট গ্রন্থাবলীর সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হইয়াছেন

সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ধারণা এই যে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মাত্র একজন পরমার্থবিদ্ (theologian) অথবা বড় জোর একজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক (dialectician) ছিলেন। ইহার অধিক তাঁহারা কিছু বলিতে রাজি নন। কারণ, আজ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দেশে যে সমস্ত প্রামাণিক দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Paul Deussen এর গ্রন্থ ব্যতীত কোথাও শঙ্করদর্শন অথবা যে সমস্ত মতবাদের সহিত শঙ্করের নাম সংযোজিত আছে তাহাদের ইঙ্গিত মাত্রও করা হয় নাই। এমন কি Encyclopædia Britanicaর ন্যায় প্রামাণিক কোষগ্রন্থেও শঙ্করের গ্রন্থসম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা দার্শনিক বিষয় (philosophy) বলিয়া উল্লিখিত না হইয়া পরমার্থতত্ত্ব (theology) বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। Dr. Thibaut শঙ্করের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়াছেন। তিনি ইহার ভূমিকায় বেদান্তে নিহিত dogma বা তত্ত্বসমূহেরই আলোচনা করিয়াছেন। অধুনাতন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় দর্শন সমূহের আলোচনার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদিগকে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধায়ী হইয়া দার্শনিক ভাবে শঙ্করের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিতে হইবে। অধুনাতন বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ভারতীয় দার্শনিকগণের মুখ্য উদ্দেশ্যের সন্ধান করিতে হইবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় 'অদ্বৈতবাদ'কে ভ্রমক্রমে 'একেশ্বরবাদ' বলিয়া প্রায়ই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এখনও অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তথ্য ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই।

প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের এবং প্রতীচ্যমতানুবর্ত্তীদিগের নিকট শঙ্কর পরমার্থবিদ্ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্রাভিমান বা হেতুন্যায়বাদী ছিলেন অথবা পরমার্থবিদ্ বা দার্শনিক ছিলেন এক্ষণে তাহাই আমাদের বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

পরমার্থবিদ্যা, ঈশ্বরজ্ঞান হিসাবে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁহার অস্তিত্ব,

তাঁহার জগৎ-সৃষ্টি, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তৎকর্ত্তৃক জগতে শোক, দুঃখ ও পাপের উদ্ভাবন সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। দর্শনের সহিত ঐক্য হয়, এরূপ খুব কমই ভাব ইহাতে আছে। এক-মাত্র সত্যনিরূপণই দর্শনের কার্য্য। দর্শন যুক্তি ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু পরমার্থবিদ্যা প্রতিপদেই স্বতন্ত্রানু-যায়ী কিছু একটা ধরিয়া লইবেই, আর তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিবেই। ইহার পক্ষ সমর্থনকারী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সংখ্যাও অল্প নয়। ইঁহারা বলেন, বিচারের যখন সীমা আছে, তখন সকল চিন্তার চরমসীমায় উপনীত হইতে হইলে বিচারকে ফেলিয়া দিয়া কোন না কোন প্রকারের dogma বা ঋষিবাক্য ইত্যাদি শব্দ-প্রমাণের আশ্রয় লইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তির অসারতার কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহারা প্রকারান্তরে একই কথায় আসিয়া পড়িতেছেন। তাঁহারাও যুক্তির উপরই নির্ভর করেন। যুক্তিই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব—এই যুক্তি দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পরমার্থতত্ত্ব যে পরিমাণে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেই লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই পরিমাণে সত্যের দিকে ধাবিত হওয়া ইহার অভিপ্রেত নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচারকালে তাঁহারা তাহারই উপর নির্ভর করেন, যাহাকে তাঁহারা শ্রুতি, ঈশোন্মেষ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকেন। দার্শনিকগণ শাস্ত্রাদি তাদৃশ আলোচনা করুন আর নাই করুন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি অনুসারে বিচার করিতে হইবে; তাঁহারা 'শাস্ত্র' বলিয়া শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিবেন না। এই সমস্ত বিষয়ে পরমার্থতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পরবিরোধী হইলেও উভয়ের মধ্যে একটী সাধারণ বিষয় আছে। উভয়েই সত্যের অনুশীলনে তৎপর এবং উভয়েই জগৎ ও জীবনের প্রহেলিকা নির্ণয় করিতে উৎসুক। পরমার্থতত্ত্ব কতকগুলি সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া পরম সত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু দর্শন যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তাহা লইয়া আরম্ভ করে

এবং তাহা হইতেই বিচারে প্রবৃত্ত হয়। বলিতে গেলে, পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ শিশু—দার্শনিক বয়োবৃদ্ধ পুরুষ। প্রথমে শিশুকে শাস্ত্র-বাক্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, পরে তাহার বিচার করিবার শক্তি জন্মিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাক।

'মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ-কারিকা'র অদ্বৈতপ্রকরণে প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—

"অদ্বৈতং কিমাগমমাত্রেণ প্রতিপত্তব্যমাহোস্বিত্তর্কেণাপীত্যত আহ। শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্। তৎকথমিত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে।"

অর্থাৎ প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদ কেবল শ্রুতিবলেই প্রমাণিত হয় অথবা বিচারবুদ্ধি বা তর্কদ্বারা অবগত হওয়া যায়—এই অধ্যায়ে প্রমাণিত হইবে যে তর্কদ্বারা ইহা জানিতে পারা যায়।

পুনশ্চ—

জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইত্যুক্তম্। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রং তৎ। তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বৈতথ্যং শক্যতেঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়প্রকরণমারভ্যতে।

বৈতথ্য প্রকরণ—১ম শ্লোক।

অর্থাৎ—দ্বৈতের অলীকত্ব শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত। যাহা হউক, ইহা শ্রুতিবাক্যদ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা যায়। এই জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এখন এ সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা যাইতে পারে যে, ইহা শঙ্করের অভীপ্সিত মত নয়। যদি তাহা হইত তাহা হইলে অন্যত্র তিনি অন্য মত প্রকাশ

করিতেন না। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, শঙ্কর বিশেষ-রূপে অবগত ছিলেন যে বৌদ্ধদিগের ন্যায় এমন একদল লোক সকল সময়েই জগতে থাকিবে যাহারা বেদের দোহাই মানিবে না। তাঁহাদের যুক্তি নিরসনের জন্যই শঙ্কর বেদের দোহাই না দিয়াই যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়াই বলিয়াছেন, "যাহা হউক এক্ষণে আমরা বেদান্তবাক্য-নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিব"—

"ইহতু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে।"

সূত্রভাষ্য—২য় অধ্যায়—১ম পাদ।

শঙ্কর জানিতেন যে, পৃথিবীতে সকল সময়েই বুদ্ধিহীন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। তাঁহাদিগের জন্য তিনি শ্রুতিবাদ সম্বন্ধে এত লিখিয়াছেন! শঙ্করের দ্বৈধভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ তাঁহার যুক্তিবাদ বুঝিতে পারেন নাই। Deussen এই ভুল করিয়াছেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কোন বিশেষ শাস্ত্র বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। সমগ্র শ্রুতি বাদ দিলেও তাঁহার মত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শঙ্করদর্শন কোন হিন্দু বা অহিন্দুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য লিখিত হয় নাই—ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী। যেমন জলবায়ু সকলেরই সমান উপভোগ্য- সেইরূপ তাঁহার মত সকলেই সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যদি কিছু সার্ব্বভৌমিক জগতে সম্ভবপর, তাহা হইলে তাহা এই শঙ্করমতেই সম্ভব। *

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাধারণ সভায় পঠিত।

বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্ব্বাণতত্ত্ব।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ)

অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে, বৌদ্ধশাস্ত্রোল্লিখিত নির্ব্বাণ আর বেদান্তশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ জিনিষ - ইহাদের মধ্যে একরূপতার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ; কিন্তু, আমাদিগের মতে এইরূপ ধারণা অতীব ভ্রমাত্মক এবং আমাদের এই মতও এই দুই দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার প্রশস্ত ভিত্তির উপরই স্থাপিত, সুতরাং ইহা আমাদিগের মনের কল্পনা অথবা স্বপ্নমাত্রপ্রসূত নহে। আসল কথা এই যে, এই উভয় দর্শনের প্রকৃত রহস্যের প্রতি অনবধানই সাধারণের মনে এই অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। অতঃপর বেদান্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রীয় পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ বচন ও প্রমাণাদি দ্বারা আমরা এই ভ্রম দুরীকরণের জন্য প্রস্তুত হইব। আরও একটি দ্রষ্টব্য এই যে অনেকেরই মতে বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, এমন কি অনেক আচার্য্যকল্প ব্যক্তিগণও ইহাই বলিয়া থাকেন। অবশ্য যদি ঈশ্বর বলিতে কোনও একজন পৃথক্ ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়, যিনি ইহলোক হইতে প্রকৃষ্টতম দুরবর্ত্তী স্থানে সিংহাসনের উপর আসীন হইয়া জীবনিবহের দণ্ডবিধাতারূপে তাহাদের পূজার্চ্চনাদি পাইয়া থাকেন, তিনি মানবের কেবল শাসক এবং তাহার সহিত অন্য সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব যে সত্য সত্যই বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী। ইহাদের দর্শনে এইরূপ ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যুত খণ্ডনই আছে, কিন্তু যদি তাহা না হইয়া সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে অনুস্যূত, পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল ও আকাশের প্রত্যেকের একমাত্র আশ্রয়, জীবমাত্রের প্রত্যেকের হৃদ্গত—সেই বিরাট অন্তর্যামী পুরুষকেই যথার্থ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে দেখিবে যে বুদ্ধকায়, ধর্ম্মকায় ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত সেই পরমেশ্বরই বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত ও

তিনিই বৌদ্ধসাধকগণের নিকট চিরদিনই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যাক সে কথা। অদ্যকার বিষয় হইতেছে নির্ব্বাণতত্ত্ব। এই নির্ব্বাণের আলোচনার দুইটি বিভাগ। (১) নিষেধমুখ ও (২) বিধিমুখ। নিষেধমুখে অভাবাত্মক নির্ব্বাণের আলোচনাই স্থান পাইয়াছে। আর বিধিমুখে নির্ব্বাণ জিনিষটি যে একেবারে অভাব নহে কিন্তু তাহা পরমার্থসৎ তাহারই সম্যক্ আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়টি যেমন জটিল তেমনই দুরূহ, ইহা অল্প সময় ও অল্প আয়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে—এজন্য অনেক সময় ও গবেষণার প্রয়োজন, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা অল্পের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ইহার সারাংশটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ব্যতিরেক মুখে নির্ব্বাণ কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া বৌদ্ধভিক্ষু নাগার্জ্জুন বলেন যে, নির্ব্বাণ সেই পদার্থ, যাহা—"অপ্রতীতমসংভ্রান্তমনুচ্ছিন্নমনাগতম্। অনিরুদ্ধমনুৎপন্নমেবং নির্ব্বাণমুচ্যতে॥" যাহা প্রতীতির গোচর নহে, ব্যাবহারিক প্রমাণের দ্বারা যাহাকে জানা যায় না, যাহা প্রাপ্তির বস্তু নহে, যাহা অপরিছিন্ন, যাহা দূরের বস্তু নহে এবং যাহা আগত বা উপস্থিত বস্তু নহে, যাহা অনিরুদ্ধ এবং অনুৎপন্ন তাহাকেই নির্ব্বাণ বলা যায় অর্থাৎ যত কিছু লোকসিদ্ধ বস্তু হইতে পারে ইহা তাহা সকল হইতেই পৃথক্। নির্ব্বাণ যে ঠিক কি বস্তু তাহা বলা যায় না, কারণ আমরা সচরাচর যাহা দেখি বা বুঝি সেগুলির কারণপরম্পরা বা হেতুর নির্দ্দেশ সম্ভব; কিন্তু নির্ব্বাণ সেরূপ বস্তু নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই নির্ব্বাণ শব্দের যৌগিক অর্থ কি। পাণিনির মত 'নির্ব্বাণোঽবাতে' অর্থাৎ যে প্রদেশে বায়ু নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারই নাম নির্ব্বাণ। অপর বৈয়াকরণিকগণের মতে প্রদীপের নিবৃত্তি বা উচ্ছেদই নির্ব্বাণ। বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম মহাবিভাগ শাস্ত্রে নির্ব্বাণ শব্দের চারি প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—(ক) বাণ শব্দের অর্থ—পথ (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের হেতু), নিঃ শব্দের অর্থ—পরিত্যাগ। পুনর্জ্জন্মের পথকে পরিত্যাগ করাই নির্ব্বাণ।

(খ) বাণ অর্থে দুর্গন্ধ বা কুৎসিত বাসনা,—নিঃ নিবৃত্তি। মিলিত

অর্থ—শুভাশুভ বাসনার নিবৃত্তি। (গ) বাণ - গভীর বন। নিঃ—নির্গত হওয়া। মিলিত অর্থ—রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দুর্ভেদ্য বা গভীর বন হইতে নির্গত হওয়া।

(ঘ) বাণ—গ্রন্থি, নিঃ—ছেদ বা নিবৃত্তি। মিলিত অর্থ— জন্ম ও মৃত্যুর গ্রন্থি বা জালের ছেদন।

আরও যথা—'দীপসম ইব নির্ব্বাণং বিমোক্‌খ আহু চেতনা নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং প্রদীপো॥"

প্রদীপের নির্ব্বাণের ন্যায়ই এই নির্ব্বাণ। এই এক দিকের কথা, অপরপক্ষে বিধিমুখে, আলোচিত নির্ব্বাণপ্রসঙ্গে ভিক্ষু নাগসেন এক স্থলে বলিয়াছেন যে ভূতদয়া, প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্টরূপ বিকাশই নির্ব্বাণ। এতদ্ব্যতীত তিনি নির্ব্বাণকে আনন্দ-স্বরূপও বলিয়াছেন। মিলিন্দ পন্নহো নামক পুস্তকে নরপতি মিলিন্দ নির্ব্বাণের সহিত অপর কোন বস্তুর সাদৃশ্য আছে কি না জানিতে চাহিতেছেন। এই প্রসঙ্গে মিলিন্দ ও নাগসেনের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—

মিলিন্দ—হে শ্রদ্ধেয় নাগসেন, আমি বুঝিলাম যে নিরবচ্ছিন্ন সুখই নির্ব্বাণ; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বা প্রমাণের অভাবে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ আমি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। নির্ব্বাণের সহিত আর কোনও বস্তুর গুণগত যদি কোনও সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

নাগসেন—নির্ব্বাণের এমন কোনও আখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা ইহার প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, কিন্তু কতকগুলি বস্তুর সহিত ইহার কোনও কোনও অংশে সাদৃশ্য আছে, তাহাই আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি।

মিলিন্দ—তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই বুঝান।

নাগসেন—এই নির্ব্বাণে পদ্মের একটি গুণ আছে, জলের দুইটি গুণ আছে, ঔষধের তিনটি গুণ আছে, সমুদ্রের চারিটি গুণ আছে,

অন্নের পাঁচটি গুণ আছে, দিকের দশটি গুণ আছে, চিন্তামণির তিনটি গুণ আছে, হরিচন্দনের তিনটি গুণ আছে, নবনীতের তিনটি গুণ আছে এবং গিরিশৃঙ্গের পাঁচটি গুণ আছে।

মিলিন্দ—ভগবন্, দয়া করিয়া এই কয়টি দৃষ্টান্তের বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

১। পদ্ম জলের দ্বারা বিকৃত বা আর্দ্র হয় না, নির্ব্বাণও তদ্রূপ পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা কখনও কলুষিত হয় না। এই কারণে নির্ব্বাণ পদ্মের স্বরূপ।

২। জলের গুণ শৈত্য বা তাপরাহিত্য, নির্ব্বাণও সমরসে শীতল ও ইহা দুষ্প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন তাপকে হরণ করে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, নির্ব্বাণও কামাদিজনিত তৃষ্ণাকে অপহরণ করে।

৩। ঔষধ বিষদাহকে নিবারণ করে নির্ব্বাণও কামক্রোধাদি বিষদাহের উচ্ছেদ করে, ঔষধ রোগ নিবৃত্তি করে নির্ব্বাণও দুঃখ নিবৃত্তি করে, ঔষধ অমৃতের কার্য্য করে নির্ব্বাণও লোককে অমর করে।

৪। সমুদ্রে কোন জঞ্জাল ফেলিলে সমুদ্র তাহা বহন করে না বরং উৎক্ষেপই করে, নির্ব্বাণও তদ্রূপ, কারণ, দুষ্প্রবৃত্তিরূপ অমেধ্য বস্তু নির্ব্বাণে প্রক্ষিপ্ত হইলে, নির্ব্বাণও তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। সমুদ্র যেরূপ অসীম শক্তিশালী এবং অপার, নির্ব্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিময় ও অপার, সমুদ্রে যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহাই নিজ সত্তা ছাড়িয়া সমুদ্র হইয়া যায়, নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইলেও সকল পরিচ্ছিন্ন বস্তুই নির্ব্বাণের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যায়। সমুদ্র যেরূপ অসংখ্য শক্তিশালী জীবের আলয়, নির্ব্বাণও সেইরূপ অসীম শক্তিশালী মহাত্মা অর্হদ্গণের আলয়। সমুদ্র যেরূপ প্রতি তরঙ্গের অগ্রে ফেনরূপ শুভ্র কুসুমরাজিতে সর্ব্বদা সুশোভিত, নির্ব্বাণও সেইরূপ পবিত্রতা শান্তি ও বিজ্ঞানরূপ অমল ধবল কুসুমরাজির দ্বারা চিরবিমণ্ডিত।

৫। অন্ন যেমন জীবের জীবনীশক্তি দেয় নির্ব্বাণও সেইরূপ জন্ম জরা ও মৃত্যু দূর করিয়া শাশ্বত জীবনীশক্তি প্রদান করে, অন্ন যেমন জীবের বলবৃদ্ধি করে, নির্ব্বাণও সেইরূপ বলবর্দ্ধক। অন্ন যেমন

জীবদেহে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, নির্ব্বাণও সেইপ্রকার অণিমাদি সিদ্ধিরূপ সৌন্দর্য্যের সম্পাদক হয়। অন্ন ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, নির্ব্বাণও সেইরূপ কামের ও মোহের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। অন্ন দুর্ব্বলতা দূর করে নির্ব্বাণও জীবের সকল প্রকার অশক্তি বা দুর্ব্বলতাকে দূর করে।

৬। আকাশ যেমন অনাদি ও অনন্ত, নির্ব্বাণও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত এবং সকল জীবদেহ যেরূপ আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান বা বিচরণ করে, সেইরূপ নির্ব্বাণকে আশ্রয় করিয়া সকল অর্হদ্গণ সংসারে অবস্থান করেন ও বিচরণ করেন।

৭। চিন্তামণি যেমন সকলপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ করে, নির্ব্বাণও সেইপ্রকার সকল অভিলাষ পূর্ণ করে। চিন্তামণি যেমন আনন্দপ্রদ নির্ব্বাণও সেইরূপ আনন্দপ্রদ। চিন্তামণি যেমন জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বাণও সেইরূপ সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়।

৮। হরিচন্দন যেমন দুর্ল্লভ, নির্ব্বাণও তদ্রূপ দুর্ল্লভ, হরিচন্দনের সৌরভ যেমন অতুল, নির্ব্বাণের সৌরভও তদ্রূপ। উহা যেমন সকলের প্রশংসনীয়, নির্ব্বাণও তদ্রূপ প্রশংসনীয়।

৯। ঘৃত যেরূপ কোমল, নির্ব্বাণও সেইরূপ কোমল, ঘৃতের গন্ধ যেমন তৃপ্তিকর নির্ব্বাণের সৌরভও তদ্রূপ। ঘৃত যেমন আস্বাদ্য নির্ব্বাণও তদ্রূপ আস্বাদ্য।

১০। গিরিশৃঙ্গ যেমন সমুন্নত, নির্ব্বাণও তদ্রূপ, গিরিশৃঙ্গ যেমন কম্পিত হয় না নির্ব্বাণও তদ্রূপ অকম্প্য। গিরিশৃঙ্গ যেমন দুরারোহ, নির্ব্বাণও তদ্রূপ দুরারোহ। সুমুন্নত গিরিশৃঙ্গে যেমন কোনও প্রকার লতাগুল্মাদি জন্মে না নির্ব্বাণেও তদ্রূপ বাসনারূপ লতা প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। গিরিশৃঙ্গ যেমন কাহাকেও তুষ্ট বা দুঃখিত করিতে কোনও কার্য্য করে না নির্ব্বাণও সেইপ্রকার কাহারও রোষ বা ভয়ের কারণ হয় না।

নাগসেনের এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে নির্ব্বাণ সেই অবস্থা যাহার উপর সুখ ও অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত ; অথচ তাহা সর্ব্বশূন্যতা ও সর্ব্বনিবৃত্তির আলয়, বাঙ্মনসাতীত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

লঙ্কাবতারসূত্রেও নির্ব্বাণকে নিষেধমুখে ও বিধিমুখে বর্ণনা করা হইয়াছে। "নির্ব্বাণ সেই অবস্থা যথায় স্কন্ধাদি শরীরের ধাতু ও যড়ায়তন নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আবার বলা হইয়াছে—"বিষয়বৈরাগ্যাৎ নিত্যং বৈধর্ম্ম্যদর্শনাৎ অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন বিষয়ানমুস্মরণাৎ দীপবীজানলবৎ উপাদানোপরমাৎ অপ্রবৃত্তির্ব্বিকল্পস্য ইতি বর্ণয়ন্তি। অতস্তেষাং নির্ব্বাণ-বুদ্ধির্ভবতি ন চ মহামতে বিনাশদৃষ্ট্যা নিবার্য্যতে"। সুতরাং, সব বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াটাই নির্ব্বাণের অবস্থা নহে। এইরূপ পূর্ব্বে নির্ব্বাণকে যেমন নিরোধের দিক দিয়া দেখান হইয়াছে, তদ্রূপ বিধিমুখেও কথিত হইয়াছে যে, নির্ব্বাণ তাহাই যাহা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোগভূমি হইতে জীবকে তথাগত ভূমিতে লইয়া যায়, যেখানে উপস্থিত হইলে সকল পার্থিব পদার্থই মায়িক এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি উপস্থিত হয় এবং সেই অবস্থায় চিত্ত মন ও বিজ্ঞান সকলই নিবৃত্ত হইয়া যায়। 'সর্ব্বপ্রমাণাগ্রহণাপ্রবৃত্তি দর্শনাৎ তত্ত্বস্য ব্যামোহত্বাৎ অগ্রহণং তত্ত্বস্য তদ্‌ব্যুদাসাৎ সর্ব্বপ্রমাণ স্বপ্রত্যাত্মার্য্যধর্ম্মাধিগমাৎ নৈরাত্ম্যাদ্বয়াববোধাৎ ক্লেশদ্বয়াবরণদ্বয়বিশুদ্ধত্বাৎ ভূম্যুত্তরতথাগতভূমিমায়াদিবিশ্ব সমাধি চিত্তমনোবিজ্ঞানব্যাবৃত্তেঃ নির্ব্বাণং কল্পয়ন্তি।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্ব্বাণ শূন্যত্ব নহে, তাহা জীবের সম্পূর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সে অবস্থায় সকলই এক —সমরস। আবার বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সম্বন্ধেও সর্ব্বসাধারণের একটা মস্ত আপত্তি এই যে, তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভীরুর ন্যায় দূরে পলায়ন করিত—যে সংসার তাহাদিগকে স্নেহ ও যত্নে বর্দ্ধিত লালিত ও পালিত করিয়াছিল—সেই সংসারকেই তাহারা ত্যজ্য ও হেয় মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিত, ইহাই কি তাহাদের যথেষ্ট ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক? কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য কি বস্তুতঃ তাহাই ছিল? নির্ব্বাণ যে সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এই ধারণাই তাহাদের ছিল। নাগার্জ্জুন স্পষ্টই বলিয়াছেন:—

"নসংসারস্য নির্ব্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।
ন নির্ব্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্ ॥
ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্ব্বাণং নাধিগম্যতে ॥"

সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাণের স্বরূপ প্রদর্শন হইতেই পারে না। ব্যবহার জগৎ সর্ব্বথা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থ কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? যদি তুমি নির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য করিয়া থাক, যদি তাহাতেই সকল পর্য্যবসান করিতে চাও তাহা হইলে তুমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে চাহিলে চলিবে না—ব্যবহার হইতে বিভিন্ন পরমার্থের ব্যাখ্যা হইতে পারে না—স্বার্থপরতার উপর পরম লক্ষ্যের অর্থাৎ নির্ব্বাণের অধিষ্ঠান হইতেই পারে না—নাগার্জ্জুনের ইহাই শিক্ষা।

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা
লোকসংবৃতি সত্যং সত্যং চ পরমার্থতঃ।
যেঽনয়োর্ন বিজানন্তি বিভাগং সত্যয়োর্দ্বয়োঃ
তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীরং বুদ্ধশাসনে।

বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ এইরূপেই লোকসংবৃত্তি ও পরমার্থরূপ দুই সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলে। যাহারা সত্যের এই দুইটি বিভাগকেই স্বীকার না করে তাহারা সেই গম্ভীর বুদ্ধশাসন বুঝিতেই পারে না। ইহাই হইতেছে বৌদ্ধধর্ম্মের সার—ইহার নাম মানবপ্রীতি, জীবের মৈত্রীর ভাব। ইহা স্বার্থপরতার কলঙ্কে কলুষিত নহে—সংসারের যাবতীয় জীবের উপকারের জন্য আত্মবলিদানই ভিক্ষুজীবনের চরম লক্ষ্য।

এতাবৎ আমরা এইরূপ পুঁথিগত সত্য বা বিবাদের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া আসিলাম, এখন দেখা যাউক, বৌদ্ধাচার্য্যগণ স্বয়ং এই নির্ব্বাণতত্ত্ব কি ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বুদ্ধের স্বরূপ কি? মাধ্যমিকশাস্ত্রে নাগার্জ্জুন এ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন:—

"স্কন্ধো নান্যঃ স্কন্ধেভ্যঃ নাস্মিন্ স্কন্ধা ন তে পুনঃ।
তথাগতঃ স্কন্ধবান্ ন কতমোঽত্রঃ তথাগতঃ

বুদ্ধঃ স্কন্ধানুপাদায় যদি নাস্তি স্বভাবতঃ।
স্বভাবতশ্চ যো নাস্তি কুতঃ স পরভাবতঃ॥
যদি নাস্তি স্বভাবশ্চ পরভাবঃ কথং ভবেৎ।
স্বভাবপরভাবাভ্যাং ঋতে কঃ সঃ তথাগতঃ॥
শূন্যমিতি ন বক্তব্যমশূন্যমিতি বা ভবেৎ।
উভয়ং নোভয়ং চেতি প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে॥"

বুদ্ধ যদি স্কন্ধবিরহিত* অবস্থাতেই থাকেন তাহা হইলে আমরা কিরূপে তাঁহাকে বুঝিব? স্কন্ধ ব্যতিরিক্ত কেহই থাকিতে পারে না, যাহা নিরুপাধিক তাঁহাকে তথাগত কিরূপে বলা যায়? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, স্বভাবাস্তিত্ব ব্যতিরেকে কিরূপে পরমার্থাস্তিত্ব ঘটিতে পারে? ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তিনি কিরূপেই বা থাকেন? শূন্যও নহেন, অশূন্যও নহেন কিরূপই বা তিনি? কঃ সঃ তথাগতঃ। ক্রমে সিদ্ধান্তপক্ষে ইহার উত্তর হইল, "তথাগতস্তৎস্বভাবো যৎ স্বভাবমিদং জগৎ"। তথাগতের যাহা স্বভাব জগতের স্বভাবও যে তাই, সকল অণু পরমাণুতে জীবে জীবে সেই তথাগতই বিরাজ করিতেছেন— তিনি কি কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন—জগতে তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়া রহিয়াছেন, প্রাণিমাত্রের স্বভাবে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই।

আবার দেখুন, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক পুস্তকে তথাগত আনন্দকে নির্ব্বাণের স্বরূপ কি বুঝাইতেছেন—

সমাদপেমী বহুবোধি সত্ত্বান্ বোধর্স্মি জ্ঞানস্মি স্থাপেমি চৈন।
সত্ত্বান কোটীন্ অযুতাননেকান্ পরিপাচয়ামী বহু কল্পকোট্যঃ।
নির্ব্বাণভূমিং চুপদর্শয়ামি বিনয়ার্থসত্ত্বান্ বন্ধাম্যুপায়ম্
ন চাপি নির্ব্বাম্যহু তস্মি কালে ইহৈব ধর্ম্মু প্রকাশয়ামি॥
তত্রাপি চাত্মানমধিক্ষিপামি সর্ব্বাংশ্চ সত্ত্বান তথৈবচাহম্।
বিপরীতবুদ্ধী নরা বিমূঢ়াঃ তত্রৈব তিষ্ঠন্তু, পশ্চি ধূমাং॥

* পঞ্চ স্কন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, ইহার সহিত কাম, ক্লেশ ও কর্ম্ম লইয়াই বৌদ্ধদর্শনের অবিদ্যা।

ঋজু যদা তে মৃদুমার্দ্দবাশ্চ উৎসৃষ্ট কামাশ্চ ভবন্তি সত্বাঃ।
ততোঽহং শ্রাবক সংঘ কৃত্বা আত্মানন্দশেম্যহু গৃধকূটে॥

বুদ্ধের কার্য্য জগতের জীবসকলের উদ্ধার, সকলের চিত্তে সেই বোধির জাগরণ, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার জাগরণ। বহুকোটী কল্পান্ত ধরিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের ইহাই কার্য্য যে—আধিব্যাধিক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারসাধন, তাহাদিগকে জ্ঞানের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উপায় প্রদর্শন; মানুষ অন্ধ, শোকতাপগ্রস্ত, তাহাকে নির্ব্বাণভূমি দেখাইয়া দেওয়াই বুদ্ধের কর্ত্তব্য। যখন লোকে ভাবে যে বুদ্ধ কি আর আছেন, তিনি নাই, তিনি শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সময়ে তিনি (বুদ্ধ) নির্ব্বাণমার্গের উপদেশ করিয়া থাকেন—জীবহৃদয়ে বুদ্ধই অধিষ্ঠিত আছেন, যখন জগতে শুভযুগ আসে, ঋজুতা ও সরলতা আসিয়া ইহধামে বিচরণ করে, যখনই জীবগণ সত্বগুণপ্রধান হয় তখন তিনি শ্রাবকসংঘ সংগঠন করিয়া গৃধকূটে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। জগতের সৃজন, পালন ও রক্ষণের জন্য তিনিই যুগে যুগে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়েন। মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই বিশ্বাস।

আমরা উপরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, বৌদ্ধদর্শন প্রোক্ত নির্ব্বাণে ও আমাদিগের বেদান্তস্বীকৃত নির্ব্বাণ মোক্ষের কোন বৈসাদৃশ্য নাই। বেদান্তে নির্ব্বাণের আলোচনায় আমরা ইহা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। আরও দেখিলাম যে, বৌদ্ধগণ নিরীশ্বর-বাদীও নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্ব্বাণদাতা বুদ্ধে বিশ্বাসী। এ বুদ্ধের সহিত ও আমাদের পরমেশ্বরতত্ত্বের কোন বৈসাদৃশ্য নাই। তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ, জীবহৃদয়বিহারী পরম কারুণিক, সদিচ্ছার প্রেরক ও মঙ্গলবিধাতা পিতা, জীবের উদ্ধার ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্য্যই নাই। এই তথাগত বুদ্ধের সহিত কি আমাদিগের বেদান্ত শাস্ত্র-বর্ণিত অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ঈশ্বরের কোনও পার্থক্য আছে? বাস্তবিকই হিন্দুর ঈশ্বর ও বৌদ্ধের এই তথাগততত্ত্বের কোনও পার্থক্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আজ এই যুগসন্ধির দিনে আধ্যাত্মিক জীবনের

পুনর্গঠনের এই শান্ত উষার উন্মেষকালে আমরা সকলেরই মধ্যে এই একত্বের অনুসন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সময়ের আবর্ত্তনে আমরা আরও নূতন নূতন তথ্য জানিতে পারিব। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের কারণ আর থাকিবে না, এখন আমাদিগকে পরস্পর বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে এবং একযোগে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক বৌদ্ধ হিন্দু ও অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই অকপট-ভাবে পরমার্থের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই আমরা জগতের সমক্ষে ভারতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।*

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গলার কথা"।

(ভারতের সাধনার লেখক)

"বাঙ্গলার কথার" উপর এ পর্য্যন্ত যে সব কথার অবতারণা করা হইল, সমস্তই উহার তত্ত্বাঙ্গের প্রসঙ্গে; এইবার "বাঙ্গলার কথার" সাধনাঙ্গের আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

কিন্তু "বাঙ্গলার কথায়" আরও দুইটী তত্ত্বকথার সদ্বিচার আছে, একটী পাশ্চাত্য Industrialism সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টী আমাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে। এ দুইটীই বাকি থাকে কেন? সেইজন্য এই দুইটী প্রসঙ্গও যথাস্থানে থাকিবে।

পাশ্চাত্য Industrialism বা শিল্পবাণিজ্যনীতি পাশ্চাত্য পলিটিক্সের একটী অনিবার্য্য পরিণাম। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে মানুষের যে পার্থিব জীবন, তাহার নানা আসবাব সরঞ্জাম মানুষ যতই বাড়াইতে চাহিবে, ততই তাহারা বাড়িয়া যাইতে পারে। আর

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাধারণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। ইহা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের' দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ওদিকে ঐ পার্থিব জীবনের প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের লক্ষ্য। সুতরাং পাশ্চাত্য পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য Industrialism একই সুর-লয়ে বাঁধা রহিয়াছে। একটীকে গ্রহণ করিলে আর একটী অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু পাশ্চাত্য পলিটিক্সকে সাদরে গ্রহণ করিব, অথচ পাশ্চাত্য Industrialismকে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করিব, এমন অসম্ভব ব্যাপার কোন দেশেই সম্ভবপর হইবে না। সেইজন্য পাশ্চাত্য পলিটিক্সের উৎসাহে আগুন ছুটাইয়া দিয়া দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দিকে ফিরিয়া চাওয়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে হইবে না তাহা যত শীঘ্র আমরা বুঝি, ততই মঙ্গল।

শিল্পবাণিজ্যের নীতি আমাদের দেশে কিরূপ হইবে, তাহা আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিয়া দিতে পারে। স্বদেশী পলিটিক্সের আদর্শ ও প্রকৃতি আমরা সুস্পষ্টভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছি। যে নীতি বলে, পার্থিব জীবনের নানা আসবাব-সরঞ্জাম যথাসম্ভব বাড়াইয়া যাও, সে নীতির সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের কথনও থাপ খাইতে পারে না। দেশের সমষ্টিজীবন যাহাতে ভোগবিলাসের মোহে আকৃষ্ট না হয়, তাহাই স্বদেশী পলিটিক্সের একটী উদ্দেশ্য। সেইজন্য পাশ্চাত্যে যেমন রাজৈশ্বর্য্য সমষ্টিজীবনের বনিয়াদ বলিয়া স্বীকৃত, আমাদের দেশে সেইরূপ সাধারণ চাষীর জীবনকে সমষ্টিজীবনের বনিয়াদরূপে আশ্রয় করিয়া স্বদেশী পলিটিক্সের উদ্ভব ও উৎকর্ষ। সাদাসিদা গ্রাসাচ্ছাদনের স্বচ্ছলতাই আমাদের দেশের অর্থনীতির সনাতন ভিত্তি। সেই সাধারণ ভিত্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে যেথানে যেরূপ ঐশ্বর্য্যঘটা ঘটিতে পারে ঘটুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমস্ত দেশটা ধন-মদমত্ততায় স্ফীত হইয়া অপরাপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ধাবমান হইবে, এমন অর্থনীতির আদর্শ আমাদের পলিটিক্সে স্থান পাইতে পারে না। ঠিক এইরূপ মত্ততা ও প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য Industrialismএর জনকজনয়িত্রী। অতএব সম্মিলনের সভাপতি-

মহাশয় পাশ্চাত্য Industrialism এর পরিহার্য্যতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করি। "

কিন্তু সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে যে, পাশ্চাত্যের শিল্পবাণিজ্যনীতি আমরা যদি আজ অবলম্বন না করি, তবে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতা অতি সহজেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে আমাদিগকে মুছিয়া ফেলিবে। পলিটিক্সে, ব্যবসাবাণিজ্যে পাশ্চাত্য আজ যে প্রতিযোগিতার ধূয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সমগ্র জগৎকে যোগদান করিতেই হইবে; যে দেশ যোগদান করিবে না, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই সার্ব্বজনীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার আহ্বানস্বরূপ বিধাতা ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই ইংরাজী আমলে প্রতিযোগিতা এড়ান অসম্ভব।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ইংরাজ ভারতে রাজশক্তির আসনই গ্রহণ করায় জগতের রাজনীতির প্রতিযোগিতার বর্ত্তমান ভীষণ খাণ্ডবদাহ ও হলাহল হইতে আমরা নেপথ্যে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। বিধাতার অভিপ্রায় লইয়া যদি কথা উঠে তবে বলিতে হয় যে বর্ত্তমান যুগের তুমুল রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত যাহাতে নানা নেশনের মারামারি কাড়াকাড়ির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় না হয়, সেই জন্যই ভারতকে ইংরাজের রাজনীতিক অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে ভারতের জাতীয় জীবন এমনভাবে গঠিত হয় নাই, যাঁহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশীকে রাজার আসনে বসাইলেই সেই জাতীয় জীবনের মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, গল্পে যেমন এক একটা "রাক্ষসীর প্রাণ কোন গুপ্ত কৌটায় রক্ষিত হয়, সেইরূপ আমাদের দেশের প্রাণ ধর্ম্মরূপ কৌটার মধ্যে রক্ষিত আছে। যতদিন এই ধর্ম্মের উপর—প্রজার স্বধর্ম্মের উপর সমাজের স্বধর্ম্মের উপর—আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বধর্ম্মের উপর আততায়ীর হাত না পড়িবে, ততদিন আমাদের দেশের মৃত্যু নাই। আমাদের মরণ-বাঁচনের

কাটি রাজনীতিরূপ পেটিকায় রক্ষিত হয় নাই, যেমন অন্যান্য দেশে হইয়াছে—হইলে, রাজনীতিক অধীনতা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিত। তবে যে আজ অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের চাপে মৃত্যু আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার মূল কারণ এই যে আমরা আমাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, স্বদেশী পলিটিক্সের বর্জ্জন করিয়া বিদেশী পলিটিক্সের প্রবল পীরিতে "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইতেছি। প্রত্যেক দেশে একটা না একটা পলিটিক্স ত চালাইতেই হইবে; আমরা যখন আমাদের দেশের প্রজাধর্ম্মমূলক পলিটিক্স দেশে চালাইলাম না, তখন ইংরাজ আপনার বিদেশী পলিটিক্স কেন না চালাইবে? তোমার ঘরের পলিটিক্স তুমি তোমার ঘরে চালাইলে না, বাহিরের পলিটিক্স ইংরাজ কেন না চালাইবে? আর সেই বাহিরের পলিটিক্স তুমি যে আদর ক'রে, আবদার ক'রে, নিজের অন্দরমহলে ঢুকাইতেছ, পল্লীবাসী প্রজার জীবনে খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যবস্থার দায় পর্য্যন্ত ইংরাজরাজের ঘাড়ে পদে পদে চাপাইতেছ! তোমার স্বধর্ম্মের উপর আততায়ীর হাত কে আগে উঠাইয়াছে?

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ আমরা নিজেরাই পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতাকে ডাকিয়া আনিয়াছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যতটা অত্যাচারের জোরে এ দেশে পাশ্চাত্য ব্যবসাবাণিজ্য ঢুকাইয়া দিতেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যভিচারের জোরে ইংরাজীশিক্ষিত-সম্প্রদায় এ দেশে বিদেশী ব্যবসাবাণিজ্য ঢুকাইয়া দিয়াছেন। একদিকে পূর্ব্বপক্ষ যদিও কারিগরের আঙ্গুল কাটিয়া থাকে, অপরদিকে উত্তরপক্ষ দেশশুদ্ধ কারিগরদের মুখের গ্রাস কাড়িতেছিল। আমাদেরই বাবুয়ানার জন্য গ্রামে গ্রামে শিল্পকারিগর উদরান্নের দায়ে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে ভাগ বসাইতে ছুটিয়াছে, চাষের জমি দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছে, অথবা সহরে আসিয়া বিদেশী উপকরণে নূতন কারিগরী ফাঁদিয়া বসিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপার ত এখনও চক্ষের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় এখনও যায় নাই।

এখন, হায়, পরণের কাপড়টী পর্য্যন্ত যোগাইবার জন্য ম্যাঞ্চে-

বা জাপানের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। দেশে ঘরে ঘরে যে সুতা কাটা হইত, সে সুতার কাপড়ে সহরের বাবুয়ানা চলে না; কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাবু হওয়া ত চলে? যাদের না হয় গ্রামে একটা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তারা অনায়াসেই ত প্রত্যাবর্ত্তনের পালা সুরু করিয়া দিতে পারেন? গ্রাম্য তাঁতির কাপড়ের ক্রেতা যদি এক্ষেত্রে দলে দলে আবির্ভূত হইতে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই কাল তুলার চাষ আরম্ভ হইবে, চরকা ঘরিতে আরম্ভ হইবে, তাঁত চলিতে থাকিবে। ক্রেতার আবির্ভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব ও উৎকর্ষ। দেশে কাপড়ের যে সব কল-কারখানা হইয়াছে, তাহারা সহরে বাবুদের কাপড় যোগাইতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু গ্রাম্যপথের ধারে যে সমস্ত দেশটা পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাচীন চালচাল আজ আবার প্রবর্ত্তিত না করিলে তাহার কাপড় জুটিবে কি উপায়ে? নির্লজ্জভাবে আজ আমরা কি জাপানের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বসিয়া থাকিব এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদেশী পলিটিক্সের শোভাযাত্রায় নাচিতে ও দেশশুদ্ধ লোককে নাচাইতে ছুটিব?

আজ পরণের কাপড়কে উপলক্ষ্য করিয়া একটা মস্ত সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। স্বদেশবুদ্ধি, স্বদেশীবুদ্ধি আজ যাহার প্রকৃতভাবে জাগিয়াছে, যে আসরে আজ কেবল রাজসরকারকে লইয়া মান অভিমানের পালা চলিয়াছে সে আসর থেকে সে প্রকৃত দেশের কাজের আসরে ছুটিয়া যাইবে। সে বুঝিবে যে দেশী হোম-রুলের মধুমক্ষিকা বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রামে গ্রামে গ্রাসাচ্ছাদনের মধু সংগ্রহ করিয়াছিল, সে মধুমক্ষিকাকে অবজ্ঞায় মরিতে দিয়া বিদেশী হোমরুলের সোণার ভীমরুলের পশ্চাতে ছুটা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দেশের লোকের দ্বারা দেশের পরণের কাপড়টা যদি আজ যোগাইতে পারি, তবে খুব ক্ষীণ হইলেও সত্যিকার হোম-রুলের সামান্য একটা আস্বাদ পাওয়া যাইবে। এই আস্বাদ পাইবার জন্য কাহারও প্রাণ কি পাগল হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে,

তবে নগরে নগরে হাজার হাজার হোমরুলার সঙ্ঘের তালিকায় নাম দস্তখৎ করিলেও বলিব, "হে ভারত, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"!

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি সে দিন দেশের লোককে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের লুপ্ত ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদের——

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় (Industrialism) কে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লিগ্রাম হইতে টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্যতা দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়

সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেই-জন্য জেলায় জেলায় 'জেলাবাসীদের সাহায্যে' ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।"

কি যে করিতে হইবে তাহা এর চেয়ে বিশদরূপে আপাততঃ বুঝাইবার ত আবশ্যক দেখিতেছি না। কিন্তু কে করিবে এই প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি মহাশয় একটা কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন। সেটাও এই সঙ্গে আমরা উদ্ধৃত করি, যথাঃ—

"প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ১০টী কি ২৫টী পল্লীসমাজ থাকিবে, এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চায়েৎ ব্যতীত, জেলা-সমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটী পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলাসমা-অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলাসমাজ——

(১) সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষাদীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীরশিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলাসমিতির অধীনে থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে

পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোট খাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।

(৬) গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকীদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকীদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলাসমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার সাধারণ পুলিশের ভার জেলাসমাজের হাতেই থাকিবে।

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তাহা জেলাসমাজের হাতে থাকিবে না, তাহারা সম্পূর্ণ হাইকোর্টের অধীন থাকিবে।

(৯) এই জেলাসমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুইশত হইতে পাঁচশত পর্য্যন্ত হইবে।

(১০) এই জেলাসমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটী একটী করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে। এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লীসমাজের কোন কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা-সমাজ ও পল্লীসমাজের সকল কার্য্যনির্ব্বাহের

জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলাসমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে তাহা বন্ধ দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrateএর এখন যে সব ক্ষমতা আছে তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলাসমাজসমূহকে বঙ্গীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সভাপতি মহাশয় এই যে কার্য্যের তালিকা ও কার্য্যের প্রণালী উপস্থাপিত করিয়াছেন, ইহাকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়,— এক ভাগে "কি করিতে হইবে" তাহাই শুধু বলা হইয়াছে, আর এক ভাগে "কে করিবে" তাহাই দেখান হইয়াছে। কি করিতে হইবে, এই অংশের অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতার মূল কথা—পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পল্লীগ্রাম থেকে সমস্ত দেশটাকে গড়িয়া তুলিবার কথা যে আজ উঠিয়াছে, ইহা "লাখো কথার এক কথা।" ইহাতে ভারতীয় সমস্ত সমস্যার যেন মূল বস্তুটী আমাদের করতলগত হইয়াছে। যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। আমাদের সমষ্টি-জীবনের পল্লীগ্রামরূপ মর্ম্মস্থলে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, সে প্রশ্নের মীমাংসা সমগ্র ভারতে হইবার নহে। এই মর্ম্মস্থল হইতে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, বাহিরে বাহিরে একটা ধার করা চক্‌চকে হোমরুলের খোলস পরাইয়া দিলেই জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিল না।

পল্লীগ্রামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলিলেই পল্লীজীবনের সমস্ত অঙ্গের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা বুঝায়। পল্লীতে পল্লীতে কৃষি, শিল্প, কারবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজধর্ম্মের মূলপত্তন করা চাই। এই মূলপত্তন প্রত্যেক পল্লীবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, আইনের জোরজবরদস্তির উপর নহে, কারণ ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা। পল্লীবাসীর এই যুগযুগান্তের ধর্ম্মবুদ্ধিকে উদ্বোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য লোকসেবায় উৎসৃষ্ঠ জীবন, পল্লীবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মশিক্ষাদাতৃগণের আবির্ভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য দেশে আজ সাধু ও সাধুকল্প সেবকসম্প্রদায়ের অভাব হইবে না। প্রত্যেক পল্লীসমাজে কোনও একটা ঠাকুরবাড়ী, কোনও একটা বারোয়ারিতলা, হরিসভা বা চণ্ডীতলা প্রভৃতি সৎশিক্ষার আড্ডা স্থাপন করা খুবই সহজসাধ্য। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত আড্ডা ধমনীসংযোগের মত সৎশিক্ষা, সৎপরামর্শ, কর্ত্তব্যনির্ণয় প্রভৃতি আবশ্যকীয় চিন্তা ও সাধনার সঞ্চার করিয়া দিবে, পল্লীর পঞ্চায়েৎ, মোড়ল প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, পল্লীসমাজ গড়িয়া তুলিবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পল্লীসমাজ জেলাসমাজ নির্ব্বাচিত করিবে। অতএব গোড়াথেকেই স্থির হইল, দেশের কাজ করিবে দেশের সাধারণ লোক,—চাষী, শিল্পী, কারিকর, ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক প্রভৃতি, এবং দেশের কাজ করাইবে দেশের ধর্ম্মশিক্ষক সম্প্রদায়।

তারপর পল্লীজীবনে পুলিশের কাজ, আইন আদালতের কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশের সাধারণ লোক যখন দেশের কাজের "কাজি" হইবে, তখন এই সকল রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহাদের বিরোধ হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি লোকসেবকসম্প্রদায় যখন দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেশের কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন রাজকর্ম্মচারীদের সহিত তাহাদের একযোগে কার্য্য করিতে হইয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের কাজে যতক্ষণ আমরা ইংরাজের রাজপ্রতিপত্তির বিরোধী ভাব পোষণ না করি, ততক্ষণ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত কোনওরূপ বিরোধ দূরে

থাকুক, কোনও সন্দেহমূলক কুব্যবহারেরও অবকাশ থাকে না। বরং পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগিতার ফলে দেশের কাজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া যায়। দেশের লোক দেশের কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে, পুলিশ ও রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যসাধনে সহজেই সুশৃঙ্খলা ও বাস্তবতা বাড়িয়া যাইবে। তখন রাজসরকারের বিদ্যা-পসারণ, সুবিধাবিধান ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্ত্তব্যসাধনের সহিত দেশের লোকের দেশের কাজের একটা অব্যর্থ সংযোগ গড়িয়া উঠিবে। সে অবস্থায় দেশের লোকের দেশের কাজের উপর সরকারী পূর্ত্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি বিভিন্ন-বিভাগীয় কর্ম্মের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইবে। আর যদিই বা কোনও ক্ষেত্রে রাজকীয় কোনও বিভাগের সহিত দেশের লোকের দেশের কাজে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, তবে জেলাসমাজ হইতে নির্ব্বাচিত লোক-প্রতিনিধিগণ রাজসভায় সেই অসামঞ্জস্যের প্রতি সেই রাজকীয় বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সে ত আর তখন কেবল ফাঁকা রাজনীতিক অধিকারের দাবী দাওয়া নহে, যে বাগাড়ম্বরের ধূম্রবাহুল্যে একটা হৃদ্‌কম্পনের সহজে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। সে যে কর্ম্মব্রতধারী, স্বধর্ম্মৈকপ্রাণ প্রজাবৃন্দের ব্যক্ত অভিযোগ; সে যে কাজের কথা, মুখের কথা নহে; সে কথা কোনও চক্ষুষ্মান্ চাপা দেন না, উড়াইয়া দেন না। গবর্ণমেণ্ট ত দিবেনই না, কেন না প্রজা যে তখন নিজের দেশের কাজের উপর সরকারী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করাইয়া লইয়াছে। তখন দেশের লোক কৌন্সিল প্রভৃতিতে যে প্রতিনিধি পাঠাইবেন, সে প্রতিনিধিগণ সত্য সত্যই তাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের সহিত, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক আশা ও উদ্যমের সহিত এই প্রতিনিধিদের একটা বাস্তব যোগাযোগ থাকিবে। তখন আমাদের সমষ্টিজীবন কেবল একটা আশার কথা নহে, একটা কল্পিত আদর্শ নহে, তখন উহা একটা প্রত্যক্ষ বস্তুতন্ত্র সত্তা। যতদিন না দেশের জীবনে এই বস্তুতন্ত্রতার আবির্ভাব হয়, তত দিন বিলাতেই

বল আর এদেশেই বল আমাদের প্রজাপ্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র আমাদের আশার দূত, আশার শক্তিতে শক্তিমান,—সে শক্তি ইংরাজ রাজার কর্ম্মশক্তির সম্মুখে বেশীভাগই নিষ্ফল প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইবে। অলস প্রার্থীর আশাশক্তি কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তির সম্মুখে কি আর শ্রদ্ধা পাইবে? বাচনিক শ্রদ্ধায় কি কাজ হয়, কথায় কি চিঁড়ে ভেজে?

সহজেই বুঝা যায়, দেশের কাজের যে ব্যবস্থার কথা আমরা বলিতেছি, তাহার সহিত সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের ব্যবস্থার একটা প্রকাণ্ড গরমিল আছে। দেশের কাজ যে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মিল আছে, কে যে করিবে সে সম্বন্ধেও মিল আছে বলা যায়, কিন্তু দেশের কাজ কে করাইবে, এ সম্বন্ধে একটা মস্ত মতভেদ রহিয়াছে। দেশের কাজে একটা প্রেরণা চাই, একটা বিধিবত্তা চাই। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, সে বিধিবত্তা রাজসরকারের আইন-কানুনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কার্য্যপ্রণালীর ১৪ দফায় তিনি স্পষ্টই এ কথা বলিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, দেশের কাজের সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত বিধিবত্তা, আমাদের সনাতন প্রথানুসারে প্রজার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে; গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মশিক্ষকগণ তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের কাজ করাইবে। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স চিরকালই এইরূপ প্রজাধর্ম্মমূলক। রাজা কিছু করিয়া দেন না, গড়িয়া দেন না, কেবল বিঘ্নাপসারণ করেন, তত্ত্বাবধান করেন। প্রজা গড়িয়া তুলে, রাজা বজায় রাখে। আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের এই প্রাণধর্ম্মটীর অপলাপ করিলেই স্বদেশী পলিটিক্স বিদেশী পলিটিক্সে পরিণত হইবে। রাজাকে আইনকানুন করাইয়া যদি প্রজাকে দেশের কাজ করিতে বাধ্য করিতে হইল, তাহা হইলে আগেই রাজার দরবারে আইনকানুনের একটা আবেদনপত্র লইয়া ছুটিতে হয়। রাজাকে দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা দেশের কাজে আগে না নামাইতে পারিলে, প্রজার কাছে দেশের কাজের জন্য যাওয়া নিষ্ফল হইল। এই রাজসরকারের শক্তি দ্বারা দেশের কাজের পত্তন ও উন্নতি

করার নামই বিদেশী পলিটিক্স। সভাপতি মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাবে অকস্মাৎ এই একটা গলদ ঢুকিয়া গিয়াছে।

মহাজনের হাত থেকে প্রজাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাঙ্ক খুলিতে হইলে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ট্যাক্স বা চাঁদা তুলিতে হইলে যদি উপস্থিত কোনও বিশেষ আইনের সাহায্য লইতে হয়, সে আলাদা কথা। ঐরূপ ব্যাঙ্ক না থাকুক এখনও জায়গায় জায়গায় লোন আফিস আছে, ট্যাক্স না থাকুক চাঁদা বা বারোয়ারীর বা ধর্ম্মার্থের টাকা আদায় করা এখনও চলে। এ সমস্ত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সাহায্যেই কাজ চলে। ব্যাঙ্ক বা ট্যাক্স প্রভৃতি ইংরাজী নাম গ্রহণ করিলেই কি সরকারী নূতন আইন-কানুনের কথা মনে পড়িবে?

তার পর সরকারী পুলিশ বা লোকাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রহিত-করণ, অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সঙ্কোচন ইত্যাদি যে সমস্ত রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সে সমস্ত সমর্থন করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য রাজকার্য্যকে দেশের কাজের সহিত সমঞ্জসী-ভূত করা, যাহাতে দুইটী একেরই অঙ্গীভূত হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী দেশের কাজের প্রবাহ বহাইয়া দিয়া ক্রমশঃ রাজকার্য্যের ধারাগুলিকে তাহার সহিত সম্মিলিত করাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। রাজ-কর্ম্মচারী যেখানে যেমন আছেন, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না। তাহাদের কার্য্যের খাতগুলির সহিত দেশের কাজের সংযোগ ঘটানই আমাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের সাধনা কিরূপে হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মনে করুন, আজ একটা সৌভাগ্যের কথা যে স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ রাজকীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পূর্ত্তাদি বিভাগের মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দেশের লোকের কাছে এই সকল কার্য্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা:—

Local self-government, supplemented by the spread of the co-operative movement, will gradually solve many of our most difficult problems—such as primary educotion, small industries, improved agriculture, indetbedness of the peasantry, rural sanitation and so forth, and *to this we must devote our best energies and attention in the immediate future,* bearing in mind we have got to build from the village upwards.

তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"While I gratefully acknowledge the efforts now being made by the Government in all the provinces for truly laying the foundations of local self-government, I cannot help regreting that the Resolution of the Government of India of last summer does not go far enough or even as far as Lord Ripon's Resolution of 1882 in the direction of recommending less official control and a greater extension of the elective principle both as to members and chairmen of Rural and District Boards. Let not our rulers forget that "self-government implies the right to go wrong, and it is nobler for a nation as for a man to struggle towards excellence with its own natural force and vitality, however blindly and vainly, than to live in irreproachable decency under expert guidance from without."

স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের উদ্ধৃত উক্তি হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে আমরা যেরূপ দেশের কাজের ব্যবস্থা করিতে চাই; তাহার সহিত তাঁহার মতের একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। তিনিও পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের জাতীয় জীবন গড়িবার বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহসম্পন্ন। এ অবস্থায় তিনি যখন রাজকীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত্তাদি বিভাগের মন্ত্রিপদে আরূঢ়, তখন দেশের প্রজা-জীবনের সহিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা খুবই অধিক। এই সুযোগ ত উপস্থিত, কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোক কি দেশের কাজে আজ লাগিবে ?

আমাদের দেশের কাজ কি, আমাদের জাতীয়তা ধর্ম্ম কি, যদি একবার সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে দেশের লোককে কিরূপ শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা সহজ হইয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। আমাদের দেশেও তাহাই হইবে। প্রচলিত সমস্ত বিদ্যাদির অনুশীলন ত সব দেশেই উচ্চ শিক্ষায় বিষয়ীভূত, কিন্তু সেই উচ্চশিক্ষাবিস্তারকে আমাদের দেশে আমাদের দেশের কাজের সম্পূর্ণ অনুকূল করিয়া দিতে হইবে। সেই উচ্চশিক্ষার মধ্যে এমন একটা ভাবরূপ ভিত্তির সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সমগ্র জাতীয় জীবনের দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে, যাহাতে জাতীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য প্রত্যেক শিক্ষিত জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, যাহাতে সেই লক্ষ্যানুগত্যের ফলে স্থায়ী দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে এবং দেশব্যাপী দেশের কাজে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান ও কাজ আশ্রয় করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করে। আর পল্লী-সমাজের নিম্নশিক্ষার ভার পল্লীসমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। এখন যেমন সহরের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া সে শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পল্লীজীবনের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ইহার পরিবর্ত্তে পল্লীজীবনের কর্ম্ম ও ভাবসম্পদ কি তাহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিরূপে কেন্দ্রস্থানীয় তাহা ছেলেরা ক্রমশঃ বুঝিতে শিখে, যাহাতে সেই জাতীয় জীবনের আদর্শ শিখিতে চাহিয়া তাহারা সমগ্র জগতের আদর্শ ও শিক্ষায় ক্রমশঃ প্রবেশলাভ করিতে শিখে। এইরূপে পল্লীগ্রামের প্রয়োজনাদি হইতে পত্তন করিয়া চিন্তামূলক শিক্ষা ও সাধনমূলক শিক্ষা উভয়েই ছেলেদের শিক্ষিত করিতে হইবে। এ শিক্ষায় কোনও আড়ম্বরের দরকার নাই; যেখানে যেরূপ আসবাব সরঞ্জাম জুটিয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট; পুস্তকপরীক্ষা অপেক্ষা চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির উৎকর্ষই লক্ষ্য করিতে হইবে। এ শিক্ষার আসল ভিত্তি শিক্ষাদাতার হৃদয় ও প্রাণ। পল্লীসমাজ ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা ইহাঁকে

নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন, কারণ পল্লীসমাজের সর্ব্ববিধ শিক্ষার মূল কেন্দ্র হইল পল্লীসমাজের দেবস্থান বা ধর্ম্মস্থান,—হরিসভা, বারোয়ারিতলা, চণ্ডীতলা প্রভৃতি। এখানে পঞ্চায়েৎ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে, চাষী ব্যবসায়ীরা মুখের কথায় আবশ্যকীয় শিক্ষালাভ করিবে, অথবা আবশ্যকমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইবে, গ্রামবাসীরা নিজ হিতাহিত বিচার করিবে, দেশবিদেশের ঘটনাবলী বিচার করিবে, আপনাদের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিবে। এক কথায় এই গ্রাম্য ধর্ম্মস্থানই দেশের কাজে উৎসস্বরূপ, এবং ইহার ধর্ম্মগতপ্রাণ, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান অধিষ্ঠাতাই দেশের কাজরূপ তরণীর কাণ্ডারী। তিনি দেশের লোককে তরণীর দাঁড় ধরাইবেন, তিনিই সারি গাওয়াইবেন; তিনিই দেশের শিক্ষা-সাধনারূপ তীর্থাবাসের পাণ্ডা। (সমাপ্ত)

একটি ডিট্‌রয়েট মহিলা ও তাহার ভারতীয় কার্য্য।

(আমেরিকার Detroit Saturday Night নামক পত্রে Rev. William F. Hopp লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত)

লোকে তাঁহাকে 'সিষ্টার খৃষ্টীন' বলিয়া ডাকে সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে রোমান্ কাথলিক চার্চ্চের কোনও একটী সম্প্রদায়ভুক্তা বলিয়াই ঠাওরাইয়াছিলাম। তৎপরে কিন্তু এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত থাকিতে দেখিলাম, যেগুলি ঐরূপ সম্প্রদায়গত খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সীমানার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। তখন বুঝিলাম যে তিনি তাহা হইলে ঐরূপ কোনও সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক নহেন এবং হইতেও পারেন না।

সিষ্টার খৃষ্টীন রামকৃষ্ণ মিশন নামক হিন্দু সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তা। পনর বৎসর পূর্ব্বে ইনি ডিট্রয়েটের খৃষ্টীয়ান্ চার্চ্চের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কেবল 'নামে খৃষ্টান্'—যাহাদের সংখ্যা আমাদের মধ্যে এত অধিক—সেরূপ নহে, বিশেষ শ্রদ্ধান্বিতা ও ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট-প্রাণা খৃষ্টীনের অন্তঃকরণ যথার্থই তখন ঐ সম্প্রদায়-প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া চলিত। শিক্ষা সমাপ্তির পর সতর বৎসর কাল ইনি আমাদের একটী সরকারী স্কুলে অধ্যাপনা করিয়া কাটাইয়াছেন। দশ বৎসর হইল ইনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া হিন্দুদের মধ্যে তাহাদেরই একজনরূপে কাল কাটাইয়া আসিতেছেন। যে ভারতীয় জনসাধারণের সহিত অবাধে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের নিকট থাকিতেই ইনি অভিলাষী। সম্প্রতি এখন বন্ধু বান্ধবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য ইনি একবার ডিট্রয়েটে আসিয়াছেন। ইঁহার সমগ্র ব্যক্তিত্ব এখন প্রাচ্যভাবের মাধুর্য্যে মণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি ইঁহার কণ্ঠস্বর ও বদনমণ্ডলই অসাধারণ সহানুভূতির পরিচায়ক ও ধর্ম্মভাবের উদ্বোধক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান খুব ব্যাপক ও তাহার বর্ণনাগুলিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। যদিও সিষ্টার খৃষ্টীন অত্যন্ত বিনয়-সহকারে তাঁহার নিজের কার্য্য সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলেন তাহা হইলেও তাহাতেই ইঁহার পরদুঃখপ্রবণ হৃদয়ের মহৎ ও উচ্চ-ভাব স্বতঃ-প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিঃস্বার্থতা, নিস্পৃহতা, ও পরোপ-কারৈষণাই তাঁহাকে আপন গৃহ, কর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের কার্য্যে জীবন নিবেদিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ডিটরয়েটে আগমন ও ধর্ম্মব্যাখ্যানাদি করেন সেই সময়ে কয়েকটী গুরু সন্দেহভারে প্রপীড়িতা খৃষ্টীনের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দের সাধকজীবনের বিশালত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের মহান্ জ্ঞান গর্ভ অভিনবত্বের উত্তেজনা মিস্ গ্রীন্‌ষ্টিড্‌ল খৃষ্টীনের হৃদয় স্পর্শ করিল! বিবেকানন্দ কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই—ব্যষ্টি-জীবনে ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিই

তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ডিট্রয়েট্ ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে খৃষ্টীন ইঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হন ও পরে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তনের দুই বৎসর পরে খৃষ্টীন যতই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি ভারত-পর্য্যটন-নিযুক্তা একটি বন্ধুর চিঠি পাইলেন—বন্ধু তাঁহাকে একবার ভারতে আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। খৃষ্টীন বুঝিলেন, ইহাই অবসর। তিনি ভারতে আসিলেন। বন্ধুর দেশে ফিরিবার সময় আসিল কিন্তু খৃষ্টীন ভারতেই থাকিয়া গেলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে যোগদান করিয়াছিলেন, তৎসূত্রে ভারতে কার্য্য করিবেন, ইহাই ইচ্ছা।

ইউরোপীয় পরা পরিত্যাগ করিয়া মার্গারেট. ই, নোব্লের সহিত গঙ্গাতীর হইতে অনতিদূরে একটি অর্দ্ধভগ্ন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিস্ নোব্ল্ এই সময়ে নিবেদিতা নামে ভারত সংক্রান্ত পুস্তকাদি রচনার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞগণের নিকট সমাদৃতা হইয়াছিলেন। এই কুটীরে অবস্থানকালেই সিষ্টার খৃষ্টীন ও তাঁহার এই সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সহযোগীটি তৎকালীন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সমাধানে অগ্রসর হয়েন।

বিবেকানন্দ ভারতের অতীত প্রশস্তি ও প্রাচীনযুগে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের দান সম্বন্ধে যেরূপ অবহিত ছিলেন তদ্রূপ তিনি আধুনিকদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ভারতের সমাজোন্নতি বিষয়ী নানারূপ পন্থার উদ্ভাবনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তৎ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় যে কেবল ধ্যান-ধারণা লইয়াই কালযাপন করিবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, সমাজসেবাও তাঁহাদের কর্ম্ম ও সাধনার অঙ্গীভূত হউক, ইহাও তাঁহার শিক্ষা ছিল। কোনও একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা

ভারতবর্ষের স্ত্রী-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করাইয়া দিয়া যাইতে ইঁহার আগ্রহ জন্মে। সিষ্টার খৃষ্টীন তন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর এই বিভাগকেই আপনার জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা 'গোঁড়া' হিন্দুগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, সিষ্টার খৃষ্টীনের পক্ষে হিন্দু বালিকা ও বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন কতটা কষ্ট-সঙ্কুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই আমেরিকান্ শিক্ষয়িত্রী ও তাঁহার ইংরাজ সহযোগী দৃঢ়সংকল্প হইয়াই আসরে নামিয়াছিলেন, ফলে শীঘ্রই ইঁহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মের পরিধির প্রসার করিতে হইয়াছিল।

গ্রীষ্টীন এখন সত্য সত্যই বাগবাজার বোসপাড়া গলিতে শিক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজমানা। তাঁহার আমেরিকালব্ধ বিদ্যাদান-প্রণালীর এখানে 'হাতে কলমে' ব্যবহার করিবার সুযোগ উপস্থিত। যাহাতে আধুনিক শিক্ষা-প্রদাতার পদ্ধতি ও আদর্শ প্রাচ্য মহিলা ও বলিকাগণের "মঠবৎ" নিভৃত অন্তঃপুরের মধ্যেও কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যই ইঁহাদিগকে একজন ভারতবাসীর গৃহ-মধ্যেই এইরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর করিয়াছে। ফলেও তাহাই ঘটিল। ক্রীড়াপদ্ধতি ক্রমে শিক্ষাদান (Kindergarten) অবলম্বনে যে বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত তাহা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ছোট ছোট মেয়ে হইতে বিবাহযোগ্যা বয়সের হিন্দু বালিকা এবং এমন কি, অনেক সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোকগণের দ্বারাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সিষ্টার গ্রীষ্টীন ও সিষ্টার নিবেদিতার কার্য্যপ্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব যে, ইঁহারা দেশীয়গণের অনুকূল ও স্বাভাবিক অবস্থার কিছুমাত্র বিপর্য্যয় করেন নাই। তাহারা যে একটা বিদেশী আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইতেছে, ছাত্রীদিগের এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ কখনও উপস্থিত হয় না। এই বিদ্যালয়ে কাহাকেও তাহার অভ্যস্ত সামাজিক আচার, ধর্ম্মের অনুশীলন অথবা তাহার সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে লওয়াইবার চেষ্টা করা হয় না। বরং তাহাদিগেরই বিভিন্ন

আচার ব্যবহার স্বীকার করিয়া লইয়া সনাতন ভারতীয় আদর্শে সকলকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই শিক্ষয়িত্রী-দ্বয়ও আপনাদিগের জীবনে যতদূর সম্ভব সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সমাজ-বিপ্লব ভারতের দেশীয় শিল্পকর্ম্মাদির প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া তথাকার স্ত্রীলোকগণের জীবন বড়ই অল্প পরিসর করিয়া তুলিয়াছে। এখন ভারতের সকল স্ত্রীলোকই রন্ধনকার্য্যে সুদক্ষা—কিন্তু তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় সীবন ও বয়নাদি কার্য্যে অভ্যস্তা নহেন। তাঁহাদের অবসর কালের কর্ম্মের অভাব। সিষ্টার খৃষ্টীন এই জন্য সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে নানারূপ সূচী-শিল্প শিখাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। এইরূপে তিলে তিলে এই বিদ্যালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের অল্প সঙ্গতি নিবন্ধন এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে না পারিলেও ইহার ছোট ছোট ঘরগুলি ও উঠানে এইরূপে যে শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃতি ও প্রভাব শুধু এই প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহার ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল। খৃষ্টীন তাঁহার মধুর স্বভাবগুণেই অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর হইতে ইনি একাকীই এখন এই কার্য্য করিয়া আসিতে-ছেন। এক্ষণে এই বিদ্যালয়বাটী শুধু পাঠাগার বলিয়া নহে অপিচ সৌহৃদ্য ও সকল প্রকার সাহায্যের কেন্দ্ররূপে সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ বাগবাজার পল্লীর সকলের নিকট পরিচিত।

ভারতবাসীর সহিত সম্পূর্ণ মিলনের সূত্রে কার্য্য করিতে পারিলেই পাশ্চাত্য মহিলাগণের পক্ষে এদেশের যথার্থ উপকারে আসা সম্ভব, নচেৎ নহে—খৃষ্টীনের ইহাই বিশ্বাস এবং শুধু বিশ্বাস নহে এইরূপ আত্মত্যাগই তাঁহার সাধন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পাণিহাটির মহোৎসবে।

(স্বামী সারদানন্দ)

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট নিবারণের জন্য কিরূপে নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকিবে না'-রূপ বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার পর হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় দারুণ অভাব সংসারে আর কখনই হয় নাই। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরে কলিকাতার চাঁপাতলা নামক পল্লীতে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের অনুগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি মাস কাল তিনি ঐ স্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সাংসারিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতা-চরণে নরেন্দ্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সময় বুঝিয়া তাহারা পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থান-গুলি ছলে বলে কৌশলে দখল করিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে এখন কিছুকালের জন্য ঐ বাটী ত্যাগপূর্ব্বক রামতনু বসুর লেনস্থ তাঁহার মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়ন-

পূর্ব্বক সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃ-বন্ধু, এটর্ণি নিমাই চরণ বসু মহাশয় তাঁহাকে ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার তদ্বিরে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ওকালতি (বি, এল্) পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শিক্ষকতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের অন্য একটি গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল—ঠাকুর এখন রোহিনি (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেন্দ্র, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বরফ খাইয়া তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া যাইতে লাগিল এবং সরবৎ পানীয়াদির সহিত উহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক মাস ঐরূপ করিবার পরে তাঁহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হইল। বোধ হয় চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে তিনি ঐরূপ বেদনা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন।

মাসাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন আকার ধারণ করিল—অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার কণ্ঠ-তালুদেশ ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে সামান্য প্রলেপের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কয়েক দিবস ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া গেল না দেখিয়া জনৈক ভক্ত বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারের ঐরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগনির্ণয় করিয়া গলার ভিতরে এবং

বাহিরে লাগাইবার জন্য ঔষধ ও মালিসের বন্দোবস্ত করিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলে ও বারম্বার সমাধিস্থ না হয়েন তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আগতপ্রায় হইল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্বলন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পরমা সুন্দরী স্ত্রী ও অতুল বৈভব ত্যাগ পূর্ব্বক পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়-মানসে যখন প্রথম শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি তাহাকে মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার প্রবল বাসনা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া ইতর-সাধারণের ন্যায় বিষয়কার্য্যের পরিচালনা প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও পিতৃব্যকে সাহায্য করিতে থাকেন। ঐরূপে অবস্থান করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কখন কখন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস তাঁহাদিগের পূতসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন। ঐরূপে দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অন্বেষণ করিয়া রঘুনাথ সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে বাস করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামকে প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা বহু ব্যক্তিকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ঐরূপে এক সময়ে পাণিহাটি গ্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিঁড়া, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলী সহ তাঁহাকে ভোজন করাইতে আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহা সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেই দিন ভাগীরথী তীরে ভোজনদানে পরিতৃপ্ত করেন। উৎসবান্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কাল পূর্ণ হইয়াছে, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন করিলে তিনি তোমাকে এখন আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং ধর্ম্ম-জীবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য সনাতন গোস্বামীর হস্তে তোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন।' নিত্যানন্দ প্রভুপাদের ঐরূপ আদেশে রঘুনাথের উল্লাসের অবধি রহিল না এবং বাটীতে ফিরিবার অনতিকাল পরে তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ চলিয়া যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণ রাখিয়া তদবধি প্রতি বৎসর ঐ দিবস পাণিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া তাঁহার ন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে ঐরূপ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির চিঁড়ার মহোৎসব নামে ভক্তসমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল,' কখন ঐরূপ দেখিস নাই,

চল দেখিয়া আসিবি।” রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদিগের মধ্যে এক-দল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদিগের সন্তোষের জন্য তিনি বলিলেন, “এখান হইতে সকাল সকাল দুইটি খাইয়া যাইব এবং দুই এক ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সামলাইয়া চলিলেই হইবে।” তাঁহার ঐরূপ কথায় সকল ওজর আপত্তি ভাসিয়া গেল এবং ভক্তগণ তাঁহার পাণিহাটি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী—আজ পাণিহাটির মহোৎসব। প্রায় পাচঁশ জন ভক্ত দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয় ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি পৃথক্ নৌকা ভাড়া হইয়া ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েক জন স্ত্রীভক্ত অতি প্রত্যূষে আসিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিতা হইয়া তাঁহারা ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ঠাকুরের ভোজনান্তে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জনৈকা স্ত্রীভক্তের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি (মা) যাইবেন কি না। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, ‘তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর (মার) ইচ্ছা হয় ত চলুক্।’ শ্রীশ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, “অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।” শ্রীশ্রীমা যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং দুই তিন জন স্ত্রীভক্ত, যাঁহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর আন্দাজ পাণিহাটিতে পৌঁছিয়া দেখা গেল, গঙ্গাতীরে প্রাচীন অশ্বত্থগাছের চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক সমাগত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থানে স্থানে সংকীর্ত্তনে আনন্দলাভের চেষ্টা করিতেছেন। ঐরূপ করিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবৎ নামগানে যথার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্ব্বত্র একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল। নৌকায় যাইবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরীশ চন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তসকলে ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি কোনও কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি না করেন; কারণ, কীর্ত্তনে মাতিলে তাঁহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্য্য হইবে এবং উহাতে গলদেশের বেদনা বৃদ্ধি পাইবে।

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণি বাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর বৈঠকখানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, সোফা, কার্পেটাদি দ্বারা ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত। এখানে দশ পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইঁহাদিগের ঠাকুরবাটিতে ৺রাধাকান্তজীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

বৈঠকখানা গৃহের পার্শ্বেই ঠাকুরবাটী। পার্শ্বের দরজা দিয়া আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ-মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলাম। মূর্ত্তি দুইটি সুন্দর। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। নাট-মন্দিরের মধ্যভাগ হইতে পাঁচ সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চকমিলান প্রশস্ত উঠান ও সদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিদ্যমান যে ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ মাত্র বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। ঠাকুর যখন প্রণাম করিতেছিলেন তখন এক দল কীর্ত্তন উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্ব্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলা-

স্থলে যত কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিতেছে তাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে এখানে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরে গঙ্গাতীরে আনন্দ করিতে যাইতেছে। শিখা-সূত্রধারী, তিলক-চক্রাঙ্কিত দীর্ঘ স্থূলবপুঃ গৌরবর্ণ প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জপিতে জপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদস্ত রেলির উনপঞ্চাশের থান ধুতি, সুন্দরভাবে গুছাইয়া পরা, এবং ট্যাঁকে একগোছা পয়সা—দেখিলেই মনে হয়, কোন গোস্বামী-পুঙ্গব মেলার সুযোগে দুই পয়সা আদায়ের জন্য সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার জন্য এবং বোধ হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিজ মহত্ত্বে মুগ্ধ করিতে তিনি আসিয়াই কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি নরেন্দ্রপ্রমুখ পার্শ্বস্থ ভক্তগণকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঢং ত্যাখ!" তাঁহার ঐরূপ পরিহাসে সকলের মুখে হাস্যের রেখা দেখা দিল এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্ব্বে চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক লম্ফে কীর্ত্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যস্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তিনি কখন অর্দ্ধ বাহ্যদশা লাভপূর্ব্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল

তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রৌদ্র-মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত তাহার আংশিক ছায়াপাতও ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্ম্মিত নহে—বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইয়াছে—এখনিই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না, কীর্ত্তন সম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক শতগুণ উৎসাহ-আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির হইল, এখান হইতে কিঞ্চিদধিক এক মাইল দূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া তিনি যে যুগল-বিগ্রহ ও শালগ্রাম-শিলার নিত্য সেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্ব্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মণিসেনের ঠাকুরবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তন সম্প্রদায় কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নাম গান করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল, তিনিও দুই চারি পদ চলিয়া

পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি সেরূপ আর কখন নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেব-দেহের সেই অপূর্ব্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের অতদূর পরিবর্ত্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল! উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা-পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।

মণিবাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে আসিবা-মাত্র কীর্ত্তনসম্প্রদায় তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল শ্রী, মনোহর নৃত্য, ও পুনঃ পুনঃ গম্ভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গান ধরিল—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কে রে
জয় রাধে বলে কে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক বারম্বার ‘এই আমাদের প্রেমদাতা’ বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং যাহারা আসিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা মোহিত হইয়া মহোল্লাসে কীর্ত্তনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবোদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্য কয়েকটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের সহিত যোগদান করিল। ঐরূপে এক বিরাট জনসংঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের কুটীর দিকে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইবার কিছু পূর্ব্বে, একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈক স্ত্রীভক্তের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে প্রেমে গদগদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে প্রদান করিল। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাবাজী স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভঙ্গ হইল এবং মুখে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য থু থু করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক মুখ ধৌত করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তি ও বিদ্রূপের সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে দূরে পলায়ন করিল। ঠাকুর তখন অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

ঐরূপে এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে পৌঁছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অৰ্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসংঘ ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে নৌকায় লইয়া আসিল। কিন্তু এখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোন্নগরনিবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসব স্থলে ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিল। এখন নৌকা মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং কৃপা করুন বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপূৰ্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে স্তব স্তুতিপূৰ্ব্বক বারম্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল। ঐরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য ইতিপূৰ্ব্বে অনেক বার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এত দিন তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে নাই, অদ্য তল্লাভে কৃতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্ব্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের ন্যায় সাধন ভজন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ত্তনকালে বৃদ্ধ নবচৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। ঐরূপে নবচৈতন্য ঠাকুরের কৃপায় পরজীবনে বহুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিল।

নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদূর আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে নৌকারোহণ করিতেছে এমন সময়ে একব্যক্তির মনে হইল জুতা ভুলিয়া আসিয়াছে এবং উহা আনিবার জন্য সে পুনরায় ঠাকুরের গৃহাভিমুখে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে ঐকথা নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে মনে হইল, নতুবা আজিকার সমস্ত আনন্দটা ঐ ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত!" যুবক ঐ কথায় হাসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন দেখিলি বল দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে—না?" সে ঐ কথায় সায় দিলে তিনি নিজ ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ের উল্লেখ-পূর্ব্বক ছোট নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কেলে ছোঁড়াটা অল্পদিন হইল এখানে আসা যাওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না—এক ঘণ্টার উপর বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না! সে বলে তাহার মন আজ কাল নিরাকারে লীন হইয়া যায়। ছোট নরেন বেশ ছেলে—না? তুই একদিন তাহার বাটীতে যাইয়া আলাপ করিয়া আসিবি—কেমন?" যুবক তাঁহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, 'কিন্তু মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।' ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া ত ভারি একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াটা হীন বুদ্ধির কাজ, ভগবানের পাঁচ ফুলে সাজি—নানা প্রকারের ভক্ত, তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা

বিষম হীনবুদ্ধির কাজ, তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি -কেমন যাইবি ত ?” সে অগত্যা সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি কয়েক দিন পরে ঠাকুরের কথা মত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্যার সমাধান লাভপূর্ব্বক ধন্য হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাতায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল।

স্ত্রী-ভক্তেরা সেই রাত্রি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান করিলেন এবং স্নানযাত্রার দিবসে ৺দেবী প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালী-বাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া ঐ পর্ব্ব দর্শনান্তে কলিকাতায় ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, “অত ভিড়—তাহার উপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল—ও (শ্রীশ্রীমা) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত ‘হংস, হংসী এসেছে!’ ও খুব বুদ্ধিমতী।” শ্রীশ্রীমার অসামান্য বুদ্ধির দৃষ্টান্তস্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “মাড়োয়ারী ভক্ত* যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত্ বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, ‘মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি! সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, ‘ওগো এই টাকা দিতে চাহিছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিছে, তুমি উহা লও না কেন—কি বল?’ শুনিয়াই ও বলিল, ‘তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না, আমি লইলে ও টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না; সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে

* ইহার নাম লছমী নারায়ণ ছিল।

তোমার ত্যাগের জন্য—অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।'—ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ্ ফেলিয়া বাঁচি!"

ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর নিকটে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহা শুনাইলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "প্রাতে উনি (ঠাকুর) আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম উনি মন খুলিয়া ঐ বিষয়ে অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—হাঁ যাবে বৈ কি। ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক' তখন স্থির করিলাম যাইবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া সে রাত্রে ঠাকুরের নিদ্রা হইল না। উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চরিত্রের লোক তাঁহার দেব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইত, অপবিত্র অশুদ্ধমনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যপ্রকার সকামভাবে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ-পূর্ব্বক পদধূলী গ্রহণ করিলে ঐরূপ দাহে তিনি অনেক সময়ে প্রপীড়িত হইতেন। পাণিহাটি উৎসবের এক দিন পরে স্নানযাত্রার পর্ব্ব উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আমরা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে পারি নাই। স্ত্রী ভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াছি ঐ দিবস অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে অ—র মা নাম্নী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া তাঁহার আনন্দের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহেন নাই এবং অন্যদিবসের ন্যায় খাইতেও পারেন নাই। পরে, ভোজনান্তে আমাদের পরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "এখানে লোক

আসে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া—এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি? মাগি কামনা করিয়া'আঁব সন্দেশাদি আনিয়াছে—উহার একটুও মুখে তুলিতে পারিলাম না। আজ স্নান-যাত্রার দিন, অন্য বৎসর এই দিনে কত ভাবসমাধি হইত, দুই তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিত, আজ কিছুই হইল না—নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া উচ্চভাব আসিতে পারিল না!" অ—র মা সেই রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল না। রাত্রিতে আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, এখানে স্ত্রীলোকদিগের এত ভিড় ভাল নয়, মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু এখানে রহিয়াছে—কি মনে করিবে বল দেখি? দুই একজন মধ্যে মধ্যে আসিলে, এক আধ দিন থাকিয়া চলিয়া যাইলে,—তাহা নহে একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে! স্ত্রীলোক-দিগের অত হাওয়া আমি সহিতে পারি না।" ঠাকুরের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষণ্ণা হইয়াছিলেন এবং রজনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। স্নানযাত্রা উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহে পূজা এবং যাত্রাদি হইয়াছিল, তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সে দিন কিছু-মাত্র আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। নিরন্তর উচ্চ ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে কতদূর লক্ষ্য ছিল এবং ভক্তদিগের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদিগকে কিরূপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিষ্টার নিবেদিতা) সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য।

স্বামিজীর চক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যার পর নাই মূল্যবান্ ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার নিজের পক্ষেও বিবাহ বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। ঐ বিষয়ক প্রবৃত্তির স্মৃতি পর্য্যন্ত যাহাতে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল, এবং তিনি কায়মনোবাক্যে আপনাকে এবং নিজ শিষ্যবর্গকে উহার লেশমাত্র আশঙ্কা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিকট অবিবাহিত থাকাটাই একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা লাভের জন্যই সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন না, কিন্তু তৎসঙ্গে পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়েও সদা আকুল থাকিতেন। এই ভয় তাঁহার নিজের আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে যতই সহায়ক বা আবশ্যক হইয়া থাকুক না কেন, উহা অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় নাই।

কিন্তু ইহা যেন সকলে বুঝেন যে, তিনি স্ত্রীলোক হইতে ভয় পাইতেন না, তিনি ভয় করিতেন প্রলোভনকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাকে স্ত্রীলোকদিগের সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার শিষ্য, কার্য্যের সহায়ক, এমন কি, বন্ধু ও খেলার সাথীও ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের এই সকল বন্ধুদিগের সহিত ব্যবহারে তিনি প্রায় সকল সময়েই ভারতের পল্লীগ্রামসমূহের প্রথা অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কোন একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লইতেন। কোন স্থানের মেয়েরা তাঁহার ভগিনী হইল,

কোথাও বা মাতা, কোথাও বা কন্যা, এইরূপ সর্ব্বত্র। ইঁহাদিগের মহত্ত্ব এবং মিথ্যা বা তুচ্ছ ভাবরাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কখনও কখনও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন; কারণ তাঁহার মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠজনোচিত বিশেষত্বটী খুব বেশী পরিমাণে ছিল। তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে মহত্ত্ব ও চরিত্রবলেরই অন্বেষণ করিতেন। যেমন তিনি আমেরিকায় দেখিয়াছিলেন, মেয়েরা নৌকা চালাইতেছে, সাঁতার দিতেছে, এবং নানাপ্রকার খেলা করিতেছে, অথচ "তাহাদের একবারও মনে পড়িতেছে না যে তাহারা বেটাছেলে নহে" (এগুলি তাঁহার নিজ মুখের কথা)—এ সকলে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। ঐরূপে তাহারা যে পবিত্রতার আদর্শের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইয়াছিল, তিনি সেই আদর্শটীকে পূজা করিতেন।

সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষায় তিনি সর্ব্বদা বিশেষ করিয়া বলিতেন যে, সন্ন্যাসী নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই ভাবিবেন না, কারণ তিনি ঐ দুয়ের পারে গিয়াছেন। যাহা কিছু—এমন কি শিষ্টাচারও—লিঙ্গ-ভেদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়াইয়া দেয়, তাহাই তাঁহার নিকট অতি ঘৃণার্হ বলিয়া মনে হইত। পাশ্চাত্যে যাহা chivalry (মেয়েদের প্রতি একটু বেশী সৌজন্য প্রকাশ) নামে অভিহিত, তাহা তাঁহার নিকট স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করা বলিয়া মনে হইত। কোন কোন লেখক যে বলিয়া থাকেন, মেয়েদের জ্ঞান মোটামুটী রকমের হইলেই হইল, তাহাদিগকে সকল জিনিস ঠিক যেমনটী তেমনি করিয়া জানিতে হইবে না, এবং পুরুষদের জ্ঞানে সহানুভূতির যেন ছড়াছড়ি না থাকে, তাঁহাদের এই মত স্বামিজীর নিকট অতি নীচ এবং উপেক্ষার বস্তু বলিয়া গণ্য হইত। মানবের অন্তরাত্মা চায় স্বাধীনতা, আমাদের দৈহিক গঠন তাহার উপর যে সকল বন্ধন জোর করিয়া আনিয়া দিয়াছে, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই উচিত উহাদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করা।

নির্জ্জন বাস, সংযম এবং গভীর চিত্তৈকাগ্রতা, এই সকলের

সমবায়ে গঠিত ছাত্রজীবনের আদর্শই ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য শিরায় শিরায় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রবাহিত থাকা চাই!" ছাত্রজীবনের আনুষঙ্গিক যে পাঠ্যবিষয়ের উপর মনঃসংযোগ তাহা তাঁহার চক্ষে, সান্তকে অনন্তের মধ্যে মিলাইয়া দিবার অন্যতম পন্থা মাত্র; এই অনন্তের মধ্যে সান্তকে লয় করাকে তিনি সকল মহৎ জীবনের এরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন যে, উহার জন্য তিনি রোবস্পীয়ারকে পর্য্যন্ত তাঁহার গোঁড়ামি দ্বারা বিভীষিকার রাজত্বের (The Terror) সৃষ্টি করা সত্ত্বেও প্রশংসা করিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন। যে কোন কার্য্যে হৃদয়, মন বা শরীরের উচ্চতম শক্তি বিকাশের প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে সরস্বতী পূজা একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন; অবশ্য, সরস্বতীপূজা বলিতে তিনি ভাবরাজ্যে ঠিক ঠিক 'আপনাতে আপনি থাকা' এবং পূর্ণ সংযমকেই লক্ষ্য করিতেন। এরূপ পূজা কুস্তীগীরদিগের উপযুক্ত শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং এই ব্যাপারটীর অর্থই এই যে, যদি কেহ মধ্যে মধ্যে সেই সমাধিলভ্য অন্তর্দৃষ্টির শিখরদেশে আরোহণ করিতে চান, যাহাকে অপরে দিব্য-জ্ঞান, ঐশীপ্রেরণা বা অনন্যসাধারণ দক্ষতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ধর্ম্মের ন্যায়, সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির জন্যও ঐরূপ দিব্যজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। যে লোক এরূপ না করিয়া স্বার্থপর বা নীচ উপায়ে আপনার শক্তি ক্ষয় করিতেছে, সে কখনও রাফেলের ন্যায় অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী আবিষ্কার করিতে পারে না। ধর্ম্মাদর্শের ন্যায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আদর্শ সিদ্ধির জন্যও সন্ন্যাসি-সুলভ নিষ্ঠাভক্তির একান্ত প্রয়োজন। কৌমারব্রত গ্রহণের অর্থই দশের হিতের জন্য নিজের হিত বিসর্জ্জন দেওয়া। এইরূপে স্বামিজী দেখিয়াছিলেন যে, প্রকৃত

মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে সংযম চাই; দেখিয়াছিলেন যে, যে কোন পথ দিয়াই হউক, প্রকৃত মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে আত্মাকে দেহের প্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করিতেই হইবে।; আরও দেখিয়াছিলেন যে, একজন বড় সাধুর ভিতর বড় কর্ম্মী বা রাজ্যের গুণশালী প্রজা হইবারও সামর্থ্য রহিয়াছে। ইহার বিপরীত পক্ষটীর সম্বন্ধে অর্থাৎ উন্নতচরিত্রা পত্নী বা রাজ্যের গুণান্বিত প্রজা কেবল সেইখানেই জন্মান সম্ভবপর, যেখানে ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসীসকল জন্মিতে পারিত—এবিষয়ে তাঁহার ঐরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল কি না বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি নিজে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসকামীদিগের গুরু ছিলেন বলিয়া, একটু আধটু আভাস ছাড়া এই মহাসত্যটীকে ধরিতেই পারেন নাই, অবশেষে মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি ঐবিষয়ের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "একথা সত্য যে, এমন সব স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহাদের দর্শনমাত্র মানব অনুভব করে যে, কে যেন তাহাকে ঈশ্বরাভিমুখে ঠেলিয়া দিতেছে, কিন্তু আবার এমনও স্ত্রীলোক আছে যাহারা তাহাকে নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।"

তাঁহার নিকটে থাকিলে, যে ভালবাসায় প্রেমাস্পদের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার ইচ্ছাধীন রাখিতে চায়, অথবা নিজের সুখ বা কল্যাণের সাধনমাত্র করিয়া ফেলিতে চায়, সে ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা অসম্ভব ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে, প্রেমকে প্রেমপদবাচ্য হইতে হইলে চিরন্তন কল্যাণের প্রস্রবণস্বরূপ হইতে হইবে। উহা আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দেয়, উহা অহেতুক, এবং প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষারহিত। তিনি যে সর্ব্বদা "অনাসক্তভাবে ভালবাসার" কথা বলিতেন, তাহার অর্থই এই। একবার কোন স্থান দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আমাদের কয়েকজনকে বলিয়াও ছিলেন যে, তিনি এইবার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোন কিছু হইতে মন উঠাইয়া লইবার শক্তিও

যেমন প্রয়োজনীয়, কোন কিছুতে মন লাগাইবার শক্তিও ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়। উভয়ই তৎক্ষণাৎ, পূর্ণমাত্রায়, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্পন্ন হওয়া চাই। আর এতদুভয়ের প্রত্যেকটী অপরটীর পূর্ণতা সম্পাদন করে। তিনি ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন, "প্রেম সর্ব্বদা আনন্দেরই বিকাশ মাত্র; যখনি উহার উপর দুঃখের এতটুকু ছায়া আসিয়া পড়ে, তখনি জানিতে হইবে, উহা দেহসুখ ও স্বার্থপরতা-দুষ্ট হইয়াছে।"

যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য ও হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলায় মানবকে মুখ্যভাবে শরীর বলিয়া মনে করে—যাহা আমরা দখল করিয়া রাখিতে পারি—এবং মাত্র গৌণভাবে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি, মন ও আত্মা বলিয়া মনে করে, সে সাহিত্য ও ললিতকলাকে তিনি ভ্রমেও কখনও প্রশংসা করিতেন না। আমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বাদের (Idealism) সবটা না হইলেও, অনেকটাই তাঁহার নিকট এই ভাব দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত বলিয়া বোধ হইত, এবং উহাকে তিনি "ফুলের আচ্ছাদনে প্রাণহীন শবদেহ লুকাইয়া রাখা" বলিতেন।

প্রাচ্যদিগের ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে, আদর্শ পত্নী হইতে হইলে একমাত্র স্বামীর প্রতি জ্বলন্ত, হ্রাসবৃদ্ধিহীন নিষ্ঠা থাকা চাই। পাশ্চাত্য প্রথাসকলকে তিনি সম্ভবতঃ বহুপতিক (Polyandrous) পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকিবেন, কারণ এতদ্ব্যতীত আমি তাঁহার এই উক্তির কোনই হেতু খুঁজিয়া পাই না যে, তিনি বহুপতিক জাতিসমূহের ভিতরও স্বদেশের ন্যায় মহানুভাবা এবং পূতচরিত্রা রমণী সকল দেখিয়াছেন। তিনি মালবারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিব্বতে নহে; এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে, মালবারে তথা-কথিত বহুপতিক প্রথা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীপ্রাধান্যযুক্ত বিবাহ মাত্র। স্বামী পত্নীর পিত্রালয়ে যাইয়াই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, এবং বিবাহও যে ভারতের অন্য সকল স্থানের ন্যায় আজীবন স্থায়ী হইবেই, তাহার কোন মানে নাই; কিন্তু দুইজন পুরুষ একই

সময়ে সমপদস্থরূপে পরিগৃহীত হয় না। যাহাই হউক না কেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, "দেশাচার কিছুই নহে",—আচার ব্যবহার কোনকালে মানবের বিকাশকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না। তিনি জানিতেন যে, যে কোন দেশে, যে কোন জাতির মধ্যে আদর্শটী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া পূর্ণভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে।

তিনি কখনও কোন সামাজিক আদর্শকে আক্রমণ করিতেন না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড প্রত্যাগমনকালে, তথায় নামিবার দুই এক দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে আমি যেন ইউরোপের সামাজিক আদর্শগুলিকে পুনরায় গ্রহণ করি—যেন আমি উহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করি নাই, এমন ভাবে। ইউরোপ বা আমেরিকায় বিবাহিতা রমণীগণ তাঁহার নিকট অবিবাহিতা রমণীগণ অপেক্ষা কম সম্মান পাইতেন না। ঐ সমুদ্রযাত্রাকালে, জাহাজে, কতকগুলি পাদ্রি কয়েকগাছি রৌপ্যনির্ম্মিত বিবাহ-বলয় সকলকে দেখাইতেছিল; ঐগুলি দুর্ভিক্ষের দারুণ সঙ্কটকালে তাহারা তামিল রমণীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। কথায় কথায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কুসংস্কারবশতঃ অঙ্গুলি বা মণিবন্ধ হইতে বিবাহ-অঙ্গুরী বা বিবাহ-বলয় খুলিয়া দিতে আপত্তি করিয়া থাকে, এই কথা উঠিল। শুনিয়াই স্বামিজী সবিস্ময়ে খেদপূর্ণ অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা উহাকে কুসংস্কার বলিতেছ? উহার পশ্চাতে যে মহান্ সতীত্বের আদর্শ রহিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?"*

কিন্তু বিবাহ দ্বারা আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের

* সতীত্ব বলিতে হিন্দুগণ ইহাই বুঝেন যে, পত্নীর স্বামীতে শুধু নিষ্ঠা থাকিবে তাহাই নহে, সে নিষ্ঠার কখনও এতটুকু ইতর বিশেষ হইবে না। এই আদর্শ আমার ভাল লাগিতেছে না বলিয়া ঐ নিষ্ঠাকে এতটুকু এদিক ওদিক করিবার যো নাই।

কতকটা সহায়তা হয়, তাহা দেখিয়াই তিনি উক্ত সংস্কারটীর গুণাগুণ বিচার করিতেন। এখানে স্বাধীনতা শব্দটী প্রাচ্যদেশীয় অর্থে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উহাতে কোন কিছু করিবার অধিকার বুঝাইতেছে না, কোন কিছু করিবার ইচ্ছাটাকে দমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকার অধিকারই বুঝাইতেছে—যে নৈষ্কর্ম্ম্য সকল কর্ম্মের পারের অবস্থা তাহাই উহার লক্ষ্য। তিনি একদিন তর্কস্থলে স্বীকার করিয়াছিলেন, "বিবাহের পারে যাইবার জন্য বিবাহ করা—ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।" তাঁহার গুরুদেবের, তাঁহার ভ্রাতা স্বামী যোগানন্দের এবং তাঁহার শিষ্য স্বরূপানন্দের যে প্রকার বিবাহ হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার বিবেচনায় আদর্শ বিবাহ। এইরূপ বিবাহ অন্য দেশে হইলে নামমাত্র বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "দেখিতেছ, এই বিষয়ে ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের কি পার্থক্য রহিয়াছে? পাশ্চাত্যে বিবাহ বলিতে আইনের বন্ধনের পরের যাহা কিছু শুধু তাহাই বুঝায়, কিন্তু ভারতে লোকে বিবাহ বলিতে ইহাই বুঝিয়া থাকে যে, সমাজ দুইটী প্রাণীকে অনন্তকালের জন্য একটী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিল। ঐ দুইটী প্রাণীকে তাহাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জন্মে জন্মে পরস্পরকে বিবাহ করিতেই হইবে। উভয়ের প্রত্যেকেই অপরের কৃত শুভাশুভের অর্দ্ধাংশের ভাগী হয়। আর যদি এক জন এ জীবনে অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অপরকে, যত দিন না সে পুনরায় তাহার নাগাল ধরিতে পারে, ততদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।"

শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহকে মাত্র কয়েক জনের সেবা এবং সন্ন্যাসকে জগতের সেবা বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন। এরূপ স্থলে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকারের বিবাহের কথাই বলিতেন বলিয়া বোধ হয়। স্বামিজীর নিজের মনেও যে, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের মূল ধারণা ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি লোককে এমন ভাবে ঐ ব্রত

গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেন, যেন তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্কর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে আচার্য্যের পশ্চাতে যেন "একদল সৈন্য" বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং যে আচার্য্যের শিষ্যগণ সকলেই গৃহস্থ ও সংসারী, তাঁহার সৈন্য নাই, এই কথা বলিতেন। যে পক্ষে এই সহায় বর্ত্তমান, আর যাহাদের মধ্যে ইহার অভাব, এই দুইয়ের মধ্যে বল সম্বন্ধে তুলনাই হয় না, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল।

তথাপি বিবাহ যে অনেকের পক্ষে একটী পথ, একথা তিনি যে মোটে বুঝিতেন না, তাহা নহে। তিনি এক বৃদ্ধ দম্পতির যে গল্প বলিয়াছিলেন তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। পঞ্চাশ বৎসর একত্র বাসের পর তাহারা দরিদ্র-নিবাসের (Work house) দরজায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথম দিনের অবসানে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "কি! মেরী নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার আমি তাঁহাকে দেখিতে ও চুম্বন করিতে পাইব না? আমি যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে ঐরূপ করিয়া আসিয়াছি।" তাহার ঐ মহৎ কার্য্যের কথা ভাবিয়া স্বামিজী অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "একবার ভাবিয়া দেখ! একবার ভাবিয়া দেখ! এরূপ সংযম ও নিষ্ঠার নামই মুক্তি! ঐ দুইটী প্রাণীর পক্ষে বিবাহই প্রশস্ত পথ হইয়াছিল!"

তিনি বরাবর সমান দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। একবার একটী বালিকা, যাহার ধর্ম্মজীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগ দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার বাটীর লোকদিগের বিবাহ-প্রস্তাবসমূহের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনিও তাহার পিতাকে এ বিষয়ে রাজী করিয়া, এবং ঐরূপ করিলে তিনি কনিষ্ঠ কন্যাদিগের জন্য অধিক যৌতুকের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এইরূপ বুঝাইয়া বালিকাকে এবিষয়ে সাহায্য

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যে জীবন অবলম্বন করিয়াছিল, তৎপ্রতি তাহার এখনও তেমনি নিষ্ঠা রহিয়াছে,—প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা ঐ জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীরাও এক্ষণে সকলে বিবাহিতা। এরূপ উচ্চভাবসম্পন্ন স্ত্রীলোকের জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া তাঁহার চক্ষে মহা গর্হিত আচরণ বলিয়া বোধ হইত। তিনি গর্ব্বসহকারে, হিন্দুসমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগেরই স্থানীয়, তাঁহাদিগকে এইরূপে গণনা করিতেন—যাঁহারা বালবিধবা, যাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী, যাঁহাদের বিবাহকালে পিতা মাতা কোনরূপ যৌতুক দিতে পারেন নাই, এমন দুই চারি জন, ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন যে, বিধবাগণের সতীত্বরূপ স্তম্ভের উপরই সামাজিক অনুষ্ঠানসকল দণ্ডায়মান। কেবল তিনি ইহাই ঘোষণা করিতে চাহিতেন যে, এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পুরুষদিগের জন্যও ঠিক সমান উচ্চাদর্শ থাকা উচিত। প্রাচীন আর্য্যদিগের এইরূপ প্রথা চলিবে, বিবাহকালে একটী অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্র ঐ অগ্নির পূজা করিতেন। এই অনুষ্ঠানটী হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও দায়িত্ব সমান। মহর্ষি বাল্মীকির মহাকাব্যে সীতারও যেমন রামের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, রামেরও সীতার প্রতি তেমনি নিষ্ঠা বর্ণিত আছে।

বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী)

(কর্ম্মকাণ্ড)

ব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতাই, বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ। তবে কেবল মায়াবিলসিত জগতের জন্যই উপদিষ্ট হওয়ায়, সমাজের কল্যাণার্থে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ—"শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই; অগ্নিষ্টোম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই করিবেন; ক্ষত্রিয়ই রাজসূয়ের অধিকারী" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বর্ণ-ভেদে অধিকারী স্থির করায় সেই সেই স্থিরীকৃত বর্ণ ব্যতীত অন্যের অধিকার না থাকিলেও, যখন গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন অবশ্য বর্ণোচিত গুণলাভ করিতে পারিলেও অধিকার আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টংগুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" অর্থাৎ আমি যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তখনকার ব্যক্তি-গত গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে—চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দৃষ্টে নহে; যেহেতু, তখন অর্থাৎ "আদিতে বর্ণও একমাত্র ছিল।" (ভাগবত, ৯ম স্কঃ, ১৪শ অঃ) গৌতম সংহিতাতেও দেখা যায়—"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ"॥ অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্। উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥ ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ জিতাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র; যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাস রত ও দান্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন; হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে—গুণই কল্যাণকারক, চণ্ডালও সচ্চরিত্র

হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। আবার মহাভারতে বনপর্ব্বের চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে আছে—"পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াষক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়; আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। সুতরাং গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে—বর্ণানুসারে নহে। পূর্ব্বে সেই জন্যই উচ্চবর্ণস্থ হীনগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা নীচ বর্ণে নিক্ষিপ্ত, এবং নীচবর্ণস্থ সদ্‌গুণশালী পুরুষেরা উচ্চবর্ণে উন্নীত হইত। শূদ্র কুলোৎপন্ন বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, ব্যাস; ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র, বিশ্বামিত্র ঋষ্যাদি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব এবং অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ. কর্ণাদি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা শূদ্র-মধ্যে পরিগণিত হইত—"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" অতএব বর্ণভেদ সত্ত্বেও যখন গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন আর বর্ণভেদকে গুণভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলে শাস্ত্র, যুক্তি—এমন কি, প্রত্যক্ষেরও অপলাপ করা হয়। বর্ণভেদ সত্ত্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার হয় দেখিয়াই, মহাভারতের বনপর্ব্বে একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন—

"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে; যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশীয় হইলে যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে উহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" বাস্তবিক বর্ণভেদ দ্বারা কোন মতেই গুণকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা করা যায় না বলিয়াই, অর্থাৎ

একবর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া, মনু মহাশয় বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়; ক্ষত্রিয় শূদ্র, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়; বৈশ্য শূদ্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়।—"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াতজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥" কারণ, বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ-ব্যভিচার না হওয়া। কিন্তু যখন বর্ণভেদ সত্ত্বেও তাহার অসদ্ভাব নাই, তখন গুণানুসারে অধিকার দেওয়া না হইলে বর্ণভেদের কোন অর্থই থাকে না। তবে বর্ণভেদই উক্ত ব্যভিচার দোষ নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া, গুণলাভ সত্ত্বেও গুণোচিত বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার দিলে ঐ একই দোষ রহিয়া যায় দেখিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ কেবল বর্ণভেদেই অধিকারী স্থির করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দারা এরূপ বলা হয় নাই যে, গুণানুসারে বর্ণাধিকার নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে "সত্যকামের আত্মবিদ্যা" হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণানুসারে বর্ণাধিকার নিষেধ করেন নাই; কেবল বর্ণানুসারে কর্ম্মাধিকারই নিষেধ করিয়াছেন। যথা—"জবালা-তনয় সত্যকাম বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরুগৃহে বাসেচ্ছায় জননীকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে জবালা বলেন, আমি যৌবনাবস্থায় অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি; সে কারণ আমি তোমার গোত্র জানিনা। তবে এইমাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম। অনন্তর সত্যকাম হরিদ্রুমানের তনয় গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করায়, গৌতম গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। অজ্ঞাতগোত্র সত্যকাম জননীপ্রমুখাৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন অকপটে তাহাই বলায়, গৌতম প্রীত হইয়া বলেন—বৎস, তুমি যখন সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব—তুমি সমিধ আহরণ কর। এই বলিয়া গৌতম ঋষি সত্যকামকে উপনীত করিয়া তদনন্তর অধিকার প্রদান করেন।" অর্থাৎ দ্বিজবর্ণত্রয়

কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে ;—"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥" সুতরাং দাসীপুত্র সত্যকামও শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকায় গুণোচিত বর্ণে অধিকার থাকিলেও, উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত করতঃ সেই বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার নাই দেখিয়া গৌতম ঋষি উপনীত করিয়াছিলেন। অনেকে শ্রুতির "নৈতদব্রাহ্মণো"—অব্রাহ্মণ কখনই এরূপ সত্য কথা বলিতে পারে না—এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুই দুই দোষ হয়। অর্থাৎ শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিলে শ্রুতহানি দোষ এবং যে অর্থ শব্দের শক্তিতে লভ্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুতকল্পনা দোষ হয়। বাস্তবিক সত্যকামের যখন গোত্রসম্বন্ধে কিছুই শুনা যায় না, কেবল সদ্‌গুণের পরিচয়েই উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আর শ্রুতবিষয় অর্থাৎ সদ্‌গুণ ছাড়িয়া অশ্রুতবিষয় অর্থাৎ গোত্র কল্পনা করা উচিত হয় না। আর গৌতম ঋষিও যখন সত্যকামকে "কিং গোত্রোন্নু সোম্যাসীতি"—সৌম্য! তোমার গোত্র কি? এই বাক্য দ্বারা সত্যকামকে গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য তিনিও সত্যকামের গোত্র জানিতেন না। ফলকথা যখন আদিতে বর্ণভেদ ছিল না, পরে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে, তখন আর সত্যকাম স্বীয় সদ্‌গুণের পরিচয়ে ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত না হইবেন কেন? অর্থাৎ যখন গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণবংশ না হইলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যার্থী সত্যকামকে যখন ব্রহ্মবিদ্যার্থই উপনীত করা হইয়াছিল এবং সত্যকামও ব্রহ্মবিদ্যারই অনুশীলন করিয়া-

ছিলেন, তখন জ্ঞানাধিকারের কথা, কর্ম্মাধিকারে কেন। সুতরাং তদুত্তরে বলা যায়—কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে, উপনয়ন-সংস্কার ও বর্ণভেদের অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যেমন যজ্ঞোপবীত ভিন্ন যজ্ঞে এবং স্ববর্ণোচিত যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্য বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই, জ্ঞান কাণ্ডীয় বেদে সেরূপ নহে। জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যে, উপনয়ন-সংস্কার এবং বর্ণভেদের আদৌ অপেক্ষা নাই, তাহা আমরা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর আলোচনায় দেখিতে পাইব। তবে গৌতম ঋষি যে সত্যকামকে উপনীত করিয়াছিলেন তাহা কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণে ও ব্রাহ্মণবর্ণোচিত যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার দেওয়ার জন্য। তাই ছান্দোগ্যোপনিষদোক্ত "উপকোশলের আত্ম-বিদ্যা"য় দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যকাম, সাগ্নিক ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞাগ্নির পরিচর্য্যা এবং আচার্য্যের কার্য্যাদি করিতেছেন। আর পূর্ব্বেও এই জন্যই বলা হইয়াছে—সত্যকাম ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে অশক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যাগযজ্ঞাদির বিধান হওয়ায় এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতানুসারে প্রবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে প্রবৃত্ত্যনুসারে বর্ণভেদের এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়কে পরিচিত করিবার জন্য উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে তাহা নাই। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—"একমেবা-দ্বিতীয়ম্;" এবং তাহাও কেবল নিবৃত্তিমার্গীয় পথিকদের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং নিবৃত্তির ভাবও অদ্বৈত বলিয়া, জ্ঞান-কাণ্ডের অধিকারীদের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় উপনয়ন এবং বর্ণভেদের প্রয়োজন নাই। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যে কেবল উপনয়ন-সংস্কার এবং বর্ণভেদেরই অপেক্ষা আছে, তাহা নহে; দেবতা ও গোত্র না থাকিলেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই দেবতাদের দেবতা ও উপনয়ন না থাকায়, এবং ঋষিদের ঋষি

অর্থাৎ গোত্র না থাকায় কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার নাই। ঐ স্থলে "অধিকার নাই" না বলিয়া, প্রয়োজন নাই বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ চিত্তশুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির আবশ্যক; কিন্তু দেবতা ও ঋষিদের যখন তাহার অভাব নাই তখন অবশ্য প্রয়োজনও নাই। তাই লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—জ্ঞানামৃত-পরিতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মে প্রয়োজন কি?—"জ্ঞানামৃতেন, তৃপ্তস্য কর্ম্মণা প্রজয়া চ কিম্।" অতএব আমরা দেখিলাম যে গুণানুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হওয়ায় গুণলাভ করিতে পারিলে গুণোচিত বর্ণে অধিকার আছে বটে, কিন্তু উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। তাই "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" অর্থাৎ দুষ্কুল হইতে গুণবতী স্ত্রী গ্রহণযোগ্য হইলেও স্ত্রীলোকের উপনয়ন-সংস্কার না থাকায় বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে আদৌ অধিকার নাই। এক্ষণে চিন্তার বিষয় এই যে, গুণলাভ করিতে পারিলে যখন গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইয়া থাকে, তখন অবশ্য "উপনয়ন ব্যতীত অধিকার নাই" বলিলে, তাহাকে সাহসোক্তিই বলিতে হয়। বাস্তবিক গুণলাভ হইলে, গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইয়া থাকে; কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। তাই জমদগ্নি, জামদগ্ন্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী। আবার ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণলাভ করিয়াছিলেন। ফল কথা—গুণভেদেই অধিকারী ভেদের পরমার্থতঃ কারণ; তবে ব্যবহারিক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়ায় বর্ণাদি ব্যবহারিক মাত্র।

(জ্ঞানকাণ্ড)

আমরা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তত্ত্বতঃ গুণভেদই অধিকারী ভেদের কারণ—আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে কেবল ব্যবহারিক কল্যাণোদ্দেশ্যেই আদিষ্ট হওয়ায় সত্যতঃ কারণ না হইলেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ ব্যবহারিকভাবে উপনয়ন ও বর্ণাদিকে কারণ বলিয়াছেন;

এবং তাত্ত্বিক-কারণ সত্ত্বেও ব্যবহারিক-কারণ ব্যতীত অধিকার না দেওয়ায় ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে মুখ্য এবং পারমার্থিক কারণ গৌণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণ-ব্যভিচার না হওয়া। সুতরাং সত্ত্ব, সত্ত্বরজঃ, রজস্তমঃ ও তমোঃগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না রাখিলে, এবং বর্ণভেদ সত্ত্বেও এক বর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা আছে দেখিয়া, অর্থাৎ উক্ত বর্ণাদিও তত্ত্বতঃ গুণভেদের কারণ নহে বলিয়া, গুণানুসারে বর্ণাধিকার দেওয়া না হইলেও উক্ত ব্যভিচার দোষ রক্ষিত হয় না। কাযেই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ উভয়কেই কারণ বলিয়াছেন ; এবং গুণানুসারে বর্ণাধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার দেওয়া হইলে বর্ণভেদের অভাব হেতু সেই পূর্ব্ব দোষই থাকিয়া যায় দেখিয়া বর্ণভেদকেই মুখ্য কারণ বলিয়াছেন। আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ওরূপ বলিবার শক্তিও আছে। কারণ গুণলাভ হইলে গুণোচিত কর্ম্ম স্বতঃই হইতে থাকিলেও তদ্দারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না ; যেহেতু, যজ্ঞাদি একমাত্র বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে ওরূপ নিষেধ সঙ্গত হয় ; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণ ব্যতীত বর্ণ, উপনয়ন, দেবতা ও গোত্রকে অধিকারী ভেদের কারণ বলা যায় না—বলিলেও তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি, একমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ ; এবং উক্ত বেদাধ্যয়নও উপনয়ন সাপেক্ষ। সুতরাং গুণ সত্ত্বেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদাধ্যয়ন ব্যতীত যজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই আদৌ উপনয়ন-সংস্কার না থাকায়, গুণ সত্ত্বেও স্ত্রীজাতির কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে অনধিকার প্রযুক্ত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র বৈরাগ্য-সাপেক্ষ—বৈরাগ্য ব্যতীত শত অধ্যয়নেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না ; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ-সনৎকুমার-সম্বাদে দেখা যায়—দেবর্ষি নারদ চারি বেদ প্রভৃতি সমুদয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারিয়া ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বাস্তবিক বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের একমাত্র কারণ। তবে বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে শুভ প্রাক্তন বশতঃ দৈবাৎ কোন সৌভাগ্যযুক্ত পুরুষের সংসারের অনিত্যতা অনুভব হইয়া আসিলে তদনন্তর শম দমাদির সাধন দ্বারা বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদাধ্যয়ন-কেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের কারণ বলা যায় বটে; কিন্তু যাবৎ না বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাবৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। আবার, কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত শমদমাদির সাধন দ্বারাও বৈরাগ্য লাভ করিবার উপায় নাই; কারণ সংসারে জন্ম কর্ম্মক্ষয়ের জন্য; সে কারণ কর্ম্মক্ষয় না হইলেও বলপূর্ব্বক শমদমাদির সাধন করিতে যাইলে সঞ্চিত-কর্ম্ম ক্ষয়িত না হওয়ায় মুক্তিলাভ ত দূরের কথা, পরন্তু ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদিরূপ কঠোর কার্য্যে মৃত্যু হওয়াই সম্ভব। তাই আচার্য্য শঙ্কর তদীয় বিবেক-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ। মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণমাত্রতা" —বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে শমাদি সম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা কল্পনা মাত্র হইয়া থাকে। অতএব, যাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনার ফলে স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম বিদ্যালাভের যথার্থ অধিকারী বলিয়া, বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যালাভের একমাত্র কারণ। আরও আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রটীর ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন—বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই মানুষের ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় এবং কৃতকার্য্যও হয়। বাস্তবিক, মনোবৃত্তির পরমোপশান্তির নামই মুক্তি বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য। তাই পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

সুতরাং বৈরাগ্যোদয়ে স্বতঃই সাধন চতুষ্টয় * আয়ত্তীকৃত হইতে থাকিলে ক্রমে যখন "বশীকার" অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকে না, তখন স্বতঃসিদ্ধ মনোলয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া একমাত্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারী; এবং বৈরাগ্যের চরম অবস্থায়, অর্থাৎ "পর বৈরাগ্য" উপস্থিত হইলে স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে

* কোন্ বস্তু নিত্য, কোন বস্তু অনিত্য, তাহা বিবেচনা করা; ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্য উৎপাদন করা; আত্মাতে শমদমাদি ছয় প্রকার গুণের উদ্রেক করা; এবং মুমুক্ষা। এই চারি প্রকার আত্মব্যাপারের নাম সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারী।

নিত্যানিত্য বিচার—একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত যাহা কিছু আছে সমুদয়ই অনিত্য—এই জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করা।

বৈরাগ্য—বৈরাগ্য সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মতটা সমীচীন বোধ হওয়ায়, এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল "দৃষ্ট বিষয়, ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিঃস্পৃহ হইতে পারিলে, 'বশীকার' নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়। ইহা আবার অবস্থাভেদে চারি প্রকার। যথা—প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয় ও চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান; অনন্তর কোন্ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন্ অনুরাগই বা সজীব থাকিল তাহা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগগুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টার নাম ব্যতিরেক; ক্রমে যখন চিত্ত আর কোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্যমাত্র জন্মে, তখন তাহাকে একেন্দ্রিয়; এবং যখন সূক্ষ্ম ঔৎসুক্যটুকুও থাকিবে না, তখন তাহাকে বশীকার কহে; আর যখন বশীকার দৃঢ় হয়, তখন তাহা পরবৈরাগ্য নাম ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যই নির্ম্মল জ্ঞানের চরম সীমা বা মুক্তি। তাই পতঞ্জলি বৈরাগ্য বলিতে বশীকারকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

শম—অন্তরেন্দ্রিয় যে মন তাহাকে বশীভূত করা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয়ে মনের গতিরোধ করা।

দম—চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গণকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয়রাশি হইতে নিবৃত্ত করা।

উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্র অধিকারী ভেদের কারণ নহে। কারণ, 'যেন বিনা যৎ ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্।" অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করে না, সে তাহার কারণ। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে যখন স্বতঃই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে—কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তখন আর গুণ অর্থাৎ বৈরাগ্য ভিন্ন অন্য কোন কিছু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম ও উপকোশলের আত্মবিদ্যায় দেখা যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিলে সত্যকাম ও উপকোশলের আপনা হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল। আর বাস্তবপক্ষে কথাও তাই। কারণ, জীবই ব্রহ্ম, কেবল চিত্ত-মালিন্য হেতু তাহা জানিতে পারা যায় না, সুতরাং পরবৈরাগ্যের উদয় হইলে উক্ত মালিন্য একেবারে দূর হওয়ায় তখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এক্ষণে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যখন ব্রহ্মকে "ঔপনিষদং পুরুষং"—উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ বলিয়াছেন, তখন উপনিষদ্ ব্যতিরেকে স্বতঃই ব্রহ্মাবস্থা লাভ হয় বলিলে তাহাও শ্রুতিবিরোধী হয়। বাস্তবিক উহা শ্রুতি-বিরোধী নহে। কারণ, উপনিষদ্ শব্দের অর্থ—আত্মবাণী। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃনুতে তনূং

উপরতি—বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়া; অথবা বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করা। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ অর্থে—বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কর্ম্মত্যাগ হয়; নচেৎ বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কখনই বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ নহে।

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, মানাপমান ও শোক হর্ষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা; অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া।

সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তের একতানতা উৎপাদন।

শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

মুমুক্ষা—মুক্ত হইবার ইচ্ছা। ইহাই সাধন-চতুষ্টয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য।

স্বাম্" -এই আত্মাকে উপনিষদাদি অধ্যয়ন দ্বারা, সুতীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ করা যায় না; কিন্তু এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন, আত্মা তাঁহারই নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিবার ঐকান্তিক বাসনা জন্মিলে স্বীয় আত্মা হইতেই আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় নিগূঢ় রহস্যসকল জানিতে পারা যায় সুতরাং তখন স্বতঃই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মা-কর্তৃক বরিত না হওয়ায় উপনিষদ্ প্রভৃতি বহুবিধ অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াও নারদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নাই; কিন্তু সত্যকাম ও উপকোশল উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলেও, আত্মাকর্তৃক বরিত হওয়ায় স্বয়ংই তত্ত্বদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদ্বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় দেববাণীতে বলিয়াছেন—"নিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্তখনিস্বরূপ—ভূত ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা।" অতএব, গুণলাভ হইলে যাহা স্বতঃই আসিয়া থাকে, সে বিষয়ে আর উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্রের অপেক্ষা আছে বলা যায় না;—বিশেষতঃ যখন স্ত্রীলোক হইয়াও মৈত্রী ও গার্গী, শূদ্র হইয়াও বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ, দেবতা হইয়াও ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ঋষি হইয়াও গৌতম ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আবার কঠোপনিষদে দেখা যায় যম নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র গুণই অধিকারী ভেদের কারণ; আদৌ উপনয়নাদি কারণ নহে। তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একোনত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"সখে উদ্ধব! তুমি এই ব্রহ্মরাজ্য দাম্ভিক, নাস্তিক ও শঠকে, কিম্বা শ্রবণ করিতে

অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্বিনীতকে দান করিও না; পরন্তু শ্রদ্ধালু শূদ্র এবং স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে।"

কেহ কেহ বলেন, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই হেতু শূদ্র হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণজন্মের জ্ঞান অনিবার্য্য বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ শূদ্রজন্মে ওরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, বেদান্তের "তদন্তরপ্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" সূত্রটীর শাঙ্করভাষ্যে দেখা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষদের "তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি"—অর্থাৎ যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে তদ্রূপ জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে—এই বাক্যটীর সহিত স্বীয় ভাষ্যের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"জীব মরণকালে এতদ্দেহেই ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক জ্ঞান লাভ করতঃ প্রয়াণ করে, মরণযন্ত্রণা তাঁহার এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়।" তাই ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥" অর্থাৎ জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সুতরাং বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধের ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অবিচ্ছিন্নভাবে শূদ্রজন্মে হওয়া শ্রুতি ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক। অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও মৃত্যুকালে শূদ্রোচিত কর্ম্মাশয়ের প্রাবল্য হেতু শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় তখন আর ব্রাহ্মণ্যভাবের সম্পর্ক বা লেশমাত্র ছিল না; আবার যখন সম্পূর্ণরূপে শূদ্রভাবাপন্ন হইলেও তজ্জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য শূদ্রজন্মেই ব্রহ্মণ্যভাবের কর্ম্মাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া মুক্তি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল

বুঝিতে হইবে। অতএব, কর্ম্মাশয় যখন আদৌ সামাজিক জাতি-ভেদের অপেক্ষা করে না, তখন অবশ্য "শূদ্রজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা ব্রাহ্মণজন্মে করা যায়," এরূপ বলিলে তাহা ভুলই। আরও, জীবের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥" হে ভারত ভূত সকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়া তাহা জানা যায় না, কেবল মধ্য ব্যক্ত বলিয়া জানা যায়; অতএব, তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি? সুতরাং "বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব্ব-জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন" বলিলে, তাহা সাহস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ফল কথা, যখন দেবতা হইতে কীট পতঙ্গ—এমন কি, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সদসৎ কর্ম্মগুণে উচ্চ নীচ যোনিতে গমন করিয়া থাকে, তখন আর শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নহে; কাজেই শূদ্রজন্মের জ্ঞান ব্রাহ্মণজন্মে ঐরূপ অনিবার্য্য হইলে আর উপরোক্ত আপত্তির প্রামাণ্য থাকে না। বাস্তবিক, কর্ম্মাশয় অর্থাৎ গুণকর্ম্ম আদৌ দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে না—তাহা কোন্ সময়, কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় কোন্ ফল দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"—কর্ম্মের গতি বা প্রভাব অতীব গহন। আমরা যে এইমাত্র অতি উচ্চবর্ণের মধ্যেও অসদ্ভাবাপন্ন এবং অতি নীচবর্ণের মধ্যেও সদ্‌গুণশালী ব্যক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহার কারণ কি? তাহার কারণই—কর্ম্মাশয়। কেহ কেহ ইহাকে দৈব বলেন। বস্তুতঃ দৈবও প্রাক্তন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিয়া কর্ম্মাশয়কেই দৈব, অপূর্ব্ব এবং অদৃষ্ট প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তদ্দেহেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার কত শত সহস্র যোগী এই কর্ম্মাশয় প্রভাবেই যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহার প্রভাব বা গতি

বাস্তবিকই অতীব গহন। অতএব শুভাশুভ কর্ম্মাশয় যখন আদৌ জাতিভেদের অপেক্ষা করে না, এবং বৈরাগ্য নামক পরম কল্যাণকর কর্ম্মাশয় উদিত হইলে যখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে জাত্যাদি অধিকারীভেদের কারণ নহে। বাস্তবিক উপনয়ন ও বর্ণভেদাদি কেবল কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের জন্য নহে। কারণ, পরমতত্ত্বদর্শী ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম দ্বারা মানবজীবন চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তদুপযোগী গ্রন্থ-চতুষ্টয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহীর জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থীর জন্য আরণ্যক ও সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই মূলভাব ভিন্ন জীবের অন্য ভাব না থাকায়—বেদকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুই কাণ্ডে বিভাগ করতঃ সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অর্পণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ব্যবহারিক হিত এবং জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা পারমার্থিক হিতসাধন করিয়াছেন। সুতরাং যাহা পারমার্থিক সৎ তাহাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া, কেবল পারমার্থিক-কারণ গুণই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে অধিকারী ভেদের কারণ—আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে ব্যবহারিক হিতার্থ উপদিষ্ট হইলেও, গুণই বস্তুতঃ অধিকারী ভেদের কারণ বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ, গুণকেও কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মাদির বাহিরে অর্থাৎ অরণ্যে পঠিত এবং একমাত্র প্রবৃত্তিসম্বন্ধরহিত অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, পারমার্থিক হিতোপদেষ্টা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ তাহা বলিবেন কেন? আর সেই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ বক্ষ্যমাণরূপে অধিকারী স্থির করিয়াছেন;—"শান্ত, দান্ত, বিষয় হইতে উপরত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করিবে।" অপিচ "যে ব্যক্তির চিত্ত শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, বহিরিন্দ্রিয়সকল বশীভূত

হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনোদোষসকল দূরীভূত হইয়াছে, যে আপনাতে সদ্‌গুণচতুষ্টয় আধান করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, তবে তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবে।" বাস্তবিক জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যদি উপনয়ন ও বর্ণাদি অধিকারী ভেদের কারণ হইত, তাহা হইলে জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ আদৌ গুণোল্লেখ করতঃ উক্ত বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তির কথা না বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ন্যায় বর্ণোল্লেখই করিতেন। অতএব, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে গুণই অধিকারী ভেদের একমাত্র কারণ; উপনয়ন ও বর্ণাদি গৌণ-ভাবেও কারণ নহে।

আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের আরণ্যক বান-প্রস্থীর জন্য এবং উপনিষদ্ সন্ন্যাসীর জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ কেবল সংসারত্যাগী অরণ্যাশ্রয়ীদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া একমাত্র অরণ্যাশ্রমেই পাঠ্য। আর সেই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের একটা সার্থক নাম আছে আরণ্যক। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।"—ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, গার্হস্থ্যান্তে বানপ্রস্থী হইবে, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা করিবে; যদি ব্রহ্মচর্য্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবে; অথবা গার্হস্থ্য হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবে।" যদিও শ্রুতি ক্রমান্বয় আশ্রমত্রয়ের কার্য্য শেষে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন বটে, তথাপি বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকার নাই। তাই শ্রুতি "বনাদ্বা" বাক্যে বানপ্রস্থীকেও বৈরাগ্য জন্মিলে তবে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক বৈরাগ্য জন্মিলে "উপরতি"র প্রাবল্যে স্বতঃই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা আসিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা আর অপরাশ্রমের কার্য্যাদি যথাবিধি সম্পাদিত না হওয়ায় প্রত্যবায় আছে বলিয়া শ্রুতি বৈরাগ্যবানকেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, সন্ন্যাসাশ্রমে বিধিপূর্ব্বক

কর্ম্মানুষ্ঠান নাই; বরং বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে আর তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা যথাবিধি কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি একমাত্র বৈরাগ্যবানকেই প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। যথা "অথ পুনরেব ব্রতী বাহব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকোবা।"—অনন্তর ব্রতাচারী হউক, অব্রতাচারী হউক, স্নাতক হউক, অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক, অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবে। "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি।" অনন্তর প্রব্রজ্যা গ্রহণ, বিবর্ণ বস্ত্র পরিধান মস্তক মুণ্ডন বিত্তাদি স্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধস্বভাব থাকা, পরাপকার বর্জ্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। যদিও বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখানে শ্রুতি "অনন্তর" শব্দে বৈরাগ্যের অনন্তরই বলিয়াছেন। কারণ, বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে না এবং বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে বৈরাগ্যোদয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা। সুতরাং বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বানপ্রস্থীরও স্বাশ্রমবিহিত প্রতীকোপাসনা ও শমদমাদির সাধন করিতে হয় বলিয়া, এখানে বৈরাগ্যের অনন্তরই বুঝিতে হইবে। তাই এ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মত এই যে, "যাবৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহামুত্রফলভোগবিরাগো যোগারূঢ়ো ভবতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি" —যতদিন না বিশুদ্ধসত্ত্ব, ঐহিক পারত্রিক ভোগবিলাসে নিঃস্পৃহ এবং যোগারূঢ় হইতে পারিবেন, ততদিন স্বাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। আবার শ্রুতিও বলিয়াছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥"—দেহাভিমানী নর স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মে রত থাকিয়া শত বর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে; মনুষ্যাভিমানীর ঐ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যাহাতে তদীয় আত্মা কর্ম্মলিপ্ত না হয়। অতএব আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা যখন জাতিনির্ব্বিশেষে স্বতঃই আসিয়া থাকে, এবং ক্রমান্বয় গার্হস্থ্য

শেষ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে ইন্দ্রিয়নিরোধক শমদমাদির সাধন দ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে অথবা ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা গার্হস্থ্যকালে স্বতঃই বৈরাগ্য জন্মিলে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে যখন সমাজত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, তখন অবশ্য উপনয়ন ও বর্ণাদি তত্ত্বতঃ কারণ নহে বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তাই গুণের পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ জানিয়াও যম নচিকেতাকে ব্রহ্মোপদেশ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় এক ও অদ্বিতীয়; এবং অধিকারীরাও সকলে সমভাবাপন্ন। তাই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের সার সিদ্ধান্ত "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" —এখানে ভেদ নাই, সবই এক। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের অদ্বৈততত্ত্বানুসন্ধিৎসাই সকল রকম ভেদজ্ঞানের নিবারক বলিয়া, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদাধিকারীরা সকলেই "একবর্ণ।" বাস্তবিক গুণই পরমার্থ; সুতরাং গুণবানের পক্ষে জাত্যাদি কোনরূপ বিধিনিষেধ নাই। তাই মহাবাক্য রত্নাবলীর সাদ্ধ্যাত্মিক বাক্যে উক্ত হইয়াছে— "আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা সুনিশ্চলম্। দেহ জাত্যাদি সম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রমসমন্বিতান্। বেদ শাস্ত্র পুরাণানি, পদপাংশুমিব ত্যজেৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃক পরমাত্মার সাক্ষাৎ-কার হইলে, বর্ণাশ্রমে সম্যক্ প্রকারে অন্বিত যে দেহ জাত্যাদির সম্বন্ধ তাহা এবং বেদশাস্ত্র ও পুরাণসকল পদধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। অতএব আমরা বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখিলাম যে গুণই পরমার্থ বলিয়া গুণেরই পূজা বা আদর হইয়া থাকে, জাত্যাদির পূজা বা আদর নাই—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"

শঙ্কর-দর্শন।

মায়াবাদ *

(শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ)

(১)

শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি যে মায়াবাদের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন তাহার নামান্তর বিবর্ত্তবাদ বা অদ্বৈতবাদ। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। যেমন মৃন্ময় ঘটাদি বস্তুতঃ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়—"বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ম্" [ছান্দোগ্য—৬।১।৪]; সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মমাত্র, ব্রহ্ম ব্যতিরেক ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই—"নহি নানাস্তি কিঞ্চন" [বৃহদারণক. ৪।৪।১৯]।

এইখানে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইল। আমরা যাহাকে নামরূপ প্রপঞ্চ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত রূপভেদ দেখিতে পাই, এইগুলি সমস্তই পরমার্থ অবস্থায় অবিদ্যা কল্পিত—অবিদ্যপ্রত্যুপস্থাপিত বা অবিদ্যা অধ্যারোপিত। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এ গুলি মিথ্যা অভিমান ভিন্ন আর কিছুই নয়—আমাদের জগতের যা কিছু সমস্তই 'মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত'। এই মিথ্যা অভিমান আবার সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা খণ্ডিত হইয়া যায়। আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রকৃত জ্ঞান হয় তখনিই সমস্ত ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। বলিতে গেলে, সমগ্র জগৎ মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়; ব্রহ্ম যিনি, তিনি স্বয়ং মায়াবীরূপে আপনা হইতে জগৎকে প্রসারণ করিতেছেন। অথবা "অবিদ্যয়া ব্রহ্ম

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাধারণ সভায় পঠিত।

বিভাব্যতে"। তিনি পুনরায় স্বীয় আত্মায় যাহা কিছু সমস্তই উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্ম উপসংহার কারণ-স্বরূপ—"স্বাত্মনি এব উপসংহারকারণম্"।

ব্রহ্ম বুঝিতে আমরা সৎ, চিৎ, আনন্দ বুঝিয়া থাকি। সৎ কাহাকে বলি? ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তাই তাঁহাকে সৎ বলা হয়। যখন তাঁহাকে চিৎ বলি, তখন বুঝি, ব্রহ্ম চৈতন্যপদবাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ। তাঁহাকে পরমানন্দ-স্বরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে, তিনি অখণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নির্ধর্ম্মক; ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্মই নাই—তিনি স্বয়ং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। আমরা যখন ঘট দেখি তখন আমাদের ঘটজ্ঞান হয়, আর আমরা যখন পট দেখি তখন আমাদের পটের জ্ঞান হয়। এই ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞানের প্রভেদ আছে। যাহা ঘটজ্ঞান তাহা পটজ্ঞান নয়; আপনার যে জ্ঞান এবং আমার যে জ্ঞান তাহা সমান নয়; আপনার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান স্বতন্ত্র। আমাদের কাছে জ্ঞানের যে নানাত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ ভেদব্যবহার দেখিয়াই হইয়া থাকে। জ্ঞান যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা, কিংবা যাহা সমস্ত জ্ঞানের ঐক্য সাধন করে ঐরূপ কোন যুক্তি এখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা বিষয়রূপ উপাধি লইয়াই জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। বস্তুতঃ জ্ঞান একমাত্র, বিষয়রূপ উপাধির ন্যায় কখনও ভিন্ন ভিন্ন নহে। যেমন একজনের মুখের প্রতিবিম্ব তৈলে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইবে, জলে সেরূপ হইবে না, পরন্তু অন্য আকার ধারণ করিবে। কিন্তু মুখ একই, কেবল জল ও তৈলের ভেদবশতঃই মুখের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই তৈল প্রভৃতি উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদব্যবহার হয়। সেইরূপ জ্ঞান যদিও এক, যদিও তাহার নানাত্ব নাই, তথাপি ঘটপটাদির বিষয়স্বরূপ উপাধিতে যখন আমরা আমাদের জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে সন্নিবেশ করি তখনই জ্ঞানের বিভিন্নতা বুঝা যায়।

যখন আমরা দেখি কোন লোক কোন দেশ জয় করিয়া হউক বা উত্তরাধিকারসূত্রেই হউক, কোন দেশের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন আমরা কি বলিব? আমরা তাঁহাকে সেই দেশের রাজা বলিয়াই অভিহিত করিব। কিন্তু যদি কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া তাঁহাকে দেশান্তরের রাজাসন গ্রহণ করিতে হয়, তখন আমরা তাঁহাকে সেই দেশান্তরের রাজাই বলিব পূর্ব্বদেশের রাজা বলিয়া আর তাঁহাকে অভিহিত করিব না। তেমনই অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল যখন বিষয়ের আবরণরূপ অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সকল প্রকাশ করে, তখনই তাহার জ্ঞান এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। আর উহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ যদি ঐরূপ না হয়, তাহা হইলে তখন জ্ঞান বলিয়াও প্রয়োগ হয় না। জ্ঞান যদিও এক, 'তোমার জ্ঞান, আমার জ্ঞান' প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা কি? বরং জ্ঞান যে এক সেই সম্বন্ধেই বহুল প্রমাণই দৃষ্ট হয়। একটা প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। বাস্তবিক বিভিন্ন দুই বস্তুর উপাধি ত্যাগ করিলেও আপনা আপনি আমাদের মনে ভেদ জ্ঞান আসিয়া থাকে, যেমন ঘট ও পট এই দুই বস্তুর মধ্যে কোনরূপই ঐক্য নাই—দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; কিন্তু যদি ইহাদের ঘট ও পটাদিরূপ উপাধি বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলেই কি ইহাদের অভিন্নতা প্রতীত হয়? সুতরাং ঘট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায় এবং পট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক যদি কোন ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধি উঠাইয়া দিলেও নিঃসন্দেহ ভেদব্যবহার হইত, কিন্তু যখন ঘট ও পটজ্ঞানের শুদ্ধ ঘট পটাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ স্বাতন্ত্র্য কেহই অঙ্গীকার করেন না, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের প্রকৃত ভেদ কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? ঐ ঐ জ্ঞানের ঘট ও পটরূপ উপাধির দ্বারাই, "যেহেতু ঘটই ঘটজ্ঞানের বিষয়, আর পটই পটজ্ঞানের বিষয়; অর্থাৎ ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদ ব্যবহার হয়, ইহাতে ঐ ঐ জ্ঞানের কেবলমাত্র

ঔপাধিক ভেদ আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। ইহা ভিন্ন জ্ঞান সমূহের স্বাতন্ত্র্য সাধনসূচক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং একতা প্রতিপাদন পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বহু প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকন্তু যখন সহজভাবে জানা যাইতেছে যে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান উভয়ই জ্ঞান, তখন ঐ দুই জ্ঞানের প্রভেদ স্বীকার কিরূপে করিতে পারা যায়? অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল লোকের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান বিভিন্ন নয়, এক। এই জ্ঞানেরই অপর নাম চৈতন্য। চৈতন্য ও জ্ঞান পৃথক্ নহে। এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই আত্মার, আবার আত্মাও চৈতন্য ছাড়া কিছুই নয়। অতএব উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে যখন জ্ঞানের একত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তখন আত্মা সকল যে এক এবং পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য আছে তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই জীব ও ব্রহ্ম যে এক তাহা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে; জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপায় ও তিন রূপ—ছয় প্রকার বিকারের মধ্যে—আত্মার কোন বিকারই নাই। আত্মা সকল সময় সকল স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই আত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ, কেন না আত্মাই সকলের একান্ত স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র। আমাদের যে স্ত্রী পুত্রাদিতে স্নেহাদি জন্মে তাহা এই আত্মার প্রীতির জন্যই হইয়া থাকে। অন্যের প্রীতির জন্য কেহ কখনও আত্মাতে স্নেহ করে না।

এখন একটা আপত্তি হইতে পারে—"যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত না হয়, তাহা হইলে আত্মার আনন্দরূপত অজ্ঞাত রহিল; সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি? এই দোষ পরিহারের জন্য যদি আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্ম-স্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার ইচ্ছায় কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইত? সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি কাহারও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার প্রতীতি অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে।"

কিন্তু এই আপত্তি অঙ্গীকার করা যাইত, যদি আত্মার আনন্দ-

রূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধকতা হেতু প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে; অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত হইতেছে, অধ্যয়নশীল কতকগুলি ছাত্রের মধ্যস্থিত দেবদত্ত নামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এখানে অন্যান্য বালকের অধ্যয়নের জন্য প্রতিবন্ধক হইতেছে। সুতরাং দেবদত্তের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ তাহা বিশেষ জানিতে পারা যায় না। তবে সামান্যতঃ এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যে দেবদত্তের অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব রজঃ, ও তমোগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্দেয় পদার্থবিশেষকে অজ্ঞান বলে, এই অজ্ঞান জগতের কার্য্য বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে দুইটি শক্তি আছে। যেমন মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজন বিস্তৃত সূর্য্য-মণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি বলে। আর যে শক্তির সহিত অজ্ঞান উপা-দান কারণরূপে জগৎ সৃষ্টি করে সেই শক্তিকে বিক্ষেপশক্তি বলে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ—মায়া এবং অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ অথবা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে মায়া নামে অভিহিত করা হয়; আর মলিন অর্থাৎ রজোগুণ বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। উল্লিখিত মায়াতে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় সেই প্রতিবিম্বই এ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

এই জন্য ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা, ও অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য। আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেই প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া

মনুষ্যাদি যাবৎ জীবপদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপ্রতিবিম্বও নানা; কাজেই জীবও নানা; মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর বলে; এইজন্য শরীরের অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়াসহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমে বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এইরূপ করাই কর্ত্তব্য" এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বলে।

অনেকে শঙ্করকে মায়াবাদের উদ্ভাবনকর্ত্তা মনে করেন, কিন্তু মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে আচার্য্য শঙ্করের বহু পূর্ব্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে নাসদীয়সূক্তে এই মায়াবাদের কয়েকটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥'

ইত্যাদি। ১০।১২৯

এই সূক্তের সায়ন যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অনুরূপ অর্থ অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামতীর্থের পদযোজনিকা অথবা আচার্য্য শঙ্করের উপদেশসহস্রীর ভাষ্য এবং আত্মপুরাণে একইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সায়ন প্রলয়াবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। জগতের প্রাগবস্থা মায়ার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যাবস্থার সত্তা এখনও আসে নাই। মায়া সৎও নয় অসৎও নয়, ইহা অনির্ব্বচনীয়।

উপনিষদে স্পষ্টতরভাবে মায়াবাদের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে মায়া নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ভাষ্যে (১।৩) মায়ার নিম্নলিখিত কয়টী ঔপনিষদিক নামের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"অব্যাকৃতং, আকাশং, পরমব্যোম, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, অবিদ্যা, ছায়া, অজ্ঞানম্, অনৃতং, অব্যক্তম্।"

মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদের কয়েক স্থানে মায়াব্যাপারের উল্লেখ আছে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে মায়াবাদ ছিল। কিন্তু কর্ম্মবহুল বৈদিক যুগে দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। কাজেই বৈদিকযুগে মায়াবাদ আর্য্যদিগের মনোরাজ্যে তাদৃশ ভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে কর্ম্মপ্রবণতা হ্রাস পায়, দার্শনিকতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড লোপ পাইতে আরম্ভ হয়। এই সময় মায়াবাদের আবার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ও চৈনিক পর্য্যাটকগণের কৃপায় ইহা দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অতঃপর গৌড়পাদ আবার নূতন করিয়া ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত বেদান্ত দর্শনের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ হইতেছে —গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকা। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় গৌড়পাদই এই যুগে সর্ব্বপ্রথম মায়াবাদের অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত সমস্তই অলীক এই মতের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও এই মতবাদ ছিল, তবে তিনিই প্রথমে ইহার বিহিত প্রচার করেন। আমাদের বাহেন্দ্রিয় জ্ঞানের বৈতথ্য বা অসত্যত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনিও ঠিক সেই যুক্তিগুলিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইঁহার পর আচার্য্য শঙ্কর নানা উপায়ে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। মায়াবাদ ত প্রচারিত হইল। এই মায়া বলিলে কি

বুঝায় দেখা যাউক। মায়াশব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। মায়া-শব্দে শিল্প-চাতুর্য, সৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রজাল, রচনাকৌশল, অলীকপ্রপঞ্চ, ইত্যাদি কত অর্থ হয়। শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মায়াবাদ বলিয়া যে যে মত প্রসিদ্ধ সেই সেই মতই যে বস্তুতঃ একই তাহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার মায়াশব্দের যথার্থ অর্থ কি তাহা নিরূপিত না হইলে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। শঙ্কর কি অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও তৎপূর্ব্বে শাস্ত্রকারেরাই বা 'মায়া'কে কি অর্থে লইয়াছেন, ইহা লইয়া একটা বড় গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে।

যদি সর্ব্বত্র মায়া শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মায়াবাদ অর্থে যাহা বুঝি তাহা শঙ্করের সৃষ্টি নয়, তাহা যে কোন্ অতীত যুগে সৃষ্ট হইয়াছে, বলা বড় কঠিন। দেখা যাক, গীতায় মায়াসম্বন্ধে কি আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্ববারের আলোচনায় এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। আজ আর কয়েকটী কথা বলিব।

ভগবান্ বলিতেছেন,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়াকে গুণময়ী বলা হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী মায়ার গুণ। ভগবান্ বলিতেছেন 'মম মায়া' সুতরাং বুঝিতে হইবে 'মায়া' ভগবানের। এই ত্রিগুণময়ী মায়া আবার জগতের জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই জন্যই জীব ভগবানকে ভুলিয়া রহিয়াছে। ভগবান্ অব্যয়, দৃশ্য জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। একথাও আমরা গীতাতে পাই। ভগবান্ বলিতেছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

আবার একথাও তিনি বলিতেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমরা 'মায়া' শব্দ ও 'প্রকৃতি' শব্দ উভয়ই গীতাতে পাইলাম। আর বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মায়া ও প্রকৃতি একই। প্রকৃতিও গুণময়ী, মায়াও গুণময়ী। জীবের কর্ত্তৃত্বও গীতা স্বীকার করিতেছেন না।

জীবের কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণের দ্বারাই হয়, জীবের তাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। জীবের কর্ত্তৃত্ব একটা আরোপ মাত্র, আর এই আরোপের মূলে 'অহঙ্কার' আছে। তবে কি ভগবান্ নিজ মায়া দ্বারা জীবের কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির কারণ হইতেছেন। একথাই বা বলি কি প্রকারে? ভগবান্ ত একথাও বলিতেছেন,—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

তিনি জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতির জন্য দায়ী নন। জীবের জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, জীব মোহ প্রাপ্ত হয়। তবে কি মায়া তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ?

তিনি বলিতেছেন 'মায়া' আমার (মম মায়া)। আবার বলিতেছেন, এই মায়া জীবকে অভিভূত করে। জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ত্তৃত্ব মায়ার। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি যাহা জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজের উপর আরোপ করে, ভগবান্ তাহার জন্যও দায়ী নহেন। তাহা হইলে ভগবান্‌ও নিষ্ক্রিয়, জীবও নিষ্ক্রিয়, মাঝে হইতে মায়া আসিয়া সকল প্রকার গোল বাধায়। মায়া যদি ভগবানের হইল, তাহা হইলে অন্ততঃ গৌণভাবে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভগবানের একটী কথায় যেন সকল গোল মিটিয়া যাইতেছে। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন,—"তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥" তিনি কর্ত্তাও নহেন, অকর্ত্তাও নহেন। গীতাতে মায়া অর্থে প্রকৃতি বুঝায়, এ প্রকৃতি কাহার? না, ভগবানের। ভগবান্ পুরুষ,

মায়া প্রকৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। একথা ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।" আবার একথাও বলিয়াছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

আবার বলিতেছেন,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে গেলে বলিতে হয়, গীতার মতে ভগবান্ সৃষ্টি ও প্রলয়কর্ত্তা। কারণ তিনিই বলিতেছেন,—'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥' কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে তিনি তাঁহারই প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণ করেন, একথা তিনিই বলিতেছেন,— "ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত থাকেন না। 'তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্' একথাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার ত্রিগুণময়ী মায়া বা প্রকৃতি একদিকে যেমন সৃষ্টি করে, অপর দিকে তেমনই জীবকে মুগ্ধ রাখে, তাহার প্রমাণ, 'ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥' তিনি অব্যয় একথাও ইহাতে বুঝা গেল। জীব মায়াদ্বারা এরূপ মুগ্ধ হয় যে, কর্ম্ম না করিয়াও প্রকৃতিকৃত কর্ম্ম আপনার উপর আরোপ করিয়া ফেলে। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' এই ভগবদ্বাক্য তাহার প্রমাণ।

এখন মোটের মাথায় গীতাতে মায়া বলিতে কি বুঝায়? তাহার উত্তর নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারেঃ—মায়া ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাঁহারই প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। এই প্রকৃতির মূল তত্ত্ব তিনটী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, অথবা উক্ত মূল তত্ত্ব তিনটী প্রকৃতিসম্ভূত। 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।' ইহা ভগবদ্বাক্য। প্রকৃতি অনির্ব্বচনীয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, ভগবানের সহিত একীভূতা, গুণত্রয় তাহা হইতে উপজিত হইয়া বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপার সম্পন্ন করে।

জ্ঞানের যাহা আবরণ তাহাই মায়া। শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানময়। জ্ঞানময় বলিতে কি বুঝি? এবিষয়ের কিছু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক। জ্ঞানময় বলিতে আমরা সাধারণতঃ জ্ঞাতাকেই বুঝি। কিন্তু জ্ঞাতা বুঝিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয়ও বুঝিতে হয়। জ্ঞাতার ধর্ম্ম জানা, সে শুধু থাকিতে পারে না, কিছু না কিছু জানিবে। সে যাহা জানিবে, তাহাই জ্ঞেয়। তাহার জানিবার কার্য্য জ্ঞান। আমি জানি, সুতরাং আমি জ্ঞাতা; আমি বহির্জগৎকে জানি, সুতরাং বহির্জগৎ জ্ঞেয়। আমার জানিবার কার্য্য জ্ঞান। আমি সকল সময়ে জানি, আমার জানা কখনও শেষ হয় না। জাগ্রৎ অবস্থায় যে আমি জানি, নিদ্রিতাবস্থায় সেই আমি স্বপ্নের বিষয় জানি। সুষুপ্তিকালেও না কি আমার জ্ঞান তিরোহিত হয় না, এবিষয়ে দার্শনিক যুক্তি আছে। আমার জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক ও অনুমানমূলক, এই দ্বিবিধ। আমার অনুমানমূলক জ্ঞানের কারণ, আমার প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান। আমার জ্ঞানের বিষয় যাহা, তাহা আমি আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি। তজ্জন্য অনেকের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূল জ্ঞান বা আদি জ্ঞান।

যদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূল বা আদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব কাল সসীম বুঝিতে হয়। কারণ, সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিরহিত চৈতন্যময় আত্মা কল্পনায় আসে না। পঞ্চেন্দ্রিয় দেহের সহিত জন্মে ও দেহের বিলয়ে লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যদি আত্মা সৎ ও নিত্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। আমরা অনেক কারণে আত্মাকে সৎ ও নিত্য বলিতে বাধ্য।

আমরা দেখি শরীরীর পক্ষে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মূল বা আদি জ্ঞান, আর যত প্রকার জ্ঞান এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্মৃতি হইতে হয়।

দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান প্রথমতঃ আমদের শারীরিক কষ্টের জ্ঞান হইতে জাত। দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণও আমাদের

এক একটী ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞান। মনে করুন, যদি ইন্দ্রিয় সকল না থাকে, তাহা হইলে ত আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান সম্ভব হয় না। এস্থলে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? আত্মা নিত্য ও সৎ, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় সকল অচিরকালস্থায়ী, সুতরাং আত্মার ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয় সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান নহে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। আমার একমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহা 'আমি আছি' এই জ্ঞান। এই জ্ঞানই অন্য সকল জ্ঞানের কারণ। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় সকল আমাদিগকে প্রবঞ্চনাই করে। যাহাকে আমরা শ্বেতবর্ণ বলি, তাহা একটীমাত্র বর্ণ নহে। বিজ্ঞান বলে, ইহা সাতটী মূল বর্ণের সমষ্টি। আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ আমরা চক্ষে ইহাকে নীলবর্ণযুক্ত দেখি। সূর্য্য পৃথিবী হইতে অতীব বৃহত্তর অথচ সূর্য্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি। সুতরাং ইন্দ্রিয়সাহায্যে আমরা এ জগৎ যেরূপ দেখি, জগৎ যে তদ্রূপই, এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ বস্তু (substance) সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুর আকার (phenomenon) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়, কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই হয় না।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। জ্ঞাতা থাকিলেই যখন জ্ঞেয় থাকা চাই, আবার জ্ঞেয় থাকিলেই যখন জ্ঞাতা থাকা চাই, তখন এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অপরিহার্য্য। আত্মা চৈতন্যময়, সুতরাং আত্মা জ্ঞাতা। সুতরাং আত্মার জ্ঞানকার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য বিষয় থাকা অপরিহার্য্য। আত্মার জ্ঞানের বিষয় কি আত্মার বাহিরের বস্তু, না আত্মার ভিতরের বস্তু? যাহার সহিত যাহার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাহা তাহার বাহিরের বিষয় হইতে পারে না। কোন বিষয়ের সহিত তাহার বাহিরের বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরিহার্য্য হইতে পারে না। চুম্বকের সহিত লৌহের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরি-

কার্য্য নহে, কারণ লৌহ ব্যতীত চুম্বক থাকিতে পারে। জ্ঞাতার সহিত তাহার জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, তাহা জ্ঞাতার সঙ্গে সঙ্গেই চিরকাল অবস্থিতি করে। আমার জ্ঞানের বিষয় সকল আমারই ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি ছাড়া তাহারা থাকিতে পারে না। পুষ্পের গন্ধ, মধুর মিষ্টতা, আমার বাহিরের বিষয় নহে, আমারই ভিতরের বিষয়। গন্ধ পুষ্পে নাই, আমার মনেতেই আছে, পুষ্পের আকৃতি বাহিরে নাই আমারই মনোমধ্যে আছে আমি জানি বলিলেই, আমার আত্মার একটা বিক্ষিপ্ত অবস্থা বুঝায়। আত্মা যখন বিক্ষেপ শূন্য অবস্থায় থাকে, তখন বিষয় সকল (আত্মার জ্ঞানের বিষয় সকল) আত্মার মধ্যেই অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে। আত্মা বিক্ষেপযুক্ত হইলেই বিষয় সকল ব্যক্তভাব ধারণ করে। "বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগদ্‌রূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ চক্রের অন্য একটী নাম প্রকৃতি। যখন আত্মা এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন, তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বা জগদ্ধাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা হয়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরিত্যাগ করা যায়, তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা অথবা চিন্ময়ী শক্তি বিদ্যমান থাকেন, তখন আর ব্যাবহারিক দ্রষ্টা, দৃষ্টি, দৃশ্য, পূজ্য, পূজক এবং পূজা ; জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সৃষ্ট, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং মায়া প্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে না। কেবলমাত্র সেই অদ্বয় আত্মা মাত্র থাকেন।" *

শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্‌ভাষ্যে বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ এবং শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।২।২৮-৩২) তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের এসকল মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

* মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ কৃত ভামতীভাষ্যবিবৃতি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের মতবাদের প্রভাবে বিব্রত হইয়া ২য় অ, ২য় পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোক আকুলী ক্রিয়তে"—বৈনাশিক অর্থাৎ বৌদ্ধগণ সমস্ত লোককে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। শঙ্কর বিজ্ঞান-বাদ (Idealism) খণ্ডন করিয়া তাঁহার মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেগুলি বিজ্ঞানবাদের দোষ বলিয়া পরিচিত সেইগুলি সমস্তই শঙ্করের মায়াবাদে সংক্রামিত হইয়াছে। এগুলি তাঁহার ত্রুটিতে প্রবিষ্ট যদি না হইয়া থাকে অন্ততঃ তাঁহার সাম্প্রদায়িকগণের ত্রুটিতে শঙ্করের মায়াবাদকে দুষ্ট করিয়াছে।

শঙ্কর বলিতেছেন—"অনুপপন্নোয়মভাবদ্ভোবোৎপত্যভ্যুপগমঃ" (২।২।২৭) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি—বৌদ্ধদিগের এই মত অযৌক্তিক। কিন্তু পঞ্চদশী উপদেশ করিলেন—"প্রাগভাবযুতং দ্বৈতম্" (৬।২৫৫)। দ্বৈত পূর্ব্বে অভাবমাত্র ছিল। পঞ্চদশীর এই মায়াবাদে বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। একদিকে বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন—"যাহা নিশ্চিত বলিয়া অনুভূত হয়, যথা এই বস্তুই 'এইরূপই', তাহা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। তাহার বিপরীত যাহা কিছু বলা হয়, তাহাতে বক্তার বহুপ্রলাপিত্ব মাত্রই প্রকাশ পায়" (২।২।২৫)—কিন্তু পঞ্চদশীকার এই সত্যের অপলাপ করিয়া বলিতেছেন—"কোথায় বা বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মায়া বলিয়া জানিবে",—এইরূপে যদি শঙ্করের উক্তি এবং পঞ্চদশীর বচনাবলী তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাইবে যে পঞ্চদশীর মায়াবাদ বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের বৈদান্তিক সংস্করণ মাত্র। আর পঞ্চদশীকার যে অর্থে মায়াবাদী—শঙ্কর কখনই সেই অর্থে মায়াবাদী নন।

আমাদের বোধ হয়, বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ তৎকালীন জনগণের হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, শঙ্কর তাহা বহু চেষ্টা করিয়াও নির্মূল

করিতে পারেন্ নাই। আপনারা সকলেই শঙ্করের নির্দ্দিষ্ট ব্যাবহারিক দ্বৈত ও পারমার্থিক অদ্বৈতমতের কথা অবগত আছেন। জর্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মধ্যে Kant ও Fichth এবং ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে Hamilton ও Mill এই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিকের ভেদ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্কর ব্যাবহারিক দ্বৈত কখনও অস্বীকার করেন না। তবে শঙ্করের সঙ্গে Kant প্রভৃতির পার্থক্য এই যে তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের প্রচলিত পৌরাণিক "মহাপ্রলয় মত" অঙ্গীকার ও সমর্থন করিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মাত্র থাকেন। বিশ্বপ্রপঞ্চের লয় হয়। মহাপ্রলযে ব্রহ্মের নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত ব্রহ্মের সগুণ বা সবিশেষ স্বরূপের বা ঈশ্বরের এক মহাবিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপরাপর প্রাণিগণের ন্যায় থাকেন না, অথবা শক্তিরূপে মাত্র অবস্থান করেন। এই জন্যই শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য, বিশ্ব প্রপঞ্চ এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। যাহা হউক ব্যাবহারিক জগৎ সম্বন্ধে ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ সকলই সত্য শঙ্করের মত। শঙ্করের মতে পারমার্থিককে সত্যের তুলাদণ্ড করিয়া কথা বলিতে গেলে, ব্যাবহারিককে মিথ্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে মিথ্যা আপেক্ষিক বা তুলনায় মিথ্যা মাত্র; তাহা বলিয়া ব্যাবহারিকের নিজের মধ্যে কখনও কোন মিথ্যাত্ব নাই।

বস্তুতঃ শঙ্করের কথায় এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই শঙ্করের সাম্প্রদায়িকগণ অনেক স্থলে পারমার্থিক এবং ব্যাবহারিক মিশাইয়া, ইতরেতর অধ্যাস দ্বারা গোলমাল করিয়া, শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের এবং শূন্যবাদের দোষ সংক্রামিত করিয়াছেন।*

(ক্রমশঃ)

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য-নীতি—স্বাস্থ্যসমাচার পুস্তকাবলী। সংখ্যা ১ ও ২।

বাঙ্গালী দুর্ব্বল, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে রোগ, বঙ্গদেশে অকালমৃত্যুর সংখ্যা যত অধিক কোন সভ্যদেশে সেরূপ দেখা যায় না। এই কথাগুলি প্রমাণ করিবার জন্য তর্কবিচারের আবশ্যক করে না। এই জাতীয় দুর্ব্বলতার, এই রোগ ও মৃত্যু-বাহুল্যের কারণ কি? আজ কাল অনেক কৃতবিদ্য ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বাঙ্গলার স্বাস্থ্য-হীনতার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতেছেন এবং আপনাদিগের শিক্ষা ও ভূয়োদর্শনের ফল সংবাদপত্রে, পুস্তকে, সভাসমিতিতে সাধারণের মঙ্গলকল্পে প্রচার করিতেছেন। স্বাস্থ্যসমাচার পত্রিকা কিছুকাল যাবৎ এই দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ "স্বাস্থ্যনীতি" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইলে, অগ্রে স্বাস্থ্যের মূল তত্ত্বগুলি এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যাহাতে লোক সেই তত্ত্বগুলি আপন আপন প্রকৃতি ও অবস্থা উপযোগী করিয়া লইয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। সকল শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্যশিক্ষারও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহাতে শিক্ষিতের মানসিক শক্তিগুলির উন্মেষ হয়, ইচ্ছা ও বিচারশক্তি বলবতী হয়। কেবল রাশি রাশি নিয়মের অধীন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে যাইলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া জড়ত্ব লাভ করিবে—স্বাস্থ্যের মূল তত্ত্বগুলি ভুলিয়া নিয়মের বন্ধনে যন্ত্রবৎ বদ্ধ হইয়া স্বাস্থ্যলাভের পরিবর্ত্তে জীবনীশক্তিহীন হইতে থাকিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তক দুইখানিতে মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে নিয়মশিক্ষার বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বর্ণনাস্থলে লেখক লিখিয়াছেন, "ম্যালেরিয়ার সময় মশারির ভিতর ব্যতীত শয়ন করা উচিত

নয়। মশারি ছেঁড়া থাকিলে তাহা মেরামত করাইয়া লওয়া আবশ্যক। মশারির ধার বিছানার তলায় ভালরূপে গুঁজিয়া রাখা উচিত।” অশ্রুতপূর্ব্ব শিক্ষা বটে! কিন্তু গ্রন্থকার একটী শিক্ষা দিতে ভুলিয়াছেন—যদি দুষ্ট মশক মশারি ফেলিবার পূর্ব্বাহ্নে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে কি উপায় হইবে? নিয়ম শিক্ষা দিবার আতিশয্য ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মানুষের নিজের ভাবিবার আর কি আছে? চিন্তাহীন ইচ্ছাশূন্য থাকিয়া তাহার প্রতি কেবল নিয়ম পালনের ভার—তাহার জড়ত্ব লাভের কি অধিক বিলম্ব হইবে! যদি মশকদংশনই ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইলে সমবেত চেষ্টা বা রাজশক্তির বলে এই রোগ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ রোগের প্রতীকার অসম্ভব ইহা ধারণা করিতে হইবে। নিয়মগুলির স্বাস্থ্যকারিতা বুঝাইতে যাইয়া অধিকাংশ স্থলে লেখক বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ফলে পুস্তক দুইখানি ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় দূষিত হইয়াছে। কোন্ বিজ্ঞানমতে সরিষার তৈল ও লবণ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলে মুখের কীটানু বিনাশ হয়?

“দাঁতনে একপ্রকার কস্ আছে, তাহা সঙ্কোচক ও কীটানুনাশক” —এই অভিনব তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? “কুন্তলরাশি পরিশোভিত স্ত্রীলোকের মস্তকে নারিকেল তৈল দান সঙ্গত।” কেন?—সুদীর্ঘ কেশরাশিজনিত মস্তিষ্কের উষ্ণতা প্রশমনে নারিকেল তৈল বিশেষ উপযোগী। পাশ্চাত্য শারীরবিধান শাস্ত্রের কি ইহা নূতন আবিষ্কার? “সরিষার তৈল চর্ম্মরোগ নিবারণে বিশেষ উপযোগী” এবং “অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া জলপান করা অনেক সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।” যে চিকিৎসক রোগের বিশেষ অবস্থা না বুঝিয়া এইরূপ চিকিৎসার বিধান দেন তিনি আনাড়ী চিকিৎসক। পুস্তকের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, “শরীরে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য, তৈলের কিয়দংশ চর্ম্মমধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে।”

অপর স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—"তৈল মর্দ্দনে লোমকূপসমূহ বদ্ধ হইয়া যায়।" এক স্থানে লিখিয়াছেন—"দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাশ প্রভৃতি নানা রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা" কিন্তু পরেই দেখিতে পাই "যাঁহারা অজীর্ণরোগী, শ্বাস ও হিক্কারোগে পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর।" কোন্ নীতিটি গ্রহণ করিতে হইবে ?

পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, লেখক মহাশয় কলিকাতা-বাসী অর্থশালী ভদ্রপরিবার লক্ষ্য করিয়াই ইহা রচনা করিয়াছেন। পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্য ও পল্লিগ্রামবাসীদিগের আচারাদি সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান নাই। একারণ ইঁহাদিগের বিষয়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে ভ্রমপূর্ণ।

এদেশের কুসংস্কারপীড়িত অশিক্ষিত সাধারণের শিক্ষার জন্য অনেক স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। তাহাদের অধিকাংশই এই ছাঁচে ঢালা, এজন্য এতগুলি কথা বলিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

খাদ্য—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু, এম, বি, এফ, সি, এস্ প্রণীত। 'খাদ্যে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেকটা আমাদের আহারের উপর নির্ভর করে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা 'পেটুক' তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আহার্য্যের গুণাগুণ বা কি পরিমাণে আহার করা উচিত জানা না থাকায় নানারূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। আবার রুগ্ন অবস্থায় বা স্বাস্থ্যলাভের অনতিপূর্ব্বে কিরূপ খাদ্য ব্যবহার করা উচিত—যাহাতে রোগী শীঘ্র বল লাভ করে, তাহা না জানা থাকায় আমরা অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাই না। সেই জন্য প্রত্যেকেরই খাদ্য ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত চুণী বাবু 'খাদ্য' প্রণয়ন করিয়া উক্ত

অভাব দূর করিয়াছেন। তিনি যেরূপ সরল এবং সাদা সিদা ভাষায় তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে বিষয়টী সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণে দুইটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ম "উপবাসের উপকারিতা" চুণী বাবু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুই দেশেরই পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মাঝে মাঝে উপবাস যেমন এক দিকে মানসিক সংযম আনয়ন করে অপর দিকে তেমনি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, লঘুতা এবং অনেক সময় বললাভেরও কারণ হয়। আমরা তাঁহার এই মতের সমর্থন করি। ২য়—"রোগীর পথ্য প্রস্তুতপ্রকরণ।" ইহাতে শুধু আজকাল এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ যে সকল পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাদের প্রস্তুত প্রণালীর উপদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু যদি কবিরাজগণও যে সকল পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাদেরও প্রস্তুত-প্রণালী প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রবন্ধটী সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত।

যাহা হউক, আমরা উক্ত পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি এবং আশা করি উহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বিরাজ করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-চরিত্র—পণ্ডিত ভাস্কর বিষ্ণু ফাড়াক, বি, এ, মায়াবতী, অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষের অনুমত্যানুসারে ইংরাজীতে প্রকাশিত স্বামিজীর জীবনী মারহাট্টি ভাষায় অনুবাদ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি উহা দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবেন প্রত্যেক খণ্ডে দুই শত করিয়া পৃষ্ঠা থাকিবে। আমরা "চরিত্রের" দুই খণ্ড পাইয়াছি। পণ্ডিতজী মারহাট্টি ভাষায় বিশেষাভিজ্ঞ, সেই জন্য আশা করা যায় তাঁহার ভাষান্তর অতি সুন্দরই হইয়াছে। মারহাট্টি সংবাদপত্র সমুদয়ও তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছেন। পুস্তকগুলির বাঁধাই ও ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। পণ্ডিতজীর এই সৎ উদ্যম সফল হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা কোয়ালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ইং ১৯১৬ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কোয়ালপাড়া বি, এন, রেলওয়ের বিষ্ণুপুর ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামস্থ এবং স্থানীয় লোকেরা সকলেই দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। স্বামী কেশবানন্দ এবং তাঁহার তিন চারিজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্থানীয় লোকদিগের সেবার্থ কোয়ালপাড়ায় একটী অনাথ আশ্রম, একটী বয়ন বিদ্যালয় ও একটী অবৈতনিক সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অনুষ্ঠান তিনটীই সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে।

অনাথ আশ্রম এখান হইতে দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও অবস্থানুযায়ী পীড়িতগণকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়; যাঁহাদের পথ্যের সংস্থান নাই তাঁহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য উভয়ই দান করা হয়; এতদ্ব্যতীত আশ্রম হইতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র, চাউল ও অর্থ সাহায্যও করা হইয়া থাকে। ইং ১৯১৬ সালে ঐরূপ বিবিধভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ৭৬০, তন্মধ্যে যাঁহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ৭৪০; ৬ জনকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়; ১০ জনকে ঔষধ ও পথ্য উভয়ই দান করা হইয়াছে; ১ জনকে বস্ত্র, ১ জনকে চাউল ও ২ জনকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আশ্রমের সেবকগণ একটী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যাইয়া ৪ জন কলেরা রোগীর সেবা করেন। ভগবানের কৃপায় এবং সেবকগণের যত্নে ৪ জনই আরোগ্য লাভ করেন।

অনাথ আশ্রমের মোট আয় ১৯৮ টাকা, তন্মধ্যে ইং ১৯১৫ সালের তহবিল মজুত ৪৮৬/১০, মাসিক চাঁদা ৬. ও এককালীন দান ১৮৭/১০।

মোট ব্যয় ঔষধ পথ্যাদি ক্রয়, জনৈক সেবকের খোরাকী ইত্যাদি বাবদ ১৯৫।/০ আনা।

অবৈতনিক সাধারণ বিদ্যালয়—ইং ২৯১৬ সালে ইহার মোট ছাত্র সংখ্যা ২৫ জন; তন্মধ্যে ২৪টী বালক ও ১টী বালিকা। দৈনিক উপস্থিতির হার শতকরা ৭৩ জন। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন ছাত্র দিবসে অবসর পায় না বলিয়া রাত্রে অধ্যয়ন করে।

উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য পুস্তক সম্বলিত একটী পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ যাহাতে তাহাদের অবসরমত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ের আয় এককালীন দান হিসাবে ১০৮৵৫, খুচরা আদায় ॥/৫, মোট ১০৯।/১০। শিক্ষকের বেতন, স্কুলঘর মেরামত ও অন্যান্য খরচ হিসাবে মোট ব্যয় ৯৮।৵১০ টাকা।

বয়ন শিল্প বিদ্যালয়—ইং ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ৪।৫টী যুবক দেশীয় বয়ন শিল্পের উন্নতিকামনায় অর্থাদি ব্যয় করিয়া প্রায় দশ বৎসর উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা উক্ত শিল্প নিজেরা শিক্ষা করিয়া আরও ৩।৪ জনকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহাতে ৩ জন শিক্ষালাভ করিতেছে।

উক্ত শিল্পালয় স্থাপনের আরও একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে—গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়ায় যদি তাহারা সামান্য মূল ধন নিয়োজিত করিয়া তাহাদের অবসর সময় বয়নকার্য্যে নিয়োগ করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আর্থিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি বিধান করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাছে মূলধনও নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় এপর্য্যন্ত কেহই উক্ত উদ্যমে হস্তক্ষেপ করে নাই। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর একটী পৃথক শিল্পালয় স্থাপনে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহারা বয়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদিগকে সেখানে কার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা

উপার্জ্জন করিতে দেওয়া হইবে। ইহাদিগকে সফল-কাম হইতে দেখিলে অপরেও উক্ত শিল্প অর্থাগমের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ঐরূপ শিল্পালয় স্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ কিছু অর্থের প্রয়োজন।

শিল্পালয়, অনাথাশ্রম কিম্বা বিদ্যালয়ের জন্য যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে; (১) স্বামী কেশবানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, কোয়ালপাড়া, পোঃ কোতলপুর, জেলা বাঁকুড়া; অথবা (২) স্বামী সারদানন্দ, সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগ-বাজার, কলিকাতা। পাঠাগারের জন্য পুস্তকও প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠানত্রয়ের উন্নতিকল্পে আশ্রমবাসিগণ সকলের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ তাহাতে আশা করা যায়—সাধারণের সহানুভূতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইবে এবং মহানুভবগণের সাহায্যে অর্থেরও অপ্রতুলতা হইবে না।

দাতব্য ঔষধালয়, বেলুড় মঠ—ইতিপূর্ব্বে আমরা বৈশাখ মাসের উদ্বোধনে এই দাতব্য ঔষধালয়টীর জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এপর্য্যন্ত কোনও প্রকার সাহায্যাদি না আসায় আমরা পুনরায় সহৃদয় জনসাধারণের নিকট তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে এই ঔষধালয়টী মঠ বাটির একটী ঘরে ছিল; তথায় অল্প স্বল্প ঔষধাদি রাখিয়া মঠস্থ সকলের এবং প্রতিবাসীদেরও ঔষধাদি দেওয়া হইত।

কিন্তু ক্রমশঃ বাহিরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মঠের ভিতর নিত্যই জনতা ও গোলমালের জন্য একটী পৃথক্ ঔষধালয় নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। ঐ ঔষধালয়টী নির্ম্মিত হওয়ায় গ্রামের ও গ্রামান্তর হইতে আগত পীড়িত নরনারীগণের চিকিৎসার বড়ই সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থাভাব বশতঃ

ঔষধাদির অনাটন হওয়ায় ঔষধালয়টীর যাহা উদ্দেশ্য তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না।

এদিকে ঔষধালয়টীর উপর সাধারণের এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা মনে করে মঠের সাধুদের ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যাইবেই। উক্ত কারণে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরাও পীড়িত নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহাদের সেবাদি কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে তাহার চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু প্রত্যহ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আজকাল এই মহার্ঘের বাজারে সকলের জন্য সকল প্রকার ঔষধ একজনের পক্ষে দান করা অসম্ভব। সেই জন্য সহৃদয় সাধারণের নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি, যাঁহার যতটুকু সাধ্য ঔষধ, পথ্য ও অর্থসাহায্যাদি শ্রীভগবানের কার্য্য ভাবিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া উক্ত সেবাকার্য্যে সহায়তা করুন।

ইং ১৯১৬ ও ১৭ সালের একই সময়ের ষাণ্মাসিক রোগীর সংখ্যা তুলনায় আলোচনা করিলে বৎসর বৎসর রোগীর সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বেশ বুঝা যাইবে। ইং ১৯১৬ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত নূতন রোগীর সংখ্যা ৯৬২ ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা ১৭১৭। ইং ১৯১৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত নূতন রোগীর সংখ্যা ১৬৭৯ আর পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৪২৬২।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়, জেলা হাওড়া।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন।

(স্বামী সারদানন্দ)

পাণিহাটি মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদনা বৃদ্ধি হইল। সেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আর্দ্রপদে বহুক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে বারম্বার অনুযোগ করিলেন এবং পুনরায় ঐরূপ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং বালক-স্বভাব ঠাকুর ঐ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত দোষ রামচন্দ্রপ্রমুখ কয়েক জন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া বলিলেন, "উহারা যদি একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি পাণিহাটিতে যাইতে পারিতাম।" চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও রামবাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব মতের প্রতি অনুরাগবশতঃ পাণিহাটির উৎসবে যাইবার জন্য তিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এখন ঐবিষয়ে সমধিক দোষভাগী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। আমাদিগের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে ছোট তক্তাখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলেন —"বালককে শাসন করিবার জন্য কোন কার্য্য করিতে নিষেধ

করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে যেমন বিষণ্ণ হইয়া থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? তিনি তাহাতে গলার প্রলেপ দেখাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন 'এই দ্যাখ্ না, ব্যথা বাড়িয়াছে, ডাক্তার বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে।' বলিলাম, তাই ত মশায়, শুনিলাম সেদিন আপনি পেনেটি গিয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্যই ব্যথাটা বাড়িয়াছে। তিনি তাহাতে বালকের ন্যায় অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন,—'হাঁ, দ্যাখ্ দেখি এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা, আর রাম কি না আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশ-করা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করতো তাহলে কি আমি সেখানে যাই।' আমি বলিলাম, তাই ত মশায়, রামের ভারি অন্যায়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে। শুনিয়া তিনি খুসী হইলেন এবং বলিলেন, 'তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়, এই দ্যাখ্ দেখি—তুই কতদূর থেকে এলি। আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?' বলিলাম, আপনাকে দেখিলেই আনন্দ হয়, কথা নাই বা কহিলেন, আমাদের কোন কষ্ট হইবে না,' ভাল হউন, আবার কত কথা শুনিব। কিন্তু সেকথা শুনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট প্রভৃতি সকল বিষয় ভুলিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ক্রমে আষাঢ় অতীত হইল। মাসাধিক চিকিৎসাধীন থাকিয়াও ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অন্য সময়ে স্বল্প অনুভূত হইলেও একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তখন কোনরূপ কঠিন খাদ্য ও তরিতরকারি গলাধঃকরণ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত। সুতরাং দুধ ভাত ও সুজির পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর ঐ সকল দিন অতিবাহিত করিতেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষাপূর্ব্বক স্থির করিলেন, তাঁহার

clergyman's Soar throat হইয়াছে। অর্থাৎ লোককে দিবারাত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে বাগ্‌যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ঐরূপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগ নির্ণয় করিয়া ডাক্তারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্ মানিয়া চলিলেও দুইটি বিষয়ে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্যসংযমের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরূপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবুদ্ধি হারাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মুহ্যমান জনগণ পথের সন্ধান ও শান্তির প্রয়াসী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে উপদেশাদি প্রদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিসকলের আগমন বড় স্বল্প হইতেছিল না। পূর্ব্বপরিচিত ভিন্ন পাঁচ সাত বা ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে ধর্ম্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দ্বারে নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুকাল পর হইতে নিত্যই ঐরূপ হইতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ বৎসরে ঠাকুরের নিয়মিত কালে স্নান আহার, এবং বিশ্রামের সত্য সত্যই অনেক সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। তদুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাঁহার নিদ্রা স্বল্পই হইত। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থানকালে আমরা কতদিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ করিতেছেন, কখন পশ্চিমের কখন উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, আবার কখন বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরূপে রাত্রের ভিতর

তিন চারি বার শয্যাত্যাগ করিলেও রাত্রি ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ, মনন, নাম, গুণ-গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবসে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিদ্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি।

অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, ঠাকুর তদ্বিষয় আমাদিগের কাহাকেও না বলিলেও উহার পরিচয় শ্রীশ্রীজগদম্বার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কখন কখন পাইতাম কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জনৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ছোট তক্তাখানির উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "যত সব এঁদো লোককে এখানে আন্‌বি এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুঁ দিয়ে জাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আমার চোখ্ গেল, হাড় মাটি হল— অত করতে আমি পার্‌ব না, তোর সখ থাকে তুই কর্‌গে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের তুই এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে!" অন্য এক দিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম, বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে— যাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আসে।" ঐরূপে লোকশিক্ষায় সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈক স্ত্রীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তুই জল ঢাল, আমি কাদা করি।" ধর্ম্মপিপাসুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েক দিন পরে এক দিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, "এত লোক কি আন্‌তে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়াছিস! লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই

না! একটা ত এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া), রাত-দিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিক্‌বে?”

বাস্তবিক, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি ও অমৃতময়ী বাণীর কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভের আশয়ে নিত্যই দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মোহিত হইয়া তদবধি পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া হইবার পূর্ব্বে ঐরূপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হওয়া সুকঠিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার সুযোগ কখন উপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় একপ্রকার ভালই হইয়াছিল, নতুবা আমার পূজ্য দেশপূজ্য হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ তাঁহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এত দিন যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্য দর্শনে বহু পূর্ব্বে বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত—কারণ, তাঁহার নিজ মুখে তাঁহারা বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন, “অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের) অন্তর্দ্ধান হইবে।”

তাঁহার দেহরক্ষা করিবার কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত ঠাকুর সময়ে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেমে অন্ধ আমরা সে সকল কথা তখন শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাঁহার অলৌকিক কৃপা লাভে আমরা যেরূপ ধন্য হইয়াছি, আমাদিগের আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত সকলে তদ্রূপ কৃপা লাভে শান্তির অধিকারী হউক—এই বিষয়েই তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহার অদর্শনের কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? কণ্ঠরোগ হইবার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে

ঠাকুর ঐবিষয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে, দেহ রক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।" কণ্ঠ-রোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্য পদার্থ যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন—কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্ব্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন এবং অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া বহুদিবস না আসিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোল ভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐবিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর ঐরূপে বুঝাইলেও তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।"

লোকশিক্ষা প্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ ঐ বিষয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই। অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং কোন্ এক দৈব শক্তির আবেশে আত্ম-হারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের ভাবুক তাঁহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধি লাভ

করিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধাসকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় করাইতেন। ঐরূপে দেহপাতের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া দিয়াছেন!

লোকের মনের নিগূঢ় ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা তাঁহাতে চিরকাল সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি। শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা তাঁহার মনকে যে কখন স্পর্শ করিত না উহা তদ্বিষয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেও নিজ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তিনি উহা কখনও প্রকাশ করিতেন না। যখন যতটুকু প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইত, তখন ততটুকু মাত্র প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া দিতেন। অথবা কোন সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্য তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ বিষয়ক সামান্য একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের কণ্ঠের বেদনা বৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণের শেষে আমাদিগের সুপরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্য এক রমণী ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরকে দিবার মত আজ বাটীতে দুধ ভিন্ন অন্য কিছু নাই যাহা তোর হাতে পাঠাই, এক ঘটি দুধ লইয়া যাইবি?" পূর্ব্বোক্ত রমণী তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ভাল দুধের অভাব নাই, তাঁহার জন্য দুধ বরাদ্দও আছে জানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।"

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্য দুধ ভাত ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না—এবং কোন কারণে গয়লাণী সে দিন নিত্য বরাদ্দ দুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দুধ না লইয়া আসায় তিনি তখন বিশেষ অনুতপ্তা হইলেন এবং পাড়ায় কোন স্থানে দুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদূরে 'পাঁড়ে গিন্নি' নামে পরিচিতা এক হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, তাহার সকল দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; কেবল দেড় পোয়া আন্দাজ উদ্বৃত্ত থাকায় সে উহা জ্বাল দিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজন বলায় সে ঐ দুগ্ধ তাঁহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সে দিন ভাত খাইলেন। আহারান্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত বুলাইয়া দাও তো।" রমণী ঐকথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিবার পরে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐ মন্ত্র জানি, উনি একথা কিরূপে জানিতে পারিলেন? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন রমণীর নিকটে আমি উহা সকাম কর্ম্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধি জানিয়া বহুপূর্ব্বে শিখিয়া লইয়াছিলাম, পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্ত্তব্য জানিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তাভজা মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি ঘৃণা করেন ভাবিয়া ঐবিষয় তাঁহার নিকটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—কেমন করিয়া উনি তাহা টের পাইলেন!" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐকথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, উনি সকল

কথা জানিতে পারেন, অথচ মনমুখ এক করিয়া সদুদ্দেশ্যে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তাহাকে কখন ঘৃণা করেন না; তোমার ভয় নাই; আমিও ইঁহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উঁহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা এখন ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও।"

শ্রাবণ যাইয়া ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা এক দিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিল। বাগবাজারবাসিনী জনৈকা রমণী সেদিন তাঁহার বাটীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার তাঁহার বিশেষ আকিঞ্চন ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ জানিয়া সেই আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্য একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টা হইলেও ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া না আসায় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে ভোজনে বসাইতেছেন, এমন সময়ে সে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল —ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, সেইজন্য আসিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (মহেন্দ্র), প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল, কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্ব্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে। ভোজনকালে নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "যাঁহাকে লইয়া এত আনন্দ তিনি বুঝি এইবার সরিয়া যান, আমি ডাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি ঐরূপ কণ্ঠরোগ ক্রমে ক্যান্সারে (cancer)

পরিণত হয়, অন্ত রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই।”

পরদিবস ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ হইতে গঙ্গা দর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া লইয়া অনতিকাল পরে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু ভাগীরথী তীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐস্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যত দিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি ঐস্থানে থাকিয়া যাইলেন।

বাটীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধিসম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, “ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে, রোহিণী তাহাই, শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।” কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহ কালের মধ্যেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বৈঠকখানা ভবনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ব্ববাদিসম্মত হইল।

এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের সর্ব্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বহুব্যক্তি তাঁহার দর্শনমানসে যখন তখন দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসব স্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে সুগম নহে তাহাদিগকে ধর্ম্মালোক প্রদানের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজন-কাল পর্য্যন্ত, এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এবং ভজনসঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছ লিত করিয়াছিলেন। সকল দিবস সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর বলরামের ভবনে এই কয় দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরস্ত হইব।

আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই এক

দিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। এক দিবস অপরাহ্নে ঐরূপে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ এবং গিরিশচন্দ্র এবং কালিপদ * মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন,

আমায় ধর নিতাই।

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া একব্যক্তি পরমপ্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্ জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠ্‌ল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে
অষ্ট সখি সাক্ষি তাতে
(এখন) কি দিয়ে সুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, "বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল

* শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকালীপদ ঘোষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" ঐরূপে উপর্য্যুপরি তিন বার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম,ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। গোস্বামী যেমন ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য

(সিষ্টার নিবেদিতা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর).

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল বিবাহসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা রহিয়াছে। সে সকল স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাত্যে একটী বক্তৃতার এক স্থলে তিনি সবিস্ময়ে বলিতেছেন, "এই সকল দুর্দান্ত স্ত্রীলোক—যাহাদের মন হইতে 'সহ্য কর, ক্ষমা কর' প্রভৃতি শব্দ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!" তিনি ইহাও স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না যে, যেখানে বিবাহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিলে ভবিষ্যৎ মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব ও সাহসের কার্য্য। তিনি সর্ব্বদাই দেখাইয়া দিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শগুলির মধ্যে পরস্পর আংশিক

আদানপ্রদান দ্বারা উভয়কেই একটু তাজা করিয়া লওয়া আবশ্যক। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া দোষারোপ করিতেন না, এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে, ঐগুলি এমন কোন অনাচার দূর করিবার চেষ্টা হইতেই ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা উহাদের সমালোচক মহাশয় খুব সম্ভবতঃ নিজের একগুয়েমী বশতঃই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঘড়ির দোলনটা (Pendulum) কোন এক দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিতে পারিতেন।

ভারতবর্ষে একদিন তিনি, বিবাহ পাত্রপাত্রীর নিজেদের পছন্দমত না হইয়া অভিভাবকগণের ব্যবস্থানুযায়ীই হইয়া থাকে, এই কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ওঃ! এদেশে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা রহিয়াছে! ইহার কতকটা অবশ্য সকল সময়েই ছিল। কিন্তু এখন ইউরোপীয়গণকে ও তাহাদের অনুরূপ রীতিনীতিসকল দেখিয়া উহা বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজ জানিতে পারিয়াছে যে, অন্য একটা রাস্তাও আছে!"

জনৈক ইউরোপবাসীকে তিনি আবার বলিলেন, "আমরা মাতৃভাবকে বাড়াইয়া তুলিয়াছি, তোমরা জায়াভাবকে; এবং আমার মনে হয়, একটু আদানপ্রদান দ্বারা উভয় পক্ষই লাভবান হইতে পারে।"

তার পর তাঁহার সেই স্বপ্নের কথা; যাহা তিনি জাহাজে আমাদিগের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন—"স্বপ্নে আমি দুই ব্যক্তির গলা শুনিতে পাইলাম—তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবাহাদর্শসমূহের আলোচনা করিতেছে, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যাহা এখনও জগতের পক্ষে হিতকর বলিয়া অত্যাজ্য।" এই দৃঢ়বিশ্বাস হেতুই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শগুলির মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে অত সময় অতিবাহিত করিতেন।

তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষে পত্নী স্বামীকে যত ভালবাসে, পুত্রকে পর্য্যন্ত স্বপ্নেও সেরূপ ভালবাসিতে পারে না। তাহাকে সতী হইতে হইবে। কিন্তু স্বামী মাতাকে যত ভালবাসে, স্ত্রীকে তত ভালবাসিতে

পাইবে না। সুতরাং ভারতে ভালবাসার পরস্পর আদানপ্রদান প্রতিদানরহিত ভালবাসার ন্যায় উঁচু জিনিস্ বলিয়া বিবেচিত হয় না। উহা 'দোকানদারী'। স্বামী স্ত্রীর সর্ব্বদা একত্রাবস্থানের আনন্দ ভারতবর্ষে সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এটী আমাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের নিকট হইতে লইতে হইবে। আমাদের আদর্শকে তোমাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করিয়া লইতে হইবে। আর তোমাদেরও আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা লওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি মাত্র লোকের মনে এই ধারণাই অপর সকল চিন্তাকে অভিভূত করিয়া বলবতী হইত যে, যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল আত্মার মোক্ষ ও জগতের সেবা সেই সন্ন্যাসজীবন, যাহা স্বচ্ছন্দতা ও গৃহসুখের প্রয়াসী সেই গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহা মহা কর্ম্মিগণ সময়ে সময়ে পোষ্যবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার প্রয়োজন অনুভব করেন। একবার তিনি সস্নেহে ও অতি সদয়ভাবে জনৈক শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি এই সকল গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের সাধ কখনও কখনও তোমার মনে উঠে, তজ্জন্য চঞ্চল হইও না। এ সকল আমারও কখনও কখনও মনে আসে!" আর একবার জনৈক বন্ধুর মুখে তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করিতেছেন, এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "প্রত্যেক কর্ম্মী সময়ে সময়ে ঐরূপ বোধ করিয়া থাকেন!"

কিন্তু তিনি ভাবিতেন যে, কোন সামাজিক আদর্শকে মিছামিছি বাড়াইয়া তুলিয়া অবশেষে যাহা সমাজের গণ্ডীর পারে অবস্থিত, তাহার চিরন্তন মাহাত্ম্যের লাঘব করায় মহা অনর্থের সম্ভাবনা আছে, তিনি জনৈক শিষ্যকে গুরুগম্ভীর ভাবে এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি যাহাদিগকে শিক্ষা দিবে, তাহাদের প্রত্যেককে এই কথা বলিতে কদাপি ভুলিও না—

'মেরু সর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥'

—মেরু ও সর্ষপের মধ্যে যে প্রভেদ, সূর্য্য ও খদ্যোতের মধ্যে যে প্রভেদ, সাগর ও নদীর মধ্যে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।

তিনি জানিতেন যে, ইহাতে ধর্ম্মগরিমারূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে, তাঁহার নিজের উহা দমন করিবার উপায় এই ছিল যে, তিনি নিজ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তমাত্রের নিকটই—তা গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন—শির নত করিতেন। কিন্তু উক্ত বাক্যের মর্য্যাদা হ্রাস করা, তাঁহার চক্ষে, আদর্শটীকেই ছোট করিয়া ফেলা—উহা তিনি কোন মতেই করিতে পারিতেন না। বরং তিনি অনুভব করিতেন যে, এ যুগে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের উপর একটী মহাগুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে—সেটী বিবাহিত জীবনেও সন্ন্যাসাদর্শগুলিকে প্রচার করা; উদ্দেশ্য, যাহাতে কঠিনতর পথটী অপেক্ষাকৃত সহজ পথটীর উপর সর্ব্বদা নিজের সংযমশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে, এবং প্রণয়ের আপাতমধুর মোহজাল—যাহা হৃদয়মনের একান্ত প্রীতিকর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী লাভের দোহাই দিয়া, মানবজীবনের চরমলক্ষ্য যে আত্মার নিজ মহিমায় অদ্বিতীয় ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি, তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়—সে মোহজাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যই বিশ্বাস করেন যে, বিবাহের চরম পরিণতি মানবের নিজ স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি; ইহার অর্থই এই যে, উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে হয়। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মানবত্ব ঈশ্বরত্বে লীন হয়, এবং তদবধি সমগ্র জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই আদর্শের যথার্থতা এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ চরম অবস্থায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধের মধ্যে ভালবাসার একবার বৃদ্ধি, একবার হ্রাস, ক্রমাগত এইরূপ প্রবৃত্তির জোয়ার ভাঁটা হইতে থাকে। কিন্তু যখন বাহ্যসম্বন্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তখন প্রেমের আর হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

এখন হইতে মন প্রেমাস্পদকে সমভাবে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া থাকে।

তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার মতামতের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁহার কাশ্মীরে একদিনের উক্তিটীর কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। সে দিন রবিবার প্রাতঃকাল; উভয় পার্শ্বে সারি সারি পপ্‌লার গাছের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে; তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে স্ত্রীজাতি ও জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন; আমরাও শুনিতেছি। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্মের গৌরব এই যে, উহা কতকগুলি আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু কখনও একথা বলিতে সাহস করে নাই যে, ঐগুলির কোন একটীই একমাত্র সত্য পন্থা। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে। বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসমার্গকে অন্য সকল পথ অপেক্ষা ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছে, এবং বলে যে, উহাই সকল মুমুক্ষুর একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা। মহাভারতে এক ছোকরা সাধুর গল্প আছে; তিনি জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে একজন বিবাহিতা নারীর নিকট এবং পরে একজন মাংসবিক্রেতার নিকট যাইতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই গল্পটীই পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ। পতিব্রতা এবং ব্যাধ উভয়েই জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন দ্বারাই আমরা এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি।'' স্বামিজী উপসংহারে বলিলেন, "দেখিতেছ, এমন কোন জীবিকা নাই, যদ্দারা ভগবানের নিকট পৌঁছান না যায়। তাঁহাকে লাভ করা না করা শেষটা শুধু প্রাণের ব্যাকুলতার উপর নির্ভর করিতেছে।"

কোন্ জীবনে কতটা পরিমাণে আদর্শ পবিত্রতার প্রকাশ, তাহা লইয়াই যে সকল জীবনের মহত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয়—এই ব্যাপারটীকে মতবাদ হিসাবে স্বামিজী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। তবে কতক-গুলি লোক আছে, যাহারা উহার কদর্থ করিয়া এইরূপ মিথ্যা দাবি করিয়া থাকে যে, তাহাদের বিবাহ শুধু ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত

হইয়াছে। সাধু হিসাবে স্বামিজী এই সকল লোকের উক্তিকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, আমরা আত্মগরিমা-বশতঃ সর্ব্বদাই নিজ নিজ কার্য্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে ঐরূপে অজ্ঞাতসারে বাড়াইয়া তুলি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার প্রায়ই এমন সব লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত, যাহারা বিলাসের মধ্যে অলসভাবে জীবন যাপন করিলেও বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার নামগন্ধ নাই, বলিত যে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই তাহারা সংসারে রহিয়াছে; এবং তাহাদের নানা ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহারা বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই ত্যাগ অভ্যাস ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত এই সকল অলীক কল্পনার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শুধু এই উত্তর দিতাম যে, এরূপ সব মহাপুরুষ ত ভারতবর্ষে জন্মান না। মহাত্মা জনক রাজাই এই প্রকারের আদর্শ পুরুষ ছিলেন, এবং সমগ্র ইতিহাসে জনকরাজা মাত্র একবারই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!" এই বিশেষ ভ্রমটীর সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়া দিতেন যে, দুই প্রকার Idealism (আদর্শবাদ) আছে; একটী—যথার্থ আদর্শটীকেই পূজা ও উচ্চাসন প্রদান করা; অপরটী—আমরা নিজে যে অবস্থাটা লাভ করিয়াছি, তাহাকেই বাড়াইয়া স্বর্গে তোলা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদর্শটীকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের অহংজ্ঞানেরই নিম্নে আসন দেওয়া হইল।

কিন্তু তাঁহার এই কঠোর সমালোচনা কোন শুষ্ক দোষদর্শীর (cynic) মত ছিল না। যাঁহারা আমাদের আচার্য্যদেবের 'ভক্তিযোগ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশেষ উক্তিটী মনে পড়িবে যে, প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে আদর্শটীকেই দেখে। আমি তাঁহাকে একটী বালিকাকে বলিতে শুনিয়াছি—বালিকার একজনের প্রতি প্রণয়ের কথা তখন সদ্য টের পাওয়া গিয়াছে—"যতদিন তোমরা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে আদর্শটীকেই দেখিতে পাইবে, ততদিন তোমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুখ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে।"

আমাদের আচার্যদেবের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিসকলের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া মহিলার কিন্তু এই বিশ্বাস ছিল যে, স্বামিজী সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাবশতঃ বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও উপকারিতা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই। উক্ত মহিলা নিজে দীর্ঘকাল বৈধব্য জীবন যাপন করিতেছিলেন এবং বিবাহিত জীবনে অসাধারণ সুখভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, স্বামিজী দেহাবসানের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, এই বিষয়ে যে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাকেই জ্ঞাপন করিতে চাহিবেন। আবার যে পত্রবাহক তাঁহার পত্রখানি মহিলার বহুদূরস্থিত গৃহে পৌঁছাইয়া দিল, সেই তাঁহার দেহত্যাগের তারের সংবাদও ঐ সঙ্গে তাঁহার হাতে দিল। কে জানিত পত্রখানি এরূপ দারুণ শোকের সময় যাইয়া উপস্থিত হইবে? পত্রখানিতে স্বামিজী লিখিতেছেন—"আমার মতে কোন জাতিকে অখণ্ড ব্রহ্ম-চর্য্যের আদর্শে উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে মাতৃভাবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে হইবে,—বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই ইহার সোপান। রোম্যান ক্যাথলিক ও হিন্দু-গণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া প্রভূত শক্তিশালী মহাশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ ও নারীসকলের সৃষ্টি করিয়াছে। আরবীদিগের নিকট বিবাহ একটা কড়ারে বন্দোবস্ত, বা জোরপূর্ব্বক দখল, যাহা ইচ্ছামাত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। ফলে আমরা দেখি যে, তাহার চির-কুমারী বা ব্রহ্মচারীর আদর্শের বিকাশ নাই। আধু-নিক বৌদ্ধধর্ম্ম, যে সকল জাতি এখনও বিবাহবন্ধনের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের হাতে পড়িয়া, সন্ন্যাসকে অতি বিকৃত কদাচারপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যতদিন জাপানে বিবাহ সম্বন্ধে (পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও প্রণয় ছাড়া) একটা মহান্ ও পবিত্র আদর্শ গড়িয়া না উঠিতেছে, ততদিন কিরূপে তথায় উচ্চদরের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সকল জন্মিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন আপনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পতিপত্নীর

মধ্যে সম্বন্ধটীকে পবিত্র ও অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবনের গৌরব, সেইরূপ আমিও ক্রমশঃ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই মহাপবিত্র বন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইলেই কতিপয় শক্তিশালী আজীবন ব্রহ্মচর্য্যবান পুরুষ ও নারীর উদ্ভব হইতে পারিবে।"

আমাদের কেহ কেহ বোধ করেন যে, এই পত্রখানিতে স্বামিজী যতটা অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও ব্যাপকতর অর্থ নিহিত আছে। যে মহা দর্শনে বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই তাহার শেষ কথা। যদি দাম্পত্যবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য জ্ঞান করাই সমাজকে নির্জ্জনবাস ও সংযমে গঠিত সন্ন্যাসজীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাইবার সোপান স্বরূপ হয়, তাহা হইলে সংসারের কর্ত্তব্যগুলিকে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করাও পূজাপ্রার্থনাদির ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম পবিত্র উপায়স্বরূপ হইল। সুতরাং এখানে আমরা একটী সাধারণ নিয়মের পরিচয় পাইলাম, যদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, কেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি প্রভৃতিকে তত প্রশংসা না করিয়া, বরং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে চরিত্রদার্ঢ্যের বিকাশেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। আবার, স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও যে কেন সর্ব্বদা সকলকে শক্তিমান হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন, তাহার ভিতরকার অর্থও আমরা বুঝিতে পারি। উহার কারণ নির্ণয় অতি সহজ। যদি "বহু ও এক, ইহারা একই মনের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট একমাত্র সত্তা" হয়, তাহা হইলে এক কথায় বলা যায়, চরিত্রই ধর্ম্ম। জনৈক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন বলিয়াছেন, সত্য সত্যই—"জগতের সাধারণ জিনিষগুলিকে গ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের মধ্যে চলা ফেরার নামই মহত্ত্ব; এবং গভীর প্রেম ও প্রভূত সেবার নামই সাধুতা।" কে জানে, হয়ত এই সহজ সত্যগুলিই অবশেষে এ যুগের নবধর্ম্মবাণীর অস্থি-মজ্জা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা যে সম্ভবপর, আমাদের আচার্য্য-

দেবের নিজ মুখের এই কথাগুলিই তাহার নিদর্শন, "সর্ব্বোচ্চ সত্য সকল সময়েই অতি সহজ।"

ব্রজ-ভ্রমণ

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

এবৎসর জন্মাষ্টমীর দুই চারি দিন পরে শুনিলাম যে, শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে যাত্রীরা ব্রজ-চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণে যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা-স্থলী দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদেরও বড় ইচ্ছা হইল। আমি ও আমার বন্ধুতে মিলিয়া যাত্রীদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বৃন্দাবন-ধামের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক ব্রহ্মচারীজী আমাদের বলিলেন যে, যাত্রীরা রাস্তায় অনিয়ম, দূষিত আহার ও জল পান করিয়া দুরন্ত গরমে তপ্ত বালি ও কাঁটা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া যায়। এই সব অত্যাচার এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনেকেই নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের জন্য যদি পথে ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অনেকের বিশেষ উপকার হয়। আমরা ব্রহ্মচারীজীর নির্দ্দেশমত কতকগুলি হোমিওপ্যাথি-ঔষধ লইয়া বৃন্দাবন-বিহারীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাদ্র ত্রয়োদশীতে ৩টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রতিবৎসর ভাদ্র কৃষ্ণাদশমীর দিন ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণের জন্য যাত্রীরা বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া বাহির হইত এবং সন্ধ্যায় মথুরায় শ্রীশ্রীভুতেশ্বর মহাদেবের স্থানে আসিয়া, মথুরার চৌবে পাণ্ডা ও অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, পরদিন অতি প্রত্যুষে আবার পথ চলিত, কিন্তু গত বৎসর এই চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চৌবে পাণ্ডা ও বৃন্দাবনের ব্রজবাসী

পাণ্ডাদের সহিত পয়সা ও প্রাধান্য লইয়া বিবাদ এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এবার যাত্রার অন্য রকম ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের হুকুমে মথুরার দলের তিন চারি দিন পরে ব্রজবাসী দলকে যাত্রা করিতে হইয়াছিল।

৮৪ ক্রোশ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বদিন বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করিতে হয়। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি ও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা করিলাম। সন্ধ্যাকালে ৺গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরে একত্রিত হইয়া ভাগবতপাঠ নামসংকীর্ত্তন এবং যাত্রার নানাবিধ আলোচনা প্রভৃতি কর্ম্মে অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত করিলাম। তাহার পর যে যাহার স্থানে ফিরিয়া গেলেন। আমরা জয়পুররাজ-প্রতিষ্ঠিত নূতন মন্দিরে বাকি সময়টুকু কাটাইয়া দিলাম। অতি প্রত্যুষে যাত্রীদের সহিত একত্রিত হইয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হইলাম।

এখানে বৃন্দাবন-ধাম ও উহার অন্যান্য স্থানগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইলে মন্দ হইবে না।

ই, আই, রেলওয়ের হাত্রাস জংসন ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ পোয়া রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া হাত্রাস সিটি ষ্টেশনে বি, বি সি, আই রেলওয়ের ছোট গাড়িতে বদলী করিয়া মথুরা জংশন ষ্টেশনে আসিতে হয়। এখানে বৃন্দাবনের গাড়ি প্রস্তুত থাকে। গাড়ি বদল করিয়া বৃন্দাবনে আসিতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে। কেহ কেহ মথুরা হইতে একা অথবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া থাকেন। বৃন্দাবন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই, ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ দলে দলে আসিয়া পিতার নাম, জিলা, গ্রাম প্রভৃতির নাম, বৃন্দাবনে আগন্তুকের পাণ্ডা আছে কি না—যদি থাকে তাহার নাম ইত্যাদি তত প্রকার প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় খাতা খুলিয়া আগন্তুকের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কে কবে শ্রীধামে আসিয়া কোন পাণ্ডাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠের ছাড়পত্র পাইয়াছিলেন, তাহার নজির দেখাইবার জন্য মহা গোলযোগ সৃষ্টি

করে। যাহা হউক, উহারই মধ্যে কোনও পাণ্ডাকে মনোনীত করিয়া লইতে হয়। কারণ স্থানীয় পাণ্ডা ভিন্ন তীর্থদর্শন সুসম্পন্ন হয় না।

যাঁহারা তীর্থদর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন ও যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে আসেন। পাণ্ডার বাড়ীতে থাকিবার সুবিধা না হইলে এবং পাণ্ডাকে বলিলে উাহারা অন্যত্র থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দেয়।

বাসায় কিছুকাল বিশ্রাম করিবার পর সময় ও সুবিধা হইলে যমুনা স্নান ও অন্যান্য নানাবিধ তীর্থক্রিয়াদি করিতে হয়। যমুনা স্নানকালে পাণ্ডারা যাত্রিগণকে একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া থাকে যে, বৃন্দাবনে অন্য কোনও পাণ্ডাকে তাঁহারা বরণ করিবেন না—এমন কি তাঁহাদের বংশের কেহ কখনও উক্ত পাণ্ডা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা তীর্থক্রিয়াদি করাইতে পারিবেন না। স্নান-ক্রিয়াদি সারিয়া দর্শনার্থী ৺গোবিন্দজীকে দর্শন করিবেন এবং ইচ্ছামত ভেট বা প্রণামী দিবেন। এই ভেটের টাকার হিসাবে যাত্রীর নামকরণ হইয়া থাকে—যথা ২৲ টাকা অথবা তদূর্দ্ধ সংখ্যা ভেট দিলে ৺ গোবিন্দজীর আশীর্ব্বাদী একখণ্ড লাল কাপড় মস্তকে জড়াইয়া দিয়া থাকে, এই লাল "উপন্না"ধারীকে "লাল যাত্রী" বলে। ১০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ ভেট দিলে জরির ঝালরযুক্ত কাপড় মস্তকে ধারণ করিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ "শিরপা"ধারীকে "শেঠযাত্রী" অথবা "শোভাযাত্রী" বলিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বৃন্দাবন-ধামের অধিকাংশ তীর্থগুলি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্য শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা অবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় ব্যাকুল হন এবং অনেক কঠোর তপস্যা করিয়াও ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া হতাশ হইয়া প্রায়োপবেশনে শরীর ত্যাগ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মকুণ্ড-

তীরে করুণস্বরে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহসঙ্গীত গাহিতেছিলেন। ভাবে বিভোর হওয়ায় নয়নের জল আর কিছুতেই বাধা মানিতেছিল না। এমন সময় একটি ব্রজবালক একভাঁড় দুধ লইয়া আসিল এবং ভাঁড়টি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া নিজ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাঁহার নয়ন মার্জ্জন করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। শ্রীরূপ বালকের অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং মিষ্ট ব্যবহারে মোহিত হইলেন। বালকের পুনর্দর্শনলালসায় তাঁহার আবার বাঁচিতে সাধ হইল। তিনি দুগ্ধ পান করিলেন। কিন্তু দুগ্ধ পান করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে উহা দুগ্ধ না অমৃত। শূন্য ভাঁড় রাখিয়া এই বিস্ময়কর ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছু পরে শূন্য ভাঁড়টিও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রজনন্দন যশোদাদুলাল তাঁহাকে দর্শন দিয়াও বঞ্চনা করিয়া গিয়াছেন। ক্ষোভে দুঃখে তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অবসন্ন শরীর ও মন রাত্রে নিদ্রার কোলে ঢুলিয়া পড়িল। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেই বালক অতি মধুর স্বরে বলিতেছে—"সে যোগপীঠ নামক স্থানে মাটির নীচে আছে এবং শ্রীরূপ যেন তাহাকে উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠা ও সেবা করেন।" স্বপ্নে ইহাও জানিতে পারিলেন যে, যে স্থানে মাটির উপর একটি দুগ্ধবতী গাভী তাহার স্তন্যধারা ঢালিতেছে সেই স্থানটিকেই যোগপীঠ বলে এবং সেই স্থানেই শ্রীরূপের ইষ্ট শ্রীশ্রীগোবিন্দজী আছেন। পরদিন গোস্বামীজী স্বপ্ন-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মাটি খুঁড়িয়া ৺গোবিন্দজীর বিগ্রহমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং যোগপীঠের নিকটেই কুঁড়ে তৈয়ার করাইয়া শ্রীবিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেই দেবসেবা করিতে লাগিলেন।

অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিং বাঙ্গালা দেশ হইতে নিজ রাজ্যাভিমুখে ফিরিবার কালে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে আসেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর অদ্ভুতভাবে প্রাপ্ত বিগ্রহমূর্ত্তির গঠন-নৈপুণ্য ও গোস্বামীজীর আন্তরিক সেবা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে মনস্থ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই সুদৃশ্য লাল

প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়া রাজার দেবতাপ্রীতির গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল এবং শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপ প্রকাণ্ড সুগঠিত ও সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত মন্দির এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। শুনা যায়, গোবিন্দজীর মন্দিরই বৃন্দাবনে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মন্দিরের চূড়া অত্যুচ্চ থাকায় মুসলমান সম্রাট্ আরঙ্গজেব তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ হইতে ইহার আলো দেখিতে পান, এবং হিন্দুর দেবমন্দিরের চূড়া তাঁহার প্রাসাদ-চূড়া হইতেও উচ্চতর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনাকরতঃ উহার উপরাংশ ভগ্ন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। শীঘ্রই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল, এবং এই ভগ্ন মন্দিরের মালমসলা লইয়া নিকটেই একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইল। সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া নমাজ করিলেন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। প্রবাদ আছে যে, মন্দির ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক ভগ্ন হইবার আগেই গোবিন্দজীর পুরোহিত বিগ্রহমূর্ত্তি লইয়া জয়পুরে পলায়ন করেন এবং সেই অবধি ৺গোবিন্দজী বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই।

হিন্দুদেবদ্বেষী আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানগণ বৃন্দাবনে বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করে এবং এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ৺মদনমোহনজী এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তিগুলিকে নিকটবর্ত্তী হিন্দুরাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। ৺মদনমোহনের মূর্ত্তিটিকে জয়পুর রাজার শ্যালক কশৌলীরাজ নিজ রাজধানী কশৌলীতে রক্ষা করেন। এখনও কশৌলীতে ৺মদনমোহনজী ও জয়পুরে ৺গোবিন্দজীর সুবৃহৎ মন্দির আছে এবং বিগ্রহমূর্ত্তির নিত্য সেবা গৌড়ীয় গোস্বামীদের দ্বারা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, মুসলমান অত্যাচার বন্ধ হইলে দেবমূর্ত্তিগুলিকে বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনা হয় এবং নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই রাখা হয়। ৺গোবিন্দজীকেও বৃন্দাবনের সেই পুরাতন মন্দিরে রাখা হয় নাই। এই পুরাতন মন্দিরের নিকটে ২৩ পরগণা বহড়ুর গ্রামনিবাসী জমিদার দেওয়ান নন্দকুমার বসু একটি নূতন

মন্দির তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন এবং অদ্যাবধি সেই মন্দিরে ৺গোবিন্দজী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত বিরাজ করিয়া শত শত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। ভগ্ন মন্দির এখন গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির নামে আখ্যাত হইতেছে এবং এই মন্দিরের নিকটেই যোগপীঠে ৺মহামায়া পূজিত হইয়া থাকেন। এই যোগপীঠ শ্রীরূপ গোস্বামীর সাধনস্থান বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়।

অনন্তর ৺গোবিন্দজী দর্শন করিয়া ৺মদনমোহন দর্শন করিতে হয়। এই স্থানেও ৺গোবিন্দজীকে যেরূপ ভেট দিতে হইয়াছে, সেইরূপ দিতে হয়।

৺মদনমোহন-বিগ্রহ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে।

শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন ইহা নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতবর্ণিত বনশোভা ও জয়দেববর্ণিত ইহার বসন্তশোভা কেবল কবিকল্পনাই ছিল। পৌরাণিক বৈভব এখন আর, নাই ৪৫০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান অত্যাচারে ইহা প্রকৃতই মহারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। মুসলমান শাসনে পরাধীন হিন্দুজাতি দেবতার জন্য ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পণ—আত্মোৎসর্গ একবারেই ভুলিয়া গেলেন। দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু আপন জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া—ভক্তি ও শক্তি হারাইয়া সেই পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামসদৃশ বৃন্দাবন বন্যজন্তুর আবাস মহারণ্যে পরিণত করিল। গৃহী আর সেই পবিত্র বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না, কাজেই কেবল সন্ন্যাসী ও সর্ব্বত্যাগী বিরক্ত বৈষ্ণব ভিন্ন সেই পবিত্র ভগবানের লীলাস্থানে কেহই আসিতে সাহস করিতেন না। ব্রজবাসী সকলে যে যেখানে সুবিধা পাইলেন, নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ সপারিষদে বৃন্দাবনে আসিয়া ভগবানের লীলাস্থানগুলি প্রথমে খুঁজিয়া পাইলেন না কিন্তু পরে

নিজ ঐশী শক্তিপ্রভাবে উহাদের উদ্ধারের উপায় কতকটা করিয়া যান এবং শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগকে ব্রজধামের লীলাস্থানগুলি উদ্ধার করিতে অনুজ্ঞা করেন। পার্ষদেরা শ্রীগুরুর আজ্ঞানুযায়ী সেই অরণ্যে বাস করিয়া লীলাস্থানগুলি উদ্ধার করিতে থাকেন এবং ক্রমে সেই বৃন্দারণ্য বৈষ্ণব তত্ত্বপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র করিয়া প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত করিলেন। কথিত আছে যে, সম্রাট্ আকবর বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সামন্তরাজপরিবৃত হইয়া রূপ-সনাতনের নিকট আসিয়াছিলেন। নানা দিগ্ দেশ হইতে শত শত সাধু, ভক্ত গোস্বামিদ্বয়ের নিকট অপূর্ব্ব ভাগবততত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ সেই বিশাল ও বিজন অরণ্য আবার ব্রজবালক বালিকায় পূর্ণ হইয়া পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালপ্রভাবে ইহা আর সুন্দর কুঞ্জকাননশোভিত, কদম্ব-তমাল-তরুরাজিবেষ্টিত সেই বৃন্দাবন নাই—এখন ইহা বৃহৎ অট্টালিকাপূর্ণ সহরে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকিয়া সাধনে ও প্রচারে রত হইলেন—কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রত্যহ সকালে মথুরায় মাধুকরি করিতে যাইতেন—মাধুকরি অর্থাৎ মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা স্থান হইতে আহার আহরণ করা। ব্রজমণ্ডলে এই মাধুকরি প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ সাধু ও বৈষ্ণবকে দিয়া থাকেন। বিরক্ত বৈষ্ণবের এবং অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর ইহাই একমাত্র পবিত্র ভিক্ষালব্ধ অন্ন।

একদিন সনাতন মথুরায় এইরূপ ভিক্ষায় গিয়াছেন এবং চৌবে ব্রাহ্মণের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন, কোনও চৌবে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর সুদৃশ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; মূর্ত্তিটীর উপর তাঁহার মন বড়ই আকৃষ্ট হইল। সেইদিন হইতে তিনি প্রত্যহই এইস্থানে আসিতেন ও মদনমোহনকে প্রথমে দর্শন করিয়া অন্যত্র ভিক্ষায় গমন করিতেন। একদিন মথুরা পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ বোধ হয়

মূর্ত্তিটীর দর্শন পাইবেন না, এবং দুঃখিতান্তঃকরণে সেই চৌবের বাড়ীতে আসিলেন—আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, সেই বিগ্রহ মনোহর মদনমোহন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, চৌবে বালকগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে ও বালসুলভ চঞ্চলতাবশতঃ চৌবে গৃহিণী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছে। সনাতন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন এবং একদৃষ্টে সেই সুঠাম বালককে দেখিতে লাগিলেন। বালকদের আহার শেষ হইলে, রমণী মাধুকরি লইয়া সনাতনকে আহ্বান করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মাধুকরি লইলেন না, সেই মদনমোহনরূপী বালকের উচ্ছিষ্ট প্রসাদস্বরূপ ভিক্ষা করিয়া লইলেন ও তাহাই ভোজন করিলেন। অন্যত্র ভিক্ষা করিতে আর সেদিন প্রবৃত্তি হইল না। তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। একাগ্রমনে বালকের ভোজনকালীন ব্যবহার স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, সেই বালক তাঁহার নিকট আসিয়া অতি মধুর স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, "তুমি আমাকে মথুরা হইতে আনিয়া নিজে যমুনার জল ও তুলসী দ্বারা পূজা করিও।" এদিকে চৌবের স্ত্রীকেও জানাইল যে তাঁহাকে যেন সনাতনের হস্তে দেওয়া হয়। পরদিন সনাতন অতি মাত্র পুলকিত হইয়া মথুরায় চৌবের বাড়ী আসিলেন ও চৌবে গৃহিণীকে নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রমণী কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে মদনমোহন সমর্পণ করিলেন। মূর্ত্তিটী পাইয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং একটি উচ্চ টিলার উপর কুঁড়ে প্রস্তুত করিয়া বিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন। মদনমোহনকে মথুরা হইতে আনিয়া অবধি সনাতন মাধুকরি ত্যাগ করিয়া মুষ্টি ভিক্ষাই করিতে লাগিলেন ও তাহাতে যাহা আটা পাইতেন তাহার "আঙ্গাকড়ি" অর্থাৎ একপ্রকার অতি পুরু ক্ষুদ্রাকার রুটি প্রস্তুত করিয়া ভোগ দিতেন ও নিজে সেই প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। অদ্যাবধি মদন-

মোহনকে আঙ্গাকড়ি ভোগ না দিলে পূজা সফল হয় না। কৌপীন মাত্র সম্বল ভিক্ষু সনাতন এই আঙ্গাকড়ি ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভোগ তাঁহার অতি প্রিয়তম দেবতাকে নিবেদন করিতে পারিতেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই বিষন্ন হইতেন। একদিন মুলতানবাসী কৃষ্ণদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী অতি দীনভাবে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া কাতরভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার পণ্যবাহী নৌকা নিকটস্থ কালীদহ ঘাটের বালির চরে আটকাইয়া গিয়াছে, কিছুতেই টানিতে পারা যাইতেছে না—তিনি যদি কৃপা করিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন তাহা হইলেই নৌকা ভাসিয়া উঠিবে। সনাতন শ্রেষ্ঠীর কাতরতা দেখিয়া দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে সম্মত হইলেন ও তাঁহাকে লইয়া বিগ্রহের নিকট আসিয়া নৌকা ভাসিয়া উঠিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রেষ্ঠী ঘাটে আসিয়া দেখিতে পাইল যে, নৌকা ভাসিয়া উঠিয়াছে ও তাহার লোকেরা অনেকে কলরব করিতেছে। চীরধারী ভিক্ষুর উপর দেবতার অশেষ কৃপা স্মরণ করিয়া শ্রেষ্ঠী বিস্মিত হইল এবং মনে মনে মদনমোহনের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিয়া আগ্রা অভিমুখে নৌকা লইয়া প্রস্থান করিল। আগ্রায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত পণ্য আশাতীত মূল্যে বিক্রয় করিল এবং মন্দির নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত বস্তু ও রাজমিস্ত্রি লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া সেই টিলার উপরেই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বিগ্রহের সেবা ও ভোগরাগের সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদনমোহন সামান্য কুটীর ছাড়িয়া সেই বৃহৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই মন্দিরে এখন আর মদনমোহনজী নাই। আরঙ্গজেবের অত্যাচারে এই শ্রীমূর্ত্তিও জয়পুরের নিকটবর্ত্তী কশৌলী রাজ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। কশৌলীরাজ নিজ রাজধানীতে সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গৌড়ীয় গোস্বামী দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও সেই মন্দিরে মদনমোহনজীর সেবা ও পূজাদি রাজব্যয়ে নির্ব্বাহ করা হইতেছে।

বৃন্দাবনে যে মন্দিরে এখন মদনমোহনজী বিরাজিত আছেন তাহা

বহতুর নিবাসী দেওয়ান নন্দকুমার বসু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে সম্রাটের একজন হিন্দু আমিন এই অঞ্চলে রাজকর আদায় করিতেন, তিনি এই মদনমোহনের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, যাহা কিছু রাজকর আদায় করিতেন সমস্তই বিগ্রহের সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এই অমিতব্যয়িতার জন্য সরকারের বিস্তর প্রাপ্য কর বাকি পড়িয়া যায় এবং তিনি দিল্লীতে কারারুদ্ধ হন। পরে কোন উপায়ে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন ও সমস্ত ত্যাগ করিয়া মদনমোহনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীমদনমোহন কারাগারে তাহাকে দর্শন দেন ও তাহাকে তথা হইতে মুক্ত করিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করেন। যাহা হউক, ইনিই পরে ভক্ত সুরদাস নামে আখ্যাত হন। ইঁহার রচিত ভক্তিরসাত্মক বহু সঙ্গীত আজিও ব্রজমণ্ডলে অতি আনন্দের সহিত গীত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমদনমোহন দর্শন করিয়া মধু পণ্ডিত স্থাপিত ৺গোপীনাথ দর্শন করিতে হয়। বংশীবটের নিকট গোপীনাথবাজারে ইঁহার সুবৃহৎ মন্দির ও সুন্দর স্থাপত্যনৈপুণ্যযুক্ত নাটমন্দির কচ্ছবাহ ঠাকুর-বংশীয় রায় সিংহ নামক এক সর্দ্দার প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচারে এ মন্দিরও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পুরাতন মন্দিরের নিকটেই—"গোপীনাথ ঘেরায়" ৺গোবিন্দজী ও ৺মদনমোহন জীর নূতন মন্দিরনির্ম্মাতা দেওয়ান নন্দকুমার বসু গোপীনাথের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

এই প্রধান তিন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাত্রীদের আপন আপন "গুরুপাট" দর্শন করিতে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত যাত্রিগণের এখানে অনেক গুরুপাট আছে। যথা, নিত্যানন্দ পরিবার, অদ্বৈত বা সীতা-নাথ পরিবার, আচার্য্য প্রভুর পরিবার ইত্যাদি। এই সকল বংশের গোস্বামী প্রভুরা যথায় বাস করেন সেই সকল স্থানকেই "গুরুপাট"

বলিয়া থাকে। তীর্থাদি দর্শন করিয়া কুলগুরুর ভেট না দিলে তীর্থ-ক্রিয়া সফল হয় না বলিয়া শুনা যায়।

শৈব ও শাক্ত যাত্রীদের গুরুপাট পূর্ণমাসী ও কেশেশ্বরী কৃষ্ণ-কালীর কুঞ্জ—এই উভয় স্থানে সম্প্রদায়ভেদে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়।

গুরুপাট দর্শন ও দক্ষিণাদি দ্বারা গুরুপূজা করিয়া যমুনা ও বৃন্দা-পূজা করিতে হয়। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর ও সর্ব্বকলুষ-নাশিনী যমুনা দেবীর পূজা না করিলে যাত্রিগণের বৃন্দাবনযাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। এই ছয়টি অবশ্য করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য দেব দর্শন করা কর্ত্তব্য।

বৃন্দাবনে প্রায় ৫০ সহস্র দেবালয় আছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলির নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ—এখানে লোকনাথ গোস্বামী ৺রাধাবিনোদ নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আজীবন তাঁহার সেবায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত, প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর এই লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য। গুরু শিষ্য উভয়ের সমাজ এখানেই আছে। এখানে যাত্রীদের নিকট এক আনা করিয়া ভেট লওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরাধারমণ—গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যস্থ বিগ্রহমূর্ত্তি ক্ষুদ্র। ইঁহার অনেক প্রকার বেশ হয়, এবং এই বেশ দেখিবার জন্য বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরাধা দামোদর—শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামিদ্বয়ের সমাজ বা সমাধি আছে।

মন্দিরের দক্ষিণে একটি অতি প্রাচীন বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারায় ক্লান্ত হইয়া ব্যাকুল চিত্তে এই বৃক্ষের তলায় বসিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের নিকটে শ্রীজীব গোস্বামীর সাধনকুটীর অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার

পর রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। দেববন-বাসী হরিবংশ নামে এক গৌড়ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য আশ্রয় করতঃ বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হোদল-গ্রামে অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষার্থ গমন করেন। ব্রাহ্মণ অতিথিকে যথাসাধ্য ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অতিথি উচ্চবংশীয় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পরিচয় পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। তাহার পর অতি বিনীতভাবে আর্থিক অসচ্ছলতা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার দুইটি কিশোরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হরিবংশ ব্রাহ্মণের কাতরতায় বিচলিত হইলেন ও কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়া নব পরিনীতা পত্নীদ্বয়সহ বৃন্দাবনে আসিলেন। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তাঁহার নূতন শ্বশুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন, ইনি সেই মূর্ত্তি বৃন্দাবনে লইয়া আসেন ও প্রতিষ্ঠা করেন। শুনা যায়, হরিবংশ স্বভাবতঃ বড়ই রসিক ছিলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় বিবাহ করিয়া তিনি আরও রসিক হইয়া পড়েন এবং পত্নীদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিবার জন্য "কিশোরী ভজন" ও "কামসাধন" প্রভৃতি মত চালাইয়া দেন। প্রথমে ইহাঁর ধর্ম্মকে কেহই বিশ্বাস করিত না কিন্তু পরে ইহার অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল।

নিধুবন—এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকা রাজা হইয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে কোটাল সাজাইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এখানে বাঁদরের বড় উপদ্রব—যাত্রীরা এই বনে আসিবার সময় কিছু ছোলাভাজা সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং বনে প্রবেশ করিয়াই ছোলাগুলি ছড়াইয়া দেন। বড় বড় বিকট বাঁদরের পাল সেই ছোলাভাজা কুড়াইয়া লইয়া খাইতে থাকে ও সেই সময়ে যাত্রিগণ কুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আছে।

নিকুঞ্জবন বা সেবাকুঞ্জ—শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। স্থানটি এখনও

বকুল, তমাল রাজিতে শোভিত। কুঞ্জের ভিতর শ্রীমতীর পট পূজা হইয়া থাকে—কৃষ্ণ নাই। এখানে কেহ কেহ ফুলসজ্জা দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে দানগলি মানগলি প্রভৃতি আরও অন্যান্য স্থান আছে।

শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী—সম্রাট্ আকবরের সময় স্বামী হরিদাস নামে এক পরম ভক্ত সাধু নিধুবনে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার অসাধারণ ত্যাগ বৈরাগ্য ও অপূর্ব্ব প্রেম ভক্তি দর্শনে বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। স্বামিজী একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আকবরের প্রিয় গায়ক মিঞা তানসেন ইঁহারই শিষ্য ছিলেন। গুরুর কৃপায় তানসেন অপূর্ব্ব সঙ্গীতশক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতের সঙ্গীত-গুরুরূপে পূজিত হইতেন। এখনও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভক্তিনম্র-শিরে মিঞা তানসেনের নাম করিয়া থাকেন। আকবর তানসেনের নিকট স্বামী হরিদাসের অসাধারণ সঙ্গীতশক্তির পরিচয় শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে স্বামিজীর ভক্তি-রসাত্মক গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বামিজীকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ত্যাগী বৈরাগ্যবান্ সাধু তাহা গ্রহণ করেন নাই। ৺বঙ্কুবিহারী হরিদাসের ইষ্টদেবতা—ইষ্টদেবতাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেও, স্বামিজী তাঁহার সাকার মূর্ত্তির দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইলেন। ভক্ত নিজ উপাস্যকে নানাভাবে উপভোগ করিতে চাহেন এবং ভক্তের ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপাসকের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন। স্বামিজীর ইচ্ছা হইবামাত্র স্বপ্নে ইষ্টদেবতা দর্শন দিলেন ও সেই স্থানের মাটির ভিতর হইতে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া সেবা করিবার আজ্ঞা দিলেন। পরদিন স্বামিজী সেই স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারীকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে স্বামিজীর শিষ্যগণের ব্যয়ে ৺বঙ্কুবিহারীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল স্বামিজীর বংশধর সেবাইতগণের উদ্যোগে ও নানা দেশীয় শিষ্যগণের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিহারীজীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের

কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শকের মন মোহিত করিয়া রাখে। বিহারীজীর ঝাঁকি দর্শন প্রসিদ্ধ। বিগ্রহের গঠন-নৈপুণ্য এত সুন্দর যে, একবার দেখিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে যে, কোনও যুবতী এই মূর্ত্তি দেখিয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, তিনি সমস্ত ভুলিয়া এই মূর্ত্তিটিকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন, কিন্তু পুরোহিতগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে ও মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে বাধা দেয়। ইহাতে যুবতী অধৈর্য্য হইয়া সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান; তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই। তদবধি এইরূপ ঝাঁকি অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে—কেহই ক্রমান্বয়ে এক মিনিট কালও দর্শন করিতে পান না। দেবতা একটু দীর্ঘ বিশ্রামপ্রিয় বলিয়া দর্শন সকাল ৯॥০ এবং সন্ধ্যায় ৮॥০ টার পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। বৎসরে একবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিহারীজীর সম্পূর্ণ—অর্থাৎ চরণ দর্শন হইয়া থাকে। মদনমোহন দর্শন করিয়া আসিবার কালে এই মন্দির রাস্তায় পড়ে।

শেঠের মন্দির—এই মন্দিরে অনেক দেবতা আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গজী প্রধান। শ্রীরামানুজ-প্রবর্ত্তিত "শ্রী" সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃন্দাবনে পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি শাখা আছে—বড়গলৈ ও তেঙ্কলৈ। তেঙ্কল শাখার শিষ্য প্রসিদ্ধ ধনকুবের শেঠ লছমীচাঁদ এই বৃহৎ কেল্লাসদৃশ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যনৈপুণ্য ইহাতে বর্ত্তমান। এত বড় মন্দির বৃন্দাবনে—এমন কি সমগ্র উত্তর ভারতে আর নাই। শেঠ লছমীচাঁদ প্রথমে জৈন ছিলেন, তৎপরে তেঙ্কলগুরুর মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়েন। ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক বড় বড় মন্দির আছে। মথুরায় দ্বারিকাধীশের সুবৃহৎ মন্দিরও ইঁহার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

লালাবাবুর মন্দির—কায়স্থকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবুর নাম বাঙ্গালীর নিকট অবিদিত নাই। লালাবাবুর অদ্ভুত ত্যাগের কাহিনী বাঙ্গালী কেন সমগ্র হিন্দু ভক্ত ভারতবাসীই

অল্পবিস্তর শুনিয়াছেন। ইনিই এই সুবৃহৎ মন্দির ২৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডের সংস্কারও ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। পুণ্য তীর্থ জ্ঞানে এই মন্দির দর্শন করিবার জন্য নানা দেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ আসিয়া থাকেন। মন্দিরস্থ বিগ্রহ ও অতিথিসেবার জন্য লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তিও লালাবাবু দান করিয়া গিয়াছেন। সেই সম্পত্তি হইতে দেবসেবা এবং শত শত অতিথি অভুক্তের রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপিত আছে।

ব্রহ্মচারীর কুঞ্জ বা মন্দির—গোয়ালিয়র রাজের অর্থানুকুল্যে তদীয় গুরু ব্রহ্মচারীজীর নামে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোপাল, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীশ্রীহংসগোপাল নামে তিনটি বিগ্রহমূর্ত্তি আছেন। নিত্য সন্ধ্যাকালে রাসযাত্রা হইয়া থাকে। বালকগণ কৃত এই রাসলীলা ও রাসগীতি শুনিবার জন্য বহুলোকসমাগমে এই স্থান সন্ধ্যাকালে মুখরিত হইয়া উঠে।

সাহাজীর মন্দির—বোম্বাই প্রবাসী কোনও ধনাঢ্য শেঠ এই শ্বেত পাথরের বৃহৎ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নাটমন্দির, বৈঠকখানা, বাঁকা বাঁকা থাম, মেজে ও প্রাচীরে সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত নানা বর্ণের ছবিগুলি দর্শকের মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। শ্রীপঞ্চমীর দিন এখানে একটি উৎসবও হয়। বহু দূর দেশ হইতে আগত ভক্তেরা, এই উৎসবে বিচিত্র, আলোকমালায় ভূষিত অপরূপ শোভান্বিত মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকেন।

গোপীনাথবাজার ও ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যপথে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কুঞ্জ আছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই স্থানে সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। ভক্ত সাধকগণ এই স্থান দর্শন করিতে সর্ব্বদাই আসিয়া থাকেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধামাধবজীর বিগ্রহমূর্ত্তি আছে। ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণ বলেন যে, এই বিগ্রহটিকে শ্রীজয়দেব গোস্বামী ঝুলিতে করিয়া আনিয়া স্থাপন করেন।

বৃন্দাবনের পশ্চিমদিকে শ্রীগরুড়-গোবিন্দ নামে একটি মনোহর স্থান আছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য রাখাল বালকগণ গোচারণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া পড়েন এবং বৃক্ষের নীচে বসিয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ খেলা করিবার পর তাঁহার কোনও নূতন ধরণের খেলা করিবার ইচ্ছা হইল এবং সখা শ্রীদামকে গরুড়রূপে উপবেশন করাইয়া নিজে উহার পিঠে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে উপবেশন করিলেন। রাখাল বালকেরা হঠাৎ তাঁহার অন্য রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল ও বাড়ী ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতরূপে ক্রীড়া করিবার সংবাদ পিতা, মাতা ও অন্যান্য গোপগণকে জানাইল। পরদিন ব্রজবাসী বৃদ্ধ গোপেরা উক্তস্থান দর্শন করিতে আসিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে দর্শন দিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপবৃন্দের অনুরোধে পূর্ব্বদিনের ন্যায় চতুর্ভুজ হইলেন এবং সেই নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গোপ ও রাখালবালকগণ মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বনজ ফল ও পুষ্পের দ্বারা পূজা করিল। অদ্যাবধি শ্রাবণের শুক্লা-অষ্টমীর দিন এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে এবং ঐ দিবস মথুরা, বৃন্দাবন ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ হইতে বহু লোক আগমন করিয়া বিগ্রহ দর্শন ও মেলার শোভা বর্দ্ধন করে।

(ক্রমশঃ)

মাধবদেব।

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

মাধদেবের পিতার নাম গোবিন্দ।* তিনি বাণ্ডুকা নামক গ্রামে বাস করিতেন। পত্নীবিয়োগে শোকসন্তপ্ত গোবিন্দ পুত্র দামোদরকে বাণ্ডুকায় রাখিয়া স্বয়ং বরদোয়ায় টেম্বুয়ানিবন্ধে প্রস্থান করেন। তথায় শঙ্করদেবের সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মে। গোবিন্দ অবশেষে জনৈকা শঙ্করাত্মীয়ার পাণিগ্রহণ করেন। কাছাড়ীদিগের উপদ্রববশতঃ শঙ্করদেবের ন্যায় গোবিন্দও সভার্য্য বাসস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ভুলিয়াগণ কর্ত্তৃক হৃত সর্ব্বস্ব হন। অবশেষে হরশিঙ্গা নামক জনৈক অসমীয় রাজকর্ম্মচারী নিঃসহায় গোবিন্দকে স্বগৃহে আশ্রয় দান করেন।

এই স্থলে ১৪১১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে, কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদ তিথি, রবিবার, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মাধবদেবের জন্ম হয়। গোবিন্দ পুত্রের দুইটী নাম রাখিলেন,—

করিয়া গণতি নাম থৈলা দুটী
মাধব রতনাকর।
প্রখ্যাত মাধব নাম ভৈলা তান
গুপুত ভৈলা অপর॥

কালে গোবিন্দ বিষম অর্থসঙ্কটে পতিত হইলেন। বিপদে পড়িয়া স্বতঃই তাঁহার সুদিনের বন্ধুবর্গের কথা মনে পড়িল। তিনি তাহাদিগের দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু দুর্দ্দিনে কেহই তাঁহাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে সম্মত হইল না। উৎসব, ব্যসন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজদ্বার ও শ্মশানে যিনি সমভাবে প্রিয়জনপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরূপ বন্ধুর

* ইঁহার অন্যান্য কতিপয় নামও দৃষ্ট হয়।

সংখ্যা মুষ্টিমেয়! হুতাশনে যেরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, তদ্রূপ বন্ধুর পরীক্ষা বিপদ সময়ে। সত্য বটে, গোবিন্দের বন্ধুর নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু তাহাদিগের প্রায় সমস্তই সুদিনের বন্ধু, দুর্দ্দিনের নহে। এই বন্ধুপরীক্ষায় এক মাঝি মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। গোবিন্দ এই বন্ধুর গৃহে কতিপয় বর্ষ সুখে অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানে তাঁহার সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা উর্ব্বশীর জন্ম হয়।

উর্ব্বশীর বিবাহকাল সমাগত প্রায় হইলে মাধবদেব জনকজননী-সমভিব্যাহারে পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে উপস্থিত হন। তথায় গয়াপাণি নামক জনৈক সুদর্শন ও সদ্বংশজাত কায়স্থ যুবকের সহিত উর্ব্বশী পরিণয়পাশে আবদ্ধা হন।

কিয়ৎকাল গত হইলে ভার্য্যা মনোরমাকে জামাতৃগৃহে রাখিয়া গোবিন্দ পুত্রের সহিত বহুকাল-পরিত্যক্ত বাণ্ডুকায় প্রত্যাগমন করিলেন। বহুকাল পরে পিতাকে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাধবকে প্রাপ্ত হইয়া দামোদর অতীব আনন্দিত হইলেন। বাণ্ডুকায় কিয়ৎকাল অবস্থিতির পর গোবিন্দের মৃত্যু হইল। পুত্রদ্বয় পিতার যথোচিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর মাধবদেব মাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া স্বীয় প্রাপ্য পিতৃ বিষয়সম্পত্তির জন্য পুনরায় বাণ্ডুকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কিয়দ্দিবস সুখে বাণ্ডুকায় কালাতিপাত করিলেন। বিষয়সম্পত্তির স্বীয় প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইয়া মাধবদেব চিন্তা করিলেনঃ—

ইসব দ্রব্যত কোন সার নাহিকন্ত।
ইথানত নাহি কিছু ভক্তি আলোচন॥

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অংশ তিনি অগ্রজকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

মাধব মাতৃচরণদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জননীর রোগের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দেবীপূজায় এক জোড়া শ্বেতচ্ছাগ

মানসকরতঃ অনতিবিলম্বে মাতৃ-সকাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাতা ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃ-গত-প্রাণ পুত্র মাতাকে সুস্থ অবলোকন করিয়া দারুণ চিন্তাভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

মাধব ভগ্নীপতি রামদাসকে (গয়াপাণি শঙ্কর-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রামদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) একজোড়া শ্বেতচ্ছাগক্রয়ের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিলেন। পূজার সময় সমাগত প্রায়, কিন্তু রামদাস ছাগ আনয়ন করিতেছেন না দেখিয়া মাধব ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। রামদাসও সহজ পাত্র নহেন। তিনি মাধবদেবের নিকট ছাগবলির অবৈধতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। অবশেষে মাধবকে গুরু শঙ্করের নিকট লইয়া গেলেন।

শঙ্কর মাধবে ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল।
দুইহন্তো তোলন্ত শাস্ত্র দুইহন্তো খণ্ডন্ত।
দুয়ো কথা কন্ত দুয়ো দুইক নমানন্ত॥
মাধবে শাস্ত্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহন্ত।
নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্করে খণ্ডন্ত॥
প্রভাতরে পরা তিনি পর বেলি গৈল।
দুইহন্তরো কথা সাঙ্গ তথাপি নহৈল॥

অবশেষে শঙ্করদেব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন।
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ॥
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্।
তথা চ সর্ব্বার্চনমচ্যুতেজ্যা॥

এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া মাধবদেব অবনতমস্তকে শঙ্করের মতকেই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ ও তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এইরূপে শঙ্কর-মাধব-সম্মিলন হইল।

আসাম-গগন অচিরে হরিনামধ্বনিতে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। শঙ্কর-মাধবের সমবেত শক্তি নামধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইল। প্রতি

মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের সময়ে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। শত শত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা প্রবল স্রোতে প্লবমান তৃণের ন্যায় মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত মহাত্মাদিগের মহোদ্যমের নিকট ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

ইতিপূর্ব্বে মাধবদেবের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু মত্ত মধুপের ন্যায় তিনি এক্ষণে যে মধুপানে রত ছিলেন, তাহাতে সাংসারিক সুখবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে ক্ষণকালও স্থান পাইল না। তিনি চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন ও কৌশলে তৎপ্রদত্ত জোড়নের * অলঙ্কার প্রতিগ্রহণ করিলেন।

একদা অহমরাজ বন্য হস্তী ধরিবার জন্য শঙ্করাদি ভূঞাবৃন্দকে হস্তীগড় পরিরক্ষণে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শঙ্কর-রক্ষিত দিক দিয়া কতিপয় হস্তী পলায়ন করে। এই আকস্মিক বিপদে শঙ্কর ও ভূঞাগণ পলায়ন করেন। ক্রুদ্ধ অহমরাজ তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। রাজচরগণ অপর কাহাকেও ধৃত করিতে না পারিয়া শঙ্করজামাতা হরি ও শিষ্য মাধবকে ধৃত করিয়া রাজসকাশে উপস্থাপিত করিল। রাজা প্রধান মন্ত্রীপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, বন্দিদ্বয়ের মধ্যে একব্যক্তি বৈরাগী ও অপরটী সংসারী। জিঘাংসাপরায়ণ নৃপ বৈরাগীকে নিহত করা নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া সংসারী হরির শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন—বৈরাগী বধ নিষ্ফল, কারণ, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিবার কেহ নাই। হরি বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। মাধব শ্রীশ্রীহরিগুণগান করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে ঘাতককৃপাণে হরির মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইল—ভক্তের মস্তক রাম নামোচ্চারণ করিতে করিতে ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবচরণে লুটাইয়া পড়িল।

অহমরাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত শঙ্কর অহমরাজ্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে, মাধব গুরুর অনুগমন করাই স্থির

* আসামে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপক্ষ হইতে পাত্রীকে অলঙ্কার প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে—ইহাকে জোড়ন কহে।

করিলেন। যাত্রাকালে কতিপয় ভক্ত মাধবদেবের নৌকায় স্থান প্রার্থনা করিল। নৌকা লোক ও দ্রব্যে পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ স্থানাভাব; তথাপি মাধবদেব ভক্তগণের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে স্থান দান করিতে ব্যগ্র হইলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় দ্রব্যাদির কিয়দংশ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে স্থান প্রদান করিলেন। শঙ্করদেব ইহা অবগত হইয়া আনন্দভরে বলিয়া উঠিলেন ;—

সাধু সাধু মাধব করিলা বড় কর্ম্ম।
তুমি সি জানিলা সাধু ভকতর মর্ম্ম ॥

শঙ্করদেব স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন, মাধবও ছায়াবৎ সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। শঙ্করের পাটবাউসী অবস্থানকালে মাধব বরাদি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। মাধব প্রত্যহ বরাদি গ্রাম হইতে শঙ্করসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতেন। বরাদি পাটবাউসী হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী বলিয়া শঙ্কর মাধবের জন্য নিকটবর্ত্তী অন্য একস্থানে গৃহের ব্যবস্থা করিলেন।

একদা শঙ্করদেব মাধবের মন পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সংসারসুখে বীতস্পৃহ মাধব উত্তর করিলেন,—

তোমাগের সঙ্গ আসি যি কালত পাইলোঁ।
সেহি কালে জোড়নর কন্যা এড়ি আইলোঁ ॥
তোমাগের পদ সেবা করিবে ইচ্ছায়।
এতেক বিবাহ করিবাক বাঞ্ছা নাই ॥

হয়ত উপযুক্তা পাত্রীর অভাবনিবন্ধন মাধব বিবাহে অসম্মত হইতেছেন, এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া শঙ্করদেব স্বীয় কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মাধব অবিচলিত-চিত্তে পুনরায় উত্তর প্রদান করিলেন,—

কাবো * করোঁ নুবুলিবা বিহা করিবাক।

---

* মিনতি

আকে লাগি + গুরু মানি নাহিকো তোমাক ॥
যাক আগে গুরু মানি আছোঁ তোমাথেক।
তাক মাত্রী শিক্ষা আতা লাগয় দিবেক ॥
অনাদি জনম ভোগ করোঁ বিষয়ক।
তাকে এড়াইবাক কহিয়োক উপায়ক ॥'

এইরূপ নানা আলাপন করিয়া মাধবের দৃঢ়সংকল্প সন্দর্শনে শঙ্করদেব সহর্ষচিত্তে মাধবের বহু সাধুবাদ করিলেন।

অতঃপর শঙ্করদেব শতাধিক সহচর সমভিব্যাহারে দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা করিলে মাধবদেবও তদনুসরণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করদেবের দেহরক্ষার পর তৎপুত্র রামানন্দ ঠাকুর মাধবদেবের বাসস্থলে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই নিদারুণ শোকবার্ত্তা প্রদান করিলেন। মাধব এই সংবাদে শোকে অভিভূত হইলেন। কিন্তু শোকেরও সীমা আছে। ক্রমে ক্রমে মাধবদেব শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। শঙ্কর-বিচ্ছেদের বর্ষাধিক কাল পরে রামানন্দ ঠাকুর বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। মাধব দিবানিশি অক্লান্ত ভাবে গুরুপুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মাতা ও ভক্তবৃন্দকে কাঁদাইয়া শঙ্করপুত্র অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

অতঃপর মাধবদেব সুন্দরীদিয়া নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় মনোহর নামঘর নির্ম্মিত হইল। মাধবদেব ও নারায়ণ ঠাকুর * মহোৎসাহে নামধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল।

বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুরবাসী বরবিষ্ণু নামক জনৈক ব্যক্তি আসাম-পর্য্যটনে বহির্গত হন; কিন্তু প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চন্দ্রভূঞা নামক একব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বরবিষ্ণুর কৃতজ্ঞতা, চরিত্রশীলতা প্রভৃতি গুণবিমুগ্ধ, চন্দ্রভূঞা স্বীয়

+ আকে লাগি—ইহার জন্য।

* শঙ্করদেবের শিষ্যবিশেষ।

কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নারায়ণ ঠাকুরের নিকট মাধব-মহিমা শ্রবণ করিয়া বরবিষ্ণু "মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও সপ্তাহ কাল একান্ত মনে গুরুসেবা করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একদা একটী গারো ও একটী ভুটিয়া মাধবদেবের নিকট শরণ গ্রহণার্থ আগমন করে। মাধবদেব তাহাদিগকে শরণ দিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিলে তাহারা শ্রীমাধব-বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবৃত্তি করিল,—

গারো ভোট যবনে হরির নাম লয়।
হেনয় হরির নাম সজ্জনে নিন্দয়॥

এতচ্ছ্রবণে মাধবদেব যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে "শরণ" প্রদান করিলেন। গারো ও ভুটীয়া ভক্তদ্বয়ের নাম যথাক্রমে গোবিন্দ ও জয়ানন্দে পরিবর্ত্তিত করা হইল। যবন জয়হরি নামক এক ব্যক্তি উত্তরকালে মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

একদা মাধবদেবের ভক্ত জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোপাল নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপমানিত হন। ভক্তের অপমানে মাধবের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইল। ভক্তের অপমানে অপমানিত মাধব ক্রোধে ও ক্ষোভে সেদিন একেবারেই অন্নগ্রহণ করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি সুন্দরীদিয়া পরিত্যাগ করিয়া বরপেটায় গমন করিলেন।

একদল স্বার্থপরায়ণ হিংসাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণের চেষ্টায় শঙ্করদেব একাধিক বার বিপজ্জালে পতিত হইয়াছিলেন; ঠিক ঐরূপে আর একদল লোকের ষড়যন্ত্রে ও কূটমন্ত্রণায় মাধবদেবের শেষ জীবন কথঞ্চিৎ অশান্তিময় হইয়াছিল। কতিপয় ব্রাহ্মণ হিংসাবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া নৃপতি রঘুদেবকে* মাধবদেবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।—

* প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব্ব খণ্ডে চিলারায়ের পুত্র রঘুদেব ও পশ্চিম খণ্ডে নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করিতে থাকেন।

শূদ্র এক গোট আছে মাধব নামত।
অনাচার করি নষ্ট করিলে জগত॥

রাজাজ্ঞায় মাধবদেব রাজধানীতে নীত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তর্ক করিতে সাহসী না হওয়ায়, তিনি মুক্তিলাভ ও কিয়ৎকাল পরে রাজাজ্ঞায় হাজো নামক স্থানে গমন করিলেন।

অতঃপর মাধবদেব রঘুদেবের রাজ্য ত্যাগ করতঃ বেহার নগরে গমন করেন। তথায় মহোৎসাহে নামধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন; সহস্র সহস্র লোক তাঁহার পদরজঃ গ্রহণ করিতে আগমন করিতে লাগিল। তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃতা অমৃতনিস্যন্দিনী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে লাগিল। রাজমাতা, রাজমহিষী, ও রাজকুমার বীরনারায়ণ আদি বহু রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট 'শরণ' গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কোচ মেচ জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল,—

কোচ মেচ লোক সবে এড়িলেক
পূর্ব্বর যত আচার।
মাধব দেবর উপদেশ পায়া
ভৈল সবে সদাচার।

বেহার নগরে মাধবদেবের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য মাধববিদ্বেষিদল একাধিকবার উদ্যম করে, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। মাধবের প্রতিকূলাচরণ করার পরিবর্ত্তে নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন।*

ক্রমে মাধবের জীবনব্রত শেষ হইয়া আসিল। অবশেষে ১৫১৮ শকের ভাদ্র মাস, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি, দ্বিপ্রহর কালে যোগাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে মহাপুরুষ মাধবদেব মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

* মাধবদেবের দেহত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রণীত "মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব" পুস্তকে দেখা যায় যে, নৃপতি লক্ষ্মীনারায়ণ মাধবদেবের নিকট "শরণ" প্রার্থনা করেন ও তৎফল-

মাধবদেব আদর্শ গুরুসেবক ছিলেন। তাঁহার গুরুসেবার তুলনা কলিযুগে অতি বিরল। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগকরতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মাধবদেব গুরুর দন্তধাবন ও স্নানাদির জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং অবগাহন করিতে যাইতেন। স্নানান্তে গুরুদেবের স্নানের জন্য জল আনয়ন করিতেন ও নামপ্রসঙ্গের সময়ে স্বহস্তে গুরুজনের আসন পাতিয়া দিতেন। গুরুদেব ভোজনান্তে বিশ্রামপর হইলে কিয়ংকাল তাঁহার সেবা করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে যাইতেন। ভোজনান্তর গুরুগত-প্রাণ শিষ্য পুনরায় গুরুপাদপদ্মে লগ্নদৃষ্টি হইয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলে মাধবও তৎসঙ্গে গিয়াছিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর মাধবদেবের তৎকালীন কর্ম্মের যেরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ;—

বস্ত্র সলাই * গৈয়া ঠাই মাধবে আতান্ত †।
বজারক গৈয়া বস্তু কিনিয়া আনন্ত॥
স্নান করি শঙ্করক ভোজন করান্ত।
তৈল লৈয়া তান দুই চরণ জান্তন্ত॥
শঙ্করদেবের নিদ্রা আসিলেক যেবে।
আদা খার মাধবে পায়ত দিয়া তেবে॥
লাস করি নমাই থৈয়া দুখানি চরণ।
তেবেসে আপুনি গৈয়া করন্ত ভোজন॥
এহি মতে সেবা নিতে মাধবে করন্ত।
আন লোকে ফাতফোন্ত বুমটি পারন্ত॥

গুরুভক্তির কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মাধবের এই অতুল্য গুরুভক্তি চিরকাল আমাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিবে। তিনি বলিয়াছেন,—

স্বরূপে ঠিক শঙ্করদেবের ন্যায় মাধবদেবও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। দৈত্যারি ঠাকুর দেহত্যাগের অন্য কারণ বিবৃত করিয়াছেন।

* সলাই—পরিবর্ত্তন করিয়া। † আতান্ত—লেপন করেন।

গুরুসেবা করিলন্ত মার্কণ্ডেয় ঋষি।
প্রহ্লাদেয়ো গুরুসেবা করিলা হরিষি ॥
লক্ষ্মণে করিলা গুরুসেবা সাবধান।
মঞো গুরুসেবা করি আছো কিছুমান ॥

সত্য বটে, বিনয়াবতার মহাপুরুষ স্বীয় গুরুসেবার মাত্রা "কিছু-মান" (কিঞ্চিৎ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই গুরুভক্তি বস্তুতঃই অতুল্য।

কাহারও কাহারও মতে মাধবদেব যদিও স্বয়ং সংসারত্যাগী ছিলেন, তথাপি তিনি কাহাকেও বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা আরও বলেন, মাধবদেবকে সংসার-ত্যাগী দেখিয়া অন্যে সংসারত্যাগ করিলে, বিষকণ্ঠ শঙ্করকে দেখিয়া বিষপানানুযায়ী কর্ম্ম করা হইবে। স্বমত সমর্থনার্থ তাঁহারা "গুরু-চরিত্র" হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করেন ;—

তোরা যদি হরি ভকতি করিবা।
তেবে গৃহবাস পুনু কেঁহো ন ছাড়িবা ॥
আমার দেখিয়া গৃহবাস নাহি কয়।
ইতো সাস* ন করিবা তুমি সমস্তয় ॥

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাধবদেব বৈরাগ্যাশ্রমবিরোধী ছিলেন না। তিনি বরং উহা সমর্থন করিতেন। অপর-ব্যক্তি-রচিত জীবন-চরিতে লিপিবদ্ধ উপদেশ হইতে মাধবদেবের স্বরচিত গ্রন্থে লিখিত উপদেশ তাঁহার মতামত সম্বন্ধে নিশ্চিতই বলবত্তর প্রমাণ। মাধবদেব "ভক্তিরত্নাবলী"তে লিখিয়াছেন,—

মহন্তর সঙ্গ মুকুতির মুখ্য দ্বার।
স্ত্রীর সঙ্গীর সঙ্গ নরক যাইবার ॥

ইহা হইতেই মাধবদেবের বৈরাগ্যে কিরূপে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

শিষ্য মাধব গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় নিরত

* সাস—সাহস।

হইয়াছিলেন। গুরু শঙ্করের ন্যায় তাঁহারও অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। শাস্ত্রশিরোমণি "নামঘোষ" তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব ফল।

একদা বঙ্গে মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন,

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

আর আসামেও মাধবদেব জীমূতমন্দ্রে বিঘোষিত করিয়াছিলেন,—

সত্য যুগে ধ্যান ত্রেতা যুগে যজ্ঞ
দ্বাপর যুগত পূজা।
কলিত হরির কীর্ত্তন বিনাই
আবর নাহিকে দুজা॥

পুনশ্চ—

নাহিকে কলিত ধর্ম্ম কীর্ত্তনর সম।
যিতো গায়ে হরিগুণ সিসি নরোত্তম॥

মাধবদেব আর্য্য, অনার্য্য ও উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে সমভাবে নামধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন —চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো যদি হরিভক্তিপরায়ণঃ। মাধব-গুরু শঙ্করদেব প্রচার করিয়াছিলেন—

সিটো চণ্ডালক গরিষ্ঠ মানি।
যার জিহ্বাগ্রে থাকে হরিবাণী॥

আর মাধবদেব গাহিয়াছিলেন—

পরম নির্ম্মল ধর্ম্ম হরিনাম কীর্ত্তনত
সমস্ত প্রাণীর অধিকার।
এতেকে সে হরিনাম সমস্ত ধর্ম্মর রাজা
এহি সার শাস্ত্রর বিচার॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যত যার যেন বিধি আছে
তারে সে কেবলে অধিকার।
হরিনাম কীর্ত্তনর নাহিকে নিয়ম একো
এতেকে সে ধর্ম্ম মাজে সার॥

শঙ্করদেবের সহিত মিলন না হইলে হয়ত মাধবদেবের সমগ্র জীবন অন্যরূপে ও অন্য উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত পরিচালিত হইত। কিন্তু শঙ্করের সহিত সম্মিলনের দিবস হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীগুরুসমারব্ধ মহাকার্য্যের সফলতাসম্পাদনেই আত্ম-বিনিয়োগ করিয়াছিলেন—

শঙ্কর বৈকুণ্ঠ পয়াণ করিলা
মাধব আছিলা রহি।
বিধির ঈশ্বর হরিনাম ধর্ম্ম
প্রচারিলা শাস্ত্র চাহি॥
শঙ্করে ভকতি প্রকাশিলা মাত্র
মাধবেসে প্রচারিল।
মাধবর প্রসাদত ব্যভিচারী
অজ্ঞানী সবে বুঝিল॥

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক-দর্শন] [এরিষ্টটল।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম. এ, বি, এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। সেই শব্দ মোটামুটী দুইভাগে বিভক্ত করা যায়— কতকগুলি শব্দ স্বাধীনভাবে কোন পদার্থকে বুঝায়; কতকগুলি অন্যের সহিত মিলিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমটিকে স্বতন্ত্রার্থক বাচক (Categorematic) ও দ্বিতীয়টীকে পরতন্ত্রার্থবাচক (Syn-categorematic) শব্দ বলে। কোন একটী বাক্য লইলে এই দুই প্রকারের শব্দই আমাদের ব্যবহার করিতে হয়। যদু হয় মর—এই

বাক্যে 'যদু' ও 'মর' এই দুইটী শব্দ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু 'হয়' এই শব্দটী তাহা পারে না। 'যদু', 'মর' প্রভৃতি শব্দকে নাম (Name) আখ্যা দেওয়া হয়। এই নাম নানারূপে বিভাগ করা হয়—সে প্রসঙ্গ এস্থলে স্থগিত থাকুক। পদার্থ মাত্রেই গুণবিশিষ্ট। যখন এক শ্রেণীর পদার্থ অপর এক শ্রেণীর পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন ব্যাপক-জাতিকে পরজাতি (Genus) ও ব্যাপ্য জাতিকে অপর জাতি (Species) বলে। যে সকল গুণ এক পরজাতির অন্তর্ভুক্ত এক অপরজাতিকে সেই পরজাতির অন্তর্ভুক্ত অন্য একটী অপরজাতি হইতে পৃথক করে তাহারা সেই জাতির ব্যবর্ত্তক গুণ (Differentia)। একই জাতি এক হিসাবে পরজাতি অন্য হিসাবে অপরজাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। যে জাতিকে আর নিম্নতর জাতিতে বিভাগ করা যায় না তাহাকে অপরতম-জাতি (Infima species) ও যাহাকে অপর কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাহাকে জাতক-জাতি বলে (Sumum Genus)। এই জাতি শৃঙ্খল স্বেচ্ছানুসারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু এরিষ্টটল ও তাঁহার মতাবলম্বীদের মতে ইহাদের একটা সাম্য থাকা চাই। তাঁহাদের মতে সার-গুণ (Essence) লইয়া এই জাতি বিভাগকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রাণী একটা পরজাতি, ইহাকে বিভাগ করিতে হইলে পশু, মনুষ্য এই ভাবে বিভাগ করিতে হইবে কিন্তু দ্বিপদ চতুষ্পদ এইরূপ ভাবে ভাগ করা শ্রেয় নয়। পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে প্রাণীর সার-গুণ বর্ত্তমান পরন্তু দ্বিপদত্বে তাহা নাই। এই সার গুণ বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝিয়াছিলেন তাহা বলা সুকঠিন। তবে এইটুকু বুঝা যায়, কতকগুলি পদার্থকে এক জাতীয় পদার্থ হইতে হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ-সম্বন্ধবিশিষ্ট নয় এমন অনেকগুলি সাধারণ গুণ থাকা চাই। সেই নিয়মানুসারে গরুকে সাদা, কাল প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভাগ করা শ্রেয় নয়। কারণ এই স্থলে কেবল মাত্র একটী গুণকে (অর্থাৎ বর্ণ) লক্ষ্য করা হইতেছে। এই জাতিবিভাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তি-সমষ্টির হ্রাস ও গুণ-সংখ্যার হ্রাস

হইলে ব্যক্তি সমষ্টির বৃদ্ধি হয়। পরজাতির গুণ অপেক্ষা অপরজাতিতে গুণের সংখ্যা অধিক কিন্তু পরজাতি অপরজাতি হইতে ব্যাপক পদার্থ।

(২) জাতির গুণ আলোচনা করিলে দেখা যায়—অপরজাতির যেটা বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম সেটা পরজাতির নহে কিন্তু কতকগুলি গুণ আছে যাহা উভয়তঃই বর্ত্তমান। মানুষের প্রাণ আছে, এই প্রাণ থাকা গুণটী পরজাতিরও ধর্ম্ম, কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান এটী অপরজাতীয় ধর্ম। ইংরাজিতে প্রথমটীকে Generic ও দ্বিতীয়টীকে Specific property বলে। জাতির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত এইরূপ ধর্ম্ম বা গুণ ছাড়া পদার্থের কতকগুলি আকস্মিক গুণ বা ধর্ম্ম থাকিতে পারে। সেগুলিকে উপলক্ষণ (accident) বলে। যদি কোন উপলক্ষণ কোন বিশেষ জাতির সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধে জড়িত হয় তাহাদিগকে তাহার ধর্ম্ম হইতে পৃথক করা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া পড়ে। যেমন চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী জন্তুর পরিহার্য্য উপলক্ষণ খুরের দ্বিখণ্ডত্ব। পরন্তু চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী জন্তুর এটী সার-গুণ (Essence) না হওয়ায় সেটীকে ধর্ম্ম বলা যায় না। পরজাতি, অপরজাতি, ব্যবর্ত্তক গুণ, ধর্ম্ম, উপলক্ষণ, ইহাদিগকে বিধেয়ক (Predicables) বলে।

কোন একটী বাক্য প্রয়োগ করিলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। বিধেয় পদটী উদ্দেশ্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে জড়িত হইতে পারে সেটী চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে সেটী বিধেয়ের পরজাতি, অপরজাতি, ব্যবর্ত্তক গুণ, ধর্ম্ম বা উপলক্ষণ।

(৩) এরিষ্টটলের মতে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে দ্বৈখণ্ডিক-ভাগ প্রণালী (Dichotomus) অবলম্বনই শ্রেয় যেমন—

প্রাণী

চিন্তাশীল — অচিন্তাশীল

পশু — অপশু ইত্যাদি
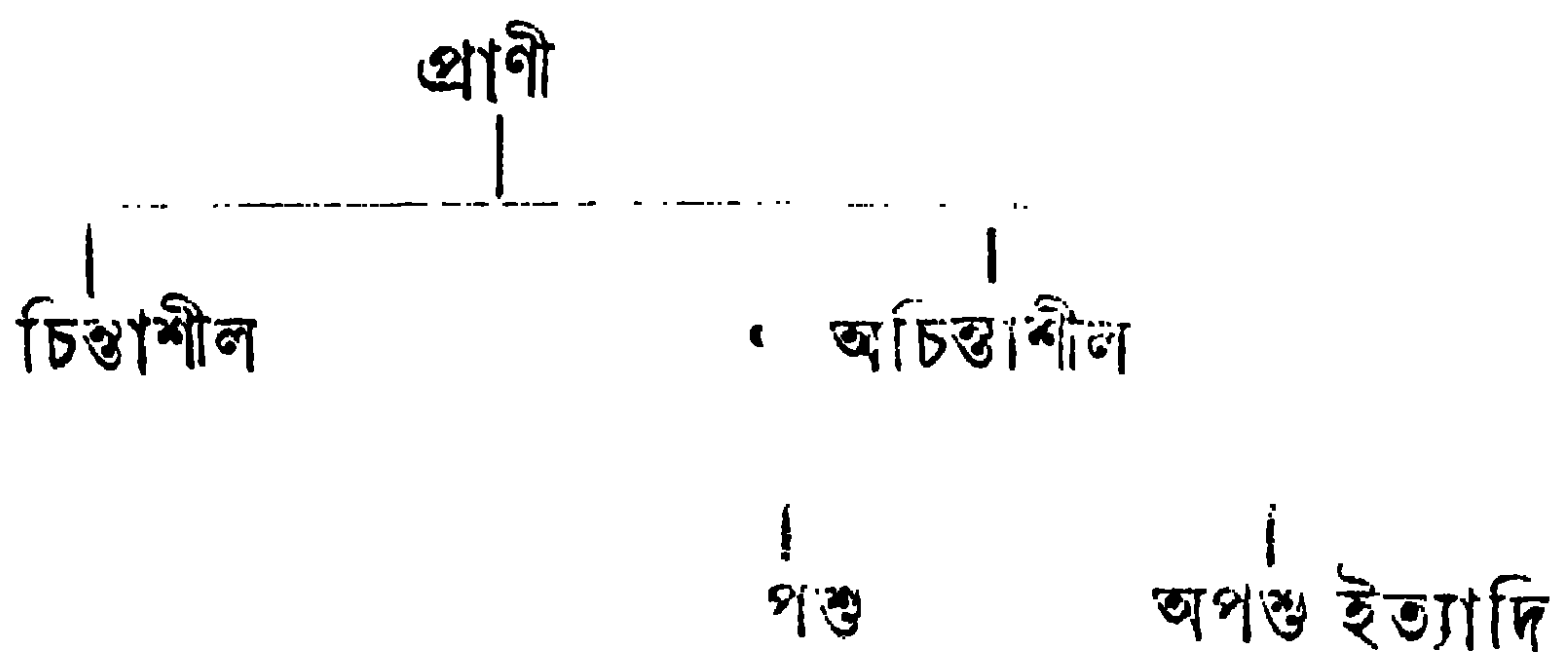
(৪) দুইটী পদার্থের সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে আমাদের সত্যাসত্য জ্ঞান লাভ হয়, এই সত্যাসত্য নির্ণয়ই ন্যায়শাস্ত্রের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ইহার অপর নাম অবগতি (Judgment)। উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়ের স্বরূপতা থাকিলে অন্বয়ী (affirmative) বাক্য হয় ও বিরূপতা থাকিলে ব্যতিরেকী (negative) বাক্য হয়। এই বাক্য নানা ভাগে বিভাগ করা যায়। যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য তাহাকে ব্যাপক বাক্য (universal proposition) ও যেটীর তাহা ব্যাপ্য নহে সেটীকে অব্যাপক বাক্য (particular proposition) বলে। দুইটী অন্বয়ী বাক্য-সমগুণ বাক্য (of the same quality)। একটী অন্বয়ী অপরটী ব্যতিরেকী বাক্য—বিষমগুণ বাক্য (not of the same quality)। দুইটী ব্যাপক বাক্য সমপরিমাণ বাক্য (of the same quantity)। একটী ব্যাপক অপরটী অব্যাপক বাক্য বিষমপরিমাণ বাক্য (not of the same quantity)। ব্যাপক বাক্য অন্বয়ী হইলে তাহাকে ব্যাপকান্বয়ী (universal affirmative) ও ব্যাপক বাক্য ব্যতিরেকী হইলে অব্যাপক-ব্যতিরেকী (universal negative) বলে। অব্যাপক অন্বয়ী বাক্যকে ইংরাজীতে (particular affirmative) ও অব্যাপক ব্যতিরেকীকে (particular negative) বলে। সংক্ষেপে A 'আ', E 'এ', I 'ই', O 'ও' বলা হয়। এই চারি প্রকার বাক্যের মধ্যে ব্যাপকান্বয়ী বাক্যে উদ্দেশ্য ব্যাপ্য, বিধেয় অব্যাপ্য — 'আ'

ব্যাপক ব্যতিরেকী বাক্যে " " " ব্যাপ্য — 'এ'
অব্যাপক অন্বয়ী বাক্যে " অব্যাপ্য " অব্যাপ্য — 'ই'
অব্যাপক ব্যতিরেকী বাক্যে " " ব্যাপ্য — 'ও'

ব্যাপক বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাপ্য, অব্যাপক বাক্যের উদ্দেশ্য অব্যাপ্য।

(৫) এই বাক্যের সাহায্যে আমাদের জ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ নিরূপিত হয়। কতকগুলি অনুমান অপর কোন মধ্যস্থ বাক্যের সাহায্য বিনা সাধিত হয়, সেগুলিকে নিরপেক্ষানুমান কহে ও কতক স্থলে মধ্যস্থ বাক্যের সাহায্য লইতে হয়, সেটী সাপেক্ষানুমান। 'মানুষ মাত্রেই মর' ইহা হইতে 'কোন কোন মানুষ' মর

অনুমান করিতে অপর কোন বাক্যের সাহায্য দরকার হয় না, এটী নিরপেক্ষানুমান। অপর স্থানে সকল 'মানুষ মর হইতে 'যদু মর' অনুমান করিতে হইলে 'যদু মানুষ' এই বাক্যের সাহায্য লইতে হয়, এটী সাপেক্ষানুমান।

(৬) ব্যবহারিক জগতে এই অনুমান বলেই সত্যাসত্য নির্ণীত হয়; কিন্তু কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য আছে যেগুলিকে আর কোন অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যায় না। এরিষ্টটল এইরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের উপর ন্যায়শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

'যে বস্তু যাহা তাহাই'—ইহার নাম তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of Identity) 'কোন বস্তু একই কালে সৎ ও অসৎ হইতে পারে না' —ইহাকে বিরোধ নিয়ম বলে (Law of Contradiction)। কোন পদার্থ হয় আছে বা নাই, এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তাহার হইতে পারে না—ইহাকে মধ্যাভাব নিয়ম বলে (Law of Excluded Middle)। ইহাই এরিষ্টটলের সুবিখ্যাত সূত্র (Dictum)। এরিষ্ট-টলের মতে এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম না মানিয়া চলিলে যুক্তি অশুদ্ধ হইবে।

(৭) এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হইতে অপর কয়েকটী নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। যদি (ক) (খ) হয় এবং (খ) (গ) হয়, তবে (ক) (গ) হইবে।

২। যদি (ক) (খ) হয় এবং (খ) (গ) না হয়, তবে (ক) (গ) নহে।

৩। যদি (ক) (খ) না হয় এবং (খ) (গ) না হয়, তবে (ক) (গ) কিনা বলা যায় না।

মোটামুটী এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম লইয়া আমাদের অনুমান কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই অনুমান হয় নিরপেক্ষ না হয় সাপেক্ষ।

আমরা প্রথমে নিরপেক্ষানুমান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব।

(৮) সকল (ক) হয়, (খ) এটী 'আ' বাক্য (Universal

affirmative)। 'আ' বাক্য সত্য হইলে 'এ', 'ই', ও 'ও' বাক্য কি হইবে দেখা যাউক।

একটী উদাহরণ লওয়া যাউক।

সকল মানুষ মর, এটী 'আ' বাক্য। সকল মানুষ মর এটী সত্য হইলে সকল মানুষ মর নহে এটী মিথ্যা হইবে অর্থাৎ কোন মানুষ মর নহে এটী মিথ্যা অর্থাৎ 'এ' বাক্য মিথ্যা হইবে।

কোন মানুষ মর নহে, এটী মিথ্যা হইলে কোন কোন মানুষ মর নহে এটীও মিথ্যা হইবে অর্থাৎ 'ও' বাক্য মিথ্যা হইবে।

সকল মানুষ মর, এটী সত্য হইলে কোন কোন মানুষ মর অর্থাৎ 'ই' বাক্য সত্য।

(৯) সুতরাং দেখা গেল।

'আ' সত্য হইলে 'ই' সত্য—'এ' মিথ্যা 'ও' মিথ্যা।

অনুরূপ যুক্তি বলে

'এ' সত্য হইলে 'ও' সত্য—'আ' মিথ্যা 'ই' মিথ্যা।

'ই' সত্য হইলে 'ও' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না। কিন্তু 'এ' বাক্য মিথ্যা হইবে এবং

'ও' সত্য হইলে 'আ' বাক্য মিথ্যা—'এ' এবং 'ই' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না।

(১০) উদাহরণ সাহায্যে বুঝা যাউক।

কোন মানুষ অমর নহে, এটী 'এ' বাক্য, সুতরাং কোন মানুষ অমর এটী মিথ্যা। কোন মানুষ অমর এটী মিথ্যা হইলে সকল মানুষ অমর এটী মিথ্যা। কতকগুলি মানুষ জ্ঞানী এটী 'ই' বাক্য, কতকগুলি মানুষ জ্ঞানী এ কথা সত্য বলিলে কোন মানুষ জ্ঞানী নয় অর্থাৎ 'ও' বাক্য মিথ্যা হইবে। কিন্তু 'ই' বাক্য সত্য বলিয়া 'সকল মানুষ জ্ঞানী' এ সিদ্ধান্ত অথবা 'কোন কোন মানুষ জ্ঞানী নয়' এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কতকগুলি মানুষ ধনী নয় এটী 'ও' বাক্য, কতকগুলি মানুষ ধনী না হইলে সকল মানুষ ধনী এ কথা বলা যায় না। সুতরাং সকল

মানুষ ধনী এটী মিথ্যা বাক্য। কতকগুলি ধনী নয় সুতরাং সকল মানুষ ধনী নয় এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং কতকগুলি ধনী এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় না।

(১১) অতঃপর দেখা যাউক 'আ' বা 'এ' বা 'ই' বা 'ও' বাক্য মিথ্যা হইলে অপরগুলি কি হইবে।

'আ' মিথ্যা হইলে 'ও' সত্য হইবে—'এ' এবং 'ই' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না।

'এ' মিথ্যা হইলে 'ই' সত্য হইবে—'আ' এবং 'ও' বাক্য সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না।

'ই' মিথ্যা হইলে 'এ' এবং 'ও' সত্য হইবে—'আ' মিথ্যা।

'ও' মিথ্যা হইলে 'আ' এবং 'ই' সত্য হইবে—'এ' মিথ্যা।

(১) 'আ' এবং 'এ' বাক্যের সম্বন্ধকে বিপরীত সম্বন্ধ বলে (Contrary)—অর্থাৎ 'আ' সত্য হইলে 'এ' মিথ্যা, 'এ' সত্য হইলে 'আ' মিথ্যা। কিন্তু 'আ' মিথ্যা হইলে 'এ' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে এবং 'এ' মিথ্যা হইলে 'আ' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(২) 'আ' এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধকে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বলে (Contradictory)—'আ' সত্য হইলে 'ও' মিথ্যা, 'আ' মিথ্যা হইলে 'ও' সত্য; 'ও' সত্য হইলে 'আ' মিথ্যা এবং 'ও' মিথ্যা হইলে 'আ' সত্য—দুইটী বাক্যের মধ্যে একটী সত্য হইলে অপরটী মিথ্যা হইবেই হইবে।

(৩) 'ই' এবং 'এ' বাক্যের মধ্যেও বিরুদ্ধ সম্বন্ধ।

(৪) 'আ' এবং 'ই' মধ্যে সম্বন্ধ এই যে 'আ' সত্য হইলে 'ই' সত্য, 'আ' মিথ্যা হইলে 'ই' মিথ্যাও হইতে পারে সত্যও হইতে পারে। 'ই' মিথ্যা হইলে 'আ' সত্য হইবেই হইবে। 'ই' সত্য হইলে 'আ' মিথ্যাও হইতে পারে সত্যও হইতে পারে, 'ই' বাক্যকে 'আ' বাক্যের অনুকূল বাক্য বলে (Subaltern)।

(৫) 'এ' এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধকেও অনুকূল বলা হয়।

(৬) 'ই' এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধ এই যে একটী সত্য হইলে

অপরটী সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে কিন্তু একটী মিথ্যা হইলে অপরটী সত্য হইবেই। ইহাদিগকে অধীন বিপরীত (Sub-contrary) বাক্য বলে।

(১৩) নিম্নলিখিত চিত্র সাহায্যে উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধি হয়।
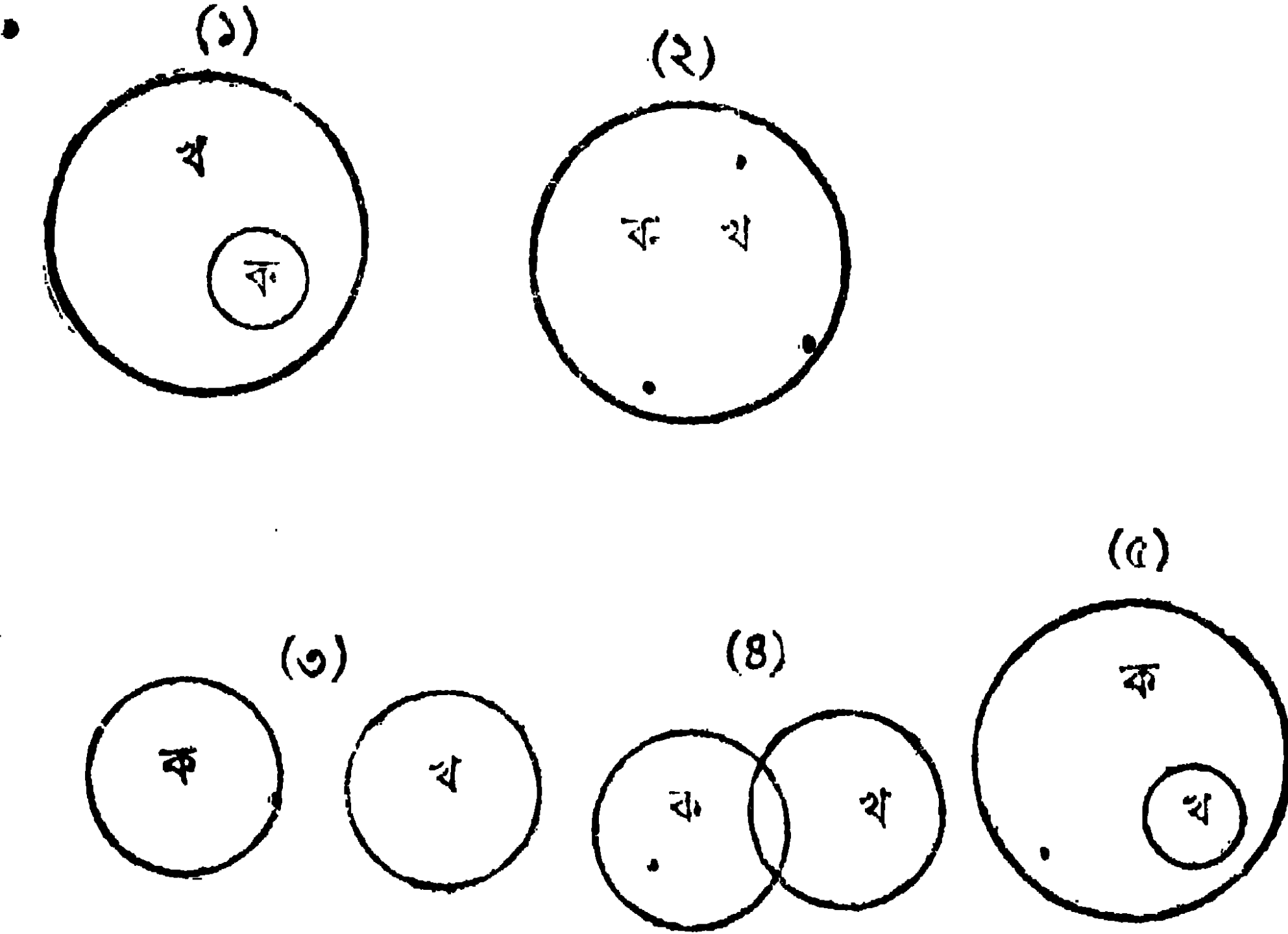
(১) (২) চিত্র 'আ' বাক্য প্রকাশক যথা সকল ক হয় খ
(৩) ,, 'এ' ,, ,, কোন ক খ নয়।
(১) (২) (৪) (৫) চিত্র 'ই' ,, ,, কতক ক হয় খ।
(৩) (৪) (৫) ,, 'ও' ,, ,, কতক ক খ নয়।

(১৪) উদাহরণ অপেক্ষা চিত্র সাহায্যে এই বিষয় সুন্দরতর-রূপে বুঝা যায় তাই সেই উপায়ে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 'আ' বাক্য সত্য বলিলে আমরা ইহাই বুঝি যে বাক্যটী (১) বা (২) চিত্রের অন্তর্গত হইবে। 'ই' বাক্যে (১) ও (২) চিত্র আছে। সুতরাং 'আ' বাক্য (১) চিত্রেরই হউক আর (২) চিত্রেরই হউক 'ই' বাক্যেও তাহারা আছে। সুতরাং 'আ' সত্য হইলে 'ই' সত্য হইবেই হইবে। 'এ' বাক্যে (১) বা (২) চিত্র নাই। সুতরাং 'এ' মিথ্যা। 'ও' বাক্যেও (১) বা (২) চিত্র নাই সুতরাং 'ও' মিথ্যা।

(১৫) 'এ' বাক্য সত্য অর্থাৎ (৩) চিত্রের অন্তর্ভুক্ত। (৩) চিত্র 'আ' কিম্বা 'ই'তে নাই। সুতরাং 'আ' এবং ই' মিথ্যা। 'ও'তে আছে সুতরাং 'ও' সত্য।

(১৬) 'ই' বাক্য সত্য অর্থাৎ (১) (২) (৪) (৫) চিত্রের মধ্যে যে কোনটীর অন্তর্গত। 'আ'তে (১) (২) চিত্র আছে (৪) (৫) নাই। সুতরাং 'আ' বাক্য সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। (৩) চিত্র নাই সুতরাং 'এ' মিথ্যা। 'ও'তে (৪) (৫) চিত্র আছে (১) (২) নাই সুতরাং 'ও' মিথ্যা হইতে পারে সত্যও হইতে পারে।

(১৭) 'ও' বাক্য সত্য অর্থাৎ (৩) (৪) (৫) চিত্রের মধ্যে যে কোনটীর অন্তর্গত। (১) (২) চিত্র অন্তর্গত নয় সুতরাং 'আ' মিথ্যা। 'এ'তে (৩) চিত্র আছে (৪) (৫) নাই সুতরাং 'এ' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। 'ই'তে (৪) (৫) আছে (৩) নাই। সুতরাং 'ই' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। এইবার দেখা যাউক এই বাক্যগুলি মিথ্যা হইলে কি হয়।

(১৮) 'আ' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (১) (২) চিত্রের অন্তর্গত নয়, (৩) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্গত। একমাত্র 'ও' বাক্যই (৩) (৪) (৫) চিত্রের যে কোনটীর আকার ধারণ করিতে সক্ষম সুতরাং 'আ' মিথ্যা হইলে 'ও' 'ই' সত্য। 'এ'তে (৩) চিত্র আছে (৪) (৫) নাই। 'ই'তে (৪) (৫) আছে (৩) নাই। সুতরাং 'এ' এবং 'ই' বাক্য সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(১৯) 'এ' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (৩) চিত্রের অন্তর্গত নয়, (১) (২) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্গত। কেবলমাত্র 'ই' বাক্যই (১) (২) (৪) (৫) চিত্রের যে কোনটীর আকার ধারণ করিতে পারে সুতরাং 'ই' সত্য। 'আ' বাক্যে (৪) (৫) নাই, 'ও' বাক্যে (১) (২) নাই, সুতরাং 'আ' এবং 'ও' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(২০) 'ই' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (১) (২) (৪) (৫) চিত্রে নাই (৩) চিত্রের অন্তর্গত। সুতরাং 'এ' সত্য। 'আ' বাক্যে (৩) চিত্র নাই সুতরাং 'আ' মিথ্যা। 'ও' বাক্য (৩) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে (৩) আছে (৪) (৫) নাই সুতরাং 'ও' সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(২১) 'ও' মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (৩) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, (১) (২) চিত্রের অন্তর্গত। সুতরাং 'অা' বাক্য সত্য। 'এ'তে (১) (২) নাই সুতরাং 'এ' মিথ্যা হইবে 'ই' বাক্যে (১) (২) (৪) (৫) চিত্র আছে—এখানে (১) (২) আছে, (৪) (৫) নাই সুতরাং 'ই' বাক্য সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

গাজী মিঞা।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)

বহু বৎসর পূর্ব্বে মীরাটের নওচন্দী মেলায় যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলাম, গত আষাঢ়ের উদ্বোধনে "নওচন্দী" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, "বহ্রাইচ, বারাবাঙ্কী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বালে-মিঞার দরগা বলিয়া যে পীরস্থান দেখা যায়, তাহা গাজী মিঞা সৈয়দ্ সলারের পিতা বালে মিঞার কবর। এক ব্যক্তির বহু স্থানে সমাধি বিদ্যমান থাকা ভারতে নূতন নহে। কথিত আছে, বালে মিঞা যে যে স্থানে প্রকটভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার কোন না কোন স্মারক বস্তুর সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার নিবাসভূমি বহ্রাইচেই সমাধিস্থ হন।" এই সম্বন্ধে 'ধর্ম্ম-সুধাকরমণ্ডলী' হইতে, কিছুদিন হইল, একখানি খোলা চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। গত জুন মাসে এলাহাবাদ অবস্থানকালে উক্ত চিঠির একখানি প্রতিলিপি আমার হস্তগত হয়। তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত অর্থ অন্য সাধারণের অবগতির জন্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পশ্চিমাঞ্চলে গাজী মিঞা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পূজা পাইয়া থাকেন। গাজী মিঞার হিন্দু পূজারীর সংখ্যা অল্প নহে। মসুউদ্

গাজী অর্থাৎ গাজী মিঞা অসরুল্লার পৌত্র এবং সালার সাহেবের পুত্র। ১০৪৪ সম্বতে ইনি অজমীঢ়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তাঁহার মাতুল মহ্মূদ গজনবীর সহিত গজনী গমন করেন। ইহা সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের পরের কথা।' গজনী পৌছিবার পর তথায় ধর্ম্মবিদ্বেষ-বশতঃ সোমনাথের মূর্ত্তির নাক কান কাটিয়া গাজী মিঞা তাহাতে চূর্ণ প্রস্তুত করাইয়া সেই চূর্ণ পানের সহিত সোমনাথের পূজারিগণকে খাইতে বাধ্য করেন। এই সূত্রে বজীর খাজা অহমদের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটে এবং এই কারণে তিনি দেশ হইতে দূরীভূত হন। গাজী মিঞা বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এবং স্বীয় মিত্র ও স্বমতাবলম্বী সর্দ্দারগণ সমভিব্যাহারে ভারতে আসিয়া খুদা রসুলের নাম ও কোরাণের সত্য প্রচারার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তিনি সেই সঙ্গে ইহাও প্রচার করেন যে, খুদা রসুল তাঁহাকে অবিশ্বাসীদিগের দণ্ডবিধানার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তিনি ভারতে ধর্ম্মযুদ্ধ এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। অতঃপর গাজী মিঞা শিবপুর, অজমীঢ়, মূলতান এবং দিল্লী প্রভৃতির জমীদার ও রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ, হিন্দুর প্রাণনাশ ও সম্পত্তি লুণ্ঠনাদি করিতে করিতে অবশেষে বহ্রাইচের রাজা সুহৃদ্দেবের হস্তে নিহত হন। তাঁহার সঙ্গী সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই সেই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করেন। যে সকল সর্দ্দার রক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহারাই পরে মৃত-সর্দ্দারদিগের সমাধি প্রস্তুত করিয়া কাহাকে 'গাজী মিঞা' কাহাকে 'মলিক আদম্', 'বড়ে পীর', 'বৈহ্রানা', 'কানর', 'লাল পীর', এবং 'তস্লা পীর' প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত করিয়া আপনারাই সেই সকল দর্গার অধিকারী হইয়া বসেন। পীরস্থান ধর্ম্মভীরু ভারতের অশিক্ষিত নরনারীর পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। সুতরাং হিন্দু মুসল-মান সেবকগণের পূজোপচারে এই সকল দর্গার প্রচ্ছন্ন পূজারিগণ অনায়াসে আপনাদের উদর পালনের পথ করিয়া লইতে সমর্থ হন এবং সেই সঙ্গে গোপনে গোপনে মুসলমানধর্ম্মের প্রচার করিতে

থাকেন। গাজীর ইহাই সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস। ব্যাপার কিন্তু এই স্থানেই শেষ হয় নাই। বহ্রাইচ যাইবার পথে রুদৌলী গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। "রুদৌলী সরীফ" গাজী মিঞার শ্বশুরালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এজন্য বহ্রাইচ-যাত্রী হিন্দুকুলাঙ্গনাগণকে রুদৌলী গ্রাম হইয়া যাইবার কালে তথাকার কুরুচিপূর্ণ মুসলমান যুবকগণের কুৎসিত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। হোলীপর্ব্বে সদৃশ আচরণে অভ্যস্থা কুলকন্যাগণ গাজী মিঞার শ্বশুরবাড়ীর প্রতিবেশী মনে করিয়া এই সকল দুর্ব্বৃত্তের আচরণে ভীতা হন না অথবা তাহা আপনাদের মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন না। ধর্ম্মসুধাকরমণ্ডলী এজন্য বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া গাজী মিঞার হিন্দু পূজারিদিগকে সম্বোধন করিয়া এক পত্রে লিখিয়াছেন। *

সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক ব্যাপার এই যে, বহ্রাইচে গাজী মিঞার রোজা বা সমাধিগৃহের সম্মুখ-দ্বারে একটা লৌহশৃঙ্খল বিরাজমান। প্রথা আছে, পীরের আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হিন্দু মুসলমান উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকল লোককেই সেই শৃঙ্খল চুম্বন করিতে হয়। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সময় আমরা বহ্রাইচে উক্ত রোজা দেখিতে যাই, তখন কোন হিন্দু যাত্রীকে তথায় উপস্থিত দেখি নাই, কিন্তু কয়েকজন মুসলমান

---

* হুআ তুম্হে ক্যা হিন্দু লোগো কি মুর্দো পর সর পটক রহে হো।
তুম অপনে দেবো কো ত্যাগ করকে মিঞাকে পিছে ভটক রহে হো॥
পড়ে হ্যায় ক্যা অক্ল পর য়ে পথর বনে তুম ঐসে নাদান ক্যা হো।
মুজাবরো সে থুকা কে খাতে গবয়াকে হিন্দ ইমান ক্যা হো॥
মুজাবর পীর মুর্দা গাজী ক্যা দেগে তুমকো সনতান ভাই।
শরম হ্যায় তুমকো ন আতী বিলকুল ডুবা দিয়া ধরম মান ভাই॥
থা হিন্দুও কা জো জা কা দুশমন বনা ওহী দেবতা তুম্হারা।
হ্যায় শোক বুদ্ধি পর ইয়ে তুম্হারে ন তুমনে সোচা ন কুছ বিচারা॥
থা বেধর্ম্মা গউ কা ঘাতক ন জিসকে অকর্ম্ম কা আরপারা।
ইসী অধর্ম্মীপনে পর রাজা সুহৃদেব নে উসে হ্যায় মারা॥
জিসে ন হো য়েকী মংগা লে তবারীখ মে হ্যায় হাল সারা।
লিখা হ্যায় জো জীবনী মিঞা কা লো মান শীতল বচন হমারা॥

যাত্রী ভক্তিভরে উক্ত শৃঙ্খল চুম্বন করিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এখানকার প্রথা দেখিয়া আমার জগন্নাথক্ষেত্রই মনে পড়ে। কিন্তু বহ্রাইচের গাজীক্ষেত্র জগন্নাথক্ষেত্রকেও টেক্কা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে দেশে চারিজন ব্রাহ্মণের জন্য পাঁচটি "চুলা"র প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই দেশে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে একই স্থানে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া চুম্বন করায় যে হিন্দুর সংস্কারে বাধে না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহা ঔষধার্থে সুরাপানের ব্যবস্থার সংস্কারাতুর বলা যাইতে পারে। যে কারণেই হউক, দাক্ষিণ ভারতে শ্রীক্ষেত্রের জাতিভেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হিন্দুর মিলনক্ষেত্রের মত উত্তরভারতে গাজী মিঞার রৌজা হিন্দু মুসলমানের মিলনমন্দিরস্বরূপ বিরাজ করিতেছে এবং উক্ত শৃঙ্খলটা উভয়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ করিবার ইঙ্গিতস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শিলচর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (Home of Service) একটী সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী ও আবেদন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইং ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন নিঃস্বার্থ যুবকের উদ্যোগে ও মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ে অধিনায়কত্বে, এই আশ্রমটী স্থাপিত হয়। তদবধি আশ্রমটী উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার সেবার ভাবে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই কায়িক ও আর্থিক সাহায্যাদি দান করিয়া অনুষ্ঠানটীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

আশ্রমের তত্ত্বাবধানে দরিদ্র ও তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় বালকগণের শিক্ষার্থ একটী 'বিবেকানন্দ নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৩০ জন। আশ্রমের সেবকগণই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক পুস্তকাবলী সম্বলিত একটী পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে। উহা হইতে সর্ব্বসাধারণকে বিনা চাঁদায় পুস্তকাদি লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

সেবকগণ ইং ১৯১৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৬০ জন পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং মৃতের সৎকারার্থ কতিপয় নিঃসহায় পরিবারবর্গকে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহারা একটী অগ্নি-নিবারণী-দলও গঠন করিয়াছেন এবং সহরের অগ্নি-নিবারণ কার্য্যে সহায়তা করেন।

বিগত অক্টোবর মাসে ভীষণ বন্যায় কাছাড় জেলা এবং শ্রীহট্টের কতক অংশ প্লাবিত হইয়া যায়, উহাতে অনেকে নিরাশ্রয় এবং নিরন্ন হইয়া পড়েন। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ কাছাড় জেলায় দুইটী ও শ্রীহট্টে একটী সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহাদের অভাব মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রথম হইতেই আশ্রমের নিজস্ব একটী কেন্দ্র-গৃহ না থাকায় ঐরূপ নানাবিধ সেবা কার্য্যের বহু অসুবিধা হইতেছে। উক্ত অভাব দূর করিবার জন্য শিলচর সহর হইতে তিন মাইল দূরে রামকৃষ্ণপুর নামক গ্রামে ২২ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। তথায় সাধু-সন্ন্যাসিগণের থাকিবার জন্য মঠ, দাতব্য ঔষধালয়, নিঃসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করিবার জন্য গৃহ ও আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। নৈশ-বিদ্যালয় ও পাঠাগারটী সহরেই থাকিবে।

এই সকলের জন্য প্রায় ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য আশ্রমবাসিগণ সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা আশা করি, এই সদনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সাহায্য অতি সামান্য হইলেও মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম শিলচর, এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা অনাথ আশ্রমের পঞ্চবিংশতিতম (ইং ১৯১৬) বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আশ্রমটী বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। অভিভাবকহীন, নিরন্ন ও আশ্রয়শূন্য বালক-বালিকাগণের পিতামাতার স্থলে অভিষিক্ত হইয়া তাহাদিগকে একদিকে স্নেহ অন্ন ও আশ্রয় দান, অপর দিকে বিদ্যা, বিনয় ও শীলতা শিক্ষা দিয়া 'মানুষ' করিয়া তোলাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য।

আশ্রমে বালক ও বালিকাদিগের জন্য তদুদ্দেশ্যে একটী করিয়া লোয়ার প্রাইমারী স্কুল আছে। বালিকাগণকে স্কুলের পাঠ ছাড়া সেলাই, কাটছাঁট, সূক্ষ্ম বয়ন কার্য্য এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম-সকল বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাদিগকে সৎপাত্রস্থ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন আনন্দময় করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা অতি আনন্দের সহিত পাঠ করিলাম যে, আলোচ্য বর্ষে এইরূপ ৫টী বালিকার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

বালকদিগের জন্য একটী শিল্প বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে; উহাতে দর্জ্জির ও ছুতারের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণকে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫টী বালক উচ্চ ইংরাজী স্কুলে এবং ২টী মধ্য ইংরাজী স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইং ১৯১৬ সালে ১টী যুবক আশ্রমে থাকিয়া বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাপড়ায় ওকালতি করিতেছে এবং একটী বালক ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে, বালক-বালিকাদিগের নৈতিক উন্নতির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

আলোচ্য বর্ষে ৮৭টী বালক ও ৪৬টী বালিকা—মোট ১৩৩ জন আশ্রমে স্থান পাইয়াছে।

আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণের পক্ষ হইতে কর্ম্মঠ ও পরহিতব্রত অবৈতনিক সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয়, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও

রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর যাহাতে তাঁহারা আরও অধিক সংখ্যক অনাথ বালকবালিকাগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ তাহাতে কেহই সহানুভূতি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আগষ্ট মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে জানা যায় যে, গত জুলাই মাসে ১৭ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ২৭ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ৩ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, ২ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ও ১২ জন তখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৮৩৬ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০৯ জন নূতন এবং ২২২৭ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয়, চাঁদা হিসাবে ৯৷৷০, এক কালীন দান হিসাবে ১৯ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে ৫০০—মোট ৫৬৮৷৷০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ১৯৮৵১৫ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে খরচ ২৭৭/১৫—মোট ৪৭৫৷/১০।

সন ১৩২৪ সালের মাঘ মাসে, ইং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রয়াগধামে 'কুম্ভমেলার' অধিবেশন হইবে। তদুপলক্ষে যাত্রিগণের সুবিধা ও পীড়িতের সেবার জন্য তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের পক্ষ হইতে একটী সেবা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। মেলাস্থানে পীড়িত দরিদ্র নারায়ণগণকে ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করা এবং বৃদ্ধ আতুরগণ স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রভৃতিরূপ সময়োপযোগী সাহায্য করাই উক্ত সেবা-কেন্দ্রের প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইবে। ঔষধপথ্যাদি কিম্বা অর্থ যিনি যাহা এই অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য

করিতে চান তাহা ব্রহ্মচারী পঞ্চানন, সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ‘গঞ্জ, এলাহাবাদ এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

গত ২৯শে জুন, ১৯১৭, মান্দ্রাজবিভাগস্থ অম্বরপেটের শাখা বিবেকানন্দ সোসাইটীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে দুই দিবসব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। পূজা, হোম, স্তোত্রপাঠ, হরিকথা, ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাদি উক্ত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

ইং ১৯১৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী সারদানন্দের নিকট দরিদ্রভাণ্ডারের জন্য প্রেরিত দানের প্রাপ্তি স্বীকার ও হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দাতাগণের নাম :—

জনৈক বন্ধু, কিশোরগঞ্জ ১৫ টাকা; শ্রীযামিনীমোহন দত্ত, পাটনা, ১ টাকা; মাঃ ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য ২ টাকা; শ্রীগিরিশচন্দ্র বিশ্বাস, কালেক্টরী অফিস, মৈমনসিংহ ২ টাকা; জনৈকা স্ত্রীলোক, মুক্তাগাছা ১০ টাকা; এম, মুখার্জ্জি ১ টাকা; শ্রীযুক্ত জে, এম, কর, পুটাও, ৪ টাকা—মোট ৩৫ টাকা।

সাহায্যপ্রাপ্তগণের নাম :—

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাশদী ৪ টাকা; শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য ২ টাকা; ঔষধ পথ্যাদির জন্য কামারপুকুরের জনৈক ৫ টাকা; বাগবাজার নিবাসী একটী দরিদ্র পরিবার ২ টাকা; ব্যাধিগ্রস্ত জনৈকের রাহাখরচ ৫ টাকা; জনৈক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য দান ২ টাকা; একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারকে ২ টাকা; একটী দরিদ্র-পরিবার, নকাসীপাড়া ২ টাকা; বাগবাজারের একটী দরিদ্র পরিবারকে ৫ টাকা—মোট ২৯ টাকা। বাকি তহবিল জমা ৬ টাকা।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্য্যদেবের সম্বন্ধ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

নিঃসন্দেহ, ভারতবর্ষই মনস্তত্ত্ব-চর্চ্চার প্রকৃষ্ট স্থান। জগতের অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা হিন্দুদিগের নিকটই মানুষ সমধিক-পরিমাণে কতকগুলি মনরূপে প্রতিভাত হয়—একথা বলা চলে। চিত্তৈকাগ্রতা তাহাদের নিকট জীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। ধীশক্তি ও প্রতিভা, সাধারণ সচ্চরিত্রতা ও সর্ব্বোচ্চ সাধু জীবন, নৈতিক দুর্ব্বলতা ও শক্তিমত্তা—এসকলকে তাহারা একাগ্রতার এক আধটু তারতম্য হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে মনস্তত্ত্ব একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মত যথোচিত-ভাবে অধীত হইয়া আসিয়াছে, হিন্দুজাতির এই তন্ময়তাই কতকাংশে তাহার কারণ, আবার কতকাংশে তাহার ফলও বটে। জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে লিখনপ্রণালীর উপকারিতা লোকে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিবার বহুপূর্ব্বে, হিন্দুসমাজে মানবের সমষ্টিমনের যাবতীয় ব্যাপার, পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও অবেক্ষণের ফলসমূহের আদানপ্রদান দ্বারা নিঃশব্দে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যাপারটীর সহিত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের আদৌ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, একথা লোকের মনে উদয় হইবার যুগযুগান্তর পূর্ব্বে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের প্রকৃতির

সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল এই বিজ্ঞানটীর সম্বন্ধে পরীক্ষার যুগ পূর্ণভাবে অভ্যুদিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এইরূপে যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইয়া অদ্ভুত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে, মনোরাজ্যের এমন অনেক ঘটনার যথোচিত সমাবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস থাকিবে, যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অভিজ্ঞ পাশ্চাত্যদিগের নিকট অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলিয়া বোধ হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। সুতরাং সম্মোহনী বিদ্যা এবং অজানিত নানাপ্রকারের অসাধারণ অনুভব বা শক্তি—রোগ ভাল করা, মনের কথা বলিয়া দেওয়া, দূরদর্শন এবং দূরশ্রবণ, এইগুলিই ইহাদের মধ্যে সাধারণে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত—এ সকল যাঁহারা ভারতের প্রাচীন মনস্তত্ত্ব বা 'রাজযোগের' আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট একটা মস্ত কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা সকলেই জানি যে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রধান উপকারিতা এই যে, উহা আমাদিগকে নানা ঘটনা বুঝিতে ও লিপিবদ্ধ করিতে সহায়তা করে। কোন একটী রোগ বিরল হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্রের কোথাও একবার মাত্র উহার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তখন হইতে মানব মনে উহার একটী স্থান রহিল। উহা আর অলৌকিক ব্যাপার নহে—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, শীঘ্র বা বিলম্বে উহার শ্রেণী নির্দ্দেশ হইবেই। উহার একটী নাম আছে। উহার নিদান এবং চিকিৎসা এখন শুধু কালসাপেক্ষ।

সচরাচর যাহাকে "অলৌকিক দর্শনাদি" নামে অভিহিত করা হয়, সেই সকল ঘটনার যে অংশ বিশ্বাস্য, তৎসম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বোক্তরূপ কথা বলা চলে। সহজেই বুঝা যায় যে, এই পর্য্যায়ভুক্ত ঘটনাবলী সত্য হইলে আর আদৌ অলৌকিক থাকে না—উহা বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করা, অথবা বায়ু হইতে রেডিয়ম পৃথক করিয়া লওয়ার ন্যায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

বাস্তবিকই, 'অলৌকিক' বা 'অতিপ্রাকৃত' কথাটী আদৌ সঙ্গত কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করা যাইতে পারে, কারণ যদি কোন জিনিসের অস্তিত্ব একবার সপ্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উহা প্রকৃতির ভিতরেই এবং উহাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলা ঐজন্যই নিতান্ত অযৌক্তিক। আলোচ্য ঘটনাসমূহ ভারতবর্ষে মনোবৃত্তিরই সমধিক বিকাশের ফলমাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং উহাদের ব্যাখ্যা ঘটনাগুলির মধ্যে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া যে ব্যক্তি ঐ সকল উপলব্ধি করিয়াছে তাহারই মনের অবস্থা দৃষ্টে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, কারণ ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ঐ মন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভ্যস্ত অনুভবসকল হইতে স্বতন্ত্র এক একরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে।

শাস্ত্রে চরম চিত্তৈকাগ্রতার যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর বাস কালে বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মধ্যে সেই সকল মানসিক বিকাশের অনেকগুলির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বাহ্যজগতের ঘটনাসমূহ এমন জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আপনা হইতে তথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এবং বালকেরা যে সকল প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া লিখিয়া পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার অনুভূতিসকল এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি স্পর্শমাত্র, কিরূপ চরিত্রের লোক তাঁহার খাদ্যসামগ্রী, কাপড় চোপড়, বা বিছানা ছুঁইয়াছে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার ঐরূপ স্পর্শ করিতেই তাঁহার অঙ্গ যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন যে, তিনি দাহ যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। অন্য এক সময়ে হয়ত বলিলেন, "এই দেখ! ইহা আমি খাইতে পারিতেছি; যে উহা পাঠাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই ভাল লোক" আবার তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ ভাবের এরূপ দৃঢ়সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল যে, নিদ্রাকালেও তিনি

ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না, এবং জাগ্রত অবস্থায় কোন পুস্তক বা ফল উহার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকিলে, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার হাত যেন আপনা হইতেই উহা যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া আসিত।

জগতের ঋষিপদবীভুক্ত মহাপুরুষগণের কাহারও সম্বন্ধে কোন ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিবেন না যে, উক্ত মহাপুরুষ দেবতাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন; তাঁহারা শুধু ইহাই বলিবেন যে, তিনি এমন একটী মানসিক অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেন, যেখানে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইত যে, তিনি দেবতাদিগের সহিত কথা কহিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাকে ভারতীয় দার্শনিকগণ "স্ব-সংবেদ্য" ব্যাপার বলিয়া থাকেন। এই অবস্থার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ দেখিয়াছেন। এখনও তাঁহারা গল্প করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অতি বিস্ময়ের সহিত শুনিতেন—কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যেন দুই বা বহু জনে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তন্মধ্যে একপক্ষের কথাগুলিই শুধু তাঁহাদের কাণে আসিতেছে; এদিকে তাঁহাদের গুরুদেব শান্তভাবে বিশ্রাম করিতে করিতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, তিনি শিষ্যগণের অদৃশ্য দেব-দেবীসমূহের সহিত ধ্যানযোগে কথোপকথন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অজস্র দর্শনসমূহের পশ্চাতে সর্ব্বদাই মানবকে সেবা করিবার দৃঢ়সংকল্প বিদ্যমান থাকিয়া ঐ সকলকে একটী মহাজীবনরূপে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার বহুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ তৎসম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি তমসাচ্ছন্ন নিশায় সময়ে সময়ে যন্ত্রণায় মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেন, তিনি যেন আবার পৃথিবীতে, এমন কি কুকুর যোনিতেও, জন্মগ্রহণ করেন, যদি উহাতে একটী জীবেরও কিছু সহায়তা হয়। অন্যান্য সময়ে যখন তিনি নিজের মনের কথা অপরের সামনে কিছু কিছু খুলিয়া বলিতে পারিতেন, তিনি বলিতেন যে, উচ্চ উচ্চ দর্শন আসিয়া তাঁহাকে সেবার ভাব হইতে টানিয়া লইবার,

জন্য প্রলোভিত করিতেছে। তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহাদের গুরুদেব কখনও কখনও গভীর সমাধিভঙ্গের পর যে দুই চারিটী কথা আপন মনে বলিতেন, তাহাও এই বিষয়ক বলিয়া স্থির করিতেন। তিনি যেন তখন শিশুর ন্যায় মায়ের কাছ হইতে দৌড়িয়া গিয়া খেলিবার জন্য জগন্মাতার নিকট আবদার করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিবার জন্য তিনি 'আর একটী মাত্র জীবসেবাকার্য্য' বা 'আর একটী ছোট খাট জিনিস ভোগ' করিব —এই বলিয়া বায়না ধরিতেন। কিন্তু ঐ ব্যুত্থানকালে তাঁহাতে সর্ব্বদা অনন্ত প্রেম ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লক্ষিত হইত,—যেমন ঈশ্বরে একান্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হইয়া থাকে। যখন স্বামী বিবেকানন্দ হার্ভার্ড বক্তৃতা উপলক্ষে ঐ দুইটীকেই সমাধিজনিত বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ও মৃগীরোগের বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা, এই দুইয়ের মধ্যে লক্ষণের পার্থক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের জীবনে সমাধি-অবস্থা লাভ ও পুনরায় তাহা হইতে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, এতদুভয়কে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রত্যেক কথাটীতে ওরূপ দৃঢ়প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার উপর কিরূপ আধিপত্য ছিল তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি তাঁহার শেষ অসুখের সময় গলদেশ হইতে মনকে একেবারে উঠাইয়া লইতে পারিতেন; তখন তথায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেও, যেমন ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থানকে অসাড় করিয়া ফেলিলে হইয়া থাকে সেইরূপ, কোনই বেদনা অনুভূত হইত না। তাঁহার সকল জিনিসকে, তন্ন তন্নভাবে লক্ষ্য করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। শারীরিক গঠনের এতটুকু খুঁটিনাটিও তাঁহার নিকট অর্থপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত, তিনি উহাতে শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবের প্রকৃতির কিছু না কিছু পরিচয় পাইতেন। নবাগত শিষ্যগণকে তিনি একরূপ যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিতেন এবং তাহার মগ্নচৈতন্য হইতে কয়েক মিনিটের

মধ্যে তথায় বহু অতীতের যে সকল সংস্কার নিহিত রহিয়াছে, তাহাও জানিয়া লইতেন। লোকের প্রত্যেক সামান্য কথা ও কার্য্য, যাহা অপরের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, তাহা তাঁহার নিকট চরিত্র-রূপ মহাপ্রবাহে নীত তৃণখণ্ডের ন্যায় ঐ স্রোতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিত। তিনি বলিতেন, "কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা হয়, যখন নরনারীগণকে কাচের বস্তুর ন্যায় বোধ হয়, এবং উহাদের ভিতর বাহির সব দেখিতে পাই।"

সর্ব্বোপরি, তিনি স্পর্শমাত্র লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতে পারিতেন; তাহাতে তাহাদের সমগ্র জীবন এক নূতন শক্তি-প্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইত; সমাধির বিষয়ে, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত জনৈক সাদাসিধা প্রকৃতির লোক আমায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয় মাসের এক দিনের একটী ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। ঐ দিন কাশীপুরের বাগানে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে সমবেত কতকগুলি ভক্তের মাথায় হাত দিয়া কাহাকেও বলিলেন, "চৈতন্য হোক্", আবার কাহাকেও বলিলেন, "আজ থাক্", এইরূপ সকলকে বলিলেন। ইহার পরেই এইরূপে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের প্রত্যেকের এক এক বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি হইতে লাগিল। একজনের মনে অনন্ত বেদনা জাগিয়া উঠিল; অপর এক জনের নিকট আশপাশের সকল জিনিস ছায়ার ন্যায় অবাস্তব এবং একটী ভাবের ব্যঞ্জকমাত্র হইয়া উঠিল; তৃতীয় ব্যক্তি ঐ কৃপা অপার আনন্দরূপে অনুভব কারলেন—আনন্দ আর ধরে না; একজন একটী মহাজ্যোতি দেখিলেন, উহা তদবধি আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র গমন করিত, ফলে যখনই তিনি কোন মন্দির বা পথিপার্শ্বস্থ দেবালয়ের নিকট দিয়া যাইতেন তখনই তাঁহার বোধ হইত, যেন তিনি তথায় ঐ জ্যোতির মধ্যে একটী মূর্ত্তি আসীন দেখিতে পাইতেছেন; দেখিতেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে যেরূপ দেখিবার উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে ঐ মূর্ত্তি

কখন হাসিতেছেন, কখনও বিষণ্ণ রহিয়াছেন; ঐ মূর্ত্তিকে তিনি "বিগ্রহাধিষ্ঠাতা চৈতন্য" বলিয়া জানিতেন এবং ঐরূপেই তৎসম্বন্ধে বলিতেন।

এইরূপে প্রত্যেকের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সার বস্তু নিহিত আছে, তাহা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, অথবা তৎকালে যিনি যতটুকু গ্রহণের উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে নিজ অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কঠোর সত্যপরায়ণতা এবং প্রবল বিচারবুদ্ধির সূত্রপাতও পোষণ করিয়া যান, যাহা তাঁহার হাতে গড়া সকল শিষ্যের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছিলেন, "কোন জিনিসকে পরীক্ষা না করিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, ঠাকুর আমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন।" তার পর যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ শিক্ষা কিরূপ বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন গভীর চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিত্য বস্তুর কিছু না কিছু আভাস অনুভূতি করাইয়া দিতেন, তাহা হইতেই প্রত্যেকে এমন একটী জ্ঞান লাভ করিতেন, যাহা কখনও প্রতারিত হইবার নহে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম বয়সের বক্তৃতাগুলির একটীতে বলিয়াছেন, "আমাদের নিজ চেষ্টায়, অথবা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপায় আমরা সেই চরম বস্তু লাভ করি।"

গুরুর জীবনই শিষ্যের করতলগত রত্নসম্পদ্, এবং ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই যে, স্বামিজী মানবের মনোবৃত্তিসমূহ কতদূর প্রসারতা লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সকলকে তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, পাশ্চাত্য দেশের মনোরাজ্য বিষয়ক গবেষণাসমূহের সংস্পর্শে আসিবামাত্র সমগ্র জ্ঞানরাশিকে মগ্নচৈতন্যভূমি (sub-conscious), সাধারণ জ্ঞানভূমি (conscious) এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানভূমি (super-conscious) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিয়া-

ছিলেন। প্রথম শব্দ দুইটী ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনেকটা প্রচলিত ছিল, তৃতীয়টী তিনি স্বয়ং নিপুণ. সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং নিজ জীবনের অনুভূতির বলে মনস্তত্ত্ববিষয়ক শব্দসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সাধারণ জ্ঞান—মগ্নচৈতন্য এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ দুইটী মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা সামান্য পাতলা আবরণ মাত্র।" তিনি স বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন, "যখন আমি পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে সাধারণ জ্ঞানের এত বড়াই করিতে শুনিলাম, তখন আমি স্বকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই! সাধারণ জ্ঞান? সাধারণ জ্ঞানে কি আসিয়া যায়! তাহার নীচে যে অতলস্পর্শ সাগরোপম মগ্নচৈতন্য রহিয়াছে এবং তাহার ঊর্দ্ধে যে তুঙ্গ পর্ব্বতোপম অতীন্দ্রিয় জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাদের তুলনায় উহা ত' কিছুই নহে! ইহাতে আমার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ আমি কি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দশ মিনিটের মধ্যে লোকের মগ্ন চৈতন্য হইতে তাহার সমগ্র অতীতটা জানিয়া লইতে এবং তাহা হইতে তাহার ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র অন্তর্নিহিত শক্তি নিরূপণ করিয়া লইতে দেখি নাই?"

প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহিত কখনও বিচারবুদ্ধির বিরোধ থাকিতে পারে না—রাজযোগে লিপিবদ্ধ এই উক্তিটার সত্যতাও, নিঃসন্দেহ. তাঁহার ঐরূপ সকল জ্ঞানভূমির অভিজ্ঞতা-প্রসূত। দক্ষিণেশ্বরের সাধুর নানা অসাধারণ উপায়ে অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা ছিল. সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি জ্ঞানিগণ বৃথাভিমানে কখনও আত্মহারা হইয়া, যাহা সাধারণ উপায়ে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়াস পাইতেন না। একবার এক অদ্ভুত সাধুবেশধারী দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে আসিয়া বলে যে, সে না খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন অলৌকিক দর্শনের সাহায্য লইবার চেষ্টা না করিয়া শুধু কয়েক জন চতুর লোককে তাহাকে লক্ষ্য করিবার জন্য লাগাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যেন তাহারা

সে ব্যক্তি কি খায় এবং কোথায় খায়? তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে।

কোন জিনিসই পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা চলিবে না, এবং সাধারণ লোকেরা স্বপ্ন, ভাবী ঘটনা পূর্ব্ব হইতে দেখা এবং তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদি যে সকল উপায়ে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার এত চেষ্টা করিয়া থাকে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেহত্যাগের দিবস পর্য্যন্ত সে সকলকে আতঙ্কের চক্ষে দেখিতেন। লোকে এসকলও ভূরিপরিমাণে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত; করিবারই কথা। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা এগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, যদি উহারা সত্য হয়, তবে তাঁহার না-মানা সত্ত্বেও নিজ নিজ ফল প্রকাশ করুক। তিনি বলিতেন, কোন একটী ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যক্ষেত্রে সত্য হইবে কি না, সে কথা তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব; তিনি শুধু এই বিষয়টী ধ্রুব জানিতেন যে, যদি তিনি একবার উহাকে মানেন, তাহা হইলে তিনি আর কখনও উহার হাত এড়াইতে পারিবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বদা দেখা যাইত যে, অলৌকিক দর্শনাদি কেবল পারমার্থিক বিষয়েই প্রযুক্ত হইত; তিনি কখনও বেদিয়াদের ন্যায় ঐহিক বিষয়সমূহ গণিয়া বলিয়া দিতেন না; এবং তাঁহার শিষ্যগণের মতে ঐরূপ ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া শক্তির অল্পবিস্তর অপব্যবহারই সূচিত করে। স্বামিজী বলিতেন, "এ সকল অবান্তর ব্যাপার, ইহারা প্রকৃত যোগ নহে। অপরোক্ষভাবে আমাদের উক্তিসমূহের যাথার্থ্য প্রমাণিত করে বলিয়া উহাদের কতকটা প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। একটু সামান্য আভাসেও মানুষের বিশ্বাস হয় যে, স্থূল জড়জগতের বাহিরে একটা কিছু আছে। কিন্তু যাহারা এই সব জিনিব লইয়া কাল কাটায়, তাহাদের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।" আর একবার তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এ সকল 'সীমান্ত সমস্যার' (Frontier questions) ব্যাপার! উহাদের সাহায্যে কোন

নিশ্চিত বা দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমি ত বলিয়াছি উহারা 'সীমান্ত-সমস্যার' ব্যাপার। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখাটী সর্ব্বদাই বদ্‌লাইয়া যাইতেছে।"

আমাদের সামনে যাহা কিছু আসুক না কেন, বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা সর্ব্বদা থাকা চাই। কাহারও অলৌকিক দর্শনাদির কথা শুনিলেই বলিতেই হইবে, 'তখনই আমি উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব, যখন আমি উহা অনুভব করিব।' কিন্তু আমাদের নিজের অনুভূতিকেও তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন অলৌকিক ঘটনার যে ব্যাখ্যা প্রথমেই মনে আসিল, তাহাকেই সার জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। চট্ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক হওয়া সত্বেও, স্বামিজী শেষ বয়সে পরলোকগত আত্মা সকলের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই বলিয়াছিলেন, "আমি জীবনে অনেকবার ভূত দেখিয়াছি, এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে, এক জ্যোতির্ম্ময় অশরীরী আত্মা দেখিয়াছি।" কিন্তু ইহাতে একথা বুঝায় না যে, ভুতুড়েরা ভূতনামানর জন্য যে সকল চেষ্টা এবং পরীক্ষা করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ একদিনের ঘটনায় তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এই দলভুক্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি জগতের সকল বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমান্, সে যে তথাকথিত একজন মিডিয়মের (যাহার শরীরে ভূতাবেশ হয়) সামনে আসিয়াই তাহার সমস্ত বলবুদ্ধি খোয়াইয়া বসে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমেরিকায় তিনি কয়েকটী ভূতনামান ব্যাপারে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি ঐ সময়ে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখান হয়, তাহাদের অধিকাংশকেই একেবারে জুয়াচুরি মনে করিতেন। সকলগুলি দেখিয়া শুনিয়া তিনি এই সার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "সকল স্থলেই অতি সহজ সহজ উপায়ে অতি বড় বড় জুয়াচুরি হইয়া থাকে।" আবার

তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সকল ঘটনার অনেকগুলিকে বহির্জ্জগতের সত্য না বলিয়া অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার হিসাবেই ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।* যদি এই সকল বাদসাদ দিবার পরও উহাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর যে, সেটুকু সত্যসত্যই যথার্থ।

কিন্তু যদি এরূপই হয়, তথাপি মায়িক জগতের জ্ঞান লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দুই চারিটা জীব ঘুরিতে ঘুরিতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও, উহাতে অমৃতত্বের প্রকৃত ধারণা সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করা যায়। একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই ঐ অমৃতত্ব লাভ করা যায়। স্বামিজীর মতে ভূতপ্রেতাদি লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে বাসনাবৃদ্ধি, অহঙ্কারবৃদ্ধি এবং অসত্যে পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি আত্মার জন্য জীবনের সাধারণ ভোগগুলিকেই পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল অলৌকিক ক্ষমতা আরও কত অধিক পরিমাণে ত্যাজ্য! এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মে যদি সিদ্ধাইয়ের ব্যাপারগুলা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি উহাকে উচ্চতর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধের সিদ্ধাইসকলকে দারুণ ঘৃণা করা বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিরন্তন গৌরব। উহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে বড় জোর এই কথা বলা যায় যে, উহাদের সাহায্যে একটু আধটু বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহাও আবার ধর্ম্মশিক্ষার প্রথম সোপানগুলি সম্বন্ধে। বাইবেলের ভাষায় "সিদ্ধাই-আদি যাহা কিছু সব লোপ পাইবে; একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকিবে।"

* যেমন, দাক্ষিণাত্যে একব্যক্তির মনের কথা বলিয়া দিবার শক্তি আছে বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল। সে বলিত যে, এক অদৃশ্য স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে কি বলিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেয়। স্বামিজী বলিতেন, "আমার এই ব্যাখ্যা মনোমত না হওয়ায় আমি অপর একটী ব্যাখ্যার সন্ধান করিতে লাগিলাম।" তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ঐ সকল তথ্য সে নিজেরই ভিতর হইতেই প্রাপ্ত হইত।

যে দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এই সকল প্রলোভনকে দূর করিতে পারেন, তাঁহার নিকটই সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথায়, "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।" যিনি সিদ্ধিসকলকে সমূলে পরিহার করিতে পারেন তাহারই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধিলাভ হয়। তিনিই ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।

আগমনী।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ)

১

স্বাগত ওগো নগনন্দিনি,
স্বাগত আজি বঙ্গে,
দশ করে দশ আয়ুধধারিণী,
করি অরি'পরি রঙ্গে।
বামে ষড়ানন দক্ষে গণেশ,
কমলা বিমলা মাধুরী অশেষ,
মর্দ্দিত পদে দৃপ্ত অসুর
অসি অঙ্কিত অঙ্গে।

২

ডাকিছে তোমায় শারদ লক্ষ্মী,
বিহগ কুজন ছন্দে,
বাজায় কম্বু অম্বুদ-দল,
সঘনে পরমানন্দে।
উড়িছে হংসপতাকা আকাশে,
বিকীরিত ধূপ গন্ধ বাতাসে,
শ্রীচরণ তব পাদপ পত্র
শীর্ষ নোয়ায়ে বন্দে।

অন্নহীনের দেশে অন্নদে,
এস বরাভয় হস্তে,
শুষ্ককণ্ঠে সঞ্চারি সুধা,
অভয় বিতরি ত্রস্তে।
কোথা এবে সেই উৎসব দিন,
আঁধার-মগ্ন জ্যোতি-বিমলিন
বঙ্গ আকাশে প্রমোদ সূর্য্য
অকালে গিয়াছে অস্তে।

৪

আর কি সে দিন আছে অম্বিকে,
তোমার বোধন মন্ত্র,
ওঙ্কার রবে দিবে ঝঙ্কারি,
বিশ্ব-হৃদয় তন্ত্র!
তব আগমনী-গীতি তরঙ্গ
আর কি প্লাবিত করিবে বঙ্গ,
আর কি উঠিবে সে সুখ রাগিণী
আলোড়ি মরম-যন্ত্র।

৫

পুষ্পবিহীন এবে তরুরাজি,
প্রকৃতি নিথর ক্ষুব্ধ,
তৃষিত কণ্ঠে ছুটে না চাতক
নীরদের পাছে মুগ্ধ।
হরিৎ-শস্য-সম্ভারে আর,
শোভে না ক্ষেত্র—নেত্র-বিহার,
কেদার বাঁধিতে ধায় না কৃষক,
প্রচুর পুলক লুব্ধ।

জননী যাদের জগৎপালিনী,
ত্রিপুর যে মার রাজ্য,
অমৃতের চির অধিকারী যারা,
কীর্ত্তিত ভবে আর্য্য,
তাহারাই আজি অন্নবিহীন,
দলিত ঘৃণিত দীন হ'তে দীন,
বহে দুর্ব্বহ তুচ্ছ জীবন,
যাতনা অপরিহার্য্য !

৭

এই দুর্দ্দিনে এস পার্ব্বতি,
ওগো নগাধিপ কন্যা,
ভাসাও বঙ্গ আবার তেমতি,
প্রবাহি জীবন বন্যা।
সঙ্গেতে ল'য়ে এস মা সিদ্ধি,
অসীম শক্তি, অসীম ঋদ্ধি,
কর এ বঙ্গ গৌরবময়ী,
ধন ধান্যেতে ধন্যা।

৮

আর ভয় নাই শঙ্করী আসে
দূরিতে সকল শঙ্কা,
গগনে পবনে বাজিয়া উঠেছে,
উমার অভয় ডঙ্কা।
রে মন অন্ধ ভক্তি আবেশে,
জুড়াও চক্ষু হেরি অনিমেষে,
মঙ্গলময়ী মুরতি মায়ের,
অনঘ মুকতি অঙ্কা।

জীবনের সাহিত্য।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী)

আজকাল আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে বাঙ্গালাভাষার এই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির দিনে বাঙ্গালাসাহিত্যে ঠিক বাঙ্গালীত্বের সন্ধান মিলিতেছে না। এই 'বাঙ্গালীত্ব' জিনিষটা সমস্ত বাঙ্গালীর ঘরের কথা না হউক, যাহা বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতর আঘাত করে, তাহারই অভাব বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেটী বাঙ্গালীর—ধর্ম্মপ্রাণতা। এই সেদিন দেশের একজন কর্ম্মী ও বিদ্বান্ অথচ প্রধানতঃ বিদেশী শিক্ষাতেই শিক্ষিত বাঙ্গালী দুঃখের সহিত বলিলেন যে, প্রাচীন যুগের বাঙ্গালার গীতিকবিতার মধ্যে যে রূপান্তরের কথা ছিল—যাহার অনুধ্যান ও পরিকল্পন পাঠকের জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটাইবার যোগ্যতা রাখিত—সেইরূপ হৃদয়বত্তার সেইরূপ আন্তরিকতা-সংলেপ্ত জীবনের সাহিত্য আজ আর আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেন এমন হইল? এখনকার সাহিত্যে ত চাঁদের আলোয় প্রকৃতি হাসে, নীলাঞ্জন-নিন্দী নীল রবিদগ্ধ পাটল আকাশকে ছাইয়া ফেলে, কুটজ-কেতকী-গন্ধে আর্দ্র-স্নিগ্ধ বাতাস ভরিয়া যায়, বৃন্তচ্যুত যূথী যাঁথী মল্লিকা শেফালীর প্রচ্ছদপটে ধরণীদেবী নিত্য ভূষিতা হন, ঊষর মরুর বক্ষদেশ ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী কলতানে বহিয়া যায়, সাগরবারি বেলাতটের আহ্বানে নিমেষে নিমেষে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পদলুণ্ঠনে আত্মসমর্পণের চিহ্ন রাখিয়া যায়, সূর্য্যকিরণে নভশ্চুম্বী পর্ব্বতমালার গাত্রে "সাতশ' হীরার মাণিক" জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠে, মানবের অন্তঃপ্রকৃতি এখনও ত সেইরূপ সত্যের জন্য লালায়িত, ভালবাসা মান, অভিমান, জীবনের দ্বন্দ্ব, মোহ, হর্ষ বিষাদ, আগ্রহ ঔদাস্য, জয় পরাজয় এ সকলের চিহ্নই সাহিত্যে এখনও পাওয়া যায়। তবে কেন এমন হইল?—

* * * *

বাঙ্গালীর জীবনে আজ যে নূতনত্বের আবির্ভাব হইয়াছে ইহা তাহার জীবনের লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু 'চাঞ্চল্য ও অস্থিরতাই' জীবনের চিহ্ন নহে। বৈচিত্র্য ও গতি লইয়াই মানবজীবন, তাহা সত্য কিন্তু এই বৈচিত্র্য ও গতি যদি প্রতিপদক্ষেপে জীবনের সংরক্ষণ নীতি ও স্থিতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া চলিতে আরম্ভ করে, জীববিজ্ঞানের নিয়মানুসারে তাহা হইলে উহা পরিণামে প্রাণবস্তুটিরই সংহার করিয়া বসে—সেইজন্য সমাজে গতি স্থিতির অপেক্ষা রাখে। পরিণামে দেখা যায় যে এ উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। সংগ্রাম, সংক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের পর আবার একটা শান্তি ও স্থিতির যুগ আসিবে কিন্তু কাল-নেমির অবিশ্রান্ত ঘূর্ণনের ফলে সেই স্থিতির সুখ ও সেই স্থিতির স্বপ্ন আবার ভাঙ্গিবে, তাহার স্থান নূতন নূতন বিপ্লব ও নূতন নূতন চাঞ্চল্যের কারণ আসিয়া অধিকার করিবে ও বিশ্বের নাটাশালায় মূর্ত্তিমান্ নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের অবকাশ সৃজন করিয়া দিবে। এই দ্বন্দ্ব, এই বিক্ষোভ আবার এই শান্তি ও এই স্থিতির উত্থান পতন লইয়াই পার্থিব জীবন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ চিরদিন আধ্যাত্মিক তেজে বলীয়ান্। কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব, কত খণ্ড প্রলয়ের প্রবল বিভীষিকা ইঁহাদের চারিধার জীবন্ত কালরাত্রির ন্যায় আসিয়া ঘেরিয়াছে—ভারতের জাতিসঙ্ঘের বহিরাকারও তাহাতে কতরূপেই না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু ভারতবাসীর অন্তর কোন্ শুভ উষাকালে, কোন্ পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সামবেদী ঋষিকণ্ঠের উদ্গীথ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল—এখনও সে গীতের মাধুর্য্য সে ভুলিতে পারে নাই, তাহাই চিরদিন তাহার অবসন্ন দেহে প্রাণ বহন করিয়া আনিয়াছে। জড়জগতের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে দৃঢ়সংস্থ এই 'ব্রাহ্মীস্থিতি'র তত্ত্ব ভারতের ঋষিগণের সাধনার ধন। তামসিক ও রাজসিক ভাবের উপরে সাত্ত্বিকতার আসন। জগতের অপর অনেক জাতি একেবারে ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ভারতবাসী তাহার এই সাত্ত্বিকস্থিতির তত্ত্বকে পূজা করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তাহার সমাজও এযাবৎ

টিকিয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইল এদেশের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একটা ঘোর তামসিকতার মোহময় তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর নানাজাতির সংস্পর্শে ও চারিদিকের নানা ভাবের উত্তেজনার আঘাতে তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপেই রাজসিকতার অভ্যুদয় হয় ও ঘটিবে। এই সময়ে আমাদের দেশে ইহার আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল এবং তাহা আসিয়াছে 'কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতবাসী তাহার অতীত জীবনের উপর বীত শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাহিত্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাহিত্য জীবনকে প্রতিফলিত করে। আবার দেশের জাতীয়সাহিত্য জাতীয়জীবন গড়িয়া তুলিবার দাবী রাখে। আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা আমাদের সাহিত্যে দেখিতে পাই। শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ এবং এমন কি আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত এই বিশিষ্টতার লক্ষণে অনুপ্রাণিত। কাব্য যাহা তাহাও "কান্তাসম্মিততয়া" হইলেও "সদ্যোপরনির্বৃতয়ে" হইবে ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিকের মত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেকখানি স্থানও ধূপধুনার গন্ধে ভরপূর ছিল। তখনকার সাহিত্য সমাজের সেই পরিপূর্ণ-জীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত। সমাজের সাত্ত্বিক শ্রেণীর লোকদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ক্ষাত্র ও অপর ভাবের রাজসিকতা তাহার যথোচিত পুরস্কার লাভ করিত। ভারতের কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে রঘুবংশীয়-গণের যৌবনে ইন্দ্রিয় বিষয়ের চর্চ্চার কথা বলিয়াছিলেন, আবার তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন ও অন্তে যোগাবস্থ হইয়া তনুত্যাগের কথাও বলিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ভোগের উত্তেজনা যদি উচ্চ আদর্শস্থিতির ভাবে পরিচালিত না নয় তাহা হইলে তাহার পরিণামই বা কি হয়। সমাজ কেবল অনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দাম যৌবনের লীলাখেলারই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, ইহা যাঁহাদের মত তাঁহারা জীবনের পূর্ণত্বের দিক হইতে বিচার না করায় যৌবনের মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারেন নাই। যৌবনের নামে

যে যথেচ্ছাচারের সাহিত্য আজ জাতীয় জীবনের প্রতি বিদ্রূপের অট্টহাস প্রকাশ করিতেছে তাহা যদি ইঁহাদের কথামত সমাজের সিংহাসনে আসীন হয় তাহা হইলে সমাজের পবিত্রভাব ও চিন্তা ক্রমশঃ দূরে পলায়ন করিবে। শুধু Broad grins এ কখনও কোনও জাতির উন্নতি হয় নাই ও হইবে না। সমালোচক সাহিত্যিক মাথু আর্নল্ড শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উচ্চচিন্তাসমন্বিত জীবনের সমালোচনাপূর্ণ হইবে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখনকার সাহিত্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুর আমরা শুনিতে পাইতেছি, তাহাও আধুনিক ইউরোপীয় রীতির অনুকরণ। সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রাচীন অথবা নব্য, classical অথবা Romantic, এই সকল রীতির কোনটীই একেবারে সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অধুনা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সুরটীকে আমাদের সাহিত্যে, তথা, সমাজিকজীবনে একেবারে সর্ব্বোচ্চ স্বরগ্রামে বাহাল রাখিবার উদ্দেশ্যে যে কথা উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযোগ। অবাধগতির নীতি এই শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচকেরাই আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে "আদর্শহীন শিক্ষা ও উদ্দেশ্যহীন গতি ভারতের ছিল না" এবং হইবেও না।

সাহিত্য-সেবক যখন সমাজ-সমালোচনায় ভারতীয় আদর্শের অবান্তর পন্থার পন্থী হইয়া উঠেন তখন তাঁহাদের সমাজ সমালোচনার আদর্শ লইয়াই আমাদিগকে তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি যাচাই করিতে হয়। তখন আর তাঁহাদের আর্টের উদ্দেশ্যহীনতারূপ ফাঁকির আপত্তি আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছায় না। ইঁহাদের কাহারও কাহারও মতে সকল সময় সত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া চলা priggishness বা আত্মম্ভরিত্ব এবং সাহিত্যে তথা সামাজিক জীবনে সকল সময়ে সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শ লইয়া কালযাপন করা অবিহিত। এই শেষোক্ত-রূপ মতের ফলেই "পয়লা নম্বরের" প্রচলন। পাশ্চাত্যের অনুকরণশীল ভারতীয় জীবনের ইহা পয়লা নম্বরের একটী বিশেষ নিদর্শন বা distinctive trait বটে। Degeneration পুস্তকের রচয়িতা,

জার্ম্মাণির মনস্তত্ত্ববিৎ ডাক্তার Max Nordau নাট্যকার Ibsenএর দৃষ্টান্তে স্ত্রীদিগের এইরূপে স্বামী পরিত্যাগ প্রণালীর নামকরণ করিয়াছেন—departures à la Nora ইহাও তাই। সাহিত্যিক রসশিল্পী কি ইহাকে শুধু উদ্দেশ্যহীন আর্ট বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন? সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইউরোপের সামাজিক বিপ্লববাদ এইরূপেই অতি নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাঙ্গালীর মনে অস্থৈর্য্য ও চাঞ্চল্য আনিয়া দিতেছে। ইহার পরের দফায় হয় ত আমরা দেশের মুটে মজুরদিগকে জীবনে না হউক সাহিত্যে অন্ততঃ ফরাসী Guy de Maupassantর Vagabondএ পরিণত হইতে দেখিব। সাহিত্য রসশিল্পীগণের নিকট হইতে পাইব Strindbergএর Confessions of a fool আর বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিতা রমণীকুলের সাধনার বিষয় হইতে দেখিব Shawএর Mrs. Warren's profession!! আমাদের সমাজেও অনেক বিকৃতি আছে স্বীকার্য্য কিন্তু উচ্চ আদর্শের নামে * অপর দেশের বিকৃতিগুলিকেও কল্পনার মনোহারিত্বে ও সরস বর্ণনায় দেশের ও দশের নিকট উপস্থাপিত করিলেই কি সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখান হইল? সীমার ভিতর অসীমের সুর কি এইরূপেই শুনা যায়? ভারতীয় আদর্শের ইহা কি শোচনীয় পরিণাম নহে?

* * *

সংস্কৃতশাস্ত্রে ও সাহিত্যে কবিকে বিশ্বস্রষ্টার সহিত উপমিত করা হইয়াছে। ত্রিকালদর্শী, ক্রান্তদর্শী যোগী ও ঋষিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ-

* দেখা যায় যে, art for art's sake এর মত ও একটি উচ্চ ভাবের প্রতিধ্বনি। সম্পূর্ণরূপে রাগ ও কামনাবর্জ্জিত না হইলে শিল্পীর সে অবস্থা সম্ভবপর নহে, এবং তাহা সম্পূর্ণ স্বসংবেদ্য ভাব। ব্যবহারিক জগতে, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে সেরূপ ভাবের সমালোচনা কার্য্যকরী হইতে পারে না। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে সকল বস্তুর পরিদর্শনকে Higher contemplative aspect of things বলা যাইতে পারে, তন্নিম্নে নীতিজ্ঞান এবং আর্টের ক্ষেত্রে সৌসামঞ্জস্যের জ্ঞান বা Sense of harmony and proportionই বলবৎ। প্রাতিভাসিক হইলেও এগুলিও সত্য এবং উচ্চতম সত্যের সহিত অবিরোধী।

শ্রেণীর কবি। ইঁহাদিগের জীবনের উপলব্ধির ইঙ্গিতেই ভারতীয় জীবনের সৎসাহিত্য রচিত হইয়াছে। স্মরণ মননের রাজ্যের উপরেও ইঁহারা উঠিয়া থাকেন, ইঁহাদের কথায়, "এতাবানস্য মহিমা, অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতম্ দিবি" আমাদের এই চরাচর বিশ্ব, বিশ্বদেবতার অপার সৌন্দর্য্যের এক-চতুর্থাংশমাত্র অবলম্বনেই মহীয়সী, ধন্যা। মানবসাধারণ ইহার কতটুকুই বা জানিতে পারে, কতটুকুর ভাবেই বা সে বিহ্বল হয়! ঋষি যিনি, মন্ত্রদ্রষ্টা যিনি, ইহলোকে বিরাজ করিলেও তাঁহাদিগের দিব্য ও পূতদৃষ্টি এই আপাতদৃশ্যের যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া সেই নিখিলের দেবতায় পরাকাষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এই পরম সত্যের সাক্ষাৎ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। জীবনে ক্রমপরিস্ফুট এক সৎ সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ মানবমাত্রকে পাইয়া বসে। সে আদর্শ কোনরূপেই তাহার মন হইতে বিচ্যুত হইতে চাহে না। পরিদৃশ্যমান্ জগতে নানারূপ অবান্তর চিন্তা ও ভাবের সহিত সম্মিলিত থাকিলেও সেই অসীম সুন্দরকে জীবনে উপলব্ধি করিবার প্রেরণাই তাহাকে ইহজগতের মধ্যে নানারূপে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব অন্বেষণ করাইয়া উপরের দিকে তুলিতে চাহে। কিন্তু এই চেষ্টায় তাহাকে অনেক সময়ে বৃথা ভাবুকতার উদ্দাম গতিকে রোধ করিয়া পার্থিবজীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্পৎগুলির সহিত যোগ রাখিয়া ধাপে ধাপে সোপানপরম্পরায় সেই সৌন্দর্য্যের ও রসের রাজ্যের উপরে উঠিতে হয়, নতুবা তাহার সৃষ্টি তাহার দর্শন বস্তুতন্ত্রহীন ও মাত্র ভাবগত (merely sentimental) হইয়া পড়ে।+ এইরূপে সৌন্দর্যতত্ত্বের অনুশীলনের ফলেই তাহার আর্ট অথবা কাব্যকলা ও শিল্পকলা প্রভৃতির সৃষ্টি। সেই 'রসোবৈ সঃ' এর অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত আর্টের সৃষ্টির সার্থকতা ঘটে না। সেইজন্য সামাজিক

+ ইংরাজ দার্শনিক কবি কোলরিজ কাল্পে চলিত কল্পনাকে Fancy ও সত্যের প্রেরণায় উচ্চভাবকে Imagination আখ্যা দিয়া দুইটিকে স্বতন্ত্র বিভাগে ফেলিয়াছেন। See Coleridge—Biographia Literaria.

জীবনের প্রত্যেক স্তরে উদ্গত আর্টের মাপকাঠী স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের পরিসমাপ্তি জীবনের পূর্ণতার মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ", আর্টিষ্টকে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। সকল উচ্চাঙ্গের আর্টসৃষ্টির মধ্যে আমরা জীবনের এই মহান্ ইঙ্গিত লাভ করি, এবং দেখিতে পাই সকল বিক্ষিপ্ততা ও অস্থিরতার ঊর্দ্ধে সেই স্থির সত্যের আসন। Hegelএর metaphysics of art এর তত্ত্ব, যাহা বলে "Art is the anticipated triumph of mind over matter" এবং আর্টের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের প্রেক্ষণকে যেরূপে presence of the idea in the united phenomena ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করে, তাহা ভারতীয় ভাবেরই অনুরূপ।

* * *

ভারত ভারতী সেই উচ্চতম উদ্দেশ্যকে জীবনের নানাবিভাগের কার্য্যের ভিতর দিয়া আপনার সম্মুখে ন্যস্ত করে। আর্টের সৃষ্টি হিন্দুর চক্ষে উদ্দেশ্যহীন নহে তাহাও তাহার নিকট জীবনের সাধনা-রূপে আত্মবিকাশ করে,—শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৌন্দর্য্যরূপে নহে, অতীন্দ্রিয় সাধনার দ্বারস্বরূপ হইয়া। কবির জীবনই তখন তাঁহার কাব্য বুঝিবার নির্ণায়ক মান বা Standardরূপে ব্যবহৃত হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিণামে যাহা বৈরাগ্যবান্ হইয়া, ও "উদাসীনো গতব্যথঃ" বং করিতে হয় রসসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণে সে জিনিষ আর্টিষ্টেরই মনের অনুরূপ আকৃতি লইয়া বাহির হয়। কাব্য-কলা, আর্টের ব্যক্তপ্রকাশের ভাগ যাহাতে অধিক তাহাতে ইহা যেমন সূচিত হয় তক্ষণ ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যাদিতে সকল সময়ে সেরূপ হয় না। কাব্য ও সাহিত্যরসশিল্পীর নিকট হইতে সেইজন্য পর বা শ্রেষ্ঠ রাগের সহিত অপর বা ইতর রাগের বিশিষ্ট সমন্বয়ের প্রতীক্ষা করা যায়।' তদভাবে যাহা হয় অনেক সময় তাহা হইতে শোনা যায় কেবল আপাত-সত্যকেই সত্যের আসনে বসাইয়া পূজার অর্ঘ্য দানের আবাহন। মোহের অন্ধতমসকে দিব্যজ্ঞানের

উজ্জ্বল আলোক বোধে, উপাসনা-জীবনের সাহিত্যরূপে বিবেচিত হইবার অযোগ্য।

* * * *

যেহেতু আমরা এখনকার ইউরোপীয় মনোভাবের অনুকরণ ও ইউরোপীয় চিন্তার অনুবর্ত্তনেরই প্রয়াসী সেইহেতু আমরা কেবলই এখন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইব্‌সেনের 'প্রেতাত্মা', গলস্‌ওয়ার্দীর 'ঘাতপ্রতিঘাত' অথবা আর একটু উচ্চে উঠিয়া মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা'গণেরই সাক্ষাৎ পাইতেছি, আর পাইতেছি কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচকের লেখনী হইতে বৈষ্ণব কবিতার কুরুচিপূর্ণ অপব্যাখ্যা, ভারতীয় অতীত জীবনের সম্মানার্হ নরনারীগণের অবমাননা, দেশের স্বযত্নপরিপোষিত আদর্শগুলির উপর শ্লেষ ও অবজ্ঞার বিকট বদনবিকৃতি, তাই "পাঁচ হাজার বছরের পুরাণ পুঁথি" যাহা ভারতকে এতদিন বাঁচাইয়া আসিয়াছে, তাহা আর এখন আমাদিগের নিকট জীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারিতেছে না। জীবনে ক্লীবত্বের সহিত সাহিত্যেও ক্লীবত্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমরা ইউরোপেরও উচ্চচিন্তাশীলগণের পরিত্যক্ত অনিয়ন্ত্রিত অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যময় জীবনবাদ এবং কলা-কুশলৈকলক্ষ্যত্বকে জীবনে অবলম্বন ও সাহিত্যে গায়ত্রীরূপে অভিবন্দনা করিতেছিও তাহারই ভাবে বিভোর হইয়া জীবনকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। ইহাই আমাদের অনুকরণ প্রিয়তা! মনীষী ভিক্টর হিউগো—যাঁহার উচ্চারিত একটী কথার ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যাই art for art's sakeএর theoryএর প্রথম উদ্ভবয়িতা—তৎ-প্রণীত সেক্সপীয়র সমালোচনার একস্থলে লিখিয়াছেন, "উন্নতির উদ্দেশ্য লইয়া যে আর্টের জন্ম তাহা কলামাত্রৈকলক্ষ্যত্ব অপেক্ষা শতগুণে গরীয়ান্।" তবে কি সাহিত্যে শুধু উদ্দেশ্যের রচনাই স্থান পাইবে? তাঁহার মতে আর্ট সেই নীলিমার রাজ্য যেখানকার ধারাসম্পাতে ভূপৃষ্ঠের গোধূম পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, জনার লোহিতাভ হইয়া উঠে, আপেলফলের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়, কমলালেবুর

গাত্র সোণার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠে এবং দ্রাক্ষাতেও মধুর রস সিঞ্চিত হইয়া যায়।” এইরূপ চিন্তারই প্রতিধ্বনি আমরা Matthew Arnold, Bradley, Sharp Dowden প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকগণের এবং এমন কি Taine অথবা Walter Pater এর মধ্যেও পাই।

*　*　*　*

যে উদ্দেশ্য ব্যতীত মানবের জীবনের আর কোনরূপ ব্যাখ্যাই বিবেকিগণের অনুমোদিত হইতে পারে না সেই আকাশের মত আদন্দমন অবস্থা অসীম মহান্ উদ্দেশ্য যখন সাধক-কলাকুশলীর প্রেরণারূপে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহা তন্নিম্ন সত্যের শীর্ষদেশগুলিকেও অর্থাৎ মানবিকতার উচ্চভাব ও আশাগুলিকেও স্বীয় সাফল্যের রশ্মিতে প্রতিফলিত করিয়া সুন্দর সাজায়। হিউগোর আর একটী কথাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য,—তিনি বলিতেছেন, “বিবেকের বাঁধনহারা হইয়া উচ্চ কবিও রসশিল্পী থাকিতে পারেন না, উচ্চ চিন্তার অধীন না হইয়া তিনি কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে একদিকে যেমন সনাতন নৈতিক পন্থাকে দৃঢ় করিয়া সকলের সম্মুখে ধরিতে হইবে, তাহাদের নূতন ও কালোপযোগী অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, তেমনি আবার জ্ঞানবিচার সাহায্যে নিজের মনের ও প্রাণের আবেগগুলিকেও শোধিত ও সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে।” একথার সমর্থনের জন্য আমাদিগকে বোধ হয় আর ঘরের বাহিরে যাইতে হইবে না। বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের নব জাগরণের দিনে চারিদিক হইতে আমরা আজ নূতন নূতন আদর্শের ও নূতন নূতন ভাবের কথা শুনিতে পাইতেছি, এইজন্য আমাদিগকে খুব সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সম্পৎগুলিকে আজ আর আমরা হুবহু তাহাদের সেই পুরাণরূপে পাইব না ইহা সত্য কিন্তু তাহাদের মধ্যে জীবনের যে শিক্ষার কথা অনুস্যূত ছিল—তাহা যেন আজ আমরা না ভুলি।

ইহার জন্যই কি আজ আমাদের সমন্বয়ের গুরু, ভারতের ও জগতের নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থাপনের আচার্য্য সেই "পাঁচহাজার বছর আগেকার পুঁথির" দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন—"একটী আদর্শ কেন? আমরা পঞ্চাশটী আদর্শ অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কখনই নীচু করা উচিত নয়। এইটী আমাদের জীবনের এক বিশেষ বিপদাশঙ্কা। অনেক ব্যক্তি আছেন তাঁহারা আমাদের বৃথা অভাব সকলকে, বৃথা বাসনা সকলকে আদর্শের স্থানে বসাইতে চান আর আমরা মনে করি যে উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ আর আমাদের নাই—তাহা নহে। * * * প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে—বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত করিতে হইবে।"

* * * *

জীবনের পথে সমস্যার মেঘ যখন ঘনাইয়া আসে, 'পথ যখন দেখা যায় না, সাহিত্য মধ্যে যথার্থ প্রাণের ঝঙ্কার আর যখন শ্রুত হয় না তখন আমাদিগকে ফিরিতে হয় সেই ঋষি ও কবিদিগের অভিমুখে, যাঁহারা প্রাণের সাধনা দিয়া জীবনের মহাকাব্য রচনা করিয়া যান—ফিরিতে হয় তাঁহাদের দিকে যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, যাঁহাদের তৃতীয় নয়ন সর্ব্বদাই সেই পরম সত্যের দিকে উদ্‌ঘাটিত। যাঁহারা পারে যাবার খেয়া মাঝী' তাঁহারাই সেই পারের খবর বলিয়া দিতে পারেন। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"। এই সকল মহৎ জীবনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই জীবনের সাহিত্য রচিত হইবে, মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবাসীর নিকট সত্য ও প্রকৃত কলাকৌশলের সৃষ্টি তাহার জীবনের আলোকেই গড়িয়া উঠিবে। তন্নিম্ন শ্রেণীর উদ্দেশ্য ও প্রণোদনার 'সাহিত্য' যে একেবারে বর্জ্জনীয় তাহাও কখনও হইতে পারে না। নানা রুচিবিশিষ্ট মানব তাহাদের নানাভাবের রচনাকে সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবে। মহৎ জীবনের কষ্টি-পাথরে আজ যদি আমরা সেই সকল তথা-

কথিত 'সাহিত্যের' বিচার করি তাহা হইলেই আমরা তাহাদিগের দোষগুণ দেখিতে পাইব এবং তাহার মধ্যে যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যথার্থ আনন্দপ্রদ সেইগুলিকেই আমরা আমাদের জীবনের সাহিত্যরূপে বরণ করিয়া লইব—অবশিষ্ট যাহা তাহা আমাদিগকে 'পথের ধূলির মত' পথকেই ফিরাইয়া দিতে হইবে।

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

স্বামিজী ও ভক্তিতত্ত্ব

(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

বেদান্ত বলিলেই আমরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ বুঝি। কিন্তু দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য মাত্র। স্বামিজী বলিয়াছেন, "These are the three steps which Vedanta Philosophy has taken."

এই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা কি বুঝি? স্বামিজী বলেন, "In dualism, the universe is conceived as a large machine set going by God." অর্থাৎ দ্বৈতবাদীর মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন অধীশ্বর আছেন—যিনি জগতের নিয়ামক। "In 'qualified' monism it is conceived as an organism, interpenetrated by the Divine Self". বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহস্বরূপ, যাহাতে সেই পরমাত্মা

ওতপ্রোতভাবে আছেন।' "You as a body, mind or soul are a dream but what You realy are, is Existence, Knowledge, Bliss. You are the God of this universe, you are creating the whole universe and drawing it in. Thus says the Advaitist." অর্থাৎ সেই মন-আত্মা-বিশিষ্ট যে তুমি তাহা স্বপ্ন কিন্তু তোমার যথার্থ স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করিতেছ এবং তুমিই প্রলয় করিতেছ।—অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন।

যে অদ্বৈতবাদ মেঘগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিতেছে, "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ", যে অদ্বৈতবাদ বলে, "নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা। নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥" অর্থাৎ যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার বা অংশ নহে সেইরূপ জীবও পরমাত্মা বা ব্রহ্মের বিকার বা অংশ নহে, যে অদ্বৈতবাদ বলে, জীব ব্রহ্ম অভেদ, জীবের মুক্তি সাধনসাপেক্ষ নহে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অনেকেরই বিশ্বাস স্বামিজী সেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন। যে অদ্বৈতবাদ বলে, সিংহশিশু মেষসহবাসে যেমন নিজেকে মেষ মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ উপাধিসহযোগে জীবও ঈশ্বরভাব ভুলিয়া শোক ও মোহাভিভূত হয়—"অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" আবার যেমন কোন দয়ার্দ্রহৃদয় কেশরী সিংহশিশুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া জলে তাহার প্রতিবিম্ব—তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া বলে, "দেখ্ তুই ও আমি এক—তুইও আমারই মত সিংহ।" তখন যেমন তাহার মেষভ্রান্তি যায়, তেমনি যখন কোন সদ্গুরু করুণাপরবশ হইয়া "তত্ত্বমসি' "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽহম্" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতি-মহাবাক্যে তাহার অবিদ্যার আবরণ অপসৃত করিয়া দেন, তখন সেই জীব তাহার প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন বুঝিতে পারে যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্ বস্তু।" অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই বস্তু। এই অদ্বৈতবাদ যাহা জীব ও ঈশ্বরকে মায়া বিজৃম্ভিত বলে, সেই অদ্বৈতভাব-প্রচারক বৈদান্তিক

স্বামিজী ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সাধারণের বিশ্বাস অদ্বৈতবাদ জ্ঞানীর পথ এবং বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদ ভক্তির পথ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, "শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক"। স্বামিজীও ভক্তিযোগে তাহাই বলিয়াছেন, "সাধারণতঃ লোকের সংস্কার—জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক বস্তু, বাস্তবিকই তাহা নহে।"

ভক্তি কাহাকে বলে? ঈশ্বরে পরানুরক্তি—পরমপ্রেমই ভক্তি। এই ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও পরা।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, "এত জপ, এত ধ্যান কর্‌বে, এত এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্‌বে, এই এই উপচারে পূজা কর্‌বে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্‌বে—এই সকলের নাম বৈধী ভক্তি।" স্বামিজী তাঁহার ভক্তিযোগে বলিয়াছেন, "সাধারণ পূজা পাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগান্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি।"

পরমভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥" অবিবেকীর ইন্দ্রিয়বিষয়ে যে মহান্ প্রীতি বা আসক্তি—তোমাকে স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়। এই যে ভক্তি—মহাপ্রীতি—পরম অনুরাগ একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতিই অর্পিত হইতে পারে। এই শ্রীভগবান্ কে? "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে—যিনি অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ পরম কারুণিক পরম গুরু এবং যিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।

শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মের দুইটী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটী সগুণ—অপরটী নির্গুণ। আমরা সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্ম—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ", সেই বাক্য মনের অতীত পরব্রহ্মের উপাসনা করিব, না, যিনি সগুণ, সক্রিয়

"মনবচনৈকাধার" প্রেমময় ভগবানের ভজনা করিব? স্বামিজী বলিয়াছেন, "সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহে। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণভাব অর্থাৎ পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন।" "ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমন দ্বারা সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি।"

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মুক্ত পুরুষেরাও ত ঈশ্বরের ন্যায় সমগুণবিশিষ্ট হইতে পারেন ও স্বরূপৈক্য লাভ করিতে পারেন? কারণ, মুক্তিলাভের পর তাঁহারাও ত অনন্তশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হন। কিন্তু ভগবান্ ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে বলিতেছেন, "জগদ্ ব্যাপারবর্জ্জম্"* অর্থাৎ কেহই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, কারণ তাহা কেবল ঈশ্বরের।

মুক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরের সমগুণবিশিষ্ট হন—তাঁহারা স্বারাজ্য লাভ করেন—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্।" কিন্তু "ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ।† "ভোগমাত্রমেষামনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্।" (শঙ্কর।) সে মুক্ত পুরুষেরা ভোগেই মাত্র ঈশ্বরের সমতা লাভ করেন। সুতরাং "সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে।" একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বকর্তৃত্ব সম্ভব।

রামানুজও তাঁহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, "নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনন্যত্বা-সম্ভবাৎ" অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা অবিদ্যা নিরস্ত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত স্বরূপৈক্য সম্ভব নয়, অবিদ্যাশ্রয়ীর এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি?

শ্রুতিতেও আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন

* ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭

† ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১

জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ যাঁহাতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে সমুদয় প্রবেশ করে তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং মুক্ত পুরুষেরা যত সমত্বলাভই করুন, তাঁহারা কেহ ঈশ্বর হইতে পারেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, এই যে শ্রীভগবান্, ইনি পরমপুরুষ পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল এবং প্রেমময়। ইনি লীলার নিমিত্ত লীলাবশে পঞ্চরূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার সেই পঞ্চরূপ কি? অর্চ্চা—অর্থাৎ প্রতিমাদিতে শ্রীবিগ্রহরূপে অবস্থান করিতেছেন; বিভব—অর্থাৎ অবতারাদি যথা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি নানারূপে বিরাজিত আছেন; ব্যূহ—অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সূক্ষ্ম—অর্থাৎ ষড়্‌গুণ পরব্রহ্ম, যথা "সোঽপহতপাপ্‌মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ।" পাপহীনতা, রজঃশূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষরত্ব ও সত্যকাম-সত্যসংকল্পত্ব—এই ষড়্‌গুণে যিনি প্রকাশিত আছেন এবং অন্তর্যামী অর্থাৎ সকলের নিয়ামকরূপে যিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন।

দ্বৈতবাদ-প্রচারক মধ্বাচার্য্য দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, জীবগণ শ্রীভগবানের সহিত সমতা লাভ করিতে পারে না। দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ীরা বলেন, "শ্রীমন্মধ্বমতে হরিপরতরো নাস্তি সত্যং, তত্ত্বতো ভেদঃ, জীবগণাঃ হরেরনুচরাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বাসুদেবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই—তাঁহার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে—তাঁহার সে জগৎ সত্য—জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ রহিয়াছে, কেন না জীবগণ তাঁহার অনুচর মাত্র।

আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (৪।৪।১৭) বলিয়াছেন, "যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাবলে পরমেশ্বরের সহিত একীভূত হন অথচ যাঁহাদের মন অব্যাহত থাকে—তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সসীম কি অসীম?" এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য

অসীম কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়—'সমুদয় দেবতা তাঁহার পূজা করেন' 'সমুদয় জগতে তাঁহার কামনা পূর্ত্তি হয়।' ইহার উত্তরে ব্যাস বলেন, "জগতের সৃষ্টাদি ব্যতীত মুক্তাত্মাগণ অণিমাদি অন্যান্য শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের। কারণ সৃষ্টি সম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় বচন আছে—সকলগুলিতেই তিনিই কথিত হইয়াছেন। তৎস্থানে মুক্তাত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই পরমপুরুষই কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্টাদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে সকলগুলিই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর 'নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণও প্রদত্ত হইতেছে। আরও শাস্ত্র বলেন যে, অপরের অণিমাদি শক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরান্বেষণ হইতে লব্ধ হয়। (তদন্বেষণ বিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকম্ ইত-রেষামাদি মদৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে)। সেই শক্তিগুলি অসীম নহে। সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত্ব বিষয়ে তাঁহাদের কোন স্থান নাই। আবার তাঁহাদের মনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। একজন হয় ত সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই গোল এড়াইবার একমাত্র উপায় সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন হওয়া। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্তপুরুষের ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের অধীন।" স্বামিজী এই দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "As soon as you will think you are a body and a mind, you will have to take the whole. The man who says, here is the world and there is no God (Personal), is a fool; because if there is a world, there will have to be a cause and that is what is called God. You cannot have an effect without, knowing that there is a cause". এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা—তাঁহার প্রতি পরম প্রীতিই ভক্তি বলিয়া উক্ত হয়।

স্বামিজী তাঁহার ভক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, "ভক্তি আমাদের প্রকৃতিস্রোতের সহিত সামঞ্জস্যভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের

মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না।" ভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধন প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে তাঁহার ধ্যান—তাঁহার নাম স্মরণ মনন করা—কায়মনোবাক্যে তাঁহার ভজনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "ভক্তি মানে কি ? না, কায়-মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায় অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা—তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য অর্থাৎ তাঁর স্তব স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন—এই সব করা।" যেমন বহির্জ্জগতে বীজ বা চারাগাছ জল, আলোক ও বাতাসের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি ধর্ম্মজগতে শ্রীগুরু সাহায্যে সহজে সাধ্যভাব উপলব্ধি করিয়া সেই অনন্ত প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে। স্বামিজী বলেন, "এই সঞ্জীবনী-শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে গুরু বলে এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন—তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।"

কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে, অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় শুভ্র নির্ম্মল না হইলে, সত্যের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা ও দৃঢ় অধ্যবসায়-সম্পন্ন না হইলে প্রকৃত শিষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মতেজসম্পন্ন নিরঞ্জন গুরু না হইলে জীবের যথার্থ ভববন্ধন মোচন হয় না। যেখানে বীজ সতেজ ও ভূমি উর্ব্বর সেখানে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ হয়—আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে।

স্বামিজী দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন "ধর্ম্ম—সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহা ধনবিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নহে—গ্রন্থ হইতেও উহা পাওয়া

যায় না। জগতের সর্ব্বত্র ঢুঁড়িয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি খুঁটিয়া আসিতে পার, সমুদ্রের অতল তল আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারি কোণে অথবা গোবি মরুর চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পার, কিন্তু যত দিন না তোমার হৃদয় উহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে ও যত দিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ—কোথাও উহা খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে—অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতায় তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও। তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সৌন্দর্য্যের অলৌকিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।"

গুরু শিষ্যের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার করেন, তাহা সচরাচর মন্ত্র দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপণ করেন। এই মন্ত্র কি? নামরূপাত্মক জগতে বাচ্যবাচকভাবব্যাপী স্ফোট বা শব্দব্রহ্ম। স্বামিজী বলিয়াছেন, "সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের নিত্য সমবায়ী উপাদানস্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃজন করেন, শুধু তাহাই নহে; ভগবান্ প্রথমে আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া, পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান্ জগদ্রূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ ওঙ্কার।" * * "সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন ও সার্ব্বভৌমিক বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তদ্রূপ এই বাচ্যবাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাবসম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সকলগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের সেই বিশেষ খণ্ড ভাবের প্রকাশ করে। যেমন ওঙ্কার অখণ্ড ব্রহ্মবাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেই পরমপুরুষের খণ্ড ভাবগুলির বাচক। এই সকলগুলিই ভগবৎ ধ্যান ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়।"

সাধক গুরু-সহায়ে মন্ত্র জপ ও ধ্যানের দ্বারা স্বীয় ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হন। তিনি অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ করিবেন না। কারণ তিনি বুঝিতে পারেন, "নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥"

অর্থাৎ লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে, লোকে তোমাকে যেন ভিন্ন ভিন্ন নামের দ্বারা বহুভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, ঐ প্রত্যেক নামেই তোমার পূর্ণশক্তি অর্পিত রহিয়াছে। তোমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে স্মরণ করিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। হে ভগবন্! তোমার এতাদৃশ করুণা কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব, তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

এক রাম তাঁহার হাজার নাম, এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিয়া সাধক, ভক্তশিরোমণি মূর্ত্তিমান্ দাস্যভাবঘনবিগ্রহ, শ্রীহনুমানজীর মত বলিবেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

যদিও শ্রীনাথ ও জানকীনাথ পরমাত্মারূপে অভেদ তথাপি কমল-লোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব, এই মনে করিয়া সাধক ইষ্টের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ কোরে জলের উপর ভাসে কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল মুখে পড়্‌লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নীচে চলে যায় আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেইরূপ গুরুমন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায় আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।" স্বামিজী তাঁহার ভক্তি-যোগে বলিয়াছেন, "যদি ভক্ত সাধক অকপট হন তবে গুরুদত্ত বীজ-মন্ত্র প্রভাবেই পরাভক্তি ও পরম জ্ঞানরূপ সুবৃহৎ বটবিটপী উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্ম্মরূপ

সুবৃহৎ ক্ষেত্রকে আচ্ছাদন করিবে। তখনি প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন, তাঁহার নিজেরই ইষ্টদেবতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত হইতেছেন।”

এখন দেখা যাউক পরাভক্তি কাহাকে বলে।

ইহা পরম প্রেমের অবস্থা। বৈধীভক্তি যখন ঘনীভূত হয়, ভগবানের প্রতি যখন ভক্ত সাধকের তীব্র অনুরাগ হয়, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যখন প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হয়—শ্রীভগবানের অদর্শনে উন্মত্তের মত হয়, তখন রাগানুগা ভক্তির আরম্ভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ নামের আর্ত্তি—তাঁহার সেই প্রেমবিহ্বল অবস্থা—কৃষ্ণবিরহে কখনও মৃত্তিকায় মুখ ঘষিতেছেন, কখনও হা কৃষ্ণ বলিয়া নয়নজলে প্লাবিত হইয়া ধুলায় লুটাইতেছেন—তখন তাঁহার যে দৈন্য, যে বিহ্বলতা, যে ভাবস্ফূর্ত্তি—প্রেমের সেই জলন্ত ছবিই পরাভক্তির উদাহরণ স্থল। সে দিন পঞ্চবটীমূলে বসিয়া যে মহাপুরুষ “মা, মা, দেখা দে মা” বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন—আবার কখনও “মা! আমাকে দীনের দীন, হীনের হীন ক’রে দে মা, আমার অহং জ্ঞান নাশ ক’রে দে মা, তোর পাদপদ্মে অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি দে মা—এই যে আর্ত্তি, এই যে ব্যাকুলতা ইহা প্রেমজগতের অপূর্ব্ব আলেখ্য—ইহাই পরাভক্তি। বৈধীভক্তির আন্তরিক সাধনায় যখন সাধক সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি পরাভক্তিলাভের অধিকারী হন। পরাভক্তিলাভ করিলে তখন বিধি সব অবিধি হইয়া যায়। এই পরাভক্তি শুধু ভাবপ্রবণতা নহে—সুধু প্রেমোন্মত্ততা নহে-ইহা পরম প্রেমের অবস্থা। এই পরাভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন “শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।” স্বামিজী ভক্তিযোগে বলিয়াছেন “এইরূপে যখন পরাভক্তি প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ঐ ভক্তির বিরোধী বিষয় সম্বন্ধে মনে বিরক্তি হইতে থাকে। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। তাঁহার বিষয়, কেবল তাঁহার বিষয় চিন্তা কর, অন্য সকল কথা

ত্যাগ কর। "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।" যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন তাহারা তাঁহার পক্ষে শত্রুরূপে প্রতীয়মান হন। যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে যে এই শরীরধারণ কেবল একমাত্র তাঁহার উপাসনার জন্য, তখন তিনি ভক্তির আর এক উচ্চতর সোপনে আরোহণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। তখন উহা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয় আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখ বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম তদর্থপ্রাণস্থান—তদীয়তা। ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন তখন এই তদীয়তা আসে।"

এই তদীয়তা প্রেমের চরম স্ফূর্ত্তি।

এই প্রেম সম্ভোগ করিবার জন্য মহাপুরুষেরা ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ আস্বাদন করেন। মায়ের ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ তাই বলিয়াছিলেন "চিনি হতে চাই না, মা, চিনি খেতে ভালবাসি।" শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"আত্মারামশ্চ মুনয়োনিগ্রন্থাঽপুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইথম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

হে রাজন্! হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে যাঁহারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন—যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে—তাঁহারাও ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই পরম প্রেমের খেলা—ভাবের লীলা—অহৈতুকী ভক্তির লীলাবিলাস—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—একাধারে এই পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়। এই প্রেমলীলা মানবীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সংসারে যে পঞ্চরস যে পঞ্চভাবের খেলা দেখিতেছি—যে খেলায় জীব ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া "ত্রাহি মাং মধুসূদন" করিতেছে—

সেই পঞ্চরসে ভক্তিসাধক শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া কি অপূর্ব্ব প্রেমমাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিশাস্ত্রে সেই পরম সুন্দর চিরকিশোরকে নানাভাবে ভজনা করিতেছে। এখানে শাস্ত্রবিচার নাই, নিয়মের গণ্ডী নাই, স্বার্থের পঙ্কিলতা নাই, অহঙ্কারের মাদকতা নাই—এমন কি ভালবাসার বিচার নাই। এখানে শুধু সেই প্রেমমাধুর্য্য সম্ভোগ। এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"যারা মরম না জানে ধরম বাখানে
এমতি আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥
সেই আলার ভিতরে কপাটী রয়েছে
চৌকী রয়েছে সেথা।
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে
বাজিবে মরমে ব্যথা।

এখানে অন্যকথা শুনিলে বিরক্তি বোধ হয় যে বলে তাহাকে শত্রু মনে হয়, তাহারাই ঘরের শাশুড়ী ননদী—জটিলা কুটিলা। ভক্ত শুধু মধুর ভাবের রসেই তৃপ্ত হন নাই—তিনি পরকীয়া রসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। স্বামিজী বলিয়াছেন "মনুষ্য-হৃদয়ের সব ভালবাসা সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই একমাত্র প্রেমের পাত্র। এই মনুষ্য-হৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনি পরম সুন্দর পরম মহৎ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা জগতে আর সুন্দর কে আছে? তিনি ব্যতীত জগতে আর স্বামী হইবার উপযুক্ত কে? জগতে ভালবাসার পাত্র

আর কে আছেন? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে ভগবদ্ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা উহাকে বর্ণনা করিবার উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও বুঝিবে না, তাহারা কেবল উহা জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটী মাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান।' প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও, যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া তোলে। ভগবান্ একবার যাঁহাকে অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন তাঁহার সমুদায় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়—তাঁহার পক্ষে সূর্য্য চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না—আর সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিশাইয়া যায়। ইহা প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা। প্রকৃত ভগবৎ প্রেমিক আবার ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদকর বোধ হয় না। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়া) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল, উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে যতই উহা বাধা পায় ততই উহা উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন যেন কোন বালিকা তাহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত আর তাহার পিতা, মাতা বা, স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উহা প্রবলভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত হইয়া ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার সাড়া পাইবা-

মাত্র গোপীরা সমুদায় ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া—জগতের সব বন্ধন, জাগতিক কর্ত্তব্য, ইহার সমুদায় সুখ দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত—মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ঐশ্বরিক প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পার। তোমার কি মন মুখ এক? যেখানে রাম আছেন—সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম—সেখানে রাম থাকিতে পারেন না।"

সুতরাং সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হইলে কেহ পরাভক্তির—মধুর প্রেমের আলোচনার অধিকারী হইতে পারেন না। ভক্তিযোগের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, স্বামিজী যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা অপর কোন বাদ বা মতকে খণ্ডন করেন নাই—তিনি সকলের মধ্যে এক সমন্বয়-সূত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সেই সমন্বয় ধর্ম্মের বেদ। আমরা যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হইতেছি, আত্মার মহিমা ভুলিয়া জড়ের পূজার দিকে ধাবিত হইতেছি, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি ও কপটতা আচরণ করিয়া আসিতেছি, আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি অদ্বৈততত্ত্বের আত্মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং দ্বৈতবাদীর নারায়ণ পূজা—সেবা-ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যে নারায়ণ প্রতিদ্বারে ভিখারীর বেশে, পথে আতুরের বেশে, প্রতি গৃহে মূর্খের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন সেই নারায়ণের সেবা করিবার জন্য আমাদের বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। ভিতরে ঘোর বিষয়মত্ততা, লোককে প্রবঞ্চনার জন্য জল্পনা করিতেছে আবার এদিকে হরিনামে কপটাশ্রু ফেলিয়া নিজকে লোকের নিকট দীনহীন ভাবে দেখাইয়া পরম ভক্ত নামে প্রচারিত হইবার জন্য ব্যাহির করিতেছে—এই সব কপটতা ও অধর্ম্মকে দমন করিবার জন্য তিনি তীব্র ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাই অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া থাকি—মনে করি তিনি ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব

জীবন দেখিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত ভগবদ্বাণী শুনিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন, তিনি পরম প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ ছিলেন—ভক্তির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়া জীব কল্যাণের জন্য প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "নরেনের নির্গুণে ভক্তি।" এই ভক্তি বিরল দৃষ্টিগোচর হয়।" স্বামিজী নিজেই ভক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে।" কিরূপ উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিলে এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ হয় তাহা শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, আমাদের ন্যায় সামান্য অধিকারী তাহা ধারণা করিতে অক্ষম।

সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যোহসৌ স্মৃতঃ।

"সেই বিষ্ণু সগুণ ও নির্গুণ—তিনি জ্ঞানগম্য বলিয়া উক্ত হন।" শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্।
নান্যৎ তদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্॥

হে ভূমা! তুমি সগুণ ও নির্গুণ; তুমিই সমস্ত। মনোবাক্যে তুমি ছাড়া আর কিছুই নাই। যিনি "অচল ঘন গহন গুণ গায় তোমারি" গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন তিনিই আবার "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই" গাহিতে গাহিতে উক্ত ভজনের শেষ দুই চরণে আসিয়া—"বিহরত রঘুরাজ সখা সুন্দর সরযূতীর। তুলসীদাস হরষে নিরখে চরণরজঃ পাই।"—ভাবাবিষ্ট হইয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেন! একবার বরাহনগর মঠে তিনি ভেকধারী বৈষ্ণবভাবে রঙ্গরস করিতে করিতে "নিতাই আমার নাম এনেছে রে" এইকলি গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনানন্দে এত উন্মত্ত ও বিভোর হইয়াছিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যখন পরম ভক্ত স্বীয় নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠাকালে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া

কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া নবগোপাল বাবুর গৃহাভিমুখে গিয়াছিলেন—তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। যেবার পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব হইয়াছিল সেবার উৎসবস্থলে সালিখাদলের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাকে নৃত্য করিতে বহু লোকে দেখিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন স্বামিজী ভক্তিধর্ম্ম ও কীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা যে শুধু সত্যের অপলাপ করেন তাহা নহে তাঁহারা মহাপুরুষের ভাব বিকৃত করিয়া থাকেন। স্বামিজী স্পষ্ট বলিয়াছেন—

শোন বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য সার,
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার।
মন্ত্র তন্ত্র প্রাণ নিয়মন, মতামত দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন॥

স্বামিজী এই প্রেমধর্ম্ম কি ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—অর্থাৎ এই আত্মা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা এবং বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য হন না। ইনি যাহাকে বরণ করেন তাঁহারই লভ্য হন, তাহারই নিকট আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। রামানুজ বলেন, "যোঽয়ং মুমুক্ষুঃ বেদান্তবিহিত-বেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি।"

অর্থাৎ যখন বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানরূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর সেই ধ্যানে সুমহতী প্রীতির অনুভব হয় তখনই তিনি সেই পরম-পুরুষকে লাভ করেন।

কলিযুগে যখন জীব কঠোর সাধনায় অপারগ ও বিমুখ হইল, যখন ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদি ত্যাগ করিয়া মানুষ ধর্ম্মকে শুধু বাগ্‌জালে পরিণত করিল, তখন পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। এই নাম সাধন নাম জপ হইতে ধ্যানাদি সহজে আসিবে বলিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নামমাহাত্ম্য প্রচার করেন। কিন্তু অধুনা পাশ্চাত্য জড়বাদ প্রচারের সঙ্গে আমরা এরূপ জড়বৎ হইয়াছি যে, সে নাম সাধন করিতেও আমরা বিমুখ ও অশক্ত। কোটী কোটী লোকের মধ্যে বিবেক বৈরাগ্যবান্ ঈশ্বরলুব্ধ সাধক বিরল দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আর দেবমন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া নির্ম্মিত হয় না, সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনিতে ভক্ত গৃহস্থের ঠাকুরঘর আর পূর্ব্বের মত মুখরিত হয় না; এমন কি এখন আমরা এতদূর অধঃপতিত হইয়াছি যে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী দূরে যাক্, আপনার সহোদর এমন কি পিতামাতার সহিতও একসঙ্গে প্রীতির সহিত বাস করিতে পারি না, কেন না কেবল ভোগাভিলাষী আত্ম-সুখান্বেষণে ব্যস্তচিত্ত হইয়া কাম-কাঞ্চনের পূজায় আসক্ত হইয়াছি। দেশহিত, লোকহিত, পরহিত সব এখন অভিমান ও যশোলিপ্সার নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুজনহিতার্থে সামান্য ত্যাগ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।" অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। এখন সে অনাসক্ত কর্ম্ম কোথায়? এই অনাসক্ত কর্ম্ম করিতে কে সক্ষম? যাঁহার মন বুদ্ধি শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়াছে, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ও নিরভিমান—তিনিই যথার্থ দেশ ও সমাজের হিতকারী। ভারতের সনাতন আদর্শ ইহাই ছিল। আজকাল ভারতের শোচনীয় পরিণাম ও পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ কলুষিত হইতে দেখিয়া স্বামিজী ত্রিতাপদগ্ধ জীবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট সেবাধর্ম্ম প্রচার দ্বারা প্রত্যেককে নারায়ণজ্ঞানে সেবাধর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া সেই প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় সনাতন পদ প্রাপ্ত হন।

সুতরাং সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্ত অব্যয় শাশ্বত পদ লাভ করিতে পারেন। এই সকল কর্ম্ম কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে গীতায় শ্রীভগবান্ তাহাও বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু করিবে—অশন, যজন, দান, তপস্যা—সবই আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে। সুতরাং নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচরণ তাহা বলা বাহুল্য। যেমন নাম সাধনে জপ ধ্যান সমাধি আপনা আপনি আসিয়া থাকে—যেমন নাম জপ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি এই সেবাধর্ম্মে—এই নারায়ণ পূজায় ভাব ভক্তি প্রেম প্রভৃতি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইবে। সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় আমরা সেই পরম কারুণিক ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥"

ব্রজ-ভ্রমণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর).

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৃন্দাবনে অনেক দর্শনীয় স্থান ও দেবালয় আছে—তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত স্থান বা দেবালয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়পুর রাজার প্রতিষ্ঠিত নূতন রাধাগোবিন্দের মন্দির—মথুরা যাইবার পাকা রাস্তার বামদিকে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের কারুকার্য্য ও মন্দিরসংযুক্ত বাগান অতি রমণীয়।

রাধাবিনোদের মন্দির ও রাধাবিনোদবাগ—তরাসের রাজা রায় বনমালী রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রায় বাহাদুর এই দেব-সেবার জন্য বিস্তর ভূমি ও বিত্ত দান করিয়াছেন। এই মন্দির ও বাগান জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে ও মথুরার রাস্তার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বড় রাস্তা হইতে প্রায় ১ পোয়া ভূমি তফাতে রাজা বাহাদুরের সুবৃহৎ বাটীও আছে।

বড় রাস্তা হইতে ½ মাইল দূরে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিদ্যালয়—২০।২২ জন বালককে এই আশ্রমে রাখিয়া বিদ্যা দান করা হয়। স্থানটি অতি নির্জ্জন, নানাবিধ তরুরাজি ইহার চারিধার বেষ্টন করিয়া আশ্রমটিকে একটি রমণীয় কুঞ্জে পরিণত করিয়াছে। এখানে আসিলেই পুরাণ-বর্ণিত তাপসগণের আশ্রমের কথা মনে পড়ে। স্নিগ্ধ বনশোভা ও হরিৎ লতা-বিতানগুলি দর্শন করিয়া প্রাণে এক নির্ম্মল শান্তি আসিয়া থাকে। সহরের মধ্যে মণ্ডি বাজারের ধারে ইঁহাদের সমাজগৃহও আছে।

কেশীঘাটের নিকট কৃষ্ণকালীর মন্দির—দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুচক্রে তাঁহার শরীর ৫২

অংশে বিভক্ত হয় ও সেই অংশগুলি যে যে স্থানে পতিত হয় সেই স্থানগুলি এক একটি পীঠস্থানরূপে পূজিত হইতেছে। এখানে সতীর কেশ পড়িয়াছিল—সেইজন্য দেবী 'কেশী-কালী'রূপে বিরাজিতা আছেন।

দর্শক ও যাত্রিগণ যে কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার ভাড়া পৃথক দিতে হয় না। বৃন্দাপূজার ভেট ও উপকরণাদি সেই কুঞ্জের প্রাপ্য এবং উহাতেই কুঞ্জস্বামীর ভাঁড়া পোষাইয়া যায়।

বৃন্দাবনে সকল সময়েই যাত্রি-সমাগম হইয়া থাকে—বিশেষতঃ দোল, ঝুলন ও অন্নকূট-যাত্রায় লোকসমাগম অধিক হয়। বৈশাখ মাসে "ফুলদোল" দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হয়। মাসব্যাপী প্রতি মন্দিরের ফুলসজ্জা এখানকার একটি দেখিবার জিনিষ। প্রত্যেক মন্দিরে নানাবিধ সুগন্ধি ফুলে ছোট বড় বাঙ্গলা ও গৃহ রচিত হইয়া বিগ্রহগুলি স্থাপিত হয়। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড তাপে অবসন্ন শরীর ও মন এই সময়ে সন্ধ্যার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে মৃদুমন্দ পবন প্রত্যেক মন্দিরের ফুলসজ্জার স্নিগ্ধমধুর গন্ধ আহরণ করিয়া সারা সহরে বিলাইতে থাকে। দর্শকগণ এই সময় বিচিত্র বেশে ভূষিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে হাস্যকোলাহলে রাজপথগুলি মুখরিত করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের অপূর্ব্ব ফুলসজ্জা দর্শন করিয়া বেড়ায়। শেঠের মন্দিরে ফুলসজ্জা দর্শনযোগ্য। অন্নকূট ও ঝুলনযাত্রাই এখানকার প্রধান উৎসব—সেই সময় প্রতি মন্দিরেই সাজ সজ্জার আতিশয্য লক্ষিত হয়। নানাপ্রকার বিচিত্র হিন্দোলায় মণিমুক্তা-ভূষিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিয়া ভক্তে হৃদয়মন যে মোহিত হইয়া আনন্দে আপ্লুত হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এই ঝুলনযাত্রা শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত থাকে।

বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ পরিক্রম প্রতি একাদশীতেই হইয়া থাকে। আজকাল যমুনা বৃন্দাবনের অনেক স্থান গ্রাস করিয়া তিন ক্রোশ মাত্র পরিক্রমার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই দিন ভক্তেরা অন্ন আহার করেন না, সেই জন্য পরিক্রমা-রাস্তায় অনেক দানশীল

ব্যক্তি স্থানে স্থানে পরিক্রমাকারীকে ফলমূল ও পানীয় দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রচণ্ড উত্তাপে বৃন্দাবনের বালীর রাস্তায় পদব্রজে ভ্রমণ করা যে কি প্রকার কষ্টদায়ক তাহা যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং যাঁহারা এই সময় পরিক্রমাকারীদের সুশীতল পানীয় ও ফলমূলাদি দান করেন তাঁহারা প্রকৃত সেবাই করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, আমরা এখন পুনরায় পূর্ব্ব প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা দুই বন্ধুতে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিলিত হইলাম ও ঘন ঘন হরি-ধ্বনি ও সংকীর্ত্তনের সহিত বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে লাগিলাম। এই পরিক্রমা কেশী-ঘাট হইতে আরম্ভ হইল। পরিক্রমা-রাস্তায় যে স্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল—

কেশীঘাট এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এই স্থানে রামজীর একটি মন্দিরও আছে। খুলুকদাসী সম্প্রদায়ের ইহাই কুঞ্জ। স্বামী হরিদাসের ভক্তি ও শান্তিবাদ ইঁহারা গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রকেই ভজনা করিয়া থাকেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

প্রেম-মহাবিদ্যালয়—ইহা হাত্রাস-রাজের একটি বিশাল কীর্ত্তি। ইনি দেশের অভাব, দরিদ্রের ক্রন্দন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া উহার মোচনকল্পে যে মহানুভবতার ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। কেশীঘাটে এই রাজার একটি সুবৃহৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিল এবং বিগ্রহের নিত্যপূজারও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান রাজা এই পূজার পরিবর্ত্তে নিত্য জীবন্ত দেবতার পূজার আয়োজন করিয়া প্রেম-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিগ্রহ অন্যত্র একটি মন্দিরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালক-গণকে বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামোপযোগী নানাবিধ বিদ্যাদানের জন্য বিদেশ হইতে বহু অর্থব্যয়ে কলকব্জাদি আনীত হইয়াছে এবং রাজা

স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের একজন অন্যতম তত্ত্বাবধারক। বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তিনি অনেক টাকার সম্পত্তিও দান করিয়াছেন। এখানে বয়ন শিক্ষা, লোহার কাজ, টাইপ্ রাইটিং, সর্ট হ্যাণ্ড, ছুতার মিস্ত্রির কাজ, Mechanical Engineering, চিত্রাঙ্কন বিদ্যা প্রভৃতি বিনাব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি এইরূপ সুবৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু কি উপায়ে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে এবং কিরূপ শিক্ষা এই বিদ্যালয়ের উপযোগী দেখিবার জন্য ইউরোপ গমন করেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় তিনি জার্ম্মাণীতে আটক পড়িয়াছেন। আজকাল এই বিদ্যালয়-পরিচালনার্থ অনেক ধনী অগ্রসর হইয়াছেন। বৃন্দাবন-বিহারীর কৃপায় এই মহৎ অনুষ্ঠান দিন দিন সফলতা লাভ করুক।

ধীর সমীর—এইখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন এবং পবনদেব মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন।

বংশীবট :-এইখানে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিবার মানসে বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিতেন এবং সেই বেণুরবে আকুল হইয়া গোপিনীরা গভীর রাত্রে অভিসারে বাহির হইয়া প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতেন। এখনও নিত্য প্রাতঃকালে ব্রজ-বালকগণ রাসলীলা করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেব—বংশীবটের নিকটেই ইঁহার মন্দির। বৃন্দাবন প্রদক্ষিণকালে ও বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার সময় ইঁহার দর্শন এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। যদি কেহ তাহা না করে তবে ইনি সেই হতভাগ্যের সমুদায় পুণ্য অপহরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীবটে রাসলীলা করিতেন তখন শ্রীমহাদেব গোপীরূপে উপস্থিত হইয়া সেই আনন্দে যোগ দিতেন দুই তিন দিন এইরূপ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারেন এবং সেই গোপিকারূপিণী মহাদেবকে "গোপীশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করেন। গোপীগণ নিজ নিজ অভীষ্ট

পূর্ণ করিবার কামনায় তাঁহাকে এই স্থানে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

যমুনা-পুলিন—এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া মহারাস করিয়াছিলেন। আজকাল পুলিনের চতুর্দ্দিকে বিস্তর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে টিকারীর মহারাণীর মন্দির ও কাশীমবাজারের মহারাজার মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই পুলিনেই একদিন রাধাবিনোদিনী শ্যামবিরহে রোদন করিয়াছিলেন। এইখানেই শ্যামের বেণুরবে উদ্‌ভ্রান্ত ব্রজগোপীরা আলুথালুবেশে শ্যামসম্মিলিতা হইতেন। আর উচ্ছ্বসিত যমুনার কাল জল রাধাবিনোদের পদযুগল ধৌত করিয়া তালে তালে নৃত্য ও অবিরাম সুমধুর কলধ্বনি করিতে করিতে সেই মহারাসের মিলনগাথা দেশে দেশে বহন করিয়া ভাবুক ভক্তের হৃদয় মধুর উল্লাসে পূর্ণ করিত!—কত প্রেমিক কতই না প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইতেন!

অক্রূরঘাট—ভক্তরাজ অক্রূর কংশের আদেশে কৃষ্ণ বলরামকে নন্দালয় হইতে মথুরায় কংশযজ্ঞে লইয়া যাইতে আগমন করিলেন কিন্তু এই সুকুমার বালকদ্বয়কে কি বলিয়া, কোন পাষাণপ্রাণে, দুষ্ট কংশের কূট মন্ত্রণা জানিয়াও মথুরাপুরীতে লইয়া যাইবেন তাহা ভাবিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজেই মথুরা যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও অক্রূরকে রথ আনিবার আজ্ঞা করিয়া স্নেহময় পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাম কৃষ্ণগত প্রাণ নন্দ ও যশোদা কিছুতেই তাঁহাদের নয়নপুত্তলিদুটিকে কংশের যজ্ঞে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক যুক্তি ও তর্কসহায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মত করাইলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া পরদিবস অতি প্রত্যূষে রথারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রামপ্রান্তে আসিয়া দেখিলেন যে গোপাঙ্গনাগণ তাঁহারই দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রথ ধীরে ধীরে ব্রজবালাগণের নিকটে আসিল, অমনি সেই কিশোরীগণ—কেহ রথের চাকা কেহ বা অশ্বের বল্গা ধরিল, কেহ বা পথের মাঝেই শুইয়া

পড়িয়া পথরোধ করিল। আবার কেহ বা তাঁহার পীতবস্ত্র আকর্ষণ-পূর্ব্বক কেমন করিয়া এত নিষ্ঠুরপ্রাণে তাহাদের—কৃষ্ণগত-প্রাণা উন্মাদিনী ব্রজগোপীদের—ত্যাগ করিয়া তিনি চোরের মত চুপি চুপি পলাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই গোপীদের অতি মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু অদূরে লতাবিতানে ঐ যে অভি-মানিনী বালা ধূলায় লুণ্ঠিতা হইতেছেন, উহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন? অভিমানিনী তাঁহারই প্রেমে পাগলিনী প্যারীর নিকট বিদায় না লইয়া চুপে চুপে যে এতটা পথ চলিয়া আসিয়াছেন তাহারই বা জ্ঞানপূর্ব্বক কি কৈফিয়ৎ দিবেন? মানিনীর মান ভজন করিয়া মিষ্ট কথায় বিদায় লইতেই হইবে—নতুবা তাঁহার যে এক পা নড়িবার শক্তি নাই! তিনি ধীরে অতি সন্তর্পণে কিশোরীর নিকট আসিলেন ও মানিনীর মস্তক নিজ ক্রোড় তুলিয়া লইয়া সপ্রেম কাটাক্ষে সেই মধুর ভুবনভুলান হাসি হাসিয়া প্রিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! যে হাসিতে যে কটাক্ষে ত্রিভুবন পাগল হয়—সেই ক্রূর কটাক্ষে—তদ্গতপ্রাণা বিরহিনী যে আকুল হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাহার পর কত মান কত অভিমান—কত চোখের জল সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ প্লাবিত করিল—অতৃপ্তি তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল! কত অনুনয় বিনয়ের পর বিদায়মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল—পরস্পরে বিদায় লইলেন। রথ চলিতে লাগিল। কিশোরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদাসপ্রাণে ধীরে ধীরে ব্রজের পথে ফিরিয়া গেলেন।

দ্বিপ্রহরে অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে লইয়া যমুনা তীরে উপস্থিত হইলেন এবং নিকটবর্ত্তী কালিন্দী হ্রদে স্নানপূজাদির জন্য রথ থামাইলেন ও কৃষ্ণ-বলরামকে রথেই উপবেশন করিতে বলিয়া—জলে নামিয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়াই শ্রীভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই হ্রদের অপর দিকে জলে নামিয়া জলখেলা করিতেছেন; এই দৃশ্য

দেখিয়া তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন ও তীব্র জল হইতে উঠিয়া রথের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে দুই বালকে অতি নিবিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছে—জলে নামিবার কোন চিহ্নই নাই। দৃষ্টির ভ্রম মনে করিয়া তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ও পূজায় নিবিষ্ট হইলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে নিজের পার্শ্বেই জলে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিতে পাইলেন। এবারও রথের নিকট আসিয়া দুই ভাইকে পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হ্রদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে কৃষ্ণ-বলরাম পূর্ব্বের মত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। এখন তাঁহার চৈতন্য হইল, ভগবান্ যে তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই বার বার এইরূপ করিতেছেন! তিনি সেই হ্রদের তীরেই কৃষ্ণ-বলরামকে আবাহন করিয়া পূজা করিলেন। সেই অবধি এই স্থান বৈষ্ণব ভক্তগণ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে এখানে হ্রদ বিদ্যমান থাকিলেও এখন উহার আর চিহ্নমাত্রও নাই।

ভোজনস্থলী—একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য রাখাল-বালক-গণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দ্বিপ্রহরে যখন মার্ত্তণ্ডদেব প্রবল কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তাপিত করিতেছিলেন তখনও বালকগণের আহার হয় নাই। গোপশিশুবৃন্দ ক্ষুধায় অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল যে, তাহারা আর বসিতে পারিতেছে না-ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণের শুষ্ক মুখ দেখিয়া তিনি তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং উহারই মধ্যে দুই তিনটি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বালককে নিকটবর্ত্তী মথুরা গ্রাম হইতে—যেখানে মুনিগণ কৃষ্ণযজ্ঞ করিতেছিলেন—অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিতে পরামর্শ দিলেন। বালকগণ পুলকিতচিত্তে যজ্ঞস্থানে, উপস্থিত হইল ও মুনিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল, কিন্তু তৎকালে মুনিরা যজ্ঞ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বালকগণের প্রার্থনায় কোনও উত্তর করিলেন না এবং ভিক্ষাও দিতে পারিলেন না। হতাশ হইয়া ম্লানমুখে বালকগণ ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে মুনি-

পত্নীরা তাহাদের শুষ্কমুখ দেখিতে পাইয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ উত্তম উত্তম আহার্য্যে পাত্র সাজাইয়া কৃষ্ণ বলরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত মুনিপত্নীগণ এই দুইটি সুকুমার বালককে ও অন্যান্য রাখাল-বালকগণকে অতি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। এই দুইটি আশ্চর্য্য বালকের রূপ ও গুণাবলি বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মুনিপত্নীগণের বহুদিন হইতেই এই অদ্ভুত বালকদ্বয়কে দেখিবার বাসনা হইয়াছিল—আজ তাঁহাদের সেই বাসনা যে এমনভাবে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে মাতৃত্বের চরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা করিবে তাহা কে জানিত? মুনিপত্নীগণ স্নেহসিক্ত হইয়া নিজ নিজ সন্তানসদৃশ এই বালকদ্বয়কে ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানকে ভোজনস্থলী বলে।

দাবানলকুণ্ড—কালিন্দীর হ্রদে কালীয় নাগ দমন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইলে অন্যান্য রাখাল-বালকেরা ভীত হইয়া পুরবাসিগণকে ও রাজারাণীকে সংবাদ প্রদান করিল। বৃন্দাবনগৌরবকে চিরতরে হারাইবার আশঙ্কায় ব্রজবাসিগণ ও উন্মাদিনীপ্রায় মাতা যশোদা ছুটিয়া হ্রদের নিকট আসিলেন এবং নয়নের মণি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করিয়া ও তৎকর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্পূজিত হইয়া জল হইতে কূলে আসিলেন ও পিতামাতার চরণ বন্দনা ও অন্যান্য গোপগণকে সান্ত্বনা করিলেন। সন্ধ্যা তখন আগতপ্রায়। কৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাণী গোপালের কল্যাণে সেই স্থানেই উৎসব ও রাত্রিবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাণীর আদেশে তৎক্ষণাৎ স্থান পরিষ্কৃত হইল ও খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইল। নানাবিধ আমোদ প্রমোদে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইলে সকলেই যে যেখানে পাইল শয়ন করিল ও কর্ম্মক্লান্ত দেহ শীঘ্রই নিদ্রার কোলে ঢুলিয়া পড়িল। ব্রজবাসিগণ যখন সুষুপ্তি-মগ্ন হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিল তখন

নিকটস্থ বন হইতে সহসা প্রজ্জ্বলিত, ভীষণ দাবানল সমগ্র ব্রজমণ্ডল গ্রাস করিবার জন্যই যেন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে ও শব্দে ব্রজবাসিগণ জাগরিত, ভীত, চকিত ও ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। রাণী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়—তাঁহার সর্ব্বস্বধন কানাই বলাইকে এই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি হইতে কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অনন্তশক্তি-ধারী শ্রীকৃষ্ণ মাতার ও অন্যান্য গোপবৃন্দের ব্যাকুলতা দর্শনে সেই ভীষণ অগ্নি পান করিয়া ফেলিলেন এবং নিকটস্থ কুণ্ডে মুখ প্রক্ষালন করিয়া স্মিতহাস্যে সকলকে অভিনন্দন করিলেন। গৌরবে রাণীর মুখ উদ্ভাসিত হইল, তিনি সস্নেহে প্রিয়তম পুত্রকে কোলে টানিয়া অজস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করিলেন। পুত্রজ্ঞানে মুগ্ধা মাতা ক্ষণিকের জন্যও বুঝিতে পারিলেন না যে এ কোন অত্যাশ্চর্য্য শক্তি-ধারী বালক তাঁহাকে পুত্ররূপে মুগ্ধ করিতেছে! প্রভাতে সকলেই মহা উল্লাসে বৃন্দাবনে ফিরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিনির্ব্বাণ করিয়া এই কুণ্ডে মুখ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন; এইজন্য ইহাকে দাবানলকুণ্ড বলে।

কালীদহ—এই হ্রদে কালীয় নাগ বাস করিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য রাখালবালক-সহ গোচারণ করিতে করিতে এই হ্রদের নিকট-বর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে হ্রদের নির্ম্মল স্বচ্ছ জল দেখিয়া অনেকেই উক্ত জলে পিপাসা নিবারণ করিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু হ্রদের নিকট আসিয়া বালকগণ দেখিল, জল বিবর্ণ ও বিষাক্ত—পিপাসায় জল পান করিতে না পারিয়া সকলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জল পান না করিতে পারিবার কারণ জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ কারণ অনু-সন্ধান করিতে হ্রদসন্নিহিত কদম্ব বৃক্ষ হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই কালীয় ও অন্যান্য বিষধর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হ্রদের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাখালবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্পকর্ত্তৃক বেষ্টিত ও জলমধ্যে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া মহা ভীত হইয়া বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক ব্রজবাসীদের উক্ত সংবাদ প্রদান করিল।

ব্রজবাসী গোপগোপিকাগণ বালকগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়

হ্রদে প্রবেশের বার্ত্তা শুনিয়া সকলেই হ্রদের নিকট আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিতা ও অন্যান্য গোপগণের আগমন জানিতে পারিয়া শীঘ্র দুষ্ট সর্পকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সর্পকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। সর্প কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিষ্পেষিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইল ও তাঁহাকেই স্তব করিতে লাগিল। নাগরাজকে ভীত ও দমিত দেখিয়া, তাহার প্রতি কৃপাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহস্রফণাযুক্ত মস্তকে দাঁড়াইলেন ও মধুর বংশীধ্বনি করিতে করিতে জল হইতে কূলে আসিয়া পিতামাতা ও অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই অবধি এই হ্রদ বৃন্দাবনের অন্যতম তীর্থরূপে পূজিত হইতেছে।

আদিত্য তীর্থ বা সূর্য্যঘাট—শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর পুরাতন মন্দিরের নিকট যমুনার ঘাটগুলিকে সূর্য্যঘাট বলে। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিবার জন্য বহুক্ষণ জলমধ্যে ছিলেন তজ্জন্য শীতার্ত্ত হইয়া এই-স্থানে রৌদ্র উপভোগ করিতে আসেন এবং দ্বাদশ আদিত্য নিজ নিজ তেজ দ্বারা তাঁহাকে সেবা করেন। ইহার অপর নাম পুষ্কন্দন তীর্থ।

সিঙ্গার বট—এইস্থানে নানাবিধ ফলফুলে শোভিত কুঞ্জমধ্যে একটি বটবৃক্ষ ছিল—এই গাছের তলায় বসিয়া কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী রাই নিজ হস্তে প্রেমাস্পদের তৃপ্তির নিমিত্ত সিঙ্গার অর্থাৎ বেশ করিতেন। মুরলীমোহনের অমৃতস্রাবী প্রাণগলান বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপবালারা আত্মহারা হইয়া গোপনে ছুটিয়া আসিতেন এবং শিথিল কবরী বন্ধন করিয়া নানা ফুলে ও বিচিত্র বেশে সজ্জিতা হইয়া এই স্থানেই কালাচাঁদের অপেক্ষা করিতেন।

হায়! এখন সেই অতীতের কোনই চিহ্ন নাই—আছে শুধু মুগ্ধস্মৃতি! সিঙ্গারবট হইতে পুনরায় কেশীঘাটে আসিলেই পরিক্রমা পূর্ণ হইল।

পরিক্রমা পূর্ণ করিয়া আমরা জয়পুর রাজার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম ও সেই রাত্র সেইখানে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস সকালে অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

হরিদেব।

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

পাটবাউসীর সন্নিকটে নারায়ণপুর জনপদে অজনাভ নামক জনৈক সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অজনাভের শাস্ত্রে যেরূপে অসাধারণ অধিকার ছিল, সর্ব্বমূলাধার জগদীশ্বরেও সেইরূপে পরানুরক্তি ছিল। তাঁহার ভার্য্যার নাম পারিজাতী। ব্রাহ্মণ-দম্পতী বহুকাল পুত্র-মুখ-দর্শন সুখে বঞ্চিত ছিলেন। কথিত আছে, একদা অজনাভ স্বপ্নে দর্শন করিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতবসন মুরারি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভক্ত অজনাভ, শীঘ্রই তুমি মহাগুণসম্পন্ন এক পুত্র লাভ করিবে"। অজনাভের হৃদয় আশায় নৃত্য করিতে লাগিল। যথাসময়ে তাঁহার আশাতরুতে ফল ফলিল। পারিজাতী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। ১৪১৫ শকের ভাদ্র কৃষ্ণাপঞ্চমীতে পারিজাতী দেবী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইনিই শীর্ষদেশোল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক হরিদেব।

হরিদেব বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগান্তর তিনি একান্ত মনে শ্রীহরির ধ্যানে নিবিষ্ট হন। তিনি যতই হরিনাম সুধা পান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তৎপানাগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন।

রাজোপদ্রববশতঃ হরিদেব পূর্ব্বাবাসস্থানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া হাজো গমন করেন ও তৎপর মালীপারায় উপস্থিত হন। এই স্থানে খাগরামালী নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি হরিদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করেন। হরিদেব সুপ্রসন্ন হইয়া খাগরামালীকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করেন। অতঃপর জগন্নাথ দর্শনার্থ তিনি শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের দ্বারে তাঁহার সহিত শ্রীশঙ্করের সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া হরিদেব প্রথমতঃ বরলু চুঙ্ (পাটবাউসী) ও তৎপর দন্তপুরে গমন করেন। তিনি অতিশয় অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। অতিথিসেবা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সমূহের অন্যতম রূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে যে স্থলে বাস করিতেছিলেন, তথায় অতিথি সেবার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। উক্ত কারণে তিনি অবিলম্বে তৎস্থান ত্যাগ করিলেন—

অতিথি সেবাত জানা সব ধর্ম্ম পাই।
আকে জানি ঐত থাকিবাক নুজুয়াই॥

হরিদেবের বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তিলোত্তমা নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণ তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তিলোত্তমাদেবীর গর্ভে ভুবনেশ্বরী ও বনমালা নামে দুইটী কন্যা এবং দামোদর নামক একটী পুত্রের জন্ম হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র দমোদরের অকালে অপমৃত্যু হয়।

হরিদেব বঁহরী গ্রামের সন্নিকটে নৈসর্গিক শোভা সমাযুক্ত এক স্থলে প্রথম সত্র স্থাপন করেন। এই সত্র "মানেরী সত্র" নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, সভক্ত শঙ্করদেব ও দামোদর দেব একদা হরিদেবের বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক কোন কার্য্য দ্বারা তাঁহার মান বর্দ্ধন করেন। উক্ত মহাপুরুষগণ হরিদেবের এইরূপে মান বর্দ্ধন করায় ঐ সত্রের নাম "মানেরী সত্র" হয়। অতঃপর হরিদেব আরও নানাস্থলে সত্র স্থাপন করিয়া দেশ মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই "মানেরী সত্র" হইতে পাটবাউসীতে ধার্ম্মিক প্রবর শঙ্করের নিকট গমন করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণ এইরূপে পবিত্র ধর্ম্মালোচনা দ্বারা স্বর্গীয় সুখে কালাপনয়ন করিতেন।

একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ হরিদেবের পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিষ পান করিতে অনুরোধ করে। ঐ ব্রাহ্মণগণ আরও কতিপয় সাধুপুরুষকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা উহাতে সম্মত হন নাই। হরিদেবও প্রথমতঃ বিষপান করিতে অসম্মত

হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে অবশেষে ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে বিষপান করিয়া ফেলিলেন। ফলে তিনি কিয়ৎকাল বিলুপ্তসংজ্ঞ ছিলেন। যাহা হউক পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিস্ময় উৎপাদন করেন।

হরিদেবের ধর্ম্মমত নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতে সংক্ষিপ্ত রূপে অবজ্ঞাত হওয়া যায়।—

হরির একান্ত ভক্ত আছে নিরন্তর।
হরি হেন মানি তাঙ্ক করিয়া আদর॥
স্নান করি মাধবর স্তোত্রক বুলিবা।
পঞ্চ উপচারে হরি পূজাক করিবা॥
তাত পরে মাধবক করি স্তুতি নতি।
শিরে নমস্কার করি করিবা ভকতি॥
নির্ম্মাল্য তুলসী লই প্রসাদ ভুঞ্জিবা।
আনন্দ করিয়া হরি কীর্ত্তন করিবা॥
শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্ম্ম করিবা সদায়।
ভাগবত ধর্ম্মর এহি সে অভিপ্রায়॥
বেদর বিহিত কর্ম্ম সদায় করিবা।
কদাচিতো মহন্তক নিন্দা ন করিবা॥
প্রাণী হিংসা ন করিবা কৈলো সারে সার।
প্রাণী হিংসাও পরে পাপ নাহি আর॥

---*---

সৎকথা।

যতদিন না গুরুর উপর ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস হয়, ততদিন যার তার কাছে উপদেশ নিতে যেতে নেই। তাতে গুরুর উপর সংশয় আসবার সম্ভাবনা, একবার গুরুতে সংশয় এলে তা দূর করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততদিন ইষ্ট ও গুরু এক বোধ হবেই না, হাজার বিচার কর আর বুদ্ধি খাটাও সংশয় আসবেই আসবে। কিন্তু একবার যদি কখনও আত্মসাক্ষাৎকার হয় তখন সমস্ত সংশয় নাশ হয়ে যায় এবং গুরু ও ইষ্ট এক বলে বোধ হয়।

* * *

কিছুদিন জপধ্যান করে, ভগবান্ লাভ বা আত্মোন্নতি হল না বলে জপধ্যান ছেড়ে দিতে নাই। ছেড়ে দিলেই তুমি গোঁড়া নাস্তিক হয়ে দাঁড়াবে। মনের অবস্থা যখন ঐরূপ হয় তখন বড় বড় মহাজনদের কর্ম্ম দেখতে হয়, মনকে বুঝাতে হয় তাঁরা যখন ঐ উপায়ে ভগবান্ লাভ করেছিলেন তখন আমিই বা লাভ করব না কেন? তাঁদের জীবন আদর্শ করে আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যেতে হয়। অধ্যবসায়ে কি না হয়।

* * * *

জপধ্যান করতে করতে আলস্য, জড়তা, তন্দ্রা এসে থাকে—ওটা শরীরেরই ধর্ম্ম। এই সব জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে—না হয় একটু আধটু পায়চারি করলে—আলস্য চলে গেলে তখন আবার বসে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সব আপদ্ চলে যায়।

* * * *

মুখে অনেকেই বলে থাকে যে তারা ইচ্ছা করলেই তাদের কুসংস্কারগুলো নাশ করে ফেলতে পারে, কিন্তু সংস্কার নাশ করনেওয়ালা ত একটা দেখি না! যার সংস্কার নাশ হয়েছে সেই অন্যের সংস্কার নাশ করতে পারে। এই জন্যই ঐরূপ সৎসঙ্গের দরকার হয়। কেবল তাঁদের কাছেই গেলে তাঁদের সদ্‌গুণে কুসংস্কার-সমূহ আস্তে আস্তে চলে যায় এবং সুসংস্কার প্রবল হয়ে উঠে।

* * * *

তবে শুধু বৈদ্যের বাড়ী গেলে কি হবে; ঔষধ এনে খেতে হবে, তবে না রোগ সারবে। কেবল সাধুর কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি

হবে, তাঁদের কাছে থেকে উপদেশ পেয়ে তদনুরূপ কর্ম্ম করতে হয়, তবে ত হয়।

* * * *

ভগবান্ জীবের কর্ম্ম দেখেন, জন্ম দেখেন না। বামুনের ঘরে জন্মে যদি সৎকর্ম্ম না করে তাতে কি হবে? নীচ ঘরে জন্মে যে সৎকর্ম্ম করে, ভগবানকে ভক্তি বিশ্বাস করে তার জন্ম সার্থক।

* * * *

পরের অনিষ্ট ও হিংসা করে জীব আনন্দ পায় তাই ত অনিষ্ট ও হিংসা করে। যে পরের হিংসা বা অনিষ্ট না করে আনন্দ পায় তার আনন্দই ঠিক আনন্দ। ঐরূপ হতে গেলে ভগবানের বিশেষ দয়া থাকা চাই।

* * * *

পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে ছিলেন তখন একদিন দুর্ব্বাসা মুনি দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করলেন কখন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দুর্য্যোধন কপটভাবে দুর্ব্বাসা মুনিকে বললেন, সন্ধ্যার পর দেখা করতে যাবেন। কারণ, দুর্য্যোধন জানত যে দুর্ব্বাসা মুনি অতি কোপনস্বভাব, পাণ্ডবেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করছে; সন্ধ্যার সময় আহারাদি শেষ হয়ে যাবে তখন আর তারা মুনিকে আহারাদি দিয়ে অতিথি সৎকারে সমর্থ হবে না। কিন্তু দুর্ব্বাসামুনি অত না বুঝে মনে করলেন, যে, পাণ্ডবেরা হয়ত দিনের বেলায় শিকারে যাবে সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র থাকবে তাই দুর্য্যোধন তাঁকে সন্ধ্যার সময় যেতে বললেন। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার সময় দেখা করতে গেলেন। দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিবামাত্র যুধিষ্ঠির ত কাঁপতে লাগলেন—আজ বুঝি পাণ্ডবকুল ধ্বংশ হল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দেখে দুর্ব্বাসা মুনি নর্ম্মদাতীরে সন্ধ্যা করতে গেলেন এবং বলে গেলেন আজ আমি এখানে আহার করব। যুধিষ্ঠির তখন ত তাঁকে 'আমার মহাভাগ' বলে আপ্যায়িত করিলেন! সেদিন আবার দ্বাদশী; মুনি একাদশীর দিন থেকে উপবাসী

আছেন। আর গৃহে কিছু আহার্য্য নাই। যুধিষ্ঠির এইরূপ অবস্থা স্মরণ করে সখা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডাকে স্থির থাকতে না পেরে দ্রৌপদীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। দ্রৌপদী কিন্তু দুর্ব্বাসার ব্যাপার কিছুই জানেন না—তিনি সখাকে দেখে রঙ্গরস আরম্ভ করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন আমার রঙ্গরস ভাল লাগছে না—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে ঘরে যদি কিছু থাকে ত দাও। দ্রৌপদী বললেন, সখা ঘরে যে কিছু নেই। তা যাই হোক যা একটু ছিল তাই নিয়ে জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চলে গেলেন।

এদিকে দুর্ব্বাসামুনির দেরী হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁর খবর আনতে পাঠালেন। ভীম গিয়ে দেখে যে দুর্ব্বাসা মুনি ঘুমুচ্ছেন। ভীমকে তিনি বলে দিলেন আজ শরীরটা বড় ক্লান্ত, আজ আর কিছু খাব না কাল উপবাসের পারণ করব। এই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের খেলা।

এইরূপ যাঁরাই ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁদের আর কোনও বিপদ্ আপদ্ উপস্থিত হয় না। আরও বোঝা যায় যে, ভগবান যার উপর সন্তুষ্ট থাকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

বিদ্যাদানের শুভযোগোদয়।

রমণীগণের জীবন ভারতে বর্ত্তমানকালে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত—পাশ্চাত্য মহিলাগণ সমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা জ্ঞান করিতেছেন ভারতের কন্যাগণকে সেই সকলের কতদূর প্রদান কর্ত্তব্য,—প্রভৃতি সমস্যা সকলের মীমাংসাস্থলে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—

"স্ত্রীজাতির জীবন ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা

রমণীগণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়াই উচিত কারণ, তাঁহাদিগের ন্যায্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেক স্থলে নিঃস্বার্থ পুরুষগণেরও সামর্থ্যে কুলায় না। অতএব বৈদিকযুগে রমণী-দিগকে পুরুষের ন্যায় যেরূপে সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত এখনও ঐরূপ করিয়া অন্য সকল বিষয়ে আমাদিগের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। উহাতে সুশিক্ষিতা স্বার্থবিশূন্যা মহিলামণ্ডলী—সীতা সাবিত্রী-প্রমুখ ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নারীজীবন নিয়-মিত করিবার বর্ত্তমান যুগোপযোগী নিয়মাবলী নিরূপণপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।”

শিক্ষা কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন—

“অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম,—প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ঐ কথা অন্য প্রকারে এই ভাবে বলা যাইতে পারে—মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখন জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল তাহার অন্তরে কোন প্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্ব্বজ্ঞ এবং জগৎ-সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তুলে। অতএব ঐ আবরণসমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায় সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করিবার যোগ্য।”

স্বামিজীর শিক্ষাসম্বন্ধী পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া বেলুড়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীস্থ বসুপাড়া লেনে, ১৭ নং ভাড়াটিয়া বাটীতে, বালিকা ও অন্তঃপুরচারিকাগণের

সেবাকল্পে শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বিগত পঞ্চদশবর্ষকাল উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের কল্যাণসাধনে আজীবন ব্রতধারিণী, গুরুগতপ্রাণা পরমবিদুষী সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার ক্রিষ্টিনা নাম্নী পাশ্চাত্য ব্রহ্মচারিণীদ্বয় সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া ঐ মন্দিরে আরাধ্য দেবতার উদ্বোধন, আবাহন ও প্রাণদান পুরঃসর অন্তর্ব্বাহ্য পূজায় সতত নিযুক্ত থাকিয়া ঐ দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন। আবার বিদ্যা-রূপিনী দেবীর আসন ও প্রসন্নতা এক্ষণে ঐ স্থানে বহুজনহিতায় চির-কালের নিমিত্ত অচল অটল রাখিবার কামনায় ভারতের পুত্রকন্যাগণের প্রকৃত ভগ্নীস্থানিয়া, পূতস্বভাবা নিবেদিত, সহচরী সিষ্টার ক্রিষ্টিনার হস্তে কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক নিজ জীবন ঐ যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতিস্বরূপে প্রদান করিয়াছেন।

ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যাপ্রভাবে শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিচয় বিগত পঞ্চদশবর্ষের কার্য্য-সাফল্যে পাওয়া যাইতেছে। আকাশবৃত্তি অবলম্বনে নীরবে এতকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেও সাতশতের অধিকসংখ্যক বালিকাজীবন উহার সহায়ে বিদ্যার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। আন্দাজ তিনশত অন্তঃপুরচারিণী রমণী এই মন্দিরে সমাগতা হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভে ধন্যা হইয়াছেন। এবং দুইশত দরিদ্রা কুলকামিনী শিল্পাদি কার্য্য-সহায়ে জীবিকা অর্জ্জনের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনাদিগের ও সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থা হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কতক-গুলি মহিলা এই বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপনান্তে অন্যত্র শিক্ষয়িত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন; কতকগুলি এই শিক্ষামন্দিরে ঐ পদ গ্রহণপূর্ব্বক পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং একজন কলিকাতার লেডী ডাফরীন হাঁসপাতালে তিন চারি বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া পীড়িতের সেবা ও ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হইয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষিতা করিতে এবং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে যত্নবতী হইয়াছেন। অপর কেহ কেহ

এখানে শিক্ষালাভের পরে এইরূপ শিক্ষামন্দির অন্যত্র স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বালিগ্রামে এই বিদ্যালয়ের শাখারূপে পরিগণিত যে বিদ্যালয় গত সাত বৎসর আন্দাজ কাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঐরূপে ভারতের জাতীয় রমণীজীবনাদর্শ সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই মন্দিরের পরিচালকগণ বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান ও তৎসম্মত শিক্ষাপ্রণালী উহার সহিত অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করিয়া নবভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন অনুরাগ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ত্যাগ, তপস্যা, সংযম এবং পরহিতে জীবনোৎসর্গকরারূপ ব্রত স্বয়ং অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহারা তাহাদিগকে বৈদিকযুগের ব্রহ্মচারিণীদিগের ন্যায় উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন অন্যপক্ষে সেইরূপ সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম অটুট রাখিয়া যাহাতে তাহারা আবশ্যক হইলে আপনার ভার আপন স্কন্ধে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তদ্রূপ কার্য্য ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন।

যে বিদ্যামন্দির ঐরূপে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের জীবন অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করিতে এতকাল ধরিয়া সচেষ্ট রহিয়াছে, জটিল জীবিকা-সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যাহা অনেকগুলি দরিদ্রা কুলকামিনীপ্রাণে আশার সঞ্চার উপস্থিত করিয়াছে এবং আপনার ও অপরের যথার্থ উন্নতিসাধন ব্রতী করিয়া ঐ পথের সকল বাধা-বিঘ্নকে কঠোর ধৈর্য্য ও সংযম সহায়ে জয় করিতে যাহা ছাত্রীগণকে সমর্থা করিয়াছে—তাহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে আমরা অদ্য সকল নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। হে পাঠক, ৺ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রতীকস্বরূপা মাতা, ভগিনী, জায়া ও দুহিতা প্রভৃতি আত্মীয়া রমণীগণের নিকটে যে স্নেহ, আদর, সেবা ও ভালবাসা আজীবন লাভ করিয়াছ তাহা স্মরণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ

হৃদয়ে তাঁহাদিগের জাতির উন্নতিসাধনে অগ্রসর হও! হে পাঠিকা, শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে যদি তোমাকে ধন-জন-সম্পদে ভূষিতা করিয়া থাকে তবে দেশের, দশের এবং বিশেষতঃ নিজ জাতির কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া এই কার্য্যে সাহায্য কর। উপযুক্ত স্থানে এবং ভবনে এই শিক্ষামন্দির চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। হে ভ্রাতা ও ভগিনিগণ, তোমাদের বদান্যতার উপরে নির্ভর করিয়াই আমরা এই বিদ্যালয়ের জন্য বাগবাজার পল্লীর নিবেদিতা লেনের অন্তর্গত আঠার কাঠা আন্দাজ ভূমি উনত্রিশ সহস্র মুদ্রায় (২৯০০০৲ টাকা) ক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ঐ জমি হস্তগত হইলে কলিকাতার 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় এই শিক্ষা মন্দিরের জন্য যে ৮০০০৲ টাকা আমাদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাহার সহায়ে বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিব। দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া যাহা দান করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক দান এবং অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদানের বিশেষ মহিমা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐরূপ সাত্ত্বিকদানের শুভাবসর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমরা আজ তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। যাহার যথাশক্তি প্রদানপূর্ব্বক অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ে ধন্য হও, কৃতকৃতার্থ হও। জানিও এই শুভানুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তোমরা যাহা প্রদান করিবে তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে সামাজিক কল্যাণরূপে তোমরা অচিরে ফিরাইয়া পাইবে। পরমকারুণিক শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা তিনি দাতা এবং গৃহীতা—আমাদিগের উভয়কে, এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন।* ইতি

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

---

*বিবেকানন্দ-পুংস্ত্রীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা-বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে যাঁহার যাহা দেয় তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে—

(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

কটক রামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায়ের অষ্টম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী (১৯১৬-১৭) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেবকসম্প্রদায় একটী ভাড়াটিয়া-বাটীতে 'রামকৃষ্ণ কটেজ' নামক একটী ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বালকগণ স্বল্পব্যয়ে সহরে থাকিয়া বিদ্যা-লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই কটেজটী স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এইরূপ ১৫টী বালক 'কটেজে' স্থান পাইয়াছে। স্থানাভাব ও অর্থাভাববশতঃ কটেজের কর্তৃপক্ষগণ অনেক আবেদন-কারীকে স্থান দান করিতে পারেন নাই—স্থানাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা কটেজের নিজস্ব একটী বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একটী বিল্ডিং ফণ্ড খুলিয়াছেন—উহাতে যাঁহার যাহা অভিরুচি তাহা দান করিতে পারেন।

আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের সকলের পক্ষে সহরের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পড়া শুনা করা অসম্ভব। গরীব হইলেও শিক্ষালাভ করিয়া, নিজের উন্নতি সাধন করিব, মানুষ হইব, দেশের ও দশের একজন হইব এরূপ ইচ্ছা কাহার না হয়? কিন্তু তাহাদের এই সৎ উদ্দেশ্যের বিষয় ভাবিবার বা সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোক অল্প। এইরূপ ক্ষেত্রে কটেজের কর্তৃপক্ষগণ যে ১৫টী ছেলেরই শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তাঁহাদের এই অনুষ্ঠান প্রসারতা লাভ করুক এবং এই সৎ-দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই গরীবের জন্য ছাত্রাবাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই আমাদের ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা।

বোষ্টন, (আমেরিকা যুক্তপ্রদেশ) বেদান্ত-প্রচার-কেন্দ্রের কার্য্য স্বামী পরমানন্দের তত্ত্বাবধানে অতি সুচারুরূপেই চলিতেছে, তিনি যে "এমার্সন এবং বেদান্ত' ও 'প্লেটো এবং বৈদিক অধ্যাত্মবাদ'

সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন, তাহাতে যাহারা উপস্থিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উক্ত কেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন না, তাঁহাদেরই সংখ্যা অধিক ছিল। তিনি বর্ত্তমানে লস এন্‌জেলিসে গমন করিয়াছেন ও তথাকার উপাসনার ও ক্লাসগুলির ভার পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। বোষ্টন কেন্দ্রের রবিবাসরীয় উপাসনাদ্বয় এবং মঙ্গলবারের সান্ধ্য ক্লাসটী সিষ্টার দেবমাতার তত্ত্বাবধানেই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সেপ্টেম্বর মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত আগষ্ট মাসের ১২ জন ব্যতীত, আলোচ্য মাসে আরও ৩৯ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ২ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, ১ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছে ও ২১ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৫৭৯ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৩ জন নূতন এবং ২৪৮৬ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

ঐ মাসে ৪ জন রোগীকে তাহাদের নিজ বাটীতে ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৬৯॥০ এককালীন দান ১৯॥০ মোট ৮৯৲। ব্যয় হিসাবে, সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ১৪৮।৶০ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে খরচ ১০৮॥১০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(১)

(স্বামী সারদানন্দ)

ঠাকুরের জন্য যে বাটিখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটিতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর রক দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্ব্বদিকে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—এবং বামে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকখানা' ঘর নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাণ্ডা প্রশস্ততর ছিল—এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর—একখানিতে ভক্তদিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পপরিসর বারাণ্ডা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্ব্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার

দরজার পার্শ্বে চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাদ্র মাসের শেষার্দ্ধের কোন সময়ে, ইংরাজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ঠাকুর, বলরামের বাটি হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার দুই এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুরের বাটিতে আসিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ পূর্ব্ব-পরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আনয়ন করিল। মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সামান্যভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, ঐ জন্য কাহাকে দেখিতে আসিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্তু ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু যত্নে পরীক্ষা ও রোগনির্ণয়পূর্ব্বক ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কালিবাটি সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্ম্মালাপে স্বল্পকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার নিকটে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ আছে, ডাক্তার ঐদিন ভক্তগণকে প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন এবং যাইবার কালে তাঁহারা তাঁহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া যখন তিনি কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনয়নপূর্ব্বক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে তখন তাহাদিগের গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না—

বলিলেন, 'আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্য্যে সহায়তা করিব।'

ঐরূপে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তা লাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত করিবার এবং দিবসের ন্যায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের আবশ্যক মত সেবা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কেবল মাত্র ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ঐ দুই অভাবের একটিও যথাযথ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া তাহারা তখন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্ব্বক প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক ভক্তগণের সহায়তায় দ্বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ স্থির করিল। ঐ অভাবদ্বয়ের ঐরূপে নিরাকরণের পথে কিন্তু বিষম অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্দরমহল না থাকায় শ্রীশ্রীমা এখানে কিরূপে একাকী আসিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইল, এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র বালক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া নিত্য রাত্র-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষম অসন্তোষের উদয় হইবে, একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়াও ভক্তগণের অনেকে তাঁহার আগমন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন। দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের উত্তরের নহবৎখানায় এতকাল অবস্থানপূর্ব্বক ঠাকুরের নিত্য সেবায় নিযুক্তা থাকিলেও দুই চারি জন বালক-ভক্ত— যাহাদিগের সহিত ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে পরিচিতা করাইয়া দিয়াছিলেন—তাহারা ভিন্ন অপর কেহ কখন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই। ঐ স্বল্পপরিসর স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্য সকল দুই বেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেও ঐ স্থানে কেহ যে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা বাজিবার স্বল্পকাল পরে অন্য কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে প্রতিদিন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক

শৌচ-স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি সেই যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন সমস্ত দিবস আর বহির্গত হইতেন না—নীরবে, নিঃশব্দে অদ্ভুত ত্রাস্ততার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা, জপ ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি একদিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন—কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপরে শয়ন করিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়ে! তদবধি সঙ্গে আলোক না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না।

এতকাল ঐ স্থানে থাকিয়াও যিনি ঐরূপে কখন কাহারও দৃষ্টি-মুখে পতিতা হয়েন নাই, সর্বপ্রকার সঙ্কোচ ও লজ্জা সহসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি কিরূপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে আসিয়া সর্ব্বক্ষণ বাস করিবেন ইহা ভক্তগণের কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অথচ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে বাধ্য হইল। ঠাকুর তাহাতে শ্রীশ্রীমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন 'সে কি এখানে আসিয়া থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সকল কথা জানিয়া শুনিয়া সে আসিতে চাহে ত আসুক্।' দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিত হইল।

'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন'—ঠাকুর বলিতেন ঐরূপে দেশ-কাল-পাত্র ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক সংসারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে পারিলে শান্তি লাভে অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সর্ব্বথা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি সংস্কার ও অভ্যাসের আবরণসমূহ হইতে আপনাকে নিষ্ক্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথাযথ

আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন তাহা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের বিবরণে এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে—

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জয়রামবাটি ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে আসিতে হইত। ঐরূপে আসিতে হইলে জাহানাবাদ (আরামবাগ) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলো ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া ৺তারকেশ্বরে, এবং তথা হইতে বৈদ্যবাটিতে আসিয়া গঙ্গা পার হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন ডাকাইতগণের ঘাটি ছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, প্রদোষে, অনেক পথিকের এখানে তাহাদিগের হস্তে প্রাণ হারাইবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক ক্ষুদ্র গ্রামদ্বয়ের এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে প্রান্তরের মধ্যভাগে, করালবদনা, সুভীষণা এক ৺কালীমূর্ত্তির এখনও দর্শন মিলিয়া থাকে। জনসাধারণের নিকটে ইনি তেলোভেলোর ডাকাতেকালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইঁহাকে পূজা করিয়া ডাকাইতেরা নরহত্যারূপ নৃশংস কার্য্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথিকেরা ঐসময়ে দলবদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তরদ্বয় অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর কয়েকটি স্ত্রীপুরুষের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলো এবং কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্তি অনুভব করিলেও শ্রীশ্রীমা তজ্জন্য ঐ বিষয় কাহাকেও না বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুইক্রোশ পথ যাইতে না যাইতে দেখা গেল, তিনি সঙ্গীদিগের সহিত সমভাবে

চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন। তখন তাঁহার নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং তিনি নিকটে আসিলে তাঁহাকে দ্রুত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। অনন্তর প্রান্তর মধ্যে আসিয়া তাহারা দেখিল তিনি আবার সকলের বহু পশ্চাতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। আবার তাহারা তাঁহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং তিনি নিকটে আসিলে বলিল, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা একেবারে ৺তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগের সহিত তথায় মিলিতা হইতেছি।' বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাঁহার ঐকথার উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইল।

শ্রীশ্রীমা তখন যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ যষ্টি স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পশ্চাতে দূরে তাহার সঙ্গীর ন্যায় এক ব্যক্তিও আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা বৃথা বুঝিয়া শ্রীশ্রীমা তখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের আগমন সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ পুরুষ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করিল, 'কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?' শ্রীশ্রীমা তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক একেবারে

তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভুলিয়াছি, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তাহাদিগের নিকটে পৌঁছাইয়া দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালিবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" ঐ কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীমা দেখিলেন সে পুরুষ নহে রমণী, প্রথমাগত পুরুষের পত্নী। ঐ রমণীকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিয়া যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম, ভাগ্যে বাবা ও তুমি আসিয়া পড়িলে, নতুবা কি করিতাম বলিতে পারি না।"

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তাহার পত্নীর প্রাণ এককালে বিগলিত হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভুলিয়া তাহারা সত্য সত্যই আপনাদিগের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। পরে তাঁহার শারীরিক অবসন্নতার কথা আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না দিয়া সমীপবর্ত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া যাইয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল। রমণী, নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিল, এবং পুরুষ, দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিল। ঐরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যুষে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া দুই চারি দণ্ড বেলা হইলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল। অনন্তর রমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

'আমার মেয়ে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার (৺তারকনাথের পূজাদি শীঘ্র সারিয়া বাজার হইতে মাছ, তরিতরকারি লইয়া আইস, আজ তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে।'

পুরুষ ঐসকল কর্ম্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, 'ইঁহারা আসিয়া আমাকে না রক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।' অনন্তর পূজা, রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ঐস্থানে বিশ্রামপূর্ব্বক সকলে বৈদ্যবাটি অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে বিদায় গ্রহণ কালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্ব্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণী পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশুঁটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা, সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাইবে তখন এইগুলি দিয়া খাইও।' পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা

পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল একথা কিন্তু এখনও আমার মনে হয়।”

ডাক্তারের উপদেশমত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী আপনার থাকিবার সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া এখানে তিন মাস অবস্থানপূর্ব্বক তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্নানাদি করিবার একটিমাত্র স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ৩টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক তিনি কখন যে ঐসকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া যথা সময়ে ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুতপূর্ব্বক তিনি (অধুনা পরলোকগত) বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ অথবা স্বামী অদ্ভুতানন্দের দ্বারা ঐ সংবাদ নিম্নে প্রেরণ করিতেন—তখন সুবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাঁহাকে উহা আনয়নপূর্ব্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই উহা লইয়া আসিতাম। মধ্যাহ্নে তিনি ঐস্থানেই স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময় সকলে নিদ্রিত হইলে ঐস্থান হইতে নামিয়া দ্বিতলে তাঁহার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। ঠাকুরকে রোগ-মুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন ঐরূপে কাটাইয়া দিতেন এবং এরূপ নীরবে, নিঃশব্দে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন যে যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা যাওয়া করিত তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

পথ্যের বিষয় ঐরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের

সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ঐবিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রিকাল এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপ করিতে আকৃষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাঁহার অসীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পূত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢ়সংকল্প করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন ঐকথা বুঝিতে না পারিল ততদিন পর্য্যন্ত শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা সেবা কার্য্যে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটিতে আহার করিতে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিল তখন তাঁহাদিগের প্রাণে প্রথমে সন্দেহ এবং পরে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য ন্যায্য অন্যায্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐসকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্যপথে কখনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাহুল্য। ঐরূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে চারি পাঁচ জন মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার পূর্ণানুষ্ঠান-কালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামিজীর মৃত্যুসম্বন্ধীয় শিক্ষা।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

আমাদের আচার্য্যদেব যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী উপায় এই ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই নীরবে শিষ্যের মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিত। সে সকল জিনিসকে যে চক্ষে দেখিত, সেই দৃষ্টিটাই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, সে যেন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ভাবে একেবারে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইত, অথবা সহসা দেখিত যে, তাহার কোন বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার সমস্ত অভ্যাসটাই চলিয়া গিয়াছে, এবং তৎস্থলে একটী নূতন মতের উদ্ভব হইয়াছে—অথচ ঐ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটী কথারও আদান প্রদান হয় নাই। লোকের মনে হইত, যেন শুধু তাঁহার নিকটে থাকা হেতুই কোন জিনিস তর্কযুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আপনা হইতে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। এইরূপেই রুচি ও মূল্য-ঘটিত নানা প্রশ্ন আর মনকে আন্দোলিত করিতে পারিত না। এইরূপেই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে ত্যাগের বাসনা জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। আর, তাঁহার নিকটে থাকিলে লোকের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধারণা সঞ্চারিত হইত, তৎ-সম্বন্ধে একথা যেমন খাটে এমন আর কিছুর সম্বন্ধেই নহে।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি দিন দিন এ বিষয়ে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নির্দ্দেশ করার বিপক্ষে হইয়াছিলেন। কেহ এই অনাদি অনন্ত সমস্যাটীর মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা

করিলে তিনি উত্তর দিতেন, "আমার মনে হয় এইরূপ; আমি বলিতে পারি না।" তিনি সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, একটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকারের স্বার্থপরতা ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর স্বপ্ন দেখা; এবং তিনি দেহত্যাগের পরের অবস্থাসমূহের উপর ঝোঁক দিয়া লোকের বাসনাজনিত অজ্ঞানতার বৃদ্ধি করিতে ভয় পাইতেন। তাঁহার নিজের পক্ষে জীবনে ও মরণে ঈশ্বরই একমাত্র উপায় এবং নির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে সর্ব্বোচ্চ সমাধিই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, বাকী যাহা কিছু সমস্তই ইন্দ্রিয়সেবা। তথাপি এই ঘটনা হইতেই স্পষ্টতরভাবে বুঝা যায়, কিরূপে তাঁহার শিক্ষায় লোকের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত; এবং যে দুই তিন খানি পত্রে নিজ অনুভব ও সহানুভূতি, এই উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে এতৎ সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশে বাধ্য করিয়াছিল, এই ঘটনাই সেগুলিকে সমধিক মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, যখন আমি স্বামিজীকে প্রথম দেখি, তখন অনেক বৎসর ধরিয়া আমার এই ধারণা প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, শরীর ত্যাগের পরও যে আমাদের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন বাস্তব কারণ নাই। এরূপ ব্যাপার হয় অসম্ভব না হয় অচিন্তনীয়। যদি মন না থাকিলে আমাদের শরীরের অনুভূতি না হয় (কারণ মন দ্বারাই আমরা ঐ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি), তাহা হইলে ইহাও তেমনি সত্য যে, শরীর না থাকিলে আমরা মনের অস্তিত্বও আদৌ কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং যদি মন বাস্তবিক শরীরেরই পরিণামস্বরূপ নাও হয়—"বীণার তারে যেমন আওয়াজ হইয়া থাকে"—তাহা হইলেও আমাদিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর মন উভয়েই একই বস্তুর বিপরীত সীমা বা প্রান্ত (Poles) মাত্র। উভয়ে—শরীর ও মন, 'জড়পদার্থ' ও 'মন' নহে—একই জিনিষ,

এবং মৃত্যুর পরও যে ব্যক্তিত্ব থাকিবে, এ ধারণা জৈবসংস্কারপ্রসূত একটা ছায়া মাত্র। নীতিসম্মত আচরণ, এমন কি উহার চরম পরিণতি যে পূর্ণ আত্মত্যাগ তাহা পর্য্যন্ত, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সমাজের হিতকর ভাগগুলিকে গ্রহণ করা রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।*

ভারতীয় মনীষিবৃন্দ মনকেই জীবনের কেন্দ্রস্থানীয় কীলক-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহারই উপর যত জোর দিয়া থাকেন—উহাই তাঁহাদের অভ্যাস। আমার নিজের সম্বন্ধে, পূর্ব্বকথিত ধারণা-সকল তাঁহাদের এইরূপ চিন্তা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ একটা দেহ। এখানে

* উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধারণা কতকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে। একজন মনীষী বলিতেছেন, "আত্মা কি বীণার তারে উৎপন্ন আওয়াজের মত, অথবা নৌকায় উপবিষ্ট দাঁড়ীর মত?" জড়পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আজকাল যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বৈজ্ঞানিক-গণের পক্ষেও "একটা পরিণামাবস্থা (Cycle) কল্পনা করা—উহাকে মন বলিতে পার—সহজ হইয়া পড়িতেছে যাহাতে জড়পদার্থ এক প্রকার নীতি বলিলেই হয়।" কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্যদেশসমূহের জন্য ইহা বিশেষভাবে দেখাইতে হইবে, কিরূপে ব্যষ্টি শরীর মন, এই জড়পদার্থ ও মনের সমষ্টিকে আশ্রয় করে, যাহাতে উভয়েই একাকার হইয়া যায়। এখানে ইহা বলিবার অভিপ্রায় নহে যে, সকল ধর্ম্মে নীতিসম্মত আচরণ অবশেষে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে; এখানে শুধু অজ্ঞেয়বাদী ও হিন্দু মতের বৈপরীত্য প্রদর্শন করা হইতেছে। অজ্ঞেয়বাদী নীচে হইতে উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন; হিন্দুগণ বলে যে, আমাদের দেহবুদ্ধি, বিচার করিয়া দেখিলে, আধ্যাত্মিক জীবনের একটা স্থূল বিকাশ ও আবরণ মাত্র। এই আধ্যাত্মিক জীবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আত্মরক্ষার জন্য নহে, আত্ম-বলিদানের জন্য। আধুনিকগণ দৃষ্ট হইতে বিচার দ্বারা অদৃষ্টে পৌঁছাইতে চান, বিশেষ হইতে সামান্যে উপনীত হন; হিন্দুগণ সাধারণ বা সার্ব্বজনীন হইতে বিশেষের বিচার করেন, এবং বলেন যে, মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিতে হইলে উহাই প্রকৃষ্ট বিচারপন্থা; কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা এক্ষণেও আত্মার জীবন যাপন করিতেছি।—নিবেদিতা।

প্রাচ্য পণ্ডিতগণ একেবারে তাঁহাদের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করেন —ঐরূপ সংস্কারই প্রাচ্যদিগের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ বলে যে, মানুষ একটা দেহ, এবং তাহার একটী আত্মা আছে; কিন্তু প্রাচ্য ভাষা-সমূহ বলে যে, মানুষ আত্মা, এবং তাহার একটী দেহ আছে।"

এই নূতন ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ আমি লোকদের সহিত কথা কহিবার কালে প্রথমে নিজেকে এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, যেন আমি তাহাদের বাহ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে ভিতর-কার মনটীর সহিতই কথা কহিতেছি। ইহাতে যে বিপুল পরিমাণে অধিক প্রত্যুত্তর পাইলাম, তাহাই আমাকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল; অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে আমি সহসা দেখিলাম যে, আমার মনকেই মুখ্য জ্ঞান করিবার অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে; তখন আর আমি শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিনাশ কল্পনা করিতে পারিলাম না! যত নূতন নূতন চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই ক্রমশঃ আমার ধারণা হইয়া গেল যে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বাস্তবিকই মনঃপ্রসূত; এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে (যেমন, দেহত্যাগ) চিন্তারাজ্যে কোন আকস্মিক মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু স্বামিজীর ঐ বিষয়ক চিন্তা অনেক অধিক দূর অবগাহিনী ছিল। তিনি সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিতেন, যাহাতে ভ্রমেও কদাপি দেহাত্মবুদ্ধি না আসিতে পারে। তিনি 'আমি' শব্দটা কখনও এমন ভাবে প্রয়োগ করিতেন না, যাহাতে লোকে ঐরূপ অর্থই করিতে পারে; তৎপরিবর্ত্তে তিনি ঈষৎ অঙ্গভঙ্গীসহকারে "এইটা" বা "এই সব" বলিয়া শরীরটীকে লক্ষ্য করিতেন। অবশ্য উহা পাশ্চাত্যবাসী-দিগের কর্ণে একটু অদ্ভুত শুনাইত। কিন্তু তিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের জীবনকে জীবন বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহিতেন না, কেন না উহাতে নানা আপত্তি উঠিতে পারে। জয় পরাজয়, ভালবাসা, ঘৃণা, উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা—এ সকল প্রত্যেকেই

ব্রহ্মের এক একটী আংশিক প্রকাশ বলিয়া সকলে মিলিয়া কখনও সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে পারে না। যেমন স্বামিজী বলিতেন, আমাদের বর্ত্তমান জীবনের মত শত শত জীবন, যাহার যথাকালে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তদ্দ্বারা কখনও আমাদের অমৃতত্ব-পিপাসার নিবৃত্তি হইতে পারে না। তজ্জন্য মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ ব্যতীত অপর কিছুই চলিবে না, এবং এ কথা কখনই বলা যায় না যে, এই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবনেরই বহুশঃ পুনরাবৃত্তি বা তাহারই কিঞ্চিৎ বিকশিত অবস্থা মাত্র। এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইতে হইলে ঐ অমৃতত্ব ইহজীবনেই লাভ করা চাই, নতুবা অন্য কি উপায়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে যে, আমরা শরীরানুভূতির বাহিরে গিয়াছি। পাশ্চাত্য-বাদীরা বলিয়া থাকেন, 'আত্মা আসেন এবং যান'।—এইরূপে তাঁহারা দেহাত্মবুদ্ধি-প্রবণতারই পরিচয় দিয়া বসেন; যেন তাঁহারা এক উচ্চতর সত্তার আগম নির্গম লক্ষ্য করিতেছেন।* কেণ্টপ্রদেশবাসী যে Druid (প্রাচীনকালের পুরোহিতবিশেষ) সেণ্ট অগাষ্টিনকে অভি-নন্দন করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতাই এক শ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা বলেন, জগৎ যেন একটী উষ্ণ, আলোকিত বৃহৎ কক্ষ, এবং আত্মা যেন একটী পক্ষী, বাহিরের শীত ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য তথায় আশ্রয় লইয়াছে। তথাপি এই ধারণাতেও ইহার বিপরীত ধারণাটীতে যতগুলি, ঠিক ততগুলি বিষয়ই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যিনি বিচার দ্বারা দৃঢ়ভাবে এই ধারণায় উপনীত হন যে, আমরা আদৌ দেহসমষ্টি নহি কিন্তু তাহাদের সীমানার বাহিরে অবস্থিত চৈতন্যস্বরূপ, এবং তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি, যিনি এইরূপ ভাবেন, তাঁহার নিকট ইহাও তেমনি সত্য যে, আমরা বাস্তবিক শুধু এইমাত্র জানি যে, "দেহই আসে এবং যায়।"

* এইরূপে ক্রমাগত মানুষকে শরীর না বলিয়া আত্মা বলায়, যাঁহারা স্বামিজীর সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর মৃত্যুকে একটা অবশ্য-ম্ভাবী অন্তিম অবস্থা (যাহার পর আর কিছু নাই) বলিয়া মনে

করিতে পারেন না ; তাঁহারা দেখেন, উহা আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ শৃঙ্খলের একটা আংটা মাত্র। এইরূপে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিকেন্দ্র বদলাইয়া গেল। এই জীবন আলোকিত কক্ষ না হইয়া বরং আমাদের নিকট মোহ ও অজ্ঞানময় কারাগার, অথবা মাঝে মাঝে ক্ষণিক চেতনাবিশিষ্ট স্বপ্নসঞ্চরণ তুল্য হইয়া দাঁড়াইল। কি! বাক্যোচ্চারণ কি চিরকাল মানবীয় ভাষার গণ্ডীর মধ্যেই পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ থাকিবে? মাঝে মাঝে কি আমরা এই সকলের পারে অবস্থিত একটা কিছুর ক্ষণিক আভাস প্রাপ্ত হই না, এমন একটা জিনিস, যাহা বাক্যের সাহায্য ব্যতীত, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কার্য্য করায়, যাহা বাহ্য শিক্ষার সাহায্য না লইয়া জ্ঞানালোক প্রদান করে—যাহা অপরোক্ষ, গভীর, প্রাণে প্রাণে অনুভবস্বরূপ? জ্ঞান কি চিরকালই সসীম, এবং অস্পষ্ট, মামুলি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিসমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এবং চিরকাল আচরণরূপ কঠোর ও সঙ্কীর্ণ বর্ত্মেই আত্মপ্রকাশ করিবে? স্বামিজী একটী নিউইয়র্ক বক্তৃতায় যেন প্রাণের গভীর কাতরতা হইতেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বপ্নদ্রষ্টা যে মানুষ, সে কিনা সান্ত, পরিচ্ছিন্ন স্বপ্ন দেখিবে!"—ইহা অতি সত্য কথা!

এইপ্রকার ধারণাসমূহকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, নিজে সর্ব্বদা মৌনী হইয়া নগ্নবেশে গঙ্গার ধারে ধারে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করা, সমাধি অবস্থা লাভই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা এবং জীবনের সম্বন্ধনিচয়কে আত্মার স্বাধীনতার পক্ষে বন্ধন ও বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া নিজে জ্ঞান করা, এই সকল উপায়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভক্তগণের হস্তে, প্রকৃত সত্তা কি তাহা নিরূপণ করিবার যেন একটা মাপকাটী দিয়া গিয়াছিলেন। ফলে, শরীরের নাশ হইবামাত্র যে ঐ সত্তাতেও একটা গুরু পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, এ কথা তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের এই ধারণা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, জীবনের আনুষঙ্গিক সুখদুঃখাদি একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নের বাহ্য অবয়ব মাত্র, এবং

আমরা ইহা স্পষ্ট বোধ করিতাম যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমরা, যেমন চলিতেছিলাম, তাহার পরেও অনেকটা সেইরূপই চলিতে থাকিব; শুধু এইটুকু তফাৎ হইবে যে, তখন আমরা যে সূক্ষ্ম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইব, তাহার ফলে আমাদের গতির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি হইবে। আর এ কথাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতাম যে, তিনি যেমন বলিয়াছিলেন,— ইহজীবনের কর্ম্মপ্রসূত 'অনন্ত' স্বর্গ বা নরক একটা কথার কথা মাত্র, কেন না সান্ত কারণ কোন উপায়েই অনন্ত ফল প্রসব করিতে পারে না।

তথাপি স্বামিজী এবিষয়ে লোকের মানিয়া লইবার জন্য কোন বাঁধা ধরা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিতেন তাঁহাদিগকে তিনি, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা যতদূর পারেন, নিজের দর্শনের বলে এবং দৃষ্ট সত্যটাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে যে চেষ্টা করিতেন তাহারই শক্তি প্রভাবে, ততদূর লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি কোন অপরিবর্ত্তনীয় মতামতের ধার ধারিতেন না, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ পাকা কথা দেওয়ার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। যেমন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "আমি বলিতে পারি না"— ইহাই, যত দিন যাইতে লাগিল ততই 'মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয়' এই প্রশ্নের তাঁহার একমাত্র উত্তর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মতে, প্রত্যেককে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিজের বিশ্বাস গঠন করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার মুখের কোন কথা যেন তাহাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাধীনভাবে পরিণতি লাভের পথে বাধা প্রদান না করে।

তবে কয়েকটী জিনিস আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পর যে আমরা আমাদের পূর্ব্বগদিগের সহিত মিলিত হই এবং ইহজগতের নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া থাকি—লোকের এই সাধারণ বিশ্বাস তাঁহারও ছিল বলিয়া মনে হইত। অতি কোমলতাপূর্ণ অথচ খেয়ালী ভাষায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "যখন আমি বুড়ার সামনে দাঁড়াইব, তখন যেন আমাকে জবাবদিহি

করিতে না হয়!" আমি তাঁহাকে এই ধারণার বিরুদ্ধে কোনরূপ ওজর আপত্তি করিতে শুনি নাই। তিনি ইহাকে সাদা সিধা ভাবে, জীবনের নানা সত্য ঘটনার অন্যতমরূপে গ্রহণ করিতেন।

যিনি একবার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছেন, তিনি তথায় পৌঁছিবার পথে নিশ্চয়ই অনেক মানসিক অবস্থার পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবেন, যাহা অশরীরী অবস্থারই অনুরূপ। ঐকালে তিনি নিশ্চয়ই এমন অনেক অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিবেন, যাহা হইতে আমরা সচরাচর বঞ্চিত হইয়া থাকি। স্বামিজী বিশ্বাস করিতেন যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মৃতব্যক্তিগণের আত্মার সহিত দেখাশুনা ও কথা-বার্ত্তা হইয়াছে। একজন তাঁহাকে ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে স্বীয় ভয় জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা কাল্পনিক মাত্র। যে দিন তুমি সত্য সত্যই একটা ভূত দেখিবে, তখন আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না!" তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ গল্প করিয়া থাকেন যে, মান্দ্রাজে তাঁহার নিকট কতকগুলি আত্মঘাতীর প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাহাদের দলভুক্ত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, এবং তাঁহার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ বিচলিত করিয়াছিল। অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার মাতা কুশলে আছেন জ্ঞাত হইয়া, তিনি ঐ সকল প্রেতাত্মাকে মিথ্যাভাষণের জন্য তিরস্কার করেন। তাহারা উত্তর দিয়াছিল যে তাহারা এখন এত অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে রহিয়াছে যে, তাহারা সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহা তাহাদের খেয়ালেই আসিতেছে না। তাহারা তাঁহাকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনিও রাত্রিতে তাহাদের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। কিন্তু যখন তিনি শ্রাদ্ধকর্ম্মে যেখানে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে সেই অংশে আসিলেন তখন তিনি পিণ্ড দিবার মত কোন সামগ্রীই নিকটে নাই দেখিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন! তৎপরে তাঁহার একখানি প্রাচীন শাস্ত্রের বচন মনে পড়িল যে, অন্য পিণ্ডের অভাবে বালুকার পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে। তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া বালুকা গ্রহণ করিয়া

সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মৃতব্যক্তিগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সাগরজলে ঐ পিণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল প্রেতাত্মাও শান্তিলাভ করিয়াছিল। তাহারা আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই।

(ক্রমশঃ)

কঃ পন্থা?

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া স্তবকে স্তবকে একটীর পর আর একটী উঠিয়া দর্শকের ভয়বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে—পার্ব্বত্য নদী শিলা বক্ষে করিয়া নানা গম্ভীর মধুর রাগরাগিণীতে সমতলের উদ্দেশে ছুটিয়াছে—তন্মধ্যে প্রকৃতির ভীষণ-মধুর লীলারঙ্গের মধ্যে—, দেবদারু প্রভৃতি নানা পার্ব্বত্য বৃক্ষশোভিত শান্তিপ্রদ আশ্রম। কর্ম্মক্লান্ত মানব এক একবার সংসারের দাবদাহে জ্বলিয়া সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া এইরূপ শান্তিময় স্থানের দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য নদীতীরে বসিয়া উহার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া প্রাণকে অনন্তে মিশাইয়া দিতে কত আনন্দ! এ আনন্দে বিভোর হইলে সংসার স্বপ্নতুল্য হইয়া যায়—যেন কোন্ দূর অতীত রাজ্যে উহা পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। মন গভীর হইতে গভীরতর সমাধির রাজ্যে ডুবিতে থাকে। বাসনা থাকে না, কামনা থাকে না, মন অনন্তের নেশায় ভরপুর হইয়া যায়।

এই নেশা যদি চিরস্থায়ী হইত, যদি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে বলিতাম, ইহার চেয়ে উচ্চাবস্থা আর নাই। কিন্তু নামিতে হয়—দেহবুদ্ধি আবার আসে, সেই সমাধিরাজ্য

স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হয় এবং যে জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহাকেই আবার কঠোর-সত্য বলিয়া বোধ হয়। শরীর আছে—শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, শরীরের স্বাস্থ্য ব্যাধি আছে, সেই সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয়। ক্রমে অল্প হইতে প্রবল বাসনা আসিয়া চতুর্দ্দিকে জাল বিস্তার করে—জালে বদ্ধ বিহঙ্গম তখন সেই শান্তির আবাস ছাড়িয়া আবার অশান্তির রাজ্যে ছোটে, আবার নিজেকে কর্ম্মজালে জড়িত করে, শেষে আবার অশান্তিতে ছটফট করিতে করিতে আবার শান্তির রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লয়।

ইহাই সাধারণতঃ সংসারী মানবের নিয়তি—ইহার পরিণাম কোথায় ?

একটী প্রশ্ন মানবের স্বতঃই উদিত হয়,—শান্তিলাভ করিতে হইলে তবে কি কর্ম্মকোলাহলময় সংসার ত্যাগ করা ব্যতীত উপায় নাই ?

সাধারণতঃ আমরা লোক মুখে শুনিতে পাই যে, সংসারে ধর্ম্ম হয় না। একথা সাধুসন্ন্যাসীর মুখে শুধু শুনিয়াছি, তাহা নহে, অনেক ঘোর সংসারীর মুখেও একথা শুনিয়াছি। কিন্তু সংসারত্যাগের অর্থ কি ? বাহ্যকর্ম্ম ত্যাগ করা, স্ত্রীপুত্রাদির দায়িত্বভার, পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা ত্যাগ করা যদি সংসারত্যাগের অর্থ হয়, তবে বলিব, সংসারত্যাগী অপেক্ষা ঘোর অধার্ম্মিক কেহ নাই। সম্পূর্ণ হৃদয়-বিহীন পশুবৎ জড়পিণ্ডপ্রায় না হইলে কেহ এরূপে সংসারত্যাগ করিতে পারে না এবং ঐপ্রকার সংসারত্যাগের ফলে আত্মোন্নতির পরিবর্ত্তে ঘোর আত্মাবনতিই ঘটিয়া থাকে। তবে সংসারত্যাগ কাহাকে বলিব ?

আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য,—এ সংসারত্যাগের কথা আসে কোথা হইতে ? যাহা আছে, যাহা পাইয়াছি, তাহা ছাড়িতে যাইব কেন ? যে ত্যাগী, সে ত মহা নির্ব্বোধের মত কার্য্য করে। আমার এতটুকু আছে, আরও লইব, আমার অধিকার আরও বাড়াইব—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর আমার অধিকার বিস্তার করিব। তবে ত

তৃপ্তি তবে ত শান্তি! তবে লোকে ত্যাগের কথা কহে কেন? কি ত্যাগ করিতে হইবে? ত্যাগ করিবার কি বিষয় আমার আছে?"

জীবনের গতিটাকে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যদি অধিকারের অর্থ বহির্দ্দিকে আমার অধিকারের সীমা বিস্তার করিয়া যাওয়া হয়, তবে ভাবিয়া দেখ, উহার চরম পরিণতি কোথায়? বড় বড় দিগ্বিজয়ী যথা নেপোলিয়ন, আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতির জীবনে আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। এরূপে অনন্তরাজ্য অধিকার করা যায় না। এ একটা বৃথা মত্ত চেষ্টা মাত্র! আসল চেষ্টা —ভিতরের দিকের রাজ্য অধিকার। যখন মানুষ এই চেষ্টায় প্রাণ-পণে প্রবৃত্ত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার বাহিরের চেষ্টা কমিয়া যায় দেখা যায়, তাহাতে লোকে ভ্রমক্রমে মনে করে, এ ত সমুদয় ত্যাগ করিবার পথে চলিয়াছে। কিন্তু সে যে প্রকৃতপক্ষে মহাকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছে? এইটী না বুঝার দরুণই নানারূপ গোলযোগ হয়।

অতএব বুঝা যাইতেছে, কর্ম্ম জিনিষটাকে আমাদিগের ত্যাগের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম করিতেই হইবে—তবে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, তাহার উপায় জানা আবশ্যক। এই বিষয়টী বুঝিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত ভগবদ্গীতা আমাদিগকে যতটা সাহায্য করে, আর কিছুই তত নহে। ঐ মহাগ্রন্থে উপদিষ্ট ভগবদুক্তিগুলি খুব মনোযোগসহকারে বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই কয়েকটী কথা পাইতে পারি।

১। কর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করা সাধারণতঃ উচিত নহে।

২। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা যে কোনরূপ কর্ম্ম, অর্থাৎ সকাম কর্ম্মও শ্রেয়ঃ।

৩। সকাম কর্ম্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

৪। সকাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম হিসাবে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু পার্থক্য ভাব লইয়া। 'নিষ্কাম' অর্থে ধন ঐশ্বর্য্য মান

যশ প্রভৃতি বাহ্য কামনা হইতে মনকে ঘুরাইয়া আনিয়া মুক্তি কামনা বা ঈশ্বর কামনা করা। মুক্তিকামনা, ভক্তিকামনা, বা ঈশ্বরকামনা 'কামনা' নামে গণ্য নহে। এখানে বুঝা উচিত, অনেকে নিষ্কাম অর্থে সর্ব্বকামনাবিরহিত অবস্থা মনে করেন কিন্তু এক সিদ্ধাবস্থা বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অবতার পুরুষগণের কার্য্য ব্যতীত সম্পূর্ণ কামনারহিত অবস্থায় কর্ম্ম করা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

৫। নিষ্কাম কর্ম্ম বা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন চিত্ত ধ্যানধারণাযোগাদির উপযুক্ত হয়। যখন জীবের নিষ্কামকর্ম্ম করার কতকটা অভ্যাস হইয়াছে, তখন সময়ে সময়ে ধ্যানধারণাদির অভ্যাসের জন্য বাহ্যকর্ম্মত্যাগের স্বভাবতঃই প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাকে কর্ম্মত্যাগই বলা যাইতে পারে না।

শেষোক্ত বিষয়টী একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই জানেন, ধ্যানধারণার চেষ্টারূপ কর্ম্ম অন্য কর্ম্ম হইতে কত কঠিন। হাত পায়ের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করা যায়, সে সকল ত উহার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু একবার চুপ করিয়া বসিয়া মনকে একস্থানে স্থির করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে, মনের ছুটাছুটি কিরূপ অধিক এবং উহাকে একস্থানে বসাইতে কত বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে। মনের স্থৈর্য্যের অর্থ কি? মনের নিদ্রা বা অকর্ম্মণ্যতার অবস্থা হইতে উহার পার্থক্য কোন্‌খানে? সাধারণতঃ মানবমনকে দুই অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়—একটী ক্রিয়াশীলতা, অপরটী জড়াবস্থা। ধ্যানাবস্থা কি প্রকার? যাহার ধ্যানাবস্থা কখনও হয় নাই, তাহাকে উহা বুঝাইতে গেলে উপায় কি? কোন অজ্ঞাত বিষয়কে বুঝাইতে গেলে জ্ঞাত বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাহা বুঝান সম্ভব নহে। এক্ষণে মনের ক্রিয়াশীলাবস্থা ও জড়াবস্থা এই দুইটী আমাদের জ্ঞাত। এই দুইটীর যে কোনটীর সহিত সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া ধ্যানাবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝান যাইতে পারে। সাধারণতঃ উহাকে জড়াবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বুঝান হইয়া

থাকে। কারণ, নিদ্রা বা মূর্চ্ছাবস্থার সহিত ধ্যানাবস্থার বাহ্যসাদৃশ্য কতকটা দেখা যায়। কিন্তু শুধু উক্ত সাদৃশ্য দেখিয়া উহাকে বুঝিতে হইলে উহার স্বরূপ কিছুই বুঝান হয় না। উহার একটা পারিপার্শ্বিক অবস্থামাত্র জ্ঞাপন করা হয়। সেই জন্য উহাকে বুঝাইবার আর একটী প্রণালী আছে। সেই প্রণালী এই যে, উহাকে ক্রিয়াশীলতার ভিতর দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা। সাধারণতঃ, বাহ্যবিষয়োপলব্ধির সময় উহা যেরূপ ক্রিয়াশীল হয়, কল্পনা কর, উক্ত ধ্যানাবস্থা অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল অবস্থা। মোট কথা, জড়াবস্থা হইতে ক্রিয়াশীল অবস্থা শ্রেষ্ঠ এবং ক্রিয়াশীলতা হইতে ধ্যানাবস্থা উচ্চতর। কল্পনা কর, চুপ করিয়া বসিয়া আছ, মনের অস্থিরতা নাই, অথচ উহা জড়াবস্থাপন্ন নহে, শান্ত ও প্রসন্ন। বাহ্য বিষয় অনুভব যতদূর সম্ভব কমিয়াছে, অথচ ভিতরের জ্ঞানজ্যোতিঃ যেন বিষয়জ্ঞানাবস্থার অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে—ইহাকেই ধ্যানাবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস বলা যাইতে পারে। এই অবস্থা কঠোর সাধনের বস্তু—বহুদিনের অভ্যাসসাপেক্ষ।

এখন দোষ হয় এই যে, লোকে উক্ত ধ্যানাভ্যাসের কিছুমাত্র অধিকারী না হইয়াই প্রথমেই সহজবোধে কর্ম্মত্যাগের দিকে ছুটিয়া থাকে। মনে করে বাহ্যকর্ম্মত্যাগেই বুঝি আপনা আপনি শান্তি আসিবে, আপনা আপনি চিত্তপ্রসাদ আসিবে। সেই জন্য প্রশস্ত পন্থা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই 'কর্ম্মযোগ'।

এখন 'কর্ম্মযোগ' কথাটীও ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। নহিলে কর্ম্মাবস্থার সহিত উপরোক্ত ধ্যানাবস্থার সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। প্রথমতঃ, শব্দটীর দিকে লক্ষ্য কর—উপদেশ 'কর্ম্মযোগের' শুধু 'কর্ম্মের' নহে। কর্ম্ম সকলেই অল্প বিস্তর করিয়া থাকে—নানাবিধ ভাল, মন্দ ও ভালমন্দমিশ্রিত কর্ম্ম আমরা সদা সর্ব্বদা করিতেছি। কিন্তু আমরা কি সকলেই কর্ম্মযোগী? কর্ম্মযোগী হইতে হইলে কর্ম্ম ব্যতীত আরও কিছু চাই, আর সেটী বাহ্য নহে, মানসিক ব্যাপার। কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে ভাবনার আবশ্যক। কি ভাবনা?

সদা সর্ব্বদা কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা ভাবিতে হইবে। মনে কর, আমি অর্থোপার্জ্জনরূপ কর্ম্ম করিতেছি। এক্ষণে মনকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, অর্থোপার্জ্জন কেন? মন যদি উত্তর দেয়—ইন্দ্রিয়-সুখ; প্রচুর পরিমাণে ভোগের জন্য, তখন মনকে শাস্ত্র ও গুরূপদেশ-সহায়ে বুঝাইতে হইবে—মন, এ অর্থোপার্জ্জন তোমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য নহে। নিজের ও পরিবারবর্গের দেহধারণ-মাত্রোপযোগী অর্থেই তোমার অধিকার, বক্রী উদ্বৃত্ত যাহা কিছু সবই তোমার দরিদ্র ভ্রাতার জন্য। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, মনের এরূপ নিষ্কাম অবস্থা একেবারে কিরূপে হইবে? একেবারে হইবে একথা তোমায় কে বলিল?

শাস্ত্রে বলে, সকল মানবই স্বাভাবিক কতকগুলি কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঐসকল কর্ম্ম কেবলই ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন অথচ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র সকাম ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। যে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য উন্মত্ত, সে যথেচ্ছাচারী, সে শাস্ত্র মানে না, ঈশ্বর মানে না, আত্মা মানে না, দেবতা মানে না, পরলোক মানে না। মৃত্যুর পর যে আর কোন সত্তা থাকে, এ বিশ্বাস এ ধারণা তাহার নাই। সুতরাং সেইরূপ ব্যক্তি যদি কোনরূপ ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠান করে, সে লোকাচার বা সামাজিক অনুষ্ঠান ভাবিয়াই করে, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রাণ সেই সকল শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নাই। কিন্তু যাহার পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে যথার্থভাবে বিশ্বাস করিতে পারে, এই এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বা এই এই দেবতার উপাসনা করিয়া আমি পরলোকে এই এই সুখ পাইব। এখন বাস্তবিক এই সকল দেবতার অস্তিত্ব আছে কি না, বা সেই সেই কর্ম্মের দ্বারা ঠিক ঠিক সেই সেই ঐহিক বা পারলৌকিক কাম্য ফল লাভ হয় কি না, এ বিচার ছাড়িয়া যদি আমরা উক্ত কর্ম্মগুলির জীবনের উপর, চরিত্রের উপর প্রভাব কি, তাহা বিচার করি, তবে দেখিব, ঐরূপ কর্ম্ম সকাম নামে

অভিহিত হইলেও, উহা প্রবৃত্তিমার্গ নামে পরিচিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা নিষ্কামকর্ম্মে আরোহণের প্রথম সোপান। যজ্ঞের শাস্ত্রীয় লক্ষণ—দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ। গীতা বলিতেছেন, এই যজ্ঞের শেষ অমৃত ভোগ করিতে হইবে। এইখানেই ত নিষ্কাম আসিয়া পড়িল। নিষ্কাম কর্ম্মের একটী সোপান পাইলেন? এখন তথা-কথিত এই সকাম কর্ম্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম্মে আরোহণেরও বহু সোপান আছে। আমি নিষ্কাম কর্ম্ম করিব সংকল্প করিলাম—মন ছুটিতেছে কামনার দিকে—কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে?—ক্রমে। অভ্যাসের ফলে, মানসিক চেষ্টার ফলে, সাধনার ফলে। ক্রমে অভ্যাস পরিপক্ব হইলে এমন অবস্থা আসিবে, যখন কর্ম্ম করিবার কারণ আর বাহ্য কাম্যবস্তুর আকর্ষণ থাকিবে না, ভগবদাকর্ষণ, মুমুক্ষুতাই তখন কর্ম্মের জনক হইবে। কেহ কেহ বলেন, যদি কোন বাহ্য কামনাই না থাকে, তবে ত কর্ম্মের জন্য তাদৃশ আগ্রহ থাকিবে না! কেন আগ্রহ থাকিবে না? যদি বিশ্বাস থাকে, এই কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিব, এই কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি পাইব, তবে কেন আগ্রহ থাকিবে না? বরং আগ্রহ শতসহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে। বাস্তবিক বিভিন্ন কর্ম্মে বড় প্রভেদ নাই ভাবানুযায়ীই কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার। কথায় বলে, 'যেমন ভাব, তেমন লাভ'।

এখানে একটী সন্দেহ আসিতে পারে—যদি আজীবন কর্ম্মযোগেরই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য হয়, তবে কি সন্ন্যাস আশ্রমের কোন সার্থকতা নাই? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা ধ্যানাবস্থা বা সন্ন্যাস অবস্থা যে কর্ম্মযোগের পরিণতি ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং সে অবস্থা লাভ যে অতীব কঠিন ও তাহা যে একটা খুব উচ্চাবস্থা, তাহাও বুঝান হইয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাস অবস্থায় সম্পূর্ণ না পঁহুছিয়াও কি ঐ অবস্থাই বিশেষভাবে সাধনের জন্য সাধারণ, গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত কোন আশ্রম নাই? অথবা যদি স্বীকার করা যায়, ঐ আশ্রম আছে, তাহা হইলেও কি ঐ আশ্রম কেবল সংসারে বহুকাল অবস্থিতির পর

বার্দ্ধক্যাবস্থায়েই অবলম্বন করা যাইতে পারে, অথবা অল্প বয়সেও ইহার অবলম্বন সম্ভব।

উপনিষদ্ আলোচনা করিলে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহার মধ্যে বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবনেরই প্রায় অধিকাংশ উল্লেখ—যাজ্ঞবল্ক্য দুই পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—বোধ হয় অধিক বয়সে সন্ন্যাসাশ্রমের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া উহা অবলম্বন করেন। গার্গীনাম্নী বিদুষী মহিলাকেও অবিবাহিতা বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু আর কোথাও বড় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের দৃষ্টান্ত দেখি না। দৃষ্টান্ত অধিক না থাকিলেও সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের উপদেশও কোন কোন প্রাচীন উপনিষদে দেখা যায় বটে। বুদ্ধদেব অল্পবয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে অল্পবয়সেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করাইয়া ছিলেন এবং তদনুকরণে শঙ্করাচার্য্যও অন্যান্য আশ্রম অবলম্বন না করিয়াও সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্যও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অল্পবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে গিয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাবালোপনিষদের 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' ইত্যাদি বাক্য ব্যতীত প্রাচীন উপনিষদের বিশেষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসাশ্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মপ্রচার, পরোপকার প্রভৃতি কর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়।

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদী এবং তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে উপনিষদ্-গীতাদির দোহাই দিয়া উহাকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিবারও চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অবশ্য অনুপযুক্তাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের ফলে যে সর্ব্বদেশেই বহু অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বকথিত যুক্তিগুলির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের একথাও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে

যে। মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি সন্ন্যাসাবস্থায়—কারণ, কর্ম্মযোগ হইতে অগ্রসর হইয়া যতই মানুষ ধ্যানযোগে আরোহণ করে, ততই তাহার বাহ্য কর্ম্ম কমিয়া আসে। ভগবান্ গীতায় এ তত্ত্বটী একস্থানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।'

যাঁহারা গীতার শাঙ্করভাষ্য উত্তমরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে, আপাততঃ কেবল কর্ম্মবাদ-সমর্থক গীতার ভিতর কিরূপে সন্ন্যাসের ভাবও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' 'অনিকেতঃ' প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ব্যাখ্যায় শঙ্কর উক্ত ভাবটী বিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং ঐ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনাদুষ্ট প্রতীয়মান না হইয়া সহজ ব্যাখ্যা বলিয়াই বোধ হয়।

যাহাহউক, জীবনপরিচালন কিভাবে করা উচিত এই প্রশ্নের বিচার করিয়া আমরা ক্রমশঃ যে সিদ্ধান্তে পঁহুছিতেছি, তাহাতে আমাদের প্রাচীনকালে প্রচলিত আশ্রম-ধর্ম্মকেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সকলের পক্ষে অনিবার্য্যরূপে অবলম্বনীয়। ঐ অবস্থায় ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংসারযাত্রোপযোগী লৌকিক বিদ্যা শিখান অবশ্যকর্ত্তব্য। তৎপরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে প্রবৃত্তি ও শিক্ষার পরিপক্কতা হিসাবে কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন, কেহ বা ধ্যানাভ্যাসই জীবনের উচ্চ লক্ষ্য জানিয়া বানপ্রস্থ সন্ন্যাসাশ্রমাদিতে প্রবিষ্ট হইবেন। কিন্তু যাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে যে, চরমে আমাদিগের পক্ষেও এই উভয় আশ্রম অবলম্বনীয়। অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া এই আশ্রমচতুষ্টয়েরও পরিবর্ত্তন সাধন এবং ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কিন্তু আশ্রমচতুষ্টয়ের যে মূলভাব, সেটীর সর্ব্বথা অনুসরণ করিতেই হইবে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সাধন করিতে হইলে সমাজযন্ত্রের আমূল

পরিবর্ত্তন যত দিন না হইতেছে, ততদিন কিছুই হইবে না; এবং উক্ত ব্যাপার সাধন করিতে মহাশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য পুরুষগণের বহুদিনব্যাপী প্রচারকার্য্য আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে কে কোন্ পথে জীবনের উন্নতি-সাধনপথে অগ্রসর হইবে, তন্নির্ণয়ের উপায় কি?

উপায়।—স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বিচারের দ্বারা পথনির্ণয়ের চেষ্টা, অন্তর হইতে অন্তর্যামীর নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই অন্তরের ভিতর প্রেরণার দ্বারা বুঝাইয়া দেন, কোন্ পথ অবলম্বনীয়। শেষ উপায়—যদি তোমার কাহারও উপর এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, তাঁহার বাক্য তোমার রুচিবিরুদ্ধ হইলেও তুমি অবিচারিত-ভাবে মানিয়া লইতে পার, এরূপ ব্যক্তির উপর তোমার পথনির্ণয়ের ভারপ্রদান।

কারণ, সাধারণ ভাবে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, কাহারও কাহারও প্রথম অবস্থা হইতেই সাংসারিক সংস্রব হইতে পৃথক্ থাকিয়া মনকে সংযমের চেষ্টা করিতে হইবে আবার কাহাকেও বা সংসারের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের জন্য কোন এক পথ হইতে পারে না, কিন্তু যে পথ দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাক, শেষে জীবনের যে পূর্ণ পরিণতি হয়, তাহাকে ধ্যানাবস্থা, কর্ম্মত্যাগাবস্থা বা সন্ন্যাসাবস্থা বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেরই পথ কর্ম্মের ভিতর দিয়া। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ সাংসারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি হইতে পৃথক্ না হইয়াও যে সন্ন্যাসাবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, ইহা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য নহে।

কিন্তু একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যাঁহারা সংসারের রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে ব্রহ্মলীলা আস্বাদন করা যায় বলেন এবং সংসারকে মায়া বলিতে ভয় পান; তাঁহাদের উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা উচিত—আদর্শকে নিজ মনের খেয়ালানুযায়ী গঠন করিবার প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে—মনকে আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মোট কথা, আদর্শটীকে পরিষ্কারভাবে ধারণা করিতে হইবে এবং উহাকে যে পথ দিয়াই হউক না কেন, ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তোমার উক্ত আদর্শলাভের প্রতিকূল বোধ হয়, উহাকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে পার, অথবা প্রাণপণ চেষ্টায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে আদর্শলাভের উপযোগী করিয়া লইতে পার। কিন্তু আদর্শকে নিজ দুর্ব্বল মনের অনুযায়ী গঠন করিয়া উহাকে খাটো করিও না অথবা কোন অবস্থায় বলিও না যে, অবস্থা বাধা করিয়া আমাকে আদর্শ লাভ করিতে দিতেছে না। আত্মা স্বাধীন—উহা কোন অবস্থার অধীন নহে। তুমি বিশ্বাস কর যে, অবস্থার দাস নহ, অবস্থা তোমার দাস। তুমি মনে করিলেই নিজ উপযোগী অবস্থাচক্র গঠন করিয়া লইতে পার অথবা সর্ব্বাবস্থার অতীতও হইতে পার। তুমি সিংহশাবক—আপনাকে মেষশাবক ভ্রমে নিজ মহিমা ম্লান করিয়া বসিয়া আছ। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

অহল্যা পাষাণী।

(শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী)

ধরণী উঠিল কাঁপি লাজে শিহরিয়া,
দ্বিপ্রহরে অন্ধকার,
চারিদিকে হাহাকার,
অসময়ে সূর্য্য গেল বিশ্বজ্যোতি নিয়া।
দিবসে তামসী নিশি,
ছাইয়া ফেলিল দিশি,

প্রতিধ্বনি কলরোলে ক্রন্দনবাহিনী,
দিগ্ দিগন্তরে ছুটি,
অবনীতে পড়ে লুটি,
উচ্চরবে কাঁদি কহে অপূর্ব্ব কাহিনী।
নীরব নিস্তব্ধ ভব,
বাক্যহীন জীব সব,
শব্দ শোভা বর্ণ গন্ধ কিছু নাহি আর,
জমাট আঁধার যেন,
বসুধার অঙ্গ হেন,
পাষাণ-কারার মত রুদ্ধ চারিধার।
সতীত্ব-গৌরব নাশ,
স্বর্গ মর্ত্তে মহাত্রাস,
"অহল্যা পাষাণী" হয়ে পড়িল ভূতলে।
পৃথিবী সকল সয়,
শিলা দেহ বক্ষে লয়,
চেতনা বিলুপ্ত কায়ে হৃদয় উথলে।
প্রস্তর তনুর মাঝে,
অনুভব সদা রাজে,
স্নেহ মায়া ভালবাসা অনুতাপানলে
পুড়িয়া হইল ছাই,
প্রকাশের শক্তি নাই,
চৈতন্য রহিল জাগি সুপ্ত-দেহতলে।
কি বেদনা হৃদে জাগে,
সান্ত্বনা কভু না মাগে,
নির্ব্বাণ মুকতি সুধু চাহে চিরতরে।
পাষাণ পাষাণই-রয়,
জন্ম পুনঃ নাহি হয়,

কলঙ্ক-কালিমা মুছি যাক পুণ্য পরে,
ভস্ম হয়ে যাক্ হিয়া,
স্মৃতি নাহি জাগাইয়া
তোলে পূর্ব্ব শোক আর অভাগীর প্রাণে,
নররূপী নারায়ণ,
করিবেন বিমোচন
অহল্যার সর্ব্বতাপ পদছায়া দানে ।
যুগে যুগে ভগবান্,
পাতকী উরায়ে যান,
শরীরী মূরতি ধরি ধরাতলে নামি,
রামচন্দ্র অবতার,
শাপমুক্তি অহল্যার,
চরণ পরশ দেন বৈকুণ্ঠের স্বামী ।

ব্রজ-ভ্রমণ ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

অতি প্রত্যুষে যখন প্রকৃতি ভাল করিয়া চোখ মেলে নাই—কাক কোকিল যখনও নিজেদের নীড় ত্যাগ করে নাই—সেই সময়ে সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত মধুর শ্যামনাম যে কি এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া সেই বিপুল জনস্রোতকে টানিয়া লইয়া চলিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সহস্র সহস্র নরনারী উচ্চকণ্ঠে যশোদা-দুলালকে আবাহন করিতে করিতে আনন্দে পথ অতিবাহন করিতে

লাগিল। সাধুবৈষ্ণবগণ দলের অগ্রে অগ্রে মধুর কীর্ত্তনে সমগ্র বন ও রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। রাস্তার দুইধার হইতে দুই একটা হরিণ এদিক ওদিক করিয়া পলাইতে লাগিল। আমরা ৬॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মথুরা সহরের পশ্চিমে ভূতেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইস্থান হইতেই চৌরাশী ক্রোশ যাত্রা আরম্ভ হইল। এখানে প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর ৺পাতাল দেবী ও ভোলানাথের আশীর্ব্বাদ লইয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল।

আমরা এইবার পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া ॥ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া মধুবনে আসিলাম। পথে মধুবনের ১ মাইল পূর্ব্বদিকে ধ্রুবের তপস্যাস্থল "ধ্রুবটীলা" দেখিয়া আসিলাম। দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাঁচ বছরের শিশু হরিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া এইস্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া এইস্থান হইতেই বিজয়ী বালক মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। স্থানটি প্রকৃতই তপস্যা করিবার উপযুক্ত। চারিদিকে উচ্চতরু-রাজিবেষ্টিত সুউচ্চ মাটির টীলার উপর শ্রীহরির মন্দির, নিম্নে সুবৃহৎ পুষ্করিণী আর তাহার চারিদিকে অনন্ত বিস্তৃত মাঠ—দেখিলেই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

মধুবন মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে এইখানে আসেন এবং দৈত্যরক্ষিত মধুবনের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বলদেব মধুপান করিতে থাকিলে দৈত্য তাহা জানিতে পারিয়া বলদেবকে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়া অগ্রজকে রক্ষা করেন। এখানে একটি বাঁধান সরোবর আছে, উহাকে মধুকুণ্ড বলে—যাত্রীরা এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ আসন অথবা তাঁবু খাটাইয়া সেই রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করেন। মধুবনে আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দলের প্রধান পাণ্ডার আজ্ঞানুসারে যাত্রিগণ সেই স্থানে আহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহারান্তে সময় থাকিলে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য লীলাস্থল-

গুলিও দর্শন করিয়া যাত্রিগণকে সে রাত্রে সেই স্থানেই বাস করিতে হইবে।

বনে যে সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাত্রিবাস করিতে হয় তাহার অধিকাংশ স্থানেই বাসোপযুক্ত গৃহাদি পাওয়া যায় না। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপযুক্ত তাঁবু ও উহার সরঞ্জামাদি লইতে হয়। যাহারা বনযাত্রায় পদব্রজে যাইতে পারে না তাহারা পাল্কি অথবা ডুলি ভাড়া করিয়া গমন করে। বনে দই দুধ, লুচি সন্দেশ; চাল ডাল, আটা তরকারি—সাধারণতঃ সমস্ত খাবার জিনিষই পাওয়া যায়। যাত্রীদের সহিত বৃন্দাবন ও মথুরা হইতে দোকানদারেরা গরুর গাড়ি করিয়া নিজ নিজ দোকান পাট লইয়া যায়, সুতরাং সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই কিনিতে পাওয়া যায়। ভূতেশ্বর হইতে আসিবার সময় আমাদের সহিত আরও তিন জন সাধু মিলিত হইয়াছিল। আমরা ৫ জনে মধুকুণ্ডে স্নান ও শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক দর্শন করিয়া উপযুক্ত আশ্রয়স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। সে দিন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও গৃহ অথবা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার স্থান পাইলাম না; অগত্যা একটি ঘনপত্রসন্নিবিষ্ট গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম ও নিজ নিজ কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমে যাত্রীদের রান্না হইল এবং আমরা পাঁচজনে যথেষ্ট মাধুকরি সংগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের নীচে পরমানন্দে ভোজন করিলাম। আহারান্তে মধুবনগ্রাম ও অন্যান্য স্থানগুলি দর্শন করিতে বাহির হইলাম। এক শত অথবা কিছু বেশী ঘর লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রাম, গৃহগুলি প্রায়ই দ্বিতল, সমস্তই মাটির ছাদ। এদিকে বর্ষা বেশী হয় না—পরন্তু গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের এত বেশী তাপ হয় যে আমাদের দেশের মত ছাদ তৈয়ার করিলে ফাটিয়া যায়। সেই জন্যই এদিকে এইরূপ মাটির ছাদ তৈয়ার করিবার রীতি। বর্ষাকালে বৃষ্টিও এত বেশী হয় না যে মাটি ধুইয়া যাইবে। গ্রামের মোড়লের গৃহও এই রকম মাটির ছাদে আবৃত—কেবল গৃহের দেয়ালগুলি ইঁটের ও পাকা গাঁথুনি। ইহাদের প্রধান আহার "জনার" অথবা

"মাতুয়ার" আটার রুটি—গমের আটার রুটি ও ভাত প্রায়ই খায় না। ডালের মধ্যে ছোলা ও কলাই। রবিশস্য যথেষ্টই হয়, কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া তাহারা লবণ, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতির সংস্থান করে। রমণীরা ঘাঘরা ব্যবহার করে কাপড় প্রায়ই পরে না। বালকবালিকারা ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত দিগম্বরই থাকে। তাহার পর পিতা অথবা মাতার পরিত্যক্ত কাপড় কিংবা ঘাঘরা ব্যবহার করিতে পায়। প্রত্যেক গ্রামবাসীরই যথেষ্ট গো মহিষ আছে। বনযাত্রার সময় যাত্রীদের নিকট দুধ ঘি বেচিয়া বেশ দু' পয়সা রোজগারও করিয়া থাকে, কিন্তু সব সময়ে নয়। নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী অতিথিসৎকারে ইহাদের আগ্রহ বড় কম নয়। বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ ইহাদের দানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিতে সমর্থ হয়। এই সরলচিত্ত অধিবাসীদের সহিত কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া তালবন দর্শন করিতে প্রস্থান করিলাম।

তালবন—পূর্ব্বে এইস্থান তালবৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং ইহার সুপক্ক ফলগুলি গর্দ্দভাকার 'ধেনুক' অসুরের ভয়ে পক্ষী পর্য্যন্ত কোনও তালবৃক্ষে বসিতে সাহস করিত না। গোচারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ বলরাম সখাগণসহ একদিন এই তালবনের নিকটে আসিয়া সুপক্ক তালের সৌরভে আকৃষ্ট হইলেন, এবং গোপালগণকে দুই চারিটি তাল আনিতে অনুরোধ করিলে তাহারা অতি পুলকিতচিত্তে তালবনের দিকে ধাবিত হইল এবং বনের মধ্যে বিকটাকার অসুরকে দেখিতে পাইয়া সভয়ে পলাইয়া আসিয়া কৃষ্ণবলরামকে নিবেদন করিল। তখন মহাবলী বলরাম বালকগণসহ সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ কম্পিত করিতে লাগিলেন। ফলগুলি সশব্দে নীচে পড়িতে লাগিল। সেই শব্দে চমকিত অসুর যখন দেখিল যে কতকগুলি বালক তাহার সযত্নরক্ষিত বৃক্ষ হইতে তাল পাড়িতেছে, তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলরামকে আক্রমণ করিল। মহাবলী বলরাম সেই গর্দ্দভাকৃতি অসুরের পিছনের পা দুটি ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন, এবং সবলে

তাহাকে সেই তালবৃক্ষেই নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই অসুর পঞ্চত্ব পাইল। অসুরের দেহাঘাতে তালবৃক্ষটী ভাঙ্গিয়া অপর গাছের উপর পড়িল, এইরূপে সমস্ত গাছগুলিই পড়িয়া গেল। বালকেরা কৃষ্ণ-বলরামসহ আনন্দে তাল ভক্ষণ করিতে লাগিল। পাণ্ডারা বলে যে, সেই অবধি একটিও বৃক্ষ জন্মে নাই। এইস্থানে শ্রীশ্রীবলদেবজীর মন্দির আছে এবং মন্দিরের নিকটে তালবনকুণ্ড নামে একটি সরোবরও আছে। এই সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া তবে শ্রীশ্রীবলদেবজীকে দর্শন করিতে হয়।

তালবন দর্শন করিয়া আমরা কুমুদবনে আসিলাম। এখানেও কুমুদকুণ্ড নামে একটি মনোহর সরোবর আছে—জল অতি গভীর ও নির্ম্মল। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বিহার ও জলক্রীড়া করিতেন। মহামুনি কপিলদেবের প্রতিমূর্ত্তিও একটি মন্দিরে দেখিতে পাইলাম কথিত আছে যে, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া কপিলদেবকে দর্শন করিলে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কুমুদবন দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা মধুবনে রাত্রি যাপনের জন্য ফিরিয়া আসিলাম।

মধুবনে আসিয়া দেখিলাম যে যাত্রীদের বাস করিবার স্থানটির চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল মশালের আলোকে আলোকিত করা হইয়াছে, এবং পাণ্ডারা বড় বড় বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া উহার চারিধারে পাহারা দিতেছে। প্রাচীনকালে এখানে চোর দস্যুগণের খুবই উপদ্রব ছিল, এবং যাত্রী ও পাণ্ডারা রাজকীয় সাহায্য ব্যতীত বনভ্রমণে যাইতে সাহস করিত না। সেই জন্য জয়পুররাজ এই বনভ্রমণের সময় রাজসরকার হইতে সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পাঠাইতেন। বর্ত্তমান ইংরাজশাসনে চোর দস্যুর অত্যাচার প্রশমিত হওয়ায় জয়পুররাজ তাঁহার পুলিস প্রহরী উঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রায় ১৯ মাইল স্থান ভ্রমণ করিয়া যখন সন্ধ্যায় মধুকুণ্ডে সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলাম তখন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে—কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহ ও মন আর কিছুতেই ভিক্ষা করিতে চাহিল না। কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া নিদ্রাদেবীর শরণ লইলাম। সহসা

কাহারও হস্তস্পর্শে চমকিত হইয়া উঠিয়া দেখিলাম যে একটি বৈষ্ণব বাবাজি আমাদের সকলকে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং অতি বিনীতভাবে এইরূপ অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে, আজ দ্বিপ্রহরে যখন আমরা স্নানান্তে শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের গদী দর্শন করিতে যাই তখন তিনি আমাদের দেখিয়াছিলেন, তাহার পর আমরা মাধুকরি করিয়া বৃক্ষতলে ভোজন করিয়াছি তাহাও তিনি জানেন—কিন্তু সন্ধ্যার সময় আমাদের ভিক্ষা করিতে না দেখিয়া আমাদের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া পড়েন—তাহার পর লোক পাঠাইয়া আমাদের সন্ধানও করেন। তাঁহার লোকটি আমাদিগকে এই স্থানে নিদ্রিত দেখিয়া যায় ও তাঁহাকে সংবাদ দেয়। আমাদের কিছুই আহার হয় নাই অনুমান করিয়া তিনি নিজ হস্তে কয়েকটি রুটী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন ও সেই জন্যই ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছেন বলিয়া তিনি অতি দুঃখিত—ইত্যাদি। দেখিলাম তাঁহার হস্তে একটি পাত্র রহিয়াছে। আহারের আশা ত্যাগ করিয়াই আমরা শয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অযাচিতভাবে রুটিগুলি পাইয়া আমরা যাঁহার নাম করিয়া পথে বাহির হইয়াছি তাঁহাকে মনে পড়িয়া গেল—তখনি ভক্তিনম্র শির তাঁহারই শ্রীপদে বার বার লুণ্ঠিত হইল। আমাদের দৃঢ় ধারণা হইল যে, বনে আমরা কখন কোনও প্রকার কষ্ট পাইব না। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা যথেষ্টই ছিল। সেই রুটিগুলি একটু চাটনীযোগে অনতিকাল মধ্যেই নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈষ্ণব বাবাজী নিঃশব্দে একধারে দাঁড়াইয়া আমাদের আহার দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার নয়নে কি এক গভীর করুণা ও তৃপ্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আজও মনে পড়ে। ভোজন শেষে তিনি আমাদের তাঁহার আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। টিপি টিপি বৃষ্টি সমস্ত দিনই পড়িতেছিল। গভীর রাত্রে আরও বেশী বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহাও আকাশ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। তাই বাবাজীর আমন্ত্রণে অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার

অর্দ্ধেক ছাদশূন্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম যে আমাদের মত অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তিনি আমাদের অনুযোগ সত্বেও তাঁহার ভগ্ন তক্তাপোষ ছাড়িয়া দিলেন এবং শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া কোথায় যে প্রস্থান করিলেন তাহার আর খোঁজই পাইলাম না। অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম যে দীনতার প্রতিমূর্ত্তি—সেই বাবাজী ভগ্ন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া জোড়করে তাঁহার কুটীরে আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রিগণকে বিদায়সম্ভাষণ করিতেছেন। উষার স্নিগ্ধ আলোকে তাঁহার সেই দীনমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় ভরিয়া উঠিল। আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিলিত হইলাম। আজ আকাশ নির্ম্মল। পূর্ব্বদিনের মত আজও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সেই বিশাল জনসঙ্ঘ সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। অদ্য ৮ মাইল ভ্রমণ করিয়া বেহুলাবনে রাত্রিবাস করিতে হইবে।

মধুবন হইতে উত্তরদিকে চারি মাইল দূরে শান্তনুকুণ্ডে (দেশী নাম সাঁতোয়া) আসিলাম। এই রমণীয় স্থানে শান্তনু মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের উত্তর পাড়ে কতকগুলি মন্দির ও ধর্ম্মশালা আছে। পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ বিশ্রাম করেন। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি মাটির পাহাড়ের উপর শ্রীশ্রীবিহারিজীর মন্দির; অপর নাম শ্রীসূর্য্যমন্দির। সরোবরের পূর্ব্বপাড়ে বাঁধান ঘাট। ঘাট হইতে পাহাড়ে যাইবার কাঠের পুল। আমরা যে সময়ে মন্দিরে দেবতা দর্শন করিতেছিলাম—সেই সময় চারিদিকে হঠাৎ গোলমাল হইয়া উঠিল। অন্যান্য যাত্রিগণ প্রায় সকলেই মন্দির হইতে ব্যস্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কারণ অনুসন্ধান করিতে বাহিরে আসিবামাত্র আমাদের মধ্যে একজন টলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, এবং মন্দিরের একদিককার দেয়ালের কতক অংশ খসিয়া পড়িল। আমরাও টলিয়া উঠিলাম। তখন বুঝিতে

পারিলাম যে ভূমিকম্প হইতেছে। চারিবার কম্পন অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পর সব স্থির হইলে আবার যাত্রীর হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। আমরা চলিয়া আসিলাম। ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া নানারূপ আলোচনা শুনিতেছি এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আমাদের একজন সঙ্গী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল -তাহার চীৎকারে আমরা নিকটে আসিলাম। বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাদের কতকগুলা সিদ্ধ ছোলা ও গুড় দেখাইয়া বলিল, "একটি রামায়েৎ সাধু এইগুলির ভাণ্ডারা করিতেছে, বেশ জলযোগ চলে।" সকাল হইতে হাঁটিয়া আসিতেছি—বিশেষতঃ স্নান করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক যে না হইয়াছিল তাহাও নহে। আমরা সকলেই সাধুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সাধুটি বৃদ্ধ, দীর্ঘ পাকা চুল ও দাড়িতে তাঁহার প্রায় সমস্ত উপরার্দ্ধ আবৃত, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। আমাদের বেশ যত্ন করিয়া একখণ্ড চট পাতিয়া বসিতে বলিলেন এবং একটি পাতার ঠোঙ্গায় করিয়া ছোলা সিদ্ধ ও কতকটা গুড় দিলেন আর নিজে যষ্টি হস্তে নিকটে বসিয়া বড় বড় বাঁদর—যাদের আমরা লক্ষ্যই করিনি—তাড়াইতে লাগিলেন। বেচারা বাঁদরগুলি অনন্যোপায় হইয়া আমাদের কিছু তফাতে বসিয়া রহিল এবং মধ্যে মধ্যে হতাশভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, যদি কোনও উপায়ে ঠোঙ্গাটি কাড়িয়া লইতে পারে। আমরা জলযোগ শেষ করিয়া সাধুজীকে ধন্যবাদ ও প্রণামপূর্ব্বক এই সাঁতোয়া গ্রামের ঈশানকোণস্থিত "গনেস্র" গ্রামে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবী দর্শন ও গন্ধেশ্বরকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া বেহুলাবনাভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ ১২টার সময় বেহুলাবনে বেহুলাকুণ্ডের ধারে আসিয়া এক প্রকাণ্ড নিম গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম। পথে আসিবার সময় যাত্রিবাহিনীর সর্দ্দার পাণ্ডা আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—সেইজন্য বেশ সুস্থমনে সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রন্ধন সমাপ্ত হইলে পাণ্ডাজী ডাকিয়া লইবে, কিন্তু ৩টা বাজিয়া গেলেও কেহ ডাকিল না দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলাম। তখন আমাদের মধ্যে একজন পাণ্ডাজীর নিকট গমন করিয়া জানিল যে, আমাদের ডাকিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। যোগাড় করিতেই হইবে, কারণ ক্ষুধার উদ্রেক যথেষ্টই হইয়াছিল। এমন অসময়ে কাহার নিকট ভিক্ষা করিব চিন্তা করিতেছি এমন সময় চুঁচুড়াবাসী একটি ভদ্রলোক তাঁহার একজন সঙ্গীর অসুখ করায় আমাদের নিকট ঔষধ লইতে আসিলেন। সকলেরই শুষ্ক মুখ দেখিয়া প্রবীণ ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন যে আজ আমাদের আহার জোটে নাই। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং আমরা দোকানের পুরি ও মিঠাই খাইব কি না জানিতে চাহিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে উক্ত ভদ্রলোক লুচি, চাটনী ও মিঠাই-ই নামক চিনির সন্দেশ লইয়া আসিলেন। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে বন, গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য লীলাস্থলী দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। প্রথমে কুণ্ডের তীরে 'বহুলা' গাভীর স্থান। বহুলা নামে একটি গাভীকে এই বনে বাঘে আক্রমণ করিয়াছিল। গাভীটি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলে শ্রীকৃষ্ণ বাঘ মারিয়া গরুটিকে উদ্ধার করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই স্থান দর্শন করিতে আসিলে অনেকগুলি গরু তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহার অঙ্গ লেহন করিতে করিতে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছিল। বৈষ্ণবগণ এই স্থানটি অতি পবিত্র বোধে পূজা করিয়া থাকেন। কুণ্ডের উত্তর তীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক (বহুলাগ্রামের ব্রজবাসীরা এই গ্রামকে বাটীগ্রাম বলে)—পূর্ব্বদিকে শ্রীবলরাম কুণ্ড। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে "মান সরোবর" প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাত্রি এক প্রহরে বহুলাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

(ব্রহ্মচারী ধ্রুবচৈতন্য)

বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্যের প্রসার হওয়ায় অনেকেই আজ কাল ঐ ধর্ম্ম লইয়া বিচারাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য সুরে সুর মিলাইয়া বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভুঁই-ফোঁড়, অতীত ইতিহাসের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, বৈদিক ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং পৌরোহিত্যের অত্যাচার চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব—ইহার দর্শন স্বতন্ত্র, ইহার সাধনপ্রণালী স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ ইহার সঙ্ঘের সন্ন্যাসিমণ্ডলী জগতে একেবারে নূতন। ইহার প্রমাণস্থলগুলি উদ্ধৃত করা যাউক :—

"In its origin one of the sublimest and most radical of all reactions in favour of the common human rights of individuals against the grinding tyranny of the so-called divine rights of birth and rank. It was the work of a single man who rebelled against the Brahmanic priests in the beginning of the Sixth Century B.C. and by the simplicity and moral power of his teaching brought the Indian people to a complete breach with its own past".—Weber, Indische Streifen, I. p. 130.

"উৎপত্তির দিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বত্বস্বামিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও উচ্চ পদের অভিভবকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তিত্ববুদ্ধি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় সেই সকল অতি মহৎ ও সর্ব্বথা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলির ইহা অন্যতম। ইহা সেই একজন লোকের কর্ম্ম, যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও স্বীয় সরল ও নীতিগর্ভ শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় জনসঙ্ঘকে তাহাদের অতীত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"In the doctrine of Buddha—the Philosophy of the Indians...... had broken with results of the history of the Aryans on the Indus and the Ganges, with the development of a thousand years...... And this doctrine, which annihilated the entire ancient religion and the basis of existing society ......rested solely on the dicta of a man who declared that he had discovered truth by his own power and maintained that every man could find it. That such a doctrine found adherence and ever increasing adherence is a fact—without a parallel in history".—Max Duncker, History of Antiquity Vol. IV. p. 455.

"বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মমতের ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোদ্ভূত আর্য্যেতিহাস হইতে, সহস্র বৎসরের অনুশীলিত ভাবগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া একমাত্র তাঁহারই কথার উপর ইহা গড়িয়া উঠিল, যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তিবলেই তিনি সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছেন—এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলোকের মন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলন।"

"The deliverer of a priest-ridden, caste-ridden nation,—the courageous reformer and innovator who dared to attempt what doubtless others had long felt, was necessary, namely, the breaking down of an intolerable ecclesiastical monopoly by proclaiming absolute free-trade in religious opinions and the abolition of all caste privileges".—Prof. Monier Williams—Indian Wisdom, p. 55.

"পৌরোহিত্যোন্মোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিত্রাতা, সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি অপরের বহুকালের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভাবটিকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণা করিয়া যাজককুলের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সকল জাতিগত

উচ্চাধিকারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদৃশ একজন লোকের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।"

দুই একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ, অশোকস্তম্ভ এবং গিরিলিপি-গুলির আলোচনা করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপিত এবং উপরোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মন্তব্যগুলি মিথ্যা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। বৌদ্ধ সাহিত্যের পবর্ত্তক আলোচক-দিগের জানা উচিত যে অশোকস্তম্ভ এবং গিরিলিপিগুলির আবিষ্কারের পরে উল্লিখিত মতগুলির আর কোনই মূল্য নাই। "Rebelled against the Brahmanic priest" (ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল), "annihilated the entire ancient religion" (সমগ্র সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল), "abolition of all caste privileges" (সর্ব্বপ্রকার জাত্যাধিকারের বিলোপ সাধন করিয়াছিল) প্রভৃতি কথাগুলির যে কোন সার্থকতা আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। অনুশাসনগুলি হইতে কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে :—

(ক) "ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার"—গির্ণার ৪।

(খ) "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান"—গির্ণার ৮।

(গ) "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধু কার্য্য বলে"—গির্ণার ৯।

(ঘ) "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান"—গির্ণার ১১।

(ঙ) "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মানসহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না—যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্যসংযম—কিরূপ? সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা সামান্য বিষয়ে যেন আদৌ না হয় এবং বিষয়বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগেরও পূজা করা

কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়; এরূপ না করিলে সধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই ভাল।—কিরূপ? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন। কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়নসম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত তাঁহাদিগকে বলা উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সারবৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয় দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত নানাবিধ ধর্ম্ম মহামাত্র বচভূমিকেরা ও অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্‌সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ"—গির্ণার ১২।

এই অনুশাসনগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ধৃত পাশ্চাত্য মতগুলি কতদুর সত্য। পুনশ্চ প্রিয়দর্শী অশোক যে ঐ অনুশাসনগুলি প্রজারঞ্জনের জন্য ক্ষোদিত করিয়াছিলেন এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। কারণ তিনি যে একজন বৌদ্ধসঙ্ঘপরিচালিত গোঁড়া ভক্তিমান রাজা ছিলেন তাহা "ভাবড়া-লিপি" হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয়:—

"প্রিয়দর্শী রাজা, বিঘ্নহীন ও সুখে বিরাজমান মগধদেশীয় সঙ্ঘকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতেছেন, হে ভদন্তগণ বুদ্ধে, ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে আমার কিরূপ ভক্তি ও গৌরব আছে তাহা আপনারা জানেন। হে ভদন্তগণ, ভগবান্ বুদ্ধ যাহা কিছু কহিয়াছেন সকলই সুভাষিত। ভদন্তগণ, কিরূপে আমার দ্বারা এই সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে, তাহা আপনাদিগকে অবগত করান কর্ত্তব্য মনে করি।"

হিন্দুর যেমন "গীতা" বৌদ্ধের তেমনি "ধম্মপদ"; আবার এই ধম্মপদের আদর্শ অংশের নাম "ব্রাহ্মণ বগ্‌গো"—এই অংশে ব্রাহ্মণকেই

আদর্শ করা হইয়াছে। তবে এই ব্রাহ্মণ জাতিগত নয়, গীতার "গুণকর্ম্ম বিভাগসঃ।"

"জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যে ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী সে শুচি এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ।"

ধম্মপদ, ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ১১।

"ব্রাহ্মণজাতিতে উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণগর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহা হইলে কেবল ভোগবাদী হইবে। কিন্তু সে আসক্তিরহিত এবং নিষ্পাপী হইলে তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"Which annihilated the entire ancient religion and the basis of existing society" (যাহারা সমগ্র সনাতন ধর্ম্মের ও তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোৎসাদন করিয়াছিল) কথাটি কতদূর সত্য ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। আর "Reactions in favour of the common human rights" (সর্ব্বসাধারণের মানবব্যক্তিত্বের স্বপক্ষে প্রতিক্রিয়া) "breaking down of the intolerable ecclesiastical monopoly" by proclaiming absolute free trade in religious opinion" (ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তনে দুঃসহ পৌরোহিত্যশক্তির অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তির উপর হস্তক্ষেপ), প্রভৃতি democratic element (গণতন্ত্রী উপাদনসূচক লক্ষণের কথা) বুদ্ধদেব কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই এবং ইহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পুনরায় জাতিবিভাগ যদি বৌদ্ধদের নিকট এতই দোষের তবে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের সহিত জাতিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় কেন?—সংস্কারকেরা একেবারে উহা সমাজ হইতে মুছি ফেলিলেন না কেন? ডাক্তার Kuenen-এর মতে বৌদ্ধগণ ইহা তথায় প্রচলন করিয়াছিল কি না তাহাও জিজ্ঞাস্য। শুধু ইহাই নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের নানা স্থানে উচ্চ ও নীচ জাতির বিচার দেখিতে পাওয়া যায় এমন কি সকল বুদ্ধই হয়

না হ[illegible] ক্ষ[illegible]য়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জাতিবিষ

তৃতীয় অধ্যায়ে শাক্য-বুদ্ধের জন্ম লইয়াই বহু বিচার করা হইয়াছে। "জম্বু ভূভাগের সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বিষয় তিনি অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে এক নিষ্কলুষ শাক্যবংশ ব্যতীত অপর সকলগুলিই দোষবিশিষ্ট।" কথিত আছে, বুদ্ধদেব নাকি স্ত্রীজাতির হীনত্ব সম্বন্ধেও কটাক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মাতা ও স্ত্রীকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

দর্শন ও ধর্ম্ম মূলতঃ একই কারণের উপর স্থাপিত। দর্শনের কার্য্য স্বধর্ম্মকে বিচারের দ্বারা স্থাপিত করা। সময় সময় এই দর্শনশাস্ত্র বিদেশের এবং অপর ধর্ম্মীর চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনে অপর কোনও বিজাতীয় চিন্তার ছাপ পড়ে নাই। কাজে কাজেই যদি আমরা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির সহিত প্রাচীনতর বৈদিকধর্ম্মের তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্বরূপ গঙ্গোত্রী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ আর একটি নব ধারার উৎপত্তি হইয়াছে। সে ধারা নিজ সঙ্কীর্ণ জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতের অনুর্ব্বর ভূমি সরস করিয়াছে, অজ্ঞানীর শুষ্ক জিহ্বায় অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছে। পঞ্চ দুঃখ, কর্ম্মবাদ, শূন্যবাদ, প্রভৃতি অমূল্য মণি বৈদিক ধর্ম্মের খনিতে বহুদিন হইতেই লুক্কায়িত ছিল। শ্রীবুদ্ধদেব পুনরায় তাহাদের আবিষ্কার করিলেন এবং সর্ব্বলোক সমক্ষে নূতন ভাষায় নূতন ভাবে সেই তত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিলেন—যে দেবতা অরণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য ছিলেন তাঁহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ কার্য্য ভারতে নূতন নহে। ভারতের ভগবান্ বহুবার মূর্চ্ছাপন্ন এই দেশকে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই ভারতের একটি অপূর্ব্ব প্রথা, গোঁড়ারা নিজ নিজ সম্প্রদায় বা ইষ্ট লইয়া হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ ভাবেই ইচ্ছা শাস্ত্র ও ভাষ্য তৈয়ার করে করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥"

—প্রভৃতি হিন্দুদর্শনসূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতির "যতোবাচো নির্বর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্যই "অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।" এই শ্রীবুদ্ধ-বাক্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
মেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥" কঠোপনিষদ্।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং॥৩॥

ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূঃ।

"তৎকালে যাহা নাই তাঁহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।"

—প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা শ্রীবুদ্ধদেব নিজের ভাষায় পুনঃ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্।'
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি।"
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।"
"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"

বৌদ্ধধর্ম্মে "শূন্যম্" "গম্ভীরম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে তাহাই "পূর্ণম্", "সৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে মাত্র।

জাতক গ্রন্থের পুনর্জন্মবাদও শ্রুতিতেই বীজাঙ্কুরাকারে, কখনও বা স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তৃতীয় বরে বলিতেছেন :—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

"মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন 'আছে' কেহ কেহ বলেন 'নাই', আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি ; আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর।"

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ঈশ।

"আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে॥"

বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীও নবাবিষ্কৃত ব্যাপার নহে। ইহার অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারটি পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে পাওয়া যায়। অপস্তম্ব এবং গৌতমসূত্র, যাহা মনু অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া কথিত আছে, তাহাতে সন্ন্যাসীর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত

হইয়াছে। "তিনি (সন্ন্যাসী) নিরগ্নি, নির্গৃহ, নিবৃত্ত ও নিরালম্ব হইয়া কালযাপন করিবেন। কেবল প্রতিদিন স্বাধ্যায়ের সময় মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত অপর সকল সময়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে থাকিবেন। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন গ্রাম হইতে মাত্র ততটুকু ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক ইহামুত্রবিরাগী হইয়া সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন।"

"সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও দুঃখ, বেদের অনুশাসন এবং ইহলোক ও পরলোকসম্বন্ধীয় সকল দ্বন্দ্ব পরিহারপূর্ব্বক তিনি পরমাত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন।"

আবার উভয় ধর্ম্মগ্রন্থসকল পড়িলে ইহাও বোধগম্য হয় যে বৈদিক তপোবন বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্ম অরণ্য হইতে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যোগশাস্ত্রও বহু পূর্ব্ব হইতেই কঠ, শ্বেতাশ্বতর, গীতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুশীলীকৃত হইয়াছিল।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি বৈদিকধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয়, এত বিসদৃশ হইয়া পড়িল কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে প্রচারকের অভাব। শ্রীবুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটি বিশাল নব তরঙ্গ, শ্রীশঙ্কর আর একটি। প্রথমটি হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নিঃসৃত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিয়াছিল কিন্তু অপরটির সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রতি অন্ধকারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞানালোক লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতে যখন পুনরায় নব তরঙ্গের উত্থান হইল তখন সে তরঙ্গ আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌছিল না। কারণ বাষ্পীয় পোত, তড়িৎ-বার্ত্তাবহ, সংবাদ পত্র এবং সর্ব্বোপরি প্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং তত্তৎ দেশীয় মনীষীরা তাহার উপর নব যুক্তি ও তথ্যের আবিষ্কার করিয়া উহাকে মাতৃভূমি হইতে

একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অন্ধকারে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাই বিদেশের বুদ্ধ এত উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে অসংখ্য মহাপুরুষের মধ্যে আর একখানি আসন পাতিয়া দিল—অসংখ্য আলোকমালার মধ্যে যেন আর একটী আলোক ফুটিয়া উঠিল। ভারতবাসী তাঁহাকে পূজা করে—অবতার বলিয়া মানে কিন্তু তাঁহার পথ যে একমাত্র পথ তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শ্রীভগবান্ মানবের অবস্থা বুঝিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া একই সত্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন। ভারতের ভগবান্ মানবের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত এবং ভারতের সনাতন ধৰ্ম্মকেই গরীয়ান্ করিয়াছিলেন মাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, শ্রীবুদ্ধদেব যদি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই জীবন কাটাইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে ভারতীয় ধৰ্ম্মবীরদিগের ধারাই ঐরূপ।—তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকে বহুবার এতদ্দেশীয় আস্তিক বা নাস্তিক দার্শনিকেরা আক্রমণ করিয়াছেন যথা, ঋষি যজ্ঞ করিতে আসিয়া হবিঃহস্তে বলিয়া ফেলিলেন ঃ—

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যা অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ,দেবায় হবিষা বিধেম॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূঃ, ৫ম মন্ত্র।

এখন সায়ন যে ভাবেই ইহার ভাষ্য করেন করুন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ প্রথম মুণ্ডক, ৪, ৫।

গীতায় আছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২,২ অ।
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫, ২অ।

চার্ব্বাক্ দর্শনে আছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে—

নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
২য় উল্লাস, ১৫ শ্লোক।

যাহা হউক, আমরা এখন বৃদ্ধ Max Mullerএর সহিত সমস্বরে বলিতে চাই যে, "বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্কুরোৎপত্তির স্থান উপনিষদের মধ্যেই নিবদ্ধ। উপনিষদ্‌প্রোক্ত ধর্ম্মাভিমতগুলিকে চরম বিকাশের পথে পৌঁছাইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক তাহা নহে, পরন্তু—ইহা সেই জ্ঞানোপলব্ধি সহায়ে একটি নুতন সামাজিক শৃঙ্খলারও বিন্যাস করিয়াছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের যাহা সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সেই আত্মোপলব্ধিই বৌদ্ধের সম্যক্‌সম্বোধি ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী যাহা ভিক্ষুও তাহাই, তবে সে ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থিগণের নীরস আত্ম-সংযমন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলের নানা কর্ত্তব্যভার ও ব্রাহ্মণ প্রব্রজিত-গণের নানারূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধনার ভার হইতে উন্মুক্ত। সন্ন্যাসীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সম্ভব অথবা ভ্রাতৃমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি—সেই মণ্ডলীর দ্বার, তরুণ কিম্বা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিম্বা শূদ্র, ধনী কিম্বা দরিদ্র, জ্ঞানী অথবা মূর্খ সকলেরই নিকট অবারিত। বস্তুতঃ বৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত সম্পর্কশূন্য নহে—উভয়ের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা

বর্ত্তমান এবং আপাতদৃষ্টিতে তীব্র বিরোধসমন্বিত যে সকল চূড়ান্ত রকমের পার্থক্য আমরা ইহাদের মধ্যে, দেখিতে পাই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও উপনিষদের মধ্যে অন্বেষ্টব্য ।"

বিশু দাদা ।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

তথাকথিত বিজ্ঞ লোকেরা তাঁকে দেখ্‌লে উপেক্ষার হাসি হাস্‌ত, কেন না স্বার্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাঁর ধীর সহিষ্ণু ভাব দেখ্‌লে মনে হ'ত, যেন দুঃখকষ্টগুলিকে আগ্রহভরে বরণ কর্‌বার জন্য তাঁর দৃঢ়হৃদয় সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে আছে। সময় সময় অতিরিক্ত উদার ব্যবহারের জন্য তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত হ'তে হ'ত, কিন্তু তথাপি তাঁর স্বাভাবিক চিত্তপ্রশান্তি ভঙ্গ হ'ত না। শিশুর নগ্ন সরলতা ও প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত তাঁর অদ্ভুত চরিত্র বড়ই মধুর। তিনি যখন আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে বসে থাকেন, তখন দেখ্‌লেই মনে হ'ত যে, কল্পনার সুন্দর আবরণ খুলে নিশ্চয় আমাদের মত সাদা চোখে জগৎটাকে দেখ্‌তে তিনি মোটেই ইচ্ছুক নন। অথচ তিনি সকলকেই ভালবাসেন—আর্ত্তের কাতর ক্রন্দন কখনও তাঁর কাছে উপেক্ষিত হয়নি। ভদ্রলোকের চেয়ে গরীব চাষারাই ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশী আদরের। তিনি যখন তাদের বাড়ীতে বেতের মোড়ায় বসে, কলাপাতার ঠোঙ্গায় করে তামাক খেতে খেতে তাদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে সুখদুঃখের কথা শুন্‌তেন, তখন তাঁর সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পেত।

সে যাই হোক্, আমি তাঁর "খোকামীতে" ব্যথিত হয়ে, অনেক সময় তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার কর্‌তাম, স্নেহের অভিমানে তাঁকে "সাংসারিক অভিজ্ঞতা" অর্জ্জন কর্‌বার জন্য উত্তেজিত কর্‌তে চেষ্টা

কর্‌তাম কিন্তু বরাবরই তা নিষ্ফল হয়ে এসেছে। আঘাত পেলে যে প্রতিঘাত করাটা স্বাভাবিক, এ সাংসারিক নীতিটী তিনি যেন স্বীকার কর্‌তে মোটেই প্রস্তুত নন। কিন্তু যে দিন শুন্‌লাম কতকগুলি নীচ প্রকৃতির লোক তাঁকে অন্যায় ভাবে অপমান করেছে, অথচ তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন কর্‌বার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি, সে দিন মনে মনে স্থির কর্‌লাম, যেমন করে পারি, তাঁকে উত্তেজিত করে এর প্রতি-বিধানের চেষ্টা কর্‌বই কর্‌ব।

তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একখানা বই পড়্‌ছিলেন, আমি ঘরে প্রবেশ কর্‌তেই মাথা না তুলেই বল্‌লেন, "কে প্রতাপ—বোস্।" কারণ আমার পদশব্দ তাঁর সুপরিচিত। ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বল্‌ছিল—বিনা বাক্য ব্যয়ে তক্তাপোষের উপর বসে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন করা দূরে থাক্, তাঁর বই পড়ার রকমটা দেখে বোধ হ'ল, ঘরে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ আছে সে কথাটা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে আর চুপ করে থাকা অসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল—কঠোরস্বরে বল্‌লাম, "ও বই এখন থাক্—আমার অনেক কাজ আছে, বসে থাক্‌তে আসিনি।" তিনি একটু কুণ্ঠিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন, "ওহো, তুই যে কাজের লোক—সে কথাটা ভুলে যাওয়াটা মোটেই ভাল হয়নি।"

ভূমিকা অনাবশ্যক বিবেচনায় যা যা শুনেছিলাম সব বলে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কেমন ঠিক কি না?"

তিনি সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে, অন্যান্য কথা দিয়ে আমায় ভুলাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বল্লাম, "লজ্জা করে না? যার যা খুসি তাই বলে যাবে—আশ্চর্য্য লোক! মানুষ অনেক রকম দেখেছি, কিন্তু এত নির্লজ্জ হ'তে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

স্থির প্রশান্তভাবে তিনি উত্তর কল্লেন, "ঘটনা সত্য; কিন্তু তাই বলে তোর এতটা বিচলিত হওয়া শোভা পায় না।"

"না, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এত বড় একটা অন্যায় আমি আপনাকে নীরবে সহ্য করতে কখনই দেব না। আপনাকে কিছু করতে হবে না, কেবল অনুমতি দিন, দেখুন আমরা কি করতে পারি। বেশী কিছু নয়—আগুনে হাত দিলে যে হাত পোড়ে; এ চিরন্তন সত্যটা হতভাগাদের নূতন করে বুঝিয়ে দিতে চাই।" মাতা যেমন স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে সন্তানের দিকে চেয়ে ভৎসনা করেন, তেমনি করে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ছিঃ প্রতাপ, এত বিচলিত হয়ো না। তোমার আমার বিচারে যে কার্য্য অন্যায়, কে জানে তাঁর চক্ষে তা কিরূপ! হয় ত এর মধ্যে কোন ভাবী মঙ্গল নিহিত আছে। বিশেষতঃ অপরাধীর দণ্ডদাতা মানুষ নয়, ভগবান্; ক্ষণিক চাঞ্চল্যে সে কথা ভুলে যেও না ভাই।" তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে অবশেষে থেমে গেল, যেন আরও কত কি বল্‌বার ছিল, কি যেন একটা বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে আর বল্‌তে পার্‌লেন না।

আমি উদ্ধতভাবে উত্তর দিলাম, "সেই অনাদি কাল থেকে বিচার করতে করতে ভগবানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়, নৈলে এত অনাচার কখনই তিনি নীরবে সইতে পার্‌তেন না। আপনি যাই বলুন, ভগবান্ ভরসা করে অন্যায় অপমান সহ্য করাটা যে মহত্ত্ব—সেটা বুঝ্‌তে এখনও আমার অনেক দেরী।"

তিনি কিন্তু অবিচলিতভাবে বলে যেতে লাগ্‌লেন, "সুখও চাই, দুঃখও চাই; চরিত্র গঠন করতে দুইই সমান উপাদান। অজ্ঞ যারা, তারাই কেবল সুখ চায়, দুঃখ চায় না। কিন্তু যাঁরা জীবনরহস্য অনেকটা ভেদ কর্ত্তে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরা জানেন যে সুখের চেয়ে দুঃখই অধিক শিক্ষা দেয়; তাঁরা জানেন—প্রশংসার চেয়ে নিন্দার তীব্র কশাঘাতেই অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু হায় অন্ধ আশা!—" আমি বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লাম, "থামুন, ও সব দার্শনিক উচ্ছ্বাসের মূল্য কর্ম্মজগতে বড়ই কম। আপনি যতই কেন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করুন না, এরকম অপমান নীরবে সহ্য করা আপনার দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা।"

চমকিত হয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন, কি যেন বলতে চাইলেন কিন্তু আবেগে তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। ক্ষিপ্তের মত অস্বাভাবিকস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "তুমি কি বুঝবে প্রতাপ? তুমি কি জান, আজ বার বৎসর হ'ল আমি কত ব্যাকুল আগ্রহে আঘাতের প্রতীক্ষা করছি? আঘাত—কঠোর আঘাত—যা বজ্রনির্ঘোষে সংসারের অসারতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দেয়, যার নির্ম্মম স্পর্শে সমস্ত স্নেহ, মায়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে;—কিন্তু কৈ? তা কতদূরে বন্ধু? ঠিক বলেছ প্রতাপ—আমি দুর্ব্বল, কাপুরুষ! নৈলে বার বছরেও কিছু করে উঠতে পারলাম না কেন?"—তাঁর দৃষ্টি শূন্য, স্বর হতাশব্যঞ্জক।

আমি তাঁর আকস্মিক চঞ্চলতায় বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তার হাত ধরে কোমলস্বরে বললাম, "দাদা! মুখে যাই বলি, আপনি আমার হৃদয় জানেন—আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কেউ অন্যায় কথা বললে বড় ব্যথা পাই তাই—" তিনি বাধা দিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন, "আগে তোকে অপরাধীই বলি, তার পর ক্ষমা চাস্। পাগল, স্থির হয়ে বোস্, ভাখ, আজ তুই যেমন আমায় দুর্ব্বল ও কাপুরুষ বললি, বার বৎসর আগে আর একজন ঠিক এমনি করে বলেছিল।" সহসা কতকক্ষণ চুপ করিয়া তিনি আবার বললেন, "দেখ্ প্রতাপ, এবার আর ঠক্ছি না; ঠিক বলেছিস, প্রতীকার করা চাই। সেবার একজনের কথা শুনিনি, এবার তোর কথা শুনবো।"

এতক্ষণে আমি তাঁর কথার একটু সূত্র পেলাম, কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে বার বছর আগে আপনাকে দুর্ব্বল, কাপুরুষ বলেছিল, দাদা?"

"সে অনেক কথা—তবে শোন্, সঙ্ক্ষেপে বলি।"

"তখন আমি তোর চেয়ে অনেক ছোট, এগার কি বার বৎসর বয়স হবে। আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে পড়তো, তার নাম বিশ্বনাথ; আমি তাকে বিশু দাদা বলে ডাকতাম। ছোট জাতের ঘরে

তার জন্ম হয়েছিল, চাষ বাস করে খাওয়াই তাদের জাত-ব্যবসা। পাঠশালা থেকে উচ্চ প্রাইমারী পাশ করে সে ইংরেজী স্কুলে পড়্‌তে এসেছিল, তখন তার বয়স আঠার কি উনিশ হবে। সুন্দর বলিষ্ঠ তার কৃষ্ণবর্ণ দেহখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তো, তার পাতলা ঠোঁট দুখানি যেন হাসি দিয়েই গড়া। বেশভূষায় তার কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। আমাদের বাসার নিকটে একটা বাসায় সে থাক্‌তো, নিজে রান্না করে খেতো, বাসন মাজ্‌তো, ঘর ঝাঁট দিতো। বাল্যকাল থেকে শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত, আত্মনির্ভরশীল পল্লী-যুবক পরমুখাপেক্ষী হ'তে অত্যন্ত লজ্জা বোধ কর্‌তো। ক্লাসে সব চেয়ে আমি ছিলাম ছোট, সে ছিল বড়। কিন্তু সে আমায় অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তো—আমিও তার সরল স্নেহময় ব্যবহারে তার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাই সময় পেলেই তার কাছে ছুটে যেতাম, বিকালবেলায় তার হাত ধরে মাঠে বেড়াতে যাওয়া আমার নিত্যকর্ম্ম ছিল। কিন্তু শত উন্নতচরিত্র হলেও সে ছিল চাষা—ছোটলোক; কাজেই অনেক ছেলে আমায় ঠাট্টা কর্‌তো; কেউ কেউ—ভদ্রলোকের ছেলের ছোটলোকের সঙ্গে অত মেলামেশা ভাল দেখায় না বলে উপদেশ দিতেও ছাড়্‌তো না। যা হ'ক্‌, আমি তাদের কথায় কান দিতাম না।

বিশু দাদা যাদের বাসায় থাক্‌তো, তাঁরা তাকে নীচের তলায় দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিল, একটা ছিল তার রান্নাঘর; আর একটা শোবার ঘর। তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শোবার ঘরখানিতে বড় বেশী আস্‌বাবপত্র ছিল না। একখানি তক্তাপোষ, তার উপর সামান্য বিছানা—তার পাশেই একটা আম-কাঠের বাক্স, তাতে তার বই কাপড় চোপড় থাক্‌তো। ডানধারের দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একখানা ছোট শ্রীকৃষ্ণের পট। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সে পটখানির সামনে ধূনো দিতো, মাঝে মাঝে দু' চার্‌টে ফুলও আশে পাশে দেখ্‌তাম, আর কি কর্ত্তো তা ঠাকুরই জানেন? আর ছবির পাশে লাল কাপড়ে বাঁধা একখানি কাশীরাম

দাসের মহাভারত। অবসরমত সে সেখানা পড়তো—মাঝে মাঝে আমি শুনতাম। কখনো কখনো সে বই বন্ধ করে মহাভারতের কাহিনীগুলি আমায় বলতো—আমি সেই অতীত যুগের মহাপুরুষদের কীর্ত্তিগাথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশান্ত মুখখানির দিকে চেয়ে থাকতাম। এমনি ভাবে কত দিন গেছে।

একদিন নদীর ধারি দিয়ে বেড়িয়ে বাসায় ফিরছি, সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমি উৎসাহে বল্‌লাম, "চল বিশুদাদা, গোবিন্দজীর আরতি দেখিগে।" দু'জনে এসে ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে মিটমিটে তেলের প্রদীপে ছোট্ট ঠাকুরটী মোটেই দেখা যায় না। কাজেই আমি বল্‌লাম, "চল বিশুদাদা, বারান্দায় উঠি, ঐ দরজার সামনে থেকে বেশ দেখা যাবে এখন।" বিশুদাদা সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে, "না ভাই, আমরা ছোটজাত, বারান্দায় উঠেছি দেখলে কেউ বক্‌বে।"

"বাঃ—আমাদের ঠাকুবাড়ী, আমি সঙ্গে থাক্‌লে কে আবার কি বল্‌বে?"—বল্‌তে বল্‌তে তার হাত ধরে টেনে দরজার সামনে নিয়ে গেলাম। আরতি শেষ হলে পূজারী ঠাকুর চরণামৃত দিতে লাগ্‌লেন; এমন সময় বিশুদাদা হাত পাতলে তার মুখের দিকে চেয়েই ঠাকুর মশাই মুখ বিকৃত করে বল্লেন, "একেবারে বারান্দার উপরে ওঠা হয়েছে; কেন নীচে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হ'ত?" আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম, "ও ইচ্ছা করে ওঠেনি, আমি ওকে নিয়ে এসেছি।" কিন্তু তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "খোকাবাবু ছেলেমানুষ কি জানে বল? তুমি তো বাপু বুড়ো ধাড়ি, তোমার একটু আক্কেল নেই? ছোট লোকগুলোর ঐ একধারা, দু'পাতা ইংরেজী পড়েই ঠাকুর দেবতা আর মান্‌তে চায় না।" লজ্জায়, অপমানে মুখটী নীচু করে বিশুদাদা ধীরে ধীরে নেমে চলে গেল; আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে শুন্‌ছিলাম; তাকে নেমে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বল্‌লাম, "রাগ করোনা ভাই, আমি কালই বাবাকে বলে এর একটা বিহিত কর্‌বো।" বিশুদাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর কর্‌লে, "আমি

কিছু মনে করিনি অশু, ছোট জাতের ঘরে জন্মেছি—তা আমারই ভেবে কাজ করা উচিত ছিল।”

পরদিন বাবার নিকট এসে নালিশ কর্‌লাম। তিনি হেসে বল্‌লেন, “পাগল ছেলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।”

আমি এতক্ষণ এই ভাবরাজ্যসঞ্চরণশীল লোকটীর সুদূর শৈশব-স্মৃতি—মর্ম্মের নিহিত ব্যথা নীরবে শুন্‌ছিলাম, একটী কথা বলেও তার বাক্যস্রোতে বাধা দেইনি; এই বার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “আচ্ছা দাদা, এই সব ছোট জাত—এরাও তো হিন্দু, দেব দেবী সব মানে—তবে কেন এদের ঠাকুরঘরে ঢুক্‌তে দেওয়া হয় না?”

তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, “জানি না, কোন্ শাস্ত্রকার এ নিয়ম করে গেছেন! কিন্তু আমার মনে হয় এ উচ্চজাতীয়ের অনর্থক অহঙ্কার। মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে তাঁরা আপনাদের সব চেয়ে বড় দেখেন, অপরের স্পর্শে নিজেরা অপবিত্র হয়ে যান, তাই সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন দেবতারাও বুঝি তাই হন।” কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি দৃপ্ত স্বরে বলে উঠ্‌লেন, “ঘৃণা অবজ্ঞা উপেক্ষায় তাঁরা নীচ জাতির মন্দিরপ্রবেশদ্বার গায়ের জোরে রুদ্ধ করেছেন; কিন্তু তাঁর কৃপার দ্বার তো রুদ্ধ কর্ত্তে পারেননি! এই সব হৃদয়-হীন জাত্যভিমানীর দর্প চূর্ণ কর্‌তে যুগে যুগে তিনি আচণ্ডালকে কোল দিতে আসেন। তখন তাঁর প্রেমের বন্যায়, পতিত কাঙ্গাল, আর্ত্ত অনাথ, সমভাবে ভেসে যায়। কিন্তু সে বিশ্বপ্রেম, বারে বারে দেখেও এঁদের জ্ঞানচক্ষু খুল্‌চে না, জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেন, ‘তথাপি লোকাচার’।”

আমি অনুচ্চস্বরে বল্‌লাম, “আচ্ছা, আপনার বিশুদাদার মত কত শত ধর্ম্মপ্রাণ আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র নীচ জাতের ঘরে জন্মেছেন বলে ধর্ম্মকর্ম্মের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। এদের কি কোন উপায় নেই?”

“হাঁ আছে বৈ কি? কতদিন এতবড় একটা অত্যাচার সহ্য হবে বল? উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—” মহাবাণী ঘোষিত হয়ে গেছে।

নীচ মহৎ হয়ে যাবে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে, প্রভুর কৃপায়। তাই এবারকার যুগাবতার ঠাকুরকে প্রতিমা ও মন্দিরের গণ্ডী থেকে বাইরে এনে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন—যাঁর যত ইচ্ছে প্রাণভরে পূজা কর?"

"কথাটা আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন কি?"

"স্বামিজী বলেছেন, জানিস তো?—

'হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যিনি তাঁর বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। যাও, তাঁর নিকটে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, এবং তাঁর নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। বলি—জীবনবলি—তাদের জন্য, যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে আসেন, যাঁদের তিনি সকলের চেয়ে ভালবাসেন—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।'

"যাঁরা এইরূপে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করবে, তাঁদের কর্ত্তব্য কি?"

"তারা পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভগবানে বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হয়ে, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করবে। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করবে।"

"যাক্, এ সব কথা অন্য সময়ে শুনবো, তার পর যা বলছিলেন।"

"হাঁ—সেই ঘটনার পর থেকে বিশু দাদার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হ'ল। হাস্যপ্রফুল্ল বিশুদাদা গম্ভীর হ'ল। সময় সময় দেখতাম গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে উদাসনেত্রে চেয়ে থাকতো। তার পূতচরিত্রের কথা কি বলবো—আর তখন আমিই বা কতটুকু বুঝি।

তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, আমার মত চঞ্চল বালকও তার অসীম নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে ভগবানকে ভক্তি করতে শিখেছিল। তাকে ছোটলোক চাষার ছেলে বলে যে যতই ঘৃণা করুক্ না কেন, তার চোখে চোখে পড়্‌লে হেসে দুটী কথা কইত না, সে ক্ষুদ্র সহরে এমন লোক ছিল না বল্লেই হয়। আহা, আমাকে সে কত ভাল-বাস্‌তো, কতদিন কত ভাবে জ্বালাতন করেছি, কিন্তু সে একদিনও বিরক্তি বোধ করে নাই। রাসের সময় সেখানে খুব ধুমধাম হ'ত। যাত্রা, কথকতা, পুতুলনাচ—কত কি। আমরা দু'জনেই কথকতা শুন্‌তে ভালবাস্‌তাম্; ঠাকুরও সুন্দর কথকতা কর্‌তে পার্‌তেন। সে দিন তিনি ধ্রুবচরিত্র বলছিলেন; ভগবান্ লাভ কর্‌বার জন্য ক্ষুদ্র শিশুর তীব্র ব্যাকুলতায় গৃহত্যাগ ইত্যাদি মধুর স্বরে বল্‌ছিলেন। ধ্রুব বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আর পাগলের মত মাঝে মাঝে 'পদ্মপলাশলোচন হরি হে, একবার দেখা দাও', বলে কাতর স্বরে ডাক্‌ছে। সে বড় মধুর, সে বড় মর্ম্মস্পর্শী! কথক ঠাকুর মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর অতৃপ্ত কর্ণে সুধাবর্ষণ করে বারে বারেই ধ্রুবের সেই তীব্র ব্যাকুলতা বর্ণনা কর্‌ছিলেন। তারপর যখন সত্যসত্যই ঠাকুর এসে ধ্রুবের সম্মুখে দাঁড়ালেন, তখন চেয়ে দেখ্‌লাম, বিশু দাদার গণ্ডদ্বয়ে দরবিগলিত অশ্রুধারা! সেখান থেকে আমরা এক নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে ধ্রুবের কথাবার্ত্তা হল। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আচ্ছা, ধ্রুবের মত হরি বলে কেঁদে বনে বনে বেড়ালে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়, বিশু দাদা?"

তার বড় বড় চোখ দুটী আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—সে বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বিশ্বাস হয় না। এক একবার ইচ্ছে হয় ধ্রুবের মত বনে গিয়ে 'পদ্মপলাশলোচন হরি হে' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াই। তা বরং ভাল? কি বল, সেখানে ছোটলোক বলে ঘৃণা কর্‌বার কেউ নেই।" কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে দৃঢ় স্বরে বল্‌ছে, "হরি যদি পেতে চাস আয় চলে আয়, তুই

সংসারের মায়া মমতা পায়ে দলে চলে আয়। সত্য কথা অনু— অবিশ্বাস করো না।"

"কেন জানি না বিশু দাদা, আমারও মনে হয় যেমন করেই হোক্ হরির দেখা পেতেই হবে। নইলে শান্তি পাব না। কিন্তু ভাবি—"

"কিন্তু? না, না কিন্তু কিছু নেই। তাঁর জন্য যদি সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়, তিনি দেখা দেবেনই দেবেন। পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুব যদি অত কষ্ট সহ্য করে তাঁর দেখা পেয়ে থাকে, তবে আর আমরা পাব না?—তারপর দু'জনে এমনি ধারা কত কথা হ'ল, অনেক জল্পনা কল্পনার পর স্থির হল, শেষ রাত্রেই বেরিয়ে পড়্‌ব।

রাত্রে সেই কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম;—ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা ভাল মনে নাই—যখন জ্ঞান হ'ল, চোখ মেলে দেখি তখনো অন্ধকার। পূর্ব্বদিনের সঙ্কল্পের কথা মনে হবামাত্র হৃদ্‌পিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন লাফিয়ে উঠ্‌লো। পাশে ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি ঘুমিয়ে ছিল, একবার শেষ দেখা দেখ্‌বার জন্য তাকালাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলাম না। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শয্যাত্যাগ কর্‌লাম—আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এলাম। পশ্চিম আকাশে ম্লান চন্দ্র—তখনো কিছু রাত আছে। রাস্তায় এসে দেখি আমগাছের তলায় কে দাঁড়িয়ে, সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌লো, আর কেউ নয়—বিশু দাদা। আমায় দেখ্‌বামাত্র অগ্রসর হয়ে বল্‌লে, "তোর জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, অনু! রাত ভোর হয়ে এল, চল্।" বল্‌তে বল্‌তে বিশুদাদা অগ্রগামী হ'ল; আমিও কম্পিত পদে, স্পন্দিতবক্ষে তাঁর পেছু পেছু চল্‌লাম। কেন যেন মন কেমন অবসন্ন হয়ে গেল। মাইল দুই তিন গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখে বল্লাম. "এসো বিশু দাদা একটু জিরিয়ে নেই।"

"না, না, পেছনে যদি লোক আসে! হয় তো তোমাদের বাড়ীর সকলে এতক্ষণ তোমার খোঁজ কর্‌ছে।"

সহসা বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌লো—মনে পড়্‌লো,

কতদিনের কত সুখময় স্মৃতি! কোথায় চলেছি, কি খাব, কে দেখ্‌বে? অবসন্ন হৃদয়ে কাতরভাবে বিশু দাদার দিকে চেয়ে বল্‌লাম,—"বিশুদাদা, চল ফিরে যাই"।

"কেন?"—বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে। লজ্জায় বেদনায় মাথা নামিয়ে অস্ফুটস্বরে বল্‌লাম, "সব্বাইকে ছেড়ে যেতে বড কষ্ট হচ্ছে।"

"সব্বাইকে না ছাড়্‌লে কি হরি মেলে ভাই?—আয়, দেরী করিস্‌নি।

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "না, বিশুদাদা, আমার মন কেমন কর্‌ছে, আমি যেতে পার্‌বো না।"

হায়! সে বার বৎসর আগের কথা এখনো বেশ মনে পড়ে—বালসূর্য্যের কনককিরণোদ্ভাসিত তার জ্বলন্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি সে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে—আজ তুই যেমন বল্‌লি ঠিক তেমনি ভাবে বল্‌লে, "এ তোমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা।"

মর্ম্মবেদনায় দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম; বিশুদাদা স্থিরকণ্ঠে বল্‌লে "ছিঃ, এত দুর্ব্বল তুই! আগে জান্‌লে তোকে সঙ্গে আন্‌তাম না।" মুখ ফিরিয়ে বিশুদাদা চলে যায় দেখে অধীর ভাবে তার হাত জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম "তুমি যেয়ো না বিশুদাদা, চল ফিরে যাই"। ধীরে ধীরে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দ্রুত পদবিক্ষেপে চলে গেল। যতদূর দেখা যায় চেয়ে রইলাম, বিশুদাদা একটী বারও পেছন ফিরে চাইলে না।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত চৈত্রের উদ্বোধনে আমরা সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছি। উহাতে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, উক্ত অনুষ্ঠানটীকে স্থায়িত্বের সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে "প্রথমেই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ কতকটা জমি ক্রয় করা আবশ্যক। জমি পাওয়া গেলেই সদাশয় 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে বাটীনির্ম্মাণকার্য্য সুরু করা যাইতে পারে।" আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাগবাজারের যে স্থানে তিনি এই সদনুষ্ঠানের বীজ রোপণ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই পূতস্মৃতি-মণ্ডিত পল্লীতেই তন্নামধেয় "নিবেদিতা লেনের" উপরে কিঞ্চিদধিক চব্বিশসহস্র (২৪০০০৲) মুদ্রা ব্যয়ে ১৬ কাঠা পরিমাণ একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছে।

এই সমস্ত অর্থের অধিকাংশই ধার করা হইয়াছে এবং বাটীনির্ম্মাণ-কার্য্যে আরও অর্থের প্রয়োজন হইবে। সমস্ত যোগাযোগ হইলে কার্য্য আরম্ভ করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিলে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, বরং ভগবানের কার্য্য ভাবিয়া সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সাহায্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—এইমহাসত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও এই বিপুল ঋণগ্রহণরূপ দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি। এ দায়িত্ব শুধু আমাদের নহে—সমস্ত বাঙ্গালা দেশের—সমস্ত ভারতের। এ দায়িত্বভার শুধু পুরুষের নহে, নারীজাতিরও ইহাতে সমান দায়িত্ব—এমন কি অধিক। কারণ, জগতের সেই মাতৃস্থানীয়া নারীগণের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির বিকাশই এই বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই বিপুল ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমরা সহৃদয় স্বদেশবাসী নরনারীর নিকট আবেদন করিতেছি। বিগত দুর্ভিক্ষের

সময়ে যাঁহারা দুই বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে ইহা অচিরেই সম্পন্ন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা যতই সামান্য হউক, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে। (১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড়, হাওড়া; (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়-ভাণ্ডারে প্রাপ্তি-স্বীকার।

বিদ্যালয়ের জমির জন্য আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান স্বীকার করিতেছি:—

শ্রীহরিদাস মল্লিক, কলিকাতা	২৫৲	শ্রীরামদাস গাঙ্গুলী	১৲
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বদনগঞ্জ	২০৲	শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা	১০০৲
শ্রীমতী চারুমতী দেবী, কৃষ্ণনগর	১৲	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, রুড়কী	২৲
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, আলিগড়	১০০৲	মিঃ ডি, সি, সেনগুপ্ত, সাকচী	১৲
জনৈক বন্ধু	১।০	মিঃ আর, সি, দত্ত	১৲
শ্রীচন্দ্রশেখর কর	৪৲	"মিনার্ভা", বম্বে	১০৲
শ্রীজয়শঙ্কর পীতাম্বর, পুনা	৫০৲	শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ	৪৲
মিঃ পি, কৃষ্ণস্বামী, মান্দ্রাজ	২৲	সেঠ ওয়াসীমল আসোমল, মালয়দ্বীপ	১৫৲
মিঃ এন, ডি, মুদালিয়র	৫৲	ঠাকুর দাস বিঠল দাস, ঐ	১৫৲
শ্রীনন্দলাল বসু,	৫৲	মিঃ জে, রাজচেমর, ঐ	৭॥০
খুচরা আদায়	২১৲	রায়চাঁদ পুরুষোত্তম, ঐ	১৸০
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার	৭৲	মিঃ এস, এম, নারচালীয়া, ঐ	১৸০
শ্রীঅমূল্য চরণ বসু	১০৲	নাথরাম শিবরাম, ঐ	১৸০
মিঃ এস, এন, বি, কলিকাতা	১০০৲	মিঃ পি, এইচ, ওয়াদিলাল, ঐ	৮৸০
গনেন্দ্রনাথ	৪৩/০	মিঃ এল, ডি, সাংডি, ঐ	১৸০
শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত	৪৲	সর্দ্দার বিষণ সিং জী	৩॥০
জনৈকা মহিলা	১৪৬॥৶০	হোসেন, ঐ	২॥৶০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুন্সী, রংপুর	১০৲	মিঃ জি, এইচ, যোসী	৮॥০

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির আয়োজনে বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে মান্যবর জজ্ সার জন উডরফ কর্ত্তৃক তন্ত্র সম্বন্ধে ৬টী বক্তৃতা নিম্নলিখিত তারিখানুযায়ী শনিবার সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিষয়	তারিখ
১। তন্ত্র ও বেদ	২৪শে নবেম্বর
২। জ্ঞান ও উহার শক্তি	১লা ডিসেম্বর
৩। মায়া ও শক্তি	৮ই ,,
৪। বর্ণমালা	১৫ই ,,
৫। শক্তি উপাসনা ও সাধনা	৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮
৬। কুণ্ডলিনী যোগ	১২ই ,,

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অক্টোবর মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের ২১ জন ব্যতীত, আলোচ্য মাসে আরও ৩৯ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪২ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ৪ জন দেহত্যাগ করিয়াছে ও ১৪ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৮৩৩ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৮০ জন নূতন এবং ২২৫৩ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

ঐ মাসে ৩ জন রোগীকে, তাহাদের নিজ বাটীতে ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৩৫৩।০ এককালীন দান ২৩৲ এবং ফলাদি বিক্রয় করিয়া ১৶১৫ হয়। মোট আয় ৩৭৭৷৷৶১৫। ব্যয় হিসাবে, সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ২০৯।৶৫ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে খরচ ৭৮৷৷৶১৫।
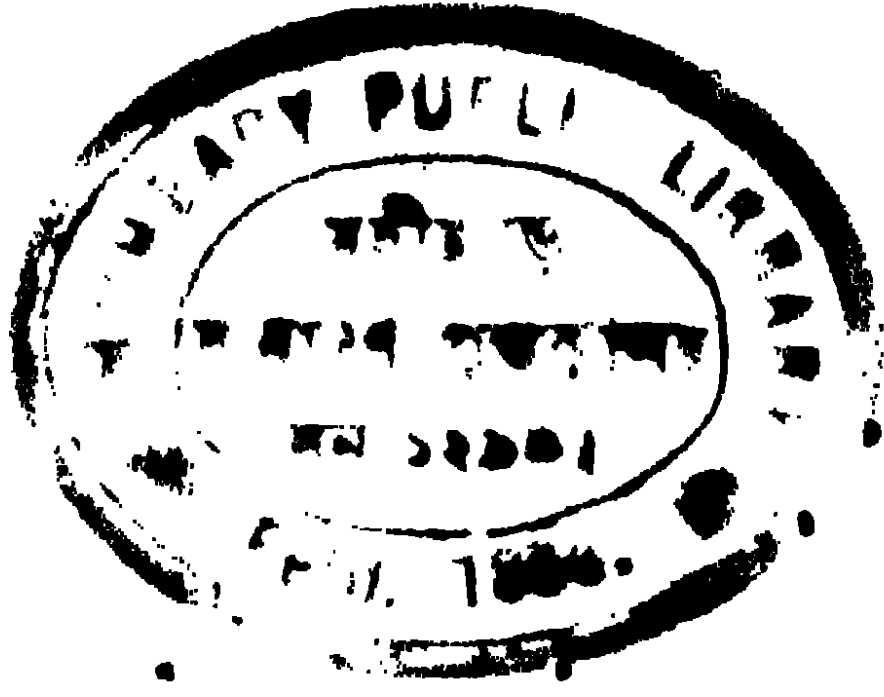
আশ্বাসবাণী।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

মহাপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে জগতে আসেন—জগৎকে আশ্বাসবাণী শুনাইবার জন্য। বৈদিক ঋষি শুনাইয়া গিয়াছেন,

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*　*　*　*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, সকলে শ্রবণ কর। * * আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, অজ্ঞানতমের অতীত। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধও স্বয়ং নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সংসারের সমুদয় পাপী, তাপী, জরা-রোগ-মৃত্যুক্লিষ্ট মানবকে অভয় বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন—এই আধিব্যাধিপূর্ণ সংসার অতিক্রম করিয়া জীবদ্দশায় নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলে তোমার আর কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না।

ভগবান্ শঙ্কর জীবকে শুনাইলেন—তুমি জীব নহ, তুমি শিব—তুমি অজ্ঞানবশে, অবিদ্যাবশে, মায়াবশে আপনার যথার্থ স্বরূপ না জানিয়া কষ্ট পাইতেছ। আপন স্বরূপজ্ঞান উপার্জ্জন কর—গুরুমুখে

বেদান্তের তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ কর, উহার মনন কর, উহার নিদিধ্যাসন কর—তুমি সম্যগ্দর্শন লাভ করিবে—তুমি শান্তি পাইবে।

আর কিঞ্চিদধিক চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবকে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার অপূর্ব্ব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দুঃখ ক্লেশ ভুলিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এখনও তদীয় ভক্ত-শিষ্যগণ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য সংসারের সব ক্লেশ ভুলিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন বর্ত্তমান যুগের কথা ভাবিয়া দেখ। এই সে দিন ভাগীরথীকূলস্থ দক্ষিণেশ্বরে যে অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়া গেল, একবার সেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী জ্ঞানপ্রেম-সমন্বয়াবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় আকুমার বৈরাগী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচনা করিয়া দেখ। তাঁহাদের পবিত্র জন্মদিন সম্মুখে আসিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র নরনারী তাঁহাদের জন্মদিনে আনন্দোৎসবে সম্মিলিত হইবে। কিসের এত আনন্দ? আনন্দ এই জন্য যে, লোকে আবার আশ্বাসবাণী পাইয়াছে—আবার ইঁহারা মানবকে অমৃতের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

তুমি মায়ের ছেলে, তুমি কাহাকে ভয় কর? তুমি সিংহশাবক—নিজেকে শৃগাল মনে করিয়া কেন অনর্থক ভীত হইতেছ?—ইহাই তাঁহাদের অভয়বাণী—ইহাই তাঁহাদের আশ্বাসবাণী।

স্বামিজী বলিলেন—

Sinners? It is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, O lions and shake off the delusion that you are sheep. You are spirits free, blessed and immortal. Matter is your servant, not you the servant of matter.

পাপী পাপী কি বলিতেছ? মানুষকে পাপী বলাটাই যে পাপ! শুদ্ধ মানবাত্মার উপর ইহা যে এক [স্থায়ী] দোষারোপ। তোমরা সিংহ, উঠ। তোমরা মেষ—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠ। তোমরা

মুক্তাত্মা, অমৃতস্বরূপ, নিত্যানন্দময়। তোমরা জড়ের দাস নহ, জড় তোমাদের দাস।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আমরা এখন ছাড়িয়া দি—তাঁহার স্বরূপ-ধারণা আমাদের ধারণার বহু ঊর্দ্ধে—অতীত বলিতেও বলিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার পূতস্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়াছি। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার ভাল-বাসা আমরা লাভ করিয়াছি। এই কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি আমাদের মত মানুষ হইয়া আমাদের সুখে দুঃখে মিশিয়া আমাদের হইয়া খেলা করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে নানা কাযকর্ম্মের মধ্যে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, একটী জীবন্ত আশ্বাসবাণীরূপেই দেখিয়াছি। তিনি এক দিনের জন্য মাত্র আমাদের গীতা পড়াইয়া-ছিলেন। মনে পড়ে, সে দিন তিনি

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। "তুমি বীর তোমাতে এ ক্ষুদ্রভাব সাজে না—অভীঃ অভীঃ—ভয়শূন্য হও—ভয় নাই—" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল কি স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! বলিতে লাগিলেন— মহাপাপীকে ঘৃণা কোরো না—আহা, তখন মুখ হইতে যেন প্রেমের জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—যেন জগতের পাপী তাপী দুঃখী পতিতকে অনন্ত বাহুদ্বারা আলিঙ্গনে অগ্রসর হইয়াছেন!

জগৎ, এখনও কি তোমার আপনার লোক চিনিবে না? তুমি ধনী হও, দরিদ্র হও, পণ্ডিত হও, মুর্খ হও, তুমি পুণ্যাত্মা হও বা পাতকী হও, তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক একটা কঠোর সমস্যা রহিয়াছে, ঘোর অস্বস্তি রহিয়াছে। আর কতকাল সামাজিক কপট জীবন যাপন করিবে? ভাবের ঘরে চুরি ছাড়, মন মুখ এক কর —তোমায় আর কোন সাধন, আর কোন যোগযাগ করিতে হইবে না। তখন তুমি মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইবে।

যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহা এক দিন মগধরাজ্যে উত্তবলাস্ত করিয়া সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, যাহা কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় অর্জ্জুনের নিকট বিঘোষিত হইয়াছিল, যাহা কেরল দেশ হইতে আসিয়া ভারত প্লাবিত করিয়াছিল, যাহা নদীয়া হইতে আসিয়া ভারত মাতাইয়াছিল, যাহা দক্ষিণেশ্বর হইতে সমগ্র জগতে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই বাণী আবার উচ্চারিত হইয়াছে—আবার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—যাহার ইচ্ছা এস—জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উঠ, জাগ, সেই চরম লক্ষ্যে না পঁহুছিয়া ক্ষান্ত হইও না। সামাজিক সমস্যা দুদিনের জন্য, রাজনীতির কোলাহল ক্ষণিক—এ সকল ছাড়াইয়া অনন্ত-সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি হইয়া—ইহলোক পরলোকের ব্যবধান ঘুচাইয়া অনন্ত পথে যাত্রা কর। ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষাদ্বেষি পুঁটুলি করিয়া দূরে, অতি দূরে ফেলিয়া দাও—এ অমৃতের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য—এখানে কেবল আনন্দ, আনন্দ।

মহাপুরুষেরা আসেন ক্ষণেকের জন্য আবরণ উন্মোচন করিতে, যবনিকা অপসারণ করিতে—এ সময়ে পাণ্ডিত্য আভিজাত্য ধনৈশ্বর্য্য ইত্যাদির অভিমানে অন্ধ না হইয়া তাঁহাদের প্রচারিত ভাবস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারিলে গন্তব্য স্থানে পঁহুছান অতি সুগম হয়। অতএব আর কালবিলম্ব করিও না।

বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইলেও সকল মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী একই প্রকার। দার্শনিক বিচার, শব্দের কচকচি যাহাতে বিরোধ বাধে, সে সকল পরে আসে—কিন্তু যথার্থ মহাপুরুষকে বাক্যের সাহায্যও লইতে হয় না—তাঁহার হৃদয় সাক্ষাৎ-ভাবে অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। তাঁহারা আজীবন নিভৃত গিরিগুহাবাসী হইলেও বাক্যবাগীশ বহু উদ্দাম বক্তা হইতে, শব্দ বিন্যাসকুশল বহু সুলেখক হইতে, তাঁহাদের অন্তরের মর্ম্মবাণী নীরবতার অপূর্ব্ব ভাষায় হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করে।

উহাতে বিশ্বসংসারের বাসনা, ভাবনা, আসক্তি, ভুলাইয়া দেয়—কিন্তু সকলকেই আপনার করিয়া তোলে। মায়ামগ্নমানব মহাপুরুষের তত্ত্ব বুঝে না—তাই তাহারা

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।

তাঁহারা যে কোন্ ভাবের প্রেরণায় কখনও 'বজ্রাদপি কঠোরাণি,' আবার কখনও 'মৃদূনি কুসুমাদপি' হন, তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সকল অবস্থায়, সকল ভাবেই যে জীবের কল্যাণকামনায় তাঁহাদের হৃদয় ভরপুর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু যে বলিয়াছিলেন,

আমার ধর নিতাই
প্রাণ আজ আমার করে কেমন
জীবে হরিনাম বিলাতে উঠ্‌লো তুফান প্রেমনদীতে
এখন জীবের দুঃখে আমার হৃদয় বিদরিয়া যায়।

ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতি সত্য কথা। রামানুজ গোপুরমের উপরে উঠিয়া সর্ব্বসাধারণকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র শুনাইতে কেন ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন যীশু বলিয়াছিলেন,—

Come unto me all ye that labour and are heavily laden and I will give you rest.—

কেন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

কেন বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, সমগ্র জগতের পাপ তাপ আমার উপর পড়ুক—জগতের লোক সুস্থ, নিরাময়, নিষ্পাপ হউক?

যাঁহারা বাহির হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ দেখিয়া মহাপুরুষজীবন আলোচনা করেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের হৃদয়ে যে এক সুর বাজিতেছে, সেইটী ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের জীবন বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয়।

সুতরাং মহাপুরুষকে যদি চিনিতে চাও, তবে তাঁহাদের হৃদয়ের সেই এক সুরকে চিনিবার বুঝিবার চেষ্টা কর—তাঁহাদের জীবনের, সমুদয় রহস্য তোমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া আসিবে।

অত চিনিবার, বুঝিবারই বা প্রয়াস কেন? তোমার জীবনের সমস্যাটা কি? তুমি একটা গোলে পড়িয়াছ, তুমি একটা দুরবস্থায় পড়িয়াছ, তুমি, সেই ভাবুক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়, তোমার মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ, ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়াছ।

Life is a sleep and forgetting
The soul that rises with us, our life's start
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar.

মহাপুরুষ আসেন—তোমার সেই ভ্রান্তি দূর করিতে, তোমার সেই ঘুমের ঘোর কাটাইয়া তোমাকে জাগাইতে। যখনই তুমি জাগিলে, তখনই তোমার সব গোল মিটিয়া গেল, জীবনের দ্বন্দ্ব অবসান হইল—তুমি মুক্ত হইলে, তুমি সকল জ্বালা এড়াইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলে।

মানুষের পুরুষকার আছে—মানুষ চেষ্টা করে—প্রবৃত্তির হাত এড়াইতে, রিপুগণকে সংযত করিতে, সৎপথে বিচরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। মানুষ কত জপ তপ করে, কত তপস্যা করে, কত প্রাণায়াম, কত নিষ্ঠা, কত ব্রত, কত সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল চেষ্টা করিতে করিতে আবার সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে—

"জপ করে যে তোমায় পাওয়া সেটা কেবল ভূতের সাজা"

তখন মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী সে দিব্যকর্ণে শুনিতে পায়—কিসের চেষ্টা করিতেছ? কেন ভিখারীর মত হারানিধির অন্বেষণে বেড়াইতেছ? স্বয়ং রাজা হইয়া আপনাকে রাজ্যভ্রষ্ট মনে করিয়া কেন অনর্থক কষ্ট পাইতেছ? সিংহশাবক হইয়া কেন আপনাকে মেষ মনে করিয়া ভীত হইতেছ? তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে

না—কেবল নিজেকে নিজে বুঝিতে হইবে, নিজেকে নিজে জানিতে হইবে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ –

নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন কর—নিজেকে অবসন্ন করিও না।

সাধারণতঃ নীতিবাদীদের শিক্ষানুযায়ী আমরা এক একটী দোষকে সংশোধন করিয়া এক একটী গুণ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু একটা দোষ কতকটা সংশোধন হইতে না হইতে কোথা হইতে শত শত দোষ আসিয়া জুটে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গিয়া, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া একা মন বিব্রত হইয়া উঠে। কামকে তাড়াইলাম, ক্রোধ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল—ক্রোধকে দূর করিতে না করিতে লোভ দেখা দিল। আবার লোভ একটু সংযত হইয়াছে ত অমনি 'আমি সাধু, আমি ধার্ম্মিক'—ইত্যাকার অভিমান আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করিল। এখন কত দিক্ সামলাইবে? তাই বলি, মহাপুরুষগণের বাক্য অনুসরণ করিয়া হৃদয়টাকে একেবারে উচ্চভূমিতে আরোহণ করাও দেখি, দেখিবে, নীচ বাসনা, নীচ ভাব সব এককালে দূর হইয়াছে। তুমি যেন মর্ত্ত্য-ভূমি হইতে উন্নীত হইয়া একেবারে অমরধামে উপনীত হইয়াছ, বোধ করিবে। এ কবিকল্পনা নয়, সাধনরাজ্যের কঠোর সত্য।

তাই বলি, মহাপুরুষদের আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিতে শিখ—জানিয়া রাখ, তাঁহারা অমররাজ্য হইতে এই মরজগতে আনন্দসন্দেশ বহন করিয়া আনিতেছেন–তাঁহারা ঈশ্বরের মূর্ত্ত রূপ। ঈশ্বর মর্ত্ত্য-লোকে মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হন, মর্ত্ত্য নরনারীকে মররাজ্য হইতে তুলিয়া নিজ পদবীতে আরোহণ করাইবার জন্য।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

সংশয় বর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজের অজ্ঞতা দূর করিয়া জ্ঞান লাভ কর।

বিশ্বাস, বিশ্বাস—অনন্ত বিশ্বাস। পাপ, অবনতি, পতন—এ সকল চক্ষের সমক্ষে শত সহস্র হইতে দেখিলেও বিশ্বাস হারাইও না।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—এই বেদবাণীকে মিথ্যা মনে করিও না। যদি জগতের সকল সাধুর উপর, সকল ভক্তের উপর, সকল মহাপুরুষের উপর তোমার সন্দেহ আসে—তথাপি যাঁহা হইতে সকল সাধুত্ব, সকল ভক্তি; সকল মহত্ত্বের উদ্ভব, সেই তোমার অন্তর্যামী হৃদয়দেবতার মহিমার উপর বিশ্বাস হারাইও না। একবার তাঁহার সঙ্গে সম্মিলন হইলে তুমিই মহাপুরুষ হইয়া বহু লোকের হৃদয়ে আশ্বাসবাণী দিবে—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তোমার জীবন সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের মত শত শত যাত্রীকে আলোকপ্রদান করিবে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

আর একটী ঘটনা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। উহা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে তাঁহার চকিত দর্শন লাভ। রাত্রিকাল; স্বামিজী ও আর একজন কাশীপুরের বাটীর বাহিরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। যে শোক তৎকালে তাঁহাদের হৃদয়কে দুর্ব্বিসহ ভারাক্রান্ত করিয়াছিল, তাঁহারা নিঃসন্দেহ তাহারই প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। মাত্র কয়েক দিন হইল তাঁহাদের আচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সহসা স্বামিজী দেখিলেন, একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। .... কয়েক মিনিট পরে তাঁহার বন্ধু রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি দেখিলাম? ও কি দেখিলাম?"

দুই ব্যক্তির একই সময়ে কোন ছায়ামূর্ত্তি দেখার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছিল।

যিনি এবম্প্রকার অনুভূতিসকল লাভ করেন, তাঁহার মনের মধ্যে উহারা সহজেই কতকগুলি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিয়া থাকে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে "থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক" হইতে লিখিত একখানি পত্রে স্বামিজী উক্ত বিশ্বাসগুলির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, কেন হিন্দুগণ মানুষকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া থাকেন। ... . পরলোকবাসিগণই একমাত্র তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী, কিন্তু তাহারাও অপর একটী সূক্ষ্ম দেহধারী মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং তাহাও হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ। তাহারা এই পৃথিবীতেই অপর কোন আকাশে বাস করে, এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে, এবং আমাদের ন্যায় তাহাদেরও মন ইত্যাদি সমস্ত আছে। সুতরাং তাহারাও মানুষ। দেবগণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয়, অন্যান্য সকলে পুনরায় মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে।

যাঁহারা আমাদের আচার্য্যদেবকে আপ্তপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত উক্তিসকলের একটা নিজস্ব মূল্য থাকিবে। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে, যেখানে স্বামিজী শুধু একটী অনুমান বা শুধু একটী মত প্রকাশ করিতেছেন, সেখানেও উহার মূলে কোন না কোন অনন্যসাধারণ উপলব্ধি নিহিত আছে।

যখন তাঁহার আমেরিকার প্রথম বারের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, প্রথমে তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তাসম্পদ্ অকাতরে দান করার পর তিনি এখন উহাদিগের বিশালতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহাদের বিশেষত্বগুলি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে এখন উহাদিগকে

কয়েকটী মুখ্য চিন্তাসূত্রে একত্র গ্রথিত ও সংহত করা চলে। একবার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই তিনি সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন যে, দেহান্তে আত্মার গতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বেদান্ত সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইতেই পারে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার প্রথমবার ইংলণ্ড আগমনকালে তিনি জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম্মমতকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিতে হইলে উহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে তিনি অবহিত আছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দুই জন যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায়, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যুবকদ্বয় সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, "যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিক হইতে ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন এবং অলৌকিক রহস্যাদির দিকও মাড়ান না।" তিনি লিখিয়াছিলেন, "ইহা আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। সাধারণ লোকের জন্য কিছু না কিছু অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে সচরাচর ধর্ম্ম বলিতে লোকে শুধু প্রতীকাদি ও কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা স্থূলাকারপ্রাপ্ত দর্শনকেই বুঝিয়া থাকে। কেবল শুষ্ক দর্শন মানবের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।"

এইরূপে তাঁহার মধ্যে যে সংগঠনী কল্পনা (যাহা শুধু ভাঙ্গে না, নূতন কিছু গড়িতে চায়) উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সেই বন্ধুকেই লিখিত পরবর্ত্তী দুই তিনখানি পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার একখানিতে জনৈক বিখ্যাত তড়িত্তত্ত্ববিদের সহিত কথোপকথনজনিত মানসিক উত্তেজনা তাঁহার তখনও রহিয়াছে—তিনি প্রাণ ও জড়ের সম্বন্ধরূপ সমগ্র সমস্যাটীকে খণ্ডন করিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কি শিখিতে পারা যায় তাহারও একটী সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছেন। পত্রখানি পড়িলেই সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের বন্ধু বেদান্তোক্ত প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্ব শ্রবণে

মুগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার মতে একমাত্র এই সকল মতই আধুনিক বিজ্ঞানের গ্রাহ্য। আবার প্রাণ ও আকাশ উভয়েই সমষ্টিমহৎ বা ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। তিনি মনে করেন যে, তিনি গণিতশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, প্রাণ ও জড়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। আগামী সপ্তাহে আমি তাঁহার নিকট গিয়া ঐ নূতন গণিতের প্রমাণটী দেখিয়া আসিব, এইরূপ কথা আছে।

"তাহা হইলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। আমি এক্ষণে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ ঐক্য স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এবং একটী সরলভাবে প্রতিপাদিত হইলেই অপরটীও হইয়া যাইবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি গ্রন্থ লিখিবার আমার ইচ্ছা আছে। তাহার প্রথম অধ্যায় সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক হইবে, এবং উহাতে বৈদান্তিক মতসমূহ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইবে।

ব্রহ্ম = The Absolute.
|
মহৎ বা ঈশ্বর = Primal Creative Energy.
|
প্রাণ আকাশ = Force and Matter.

"জীবাত্মার গতি কেবল অদ্বৈতবাদ দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন যে, জীবাত্মা মৃত্যুর পর যথাক্রমে সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও বৈদ্যুতলোকে গমন করেন। তথা হইতে এক অমানব পুরুষ উঁহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। (অদ্বৈতবাদী বলেন, তথা হইতে তিনি নির্ব্বাণ পদবী লাভ করেন।)

"অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, আত্মা আসেনও না, যানও না, এবং এই সকল লোক বা জগতের বিভিন্ন স্তর কেবল আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন রূপস্বরূপ। অর্থাৎ, সর্ব্বনিম্ন, বা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল লোক—সূর্য্যলোক; উহাতে প্রাণ জড়শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থরূপে। ইহার পরে চন্দ্রলোক, উহা সূর্য্যলোককে

বেষ্টন করিয়া আছে। এতদ্বারা আদৌ চন্দ্র বুঝায় না—দেবতাদিগের আবাস বুঝায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রারূপে প্রকাশ পায়। তাহারও পরে বৈদ্যুত-লোক, অর্থাৎ একটী অবস্থা যেখানে প্রাণ আকাশ হইতে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, আর বিদ্যুৎ প্রাণ না জড়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তাহার পর ব্রহ্মলোক, যাহার প্রাণ বা আকাশ কিছুই নাই, উভয়েই মহৎ বা আদিশক্তিতে লীন হইয়া আছে। এইখানে প্রাণ, আকাশ কিছুই না থাকায় জীব সমগ্র জগৎকে সমষ্টিমহৎরূপে ভাবনা করেন। ইহা বৈরাজপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি ইহা ব্রহ্ম নহে, কারণ তখনও বহুত্ব রহিয়াছে। তথা হইতে জীব সেই একত্বে পৌঁছান, যাহা চরম লক্ষ্য। অদ্বৈতবাদ বলে যে, এই সকল জীবের মনে ক্রমান্বয়ে উদিত কল্পনা মাত্র; জীব স্বয়ং আসেন না যানও না; এইরূপেই বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, কেবল একটাতে বিকাশ, অপরটাতে সঙ্কোচ বুঝায়।

"এখন, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাহার নিজের জগৎটাই দেখিতে পায়, সেইহেতু সে জগৎ তাহার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়—যদিও অপর যাহারা বদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে উহা বর্ত্তমান থাকে। নামরূপ লইয়াই জগৎ। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ কেবল ততক্ষণই তরঙ্গ, যতক্ষণ উহা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন থাকে। তরঙ্গ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সমুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু তখন ঐ নামরূপ তৎক্ষণাৎ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং যে জল নামরূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল তাহা ব্যতীত তরঙ্গের ঐ নামরূপ থাকিতেই পারে না, কিন্তু নামরূপ কিছু তরঙ্গ নয়। তরঙ্গ জলে মিশিয়া যাইলেই ঐ নামরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য তরঙ্গের সম্বন্ধে অপরাপর নামরূপ তখনও বর্ত্তমান থাকে। এই নামরূপই মায়া, আর ঐ জল ব্রহ্ম। তরঙ্গ সর্ব্বদা জল ছাড়া অপর

কিছুই ছিল না, তথাপি যতক্ষণ উহা তরঙ্গ পদবাচ্য ছিল ততক্ষণ উহার নামরূপও ছিল। আবার ঐ নামরূপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তরঙ্গ হইতে পৃথক থাকিতে পারে না, যদিও জলাকারে ঐ তরঙ্গ অনন্তকাল নামরূপ হইতে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু যেহেতু নামরূপকে পৃথক করা যায় না, সেইহেতু তাহারা সৎ একথা বলা যায় না। তথাপি তাহারা শূন্য নহে। ইহাই মায়া।

"আমি এইগুলিকে সাবধানে বিস্তারিত করিতে চাই, কিন্তু আমি যে ঠিক পথে চলিয়াছি, তাহা আপনি নিজেবেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার জন্য আমাকে শারীরবিজ্ঞান আরও বেশী করিয়া পড়িয়া উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির কাহার কতটুকু ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমি এখন স্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে আর হাবজা গোবজা কিছু নাই।"

আবার এই পত্রখানিতে, অন্যান্য বহু স্থলের ন্যায়, আমরা স্বামিজীর প্রতিভার সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিধায়িনী শক্তির পরিচয় পাই। আচার্য্য শঙ্কর যে উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার নড়চড় হইতে দেওয়া হইবে না। "আত্মা আসেনও না, যানও না"—এই বাক্য চিরকালের জন্য সত্য থাকিবে, এবং অপর সকল সত্যের উপর আধিপত্য করিবে। কিন্তু যাঁহারা অপর প্রান্ত হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরিশ্রমও বৃথা যাইবে না। অদ্বৈত-বাদীর দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি, এবং দ্বৈতবাদীর মনের পূর্ব্বাপর অবস্থাসমূহকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য করিয়া যাওয়া—এদুইটাই পরস্পরের এবং নূতন ধর্ম্মব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক।*

* স্বামিজীর প্রশ্নোত্তরাকারে একখানি পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি এস্থলে যে সকল ভাবের পূর্ব্ব

কিন্তু মৃত্যু জিনিষটাকে বাহির হইতে দেখিলেই তবে উহাকে ঠিক চিনিতে পারা যায়। নিজ আত্মীয়বিচ্ছেদে আমরা এই চিরন্তন নিয়তির মহাসত্যগুলিকে তত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না, যেমন গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসাপ্রণোদিত হইয়া আমরা অপরের দুঃখে আমাদের সহানুভূতিটাকে জলন্তভাবে চিত্রিত করিতে গেলে দেখিতে পাই। যে সান্ত্বনার উপর আমরা নিজেদের বেলায় নির্ভর করিতে সাহসী হই না, তাহা অপরের জন্য অন্বেষণ করিতে গেলে মধ্যাহ্নতপনের ন্যায় স্পষ্ট; দৃঢ় বিশ্বাসরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামিজীও যে এই নিয়মের পার ছিলেন তাহা নয়, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। পত্রখানি তিনি যাঁহাকে "ধীরা-মাতা" বলিতেন, সেই আমেরিকাবাসিনী মহিলাকে তাঁহার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। ইহাতে আমরা তাঁহার সার বিশ্বাসটুকু আত্মীয়তা ও সহানুভূতি দ্বারা সঞ্জীবিত দেখিতে পাই এবং উহা হইতে আমাদের প্রিয়জনেরাও মৃত্যুর পর কিরূপ গতি লাভ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও কতকটা আভাস প্রাপ্ত হই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্রুকলীন হইতে এই শোকসন্তপ্ত মহিলাটীকে লিখিতেছেন, "আপনার পিতা যে জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, আর যখন কোন ভাবী অপ্রিয় মায়াতরঙ্গ কাহাকেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহাকে পত্র লেখা আমার রীতি নহে। কিন্তু এইগুলিই জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ, এবং আমি জানি, আপনি বিচলিত হন নাই। সমুদ্রের উপরিভাগ পর্য্যায়ক্রমে উঠিতেছে ও নামিতেছে, কিন্তু যিনি সাক্ষিস্বরূপ, আনন্দময়ের সন্তান, তাঁহার নিকট প্রত্যেক পতন সমুদ্রের গভীরতা এবং তাহার তলদেশে

সূচনা দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তখনও চিন্তা করিতেছেন। "ব্রহ্ম ও মায়া" "বহির্জ্জগৎ এবং তাঁহার আমেরিকায় প্রদত্ত "মানবের যথার্থস্বরূপ" এবং "সৃষ্টিতত্ত্ব"—এই বক্তৃতা-গুলি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

যে অসংখ্য মণি-মাণিক্য-প্রবালাদি সঞ্চিত আছে, তাহাই অধিকতর-রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। আসা যাওয়া নিরবচ্ছিন্ন ভ্রম মাত্র। আত্মা কখনও যানও না আসেনও না। যখন সমগ্র দেশই আত্মার ভিতরে তখন এমন স্থান কোথায় যেখানে আত্মা যাইতে পারেন? যখন সমগ্র কালই আত্মার ভিতরে তখন এমন সময় কখন হইবে, যখন তিনি শরীরে প্রবেশ এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন?

"পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু সূর্য্য স্থির আছেন। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া গতিশীল, পরিবর্ত্তনশীল,—আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিতেছেন, এই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন, আর সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্থির অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জ্ঞানামৃত পান করিতেছেন। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকল আত্মাই বর্ত্তমান কালে, এবং একটা জড় উদাহরণ গ্রহণ করিলে—সকলে একই জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত। যেহেতু আত্মার দেশ বোধ নাই, সেই হেতু যাহা কিছু আমাদের ছিল, আছে এবং হইবে, সমস্তই সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, সর্ব্বদা সঙ্গে ছিল, এবং সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিবে। আমরা তাহাদের ভিতরে, তাঁহারা আমাদের ভিতরে।

"ঘর কতকগুলি গোলাকার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। যদিও প্রত্যেকে পৃথক, তথাপি সকলেই কথতে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ঐখানে তাহারা এক। প্রত্যেক এক একটা স্বতন্ত্র বৃত্ত, তথাপি সকলে কেথ মেরু-রেখায় এক। কেহই ঐ মেরুরেখা হইতে সরিয়া যাইতে পারে না, এবং উহাদের কোনটা যতই মেরুরেখা হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করুক না কেন, তথাপি মেরুরেখায় দণ্ডায়মান হইয়া আমরা প্রকোষ্ঠগুলির যে কোনটাতে প্রবেশ করিতে পারি। এই মেরুরেখাই ঈশ্বর। ঐখানে আমরা তাঁহার সহিত এক, সকলেই পরস্পরের মধ্যে এবং সকলেই ঈশ্বরে রহিয়াছে।

"চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিয়া যায়, ভ্রম হয় যেন চাঁদ চলিয়া

যাইতেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ ও জড়পদার্থ গতিশীল, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যেন আত্মা গতিশীল। এইরূপে আমরা অবশেষে দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতির কি উচ্চ, কি নীচ, সকল লোকেই যে সহজাত সংস্কার (না, দৈবপ্রেরণা?) বশে মৃতব্যক্তিগণ কখন কখনও নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া অনুভব করে, তাহা বিচারের দিক হইতেই সত্য।

"প্রত্যেক আত্মা এক একটী নক্ষত্র, এবং সকল নক্ষত্র ঈশ্বররূপী সেই অনন্ত নীলিমার, সেই অনাদি অনন্ত আকাশে খচিত রহিয়াছে। ঐ খানেই প্রত্যেকের এবং সকলের মূল, যথার্থ সত্তা, এবং যথার্থ ব্যক্তিত্ব। এই নক্ষত্রসমূহের মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্রবালের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে অন্বেষণ করাতেই ধর্ম্মের সূত্রপাত, এবং তাহাদের সকলকে ঈশ্বরে এবং আমাদিগকেও সেই স্থলেই দেখিতে পাওয়া—ইহাই ধর্ম্মের শেষ। সুতরাং সমগ্র রহস্য এই যে, আপনার পিতা পরিহিত জীর্ণ বস্ত্রখানি, ফেলিয়া দিয়াছেন, এবং যেখানে তিনি অনাদি অনন্ত কাল হইতে আছেন, সেই খানেই দণ্ডায়মান আছেন। এই জগতে বা অপর কোন জগতে তিনি ঐরূপ আর একখানি বস্ত্র প্রকট করিবেন কিনা? আমার আন্তরিক প্রার্থনা তিনি যেন না করেন, যতদিন না তিনি উহা পূর্ণজ্ঞানের সহিত করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কেহ নিজ কৃতকর্ম্মের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা কোথাও বলপূর্ব্বক নীত না হয়। প্রার্থনা কর, যেন সকলেই মুক্ত হয়, অর্থাৎ জানিতে পারে যে তাহারা মুক্তই আছে। আর যদি তাহাদিগকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিতে হয়, তবে আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি, যেন তাহাদের স্বপ্ন শান্তি ও আনন্দেরই স্বপ্ন হয়।"

মায়া।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী

মিথ্যাজ্ঞানের নামই মায়া।

শ্রুতি "নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন"—এখানে বহু নাই, সবই এক, 'মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—কেবল মায়ার জন্যই বহুজ্ঞান হয়, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—যে বহু দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, "যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি" যে ব্রাহ্মণাদি জগতে আত্মদর্শন করে না এবং সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সৎ বিবেচনা করে, সেই মিথ্যাদর্শীকে সেই মিথ্যাদৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি জগৎ পরাভব করে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বহুজ্ঞানকে মিথ্যা এবং মায়াকেই উক্ত বহুজ্ঞানের কারণ বলায় মিথ্যাজ্ঞানকেই মায়া বলা যায়। এতদ্ভিন্ন শ্রুতি "ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্"—আদিতে ব্রহ্মই ছিলেন এবং অন্তেও কেবল তিনিই থাকিবেন, "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ"—যে ব্যক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দর্শন করে, তাহাকে সেই পদার্থ সকল পরাস্ত করিয়া থাকে, এই দুই বাক্যও ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, যাহার আদ্যন্ত ব্রহ্ম, তাহার মধ্যও ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান মিথ্যা বলিয়া, যে ব্যক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দেখে, সে কেবল মিথ্যাই দেখিয়া থাকে এবং অমৃতত্বের অভাবে মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান যখন মিথ্যা এবং যখন মায়ার জন্যই উক্ত মিথ্যাবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে, তখন অবশ্য মিথ্যাজ্ঞানই মায়া।

এই মায়া বা মিথ্যাজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি, অপরটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি। মায়া যে শক্তির দ্বারা

ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, সেই শক্তির নাম আবরণ শক্তি ; এবং যে শক্তির দ্বারা মিথ্যা জাগতিক পদার্থসমূহের কল্পনা করে, সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ অর্থাৎ কল্পনা শক্তি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ যথা—"বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ"—বিক্ষেপ শক্তির দ্বারাই মিথ্যা জাগতিক পদার্থ সমুদয় কল্পিত হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন, "মায়া হেষা ময়া সৃষ্টা"—এই মায়া মৎ-কর্তৃক সৃষ্টা হইয়াছে। আবার শ্রুতিও "য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ"—এক অদ্বিতীয় মায়াবী মহেশ্বর সমস্ত লোককে স্বীয় মায়া শক্তির দ্বারা শাসিত করেন, এই বাক্যে মায়াকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং মায়া যখন ব্রহ্মেরই শক্তি, অথবা ব্রহ্মের শক্তির নামই যখন মায়া, তখন আর মায়াকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব বলিতে পারা যায় না ; এবং মায়ার নিরপেক্ষ অস্তিত্বও নাই। কারণ, "শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি" শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অথবা "শক্তিশক্তি-মতোরভেদঃ"—শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ।

যদিও ব্রহ্ম ও মায়া অনন্য, তথাপি ব্রহ্মে কিন্তু মায়া নাই—ব্রহ্ম মায়াতীত। কারণ শ্রুতি মায়াকল্পিত পদার্থসমূহকে "বাচারম্ভণং" বাক্যের আড়ম্বর অর্থাৎ কেবল কথা বা নাম মাত্র বলিয়া-ছেন ; সুতরাং কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি নামরূপ যেমন সুবর্ণে থাকিয়াও সুবর্ণের সুবর্ণত্বের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না, মায়াও তদ্রূপ নিত্যকাল ব্রহ্মে থাকিয়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না—ব্রহ্মের কূটস্থ অবস্থার অল্প মাত্রও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ"—এই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা অসঙ্গস্বভাব। ভগবান্ও বলিয়াছেন, "অবিকার্য্যোঽয়-মুচ্যতে"—আত্মা অবিকার্য্য।

একণে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি যখন মায়া শক্তির কার্য্যকেই "কেবল কথা বা নাম মাত্র" বলিয়াছেন, তখন আর কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এস্থলে সাধু নহে ; কারণ, মায়া ত

আছেই। সুতরাং তদুত্তর এই যে, কেবল নামরূপই যে শক্তির কার্য্য, অর্থাৎ যে শক্তি "কেবল নামরূপ" ছাড়া তত্ত্বতঃ আর কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অথবা কার্য্যান্তকালে আর থাকে না; যেমন সাগরে তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার শক্তি পূর্ব্বোক্ত ছিল না এবং পরেও থাকে না। সুতরাং কার্য্যকালেই হউক আর তৎপূর্ব্বে বা পরেই হউক, মায়া কোনও কালে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেই জন্যই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বকালে ও সৃষ্টিকালে অর্থাৎ উভয় কালেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়াছেন। অতএব, যাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকে না, তাহা মধ্যে জ্ঞানের বিষয় হইলেও সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক বলিয়া, মিথ্যাজ্ঞানের নামই মায়া। সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন, "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।" অর্থাৎ যাহার আদি ও অন্ত অব্যক্ত, তাহার মধ্যও অব্যক্ত; তবে যে মধ্যাবস্থা ব্যক্ত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক; অতএব হে ভারত, মিথ্যা বিষয়ের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া শোক করিতেছ কেন?

মায়ার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। সেই জন্যই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন "ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা"—যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় তাহাই মায়া। বাস্তবিক যাহা অজ্ঞানাবস্থায় বস্তুর ন্যায় সাবয়ব ও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানাবস্থায় আর থাকে না, তাহাকে কি প্রকারে নির্ব্বচন করা যাইবে? অতএব বেদান্ত-সার বলিয়াছেন, "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ"—অজ্ঞান সদসৎ হইতে ভিন্ন, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী এবং যৎকিঞ্চিৎ ভাবরূপী অনির্ব্বচনীয় কোন কিছু। অজ্ঞান অর্থে "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানাভাব নহে। কারণ, জ্ঞান শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহা যে "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" নহে,

তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। শাস্ত্রে চৈতন্য, এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বলে; আবার জ্ঞানকে আত্মগুণও বলা যায়। এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রথমতঃ যে চৈতন্যকে জ্ঞান বলা যায়, তাহা নিত্য নিরবয়ব চৈতন্যের নিত্য সহচর বলিয়া কস্মিন্ কালেও তাহার অভাব স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিবৃত্তিকে যে জ্ঞান বলা যায়, তাহা বাস্তবপক্ষে জ্ঞান নহে। কেন না, উহা যখন চৈতন্যব্যাপ্ত হইয়াই বস্তুর প্রকাশক হয়, অর্থাৎ উহা যখন চৈতন্য ছাড়িয়া স্বয়ং কিছুই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, তখন উহা জড়; সুতরাং যাহা জড়, তাহা জ্ঞান নহে। অতএব, বুদ্ধির অভাবও প্রকৃত জ্ঞানাভাব নহে। তৃতীয়তঃ আত্মগুণকে যে জ্ঞান বলা যায়, তাহারও একবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ, যখনই বলা যাইবে "আমি অজ্ঞান ছিলাম—কিছুই জানিতেছিলাম না" তখনই জ্ঞান থাকাও প্রমাণিত হইবে; ইহা একটা অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। বাস্তবিক, অননুভূত বিষয়ের কখনও স্মৃতি হইতে পারে না; কারণ, স্মৃতি শব্দের অর্থ ই—"পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় অবিদ্যমানে পরে স্মরণ।" সুতরাং অজ্ঞানের স্মৃতিই তাৎকালিক জ্ঞান থাকার প্রমাণ বলিয়া, জ্ঞানাভাব আদৌ অস্বীকার্য্য! অতএব অজ্ঞান অর্থে "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানাভাব নহে। পূর্ব্বে যে মিথ্যা জ্ঞানকে মায়া বলা হইয়াছে, উহা সেই মিথ্যাজ্ঞান। জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাবিষয়ক। ইহাই মায়ার সেই আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। একটী ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপকে আবৃত করে, অপরটী ঐ অবকাশে সেই স্থানে মিথ্যা জাগতিক পদার্থসমূহ কল্পনা করিয়া জ্ঞানকে মহাভ্রমে পাতিত করে।

শ্রুতির "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—ব্রহ্ম স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন, এবং "অহমবিক্রিয়ঃ"—ব্রহ্ম বিকাররহিত, এই দুই বাক্যে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, বিবর্ত্তবাদই শ্রুতির অনুমোদিত। কারণ কার্য্য দুই প্রকার—বিকার্য্য ও বিবর্ত্ত। কারণ স্বরূপচ্যুত হইয়া যে কার্য্য জন্মায়, সেই কার্য্যের নাম বিকার্য্য এবং স্বরূপচ্যুত না হইয়া যে

কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই কার্য্যের নাম বিবর্ত—"সতত্বতোঽন্যথা-প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥" দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, এবং সমুদ্রে তরঙ্গ হয়, তাহা বিবর্ত্ত। অতএব, জগৎকারণ ব্রহ্ম যখন স্বয়ং এই জগৎ হইয়াও বিকারগ্রস্ত হন না—তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না, তখন অবশ্য শ্রুতি মতে ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত স্থলে রজ্জু-সর্পকে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মত কখনই শ্রুতির অনুমোদিত নহে। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মে ভ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "পরোরজঃ" অর্থাৎ অজ্ঞানতিমিরের অতীত বলিয়াছেন, তখন আর রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইতে পারে না; অর্থাৎ ব্রহ্মে কখনও ভ্রম থাকিতে পারে না। পঞ্চদশীকার বিবর্ত্তবাদ বুঝাইতে প্রথমতঃ যে "অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ"—স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তর জ্ঞান হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়; যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতির অনুমোদিত নহে; পরন্তু তিনি যে তৎপরে বলিয়াছেন "মৃদ্রূপস্যাপরিত্যাগাৎ বিবর্ত্তত্বং ঘটে স্থিতম্। মৃৎসুবর্ণে নিবর্ত্তেতে ঘটকুণ্ডলয়োর্নহি" মৃত্তিকা রূপের অপরিত্যাগ হেতু ঘট মৃত্তিকার বিবর্ত্ত ইহা বলা যায়; ঘট ও কুণ্ডল, মৃত্তিকা ও সুবর্ণের বিবর্ত্ত-কার্য্য; এই জন্যই তাহাতে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের পূর্ব্বরূপ ত্যাগ হয় না, ইহাই শ্রুতির অনুমোদিত। আর শিষ্টদিগের রীতি অনুসারে যখন শেষ মতই বক্তার অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, তখন অবশ্য শেষোক্ত মতই পঞ্চদশীকারের। বাস্তবিক রজ্জুতে সর্পভ্রমরূপ বিবর্ত্তকার্য্য যে পঞ্চদশীকারের আদৌ অভিপ্রেত নহে তাহা তাঁহার "এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে"—তাহাতে মৃত্তিকাদির বিবর্ত্ত দৃষ্টান্ত বিষয়ে কোন হানি নাই, এবং "অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ। অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা"—শ্রুতিতে আছে, এই জগতের নামরূপ আমি প্রপঞ্চিত করি; সৃষ্টির

পূর্ব্বে অব্যক্ত যে ঈশ্বরশক্তি, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশিত হইয়া নাম ও রূপ এই দুই প্রকার হয়, এই দুই বাক্যে স্পষ্ট অনুমিত হয়। শ্রুতি মতে সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে বিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে; তবে যে উহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ নামরূপ; নামরূপই ঐ পার্থক্য রচনা করিয়াছে। অতএব যাহাতে "কেবল নামরূপ" ছাড়া যথার্থতঃ আর কিছুই সৃষ্ট হয় না, সেইরূপ বিবর্ত্তকার্য্যই শ্রুতিসম্মত; কিন্তু নামরূপের ভ্রম হওয়ারূপ বিবর্ত্তকার্য্য নহে। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "তন্নামরূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত"—তাহা (জগৎ) কেবল নামরূপের দ্বারাই ব্যক্ত করিলেন। অতএব, নামরূপই মায়া। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন, "এই নামরূপকেই মায়া বলে" "এই মায়া নামরূপেরই কার্য্য।" তবে উহাকে মিথ্যাজ্ঞান বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যকালে সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইলেও তৎপূর্ব্বে বা পরে উহা যখন আর থাকে না, অথবা উপাদান হইতে উহার যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তখন উহা কার্য্যকালে জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আত্যন্তিক মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মাদের ন্যায় তাত্ত্বিক অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে; সুতরাং উক্ত নামরূপ মিথ্যা বলিয়া, নামরূপ বা মায়াসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়। মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান বলিবার আরও বিশেষ সার্থকতা এই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইলেও জীবগণ সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক জানিয়া আর উহার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন ভ্রম নাই, তখন তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান হইবে কি প্রকারে? কারণ, ভ্রম এবং মিথ্যাজ্ঞান ত একই; তবে কেবল নামমাত্র প্রভেদ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে সে জ্ঞানকে যেমন মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম বলা যায়, এস্থলে মিথ্যাজ্ঞান সেরূপ নহে। কারণ, শ্রুতি যখন স্পষ্টই "তন্নাম-রূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত"-নামরূপের দ্বারা এই এই জগৎকে সৃষ্টি করিলেন,

বলিয়াছেন, তখন আর জগতের জ্ঞান মিথ্যা নহে। সমুদ্রে যে তরঙ্গের জ্ঞান হয়, তাহা কি রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা? তবে যখন উপাদান হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে যাইলে আর থাকে না, তখন উহা মিথ্যাই। সুতরাং মিথ্যা বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বলিয়া মায়াকে "মিথ্যাজ্ঞান" বলা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দও জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন, "আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটী মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নামরূপকেই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃজন করিয়া এক জনকে আর এক জন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না। রূপের অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে।" অতএব মিথ্যাজ্ঞান অর্থে "কিছুই নাই অথচ জ্ঞান হইতেছে" নহে; পরন্তু যাহার জ্ঞান হইতেছে তাহা মিথ্যা। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় দেববাণীতে বলিয়াছেন, "মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।" এস্থলে আরও একটী বক্তব্য বিষয় এই যে যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করকে বিজ্ঞান-বাদী স্থির করিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা আচার্য্যকৃত বেদান্তের "নাভাব উপলব্ধেঃ"—এই সূত্রের ভাষ্যমর্ম্ম আদৌ অবগত নহেন। কারণ, আচার্য্য শঙ্কর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে "ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি"—বহির্ব্বস্তুর অভাব অবধারণ করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহার উপলব্ধি হয়—বাহিরে স্তম্ভ দেখিয়া তবে স্তম্ভের জ্ঞান হয়। ভিত্তি, ঘট, পট

ইত্যাদি অগ্রে বাহিরে দেখিলে তবে তাহাদের জ্ঞান হয়, এই বাক্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন; এবং আরও তিনি ঐ সূত্রের ভাষ্যেই বিজ্ঞানবাদীর "নন্থ নাহমেবং ব্রবীমি ন কঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি, কিন্তূপলব্ধিব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি" কিছু অনুভব করি না এরূপ কথা আমরা বলি না; অনুভব করি সত্য, কিন্তু অনুভূতি ব্যতিরিক্ত অন্য বাহ্যার্থ কিছুই অনুভব করি না, এই বাক্যের প্রতি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, "বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি"—তোমাদের মুখের অঙ্কুশ নাই, তাই তোমরা ঐরূপ বল; যদি উপযুক্ত অঙ্কুশ থাকিত, তাহা হইলে আর ঐরূপ বলিতে না। এতদ্ভিন্ন তিনি বেদান্তের "মায়ামাত্রন্ত" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে "মায়ামযোব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি" স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী; তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই, এইরূপ বলিয়া সর্ব্বশেষ "তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্"—অতএব স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র, বলিয়াছেন। অতএব, মায়া সম্বন্ধে কথিত মতই আচার্য্য শঙ্করের অনুমোদিত। তবে যে তিনি বেদান্তের ভাষ্য-ভূমিকায় "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ" এই বাক্যে মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য—মায়া পরমার্থতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইতেছে বলিয়া উহার মিথ্যাত্ব জানাইবার জন্য।

এক্ষণে পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, মিথ্যায় যদি মিথ্যা বুদ্ধি না হইয়া সত্য বুদ্ধি হয়, তবে ত তাহাই ভ্রম। সুতরাং তদুত্তর এই যে, শ্রুতি যখন "নামরূপে সত্যম্" নাম ও রূপ সত্য, এই বাক্যে নাম রূপকে সত্য বলিয়াছেন, "এবং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—বিধাতা ঠিক পূর্ব্বকল্পের ন্যায় এ কল্পেও চন্দ্র সূর্য্য সৃজন করিলেন, এই বাক্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের নামরূপের সহিত পর পর কল্পের নামরূপের সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের ন্যায় বর্ত্তমানকল্পেও আম গাছে আম হইতেছে কিন্তু কাঁঠাল গাছে আম হইতেছে না, তখন অবশ্য নামরূপ সত্যই। বাস্তবিক নামরূপ যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কল্পে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় আম গাছে আম না হইয়া

কাঁঠাল গাছেই আম হইত ; এবং "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" —পরমেশ্বর 'ভূঃ' এই সার্থ শব্দ স্মরণ ও উচ্চারণপূর্ব্বক ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই শ্রুতি ও "নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বর" পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দ লইয়া, স্মরণ করিয়া, ভূতসমূহের নামের, রূপের ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই স্মৃতি যে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, তাহারও প্রামাণ্য রক্ষিত হইত না। কারণ, নামের সহিত সেই সেই রূপের এবং সেই রূপগত কর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধসূত্র না থাকিলে, পরমেশ্বর ভূলোকের সৃজনেচ্ছায় 'ভূঃ' শব্দ স্মরণ করিলে তাহাতে ভূলোক সৃজিত না হইয়া অন্য কোন কিছু অর্থাৎ হয় ত স্বর্গলোক সৃজিত হইত। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "সন্ন্যাসীর গীতি"তে বলিয়াছেন—

"সত্য সব, কিন্তু নামরূপ পারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।"

স্বামিজীর গীতুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নামরূপও সত্য ; কিন্তু আত্মা যিনি, তিনি নিত্য নামরূপ বিমুক্ত বলিয়া আত্মা নামরূপের পারে। অতএব যাহা সত্য, তাহাতে সত্যজ্ঞান হইলে সে জ্ঞান ভ্রম নহে। আবার যিনি নামরূপের অতীত ভূমি হইতে দেখিতেছেন, অর্থাৎ নামরূপবিমুক্ত কেবলোপাদান তুরীয়ব্রহ্মপদকে দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট নামরূপের আত্যন্তিক অভাব হেতু তিনি উহাকে মিথ্যাজ্ঞানরূপেই দর্শন করিতেছেন, সুতরাং উভয়েই অভ্রান্ত। অতএব, তুরীয়পদ হইতে দেখিলে নামরূপ বা মায়া মিথ্যাজ্ঞানই। কিন্তু তাই বলিয়া, নামরূপ দর্শন কালে অনাম অরূপ ব্রহ্মের দর্শনাভাব বশতঃ নামরূপের ন্যায় ব্রহ্মকে আর মিথ্যা বলিতে পারা যায় না; কারণ নামরূপ আপাতসত্য হইলেও উহা যে পরমার্থতঃ সত্য নহে, অর্থাৎ উহা যে পদার্থতঃ কিছুই নহে কেবল কথা বা নামমাত্র, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

এই নামরূপ বা মিথ্যাজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া এবং ব্যষ্টিকে অবিদ্যা বলে। সমষ্টি নামরূপ অর্থাৎ সমষ্টি মিথ্যাজ্ঞান বা মায়া

অনাদি ও অনন্ত; কারণ জীবভাব অনাদি এবং জীবও অনন্ত। সেই জন্য শ্রুতি "অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে"—"অনাদি অনন্ত গহন-গভীর সংসার মধ্যে" এই বাক্যে মায়াকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যষ্টি মায়ারূপ অর্থাৎ ব্যষ্টি মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা, অনাদি হইলেও ইহার অন্ত আছে—ইহা অনন্ত নহে; অর্থাৎ তুরীয়পদ প্রাপ্তিকালে মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিবোধ হওয়ায়, জীব মুক্তি লাভ করে। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন "নিবৃত্ত এব যস্মাৎ তে তৎ সত্যত্বমতিগতা। ঈষৎ নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্"—তোমার তাহাতে যে সত্যত্বজ্ঞান নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাকেই ঘট-জ্ঞানের নিবৃত্তি বলা যায়; এইরূপ নিবৃত্তিই জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে, ঘট-জ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি মৃত্তিকা জ্ঞান-জন্য নহে। তাৎপর্য্য এই যে, সমষ্টি অনাদি ও অনন্ত বলিয়া, ব্যষ্টির উহাতে মিথ্যাজ্ঞান হইলেও উহার অভাব হয় না; কিন্তু ব্যষ্টির উহাতে মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় মুক্তি হয়।

এক্ষণে শেষ কথা এই যে, যাঁহারা সমষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে বিশুদ্ধসত্বপ্রধান ও ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে মলিনসত্বপ্রধান ও জীব বলেন, এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিয়া উভয়ের মধ্যে নিয়ম্যনিয়ামক ভাব অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মত কিন্তু শ্রুতিসম্মত নহে। কারণ, ব্যষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে মলিনসত্বপ্রধান বলিলে, শ্রুতি যে "বিশুদ্ধসত্বঃ" ইত্যাদি বাক্যে জীবন্মুক্ত পুরুষদের ভূয়োভূয়ঃ বিশুদ্ধসত্বপ্রধান বলিয়াছেন, তাহার আর প্রামাণ্য থাকে না। অতএব, উক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতির অন্যরূপ তাৎপর্য্য আছে। মায়া সম্বন্ধে কথিত মতই শ্রুতির অনুমোদিত বলিয়া অনুমিত হয়।

দর্শনে বেদতত্ত্ব।

(শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মাইতি, বি এল)

শাস্ত্র বলিতে প্রধাণতঃ বেদ বুঝায়। অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রই সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ। স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র দর্শনাদি শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও প্রামাণিকতায় বেদের নিম্নস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে কোথাও কোথাও উল্লিখিত আছে যে ঐ সকল পুরাণ বেদতুল্য। আমাদের বিশ্বাস এ সকল কেবল প্রসংশাবাদ মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন—"বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। * * অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি দেশীয় ধর্ম্মপুস্তক সমূহে যদিও বর্ত্তমান তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ' নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্যে বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তকের প্রমাণভূমি। আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই 'বেদ'।"

বেদ বলিতে মূলতঃ ঐশ্বরিক জ্ঞান বুঝাইলেও এই জ্ঞান ঋষি-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ভাষায় ব্যক্ত হয়। সুতরাং আর্য্যজ্ঞান প্রকাশক এই ভাষাকে বেদ বলিতে আপত্তি হইতে পারে না। আর্য্যজ্ঞান যে পুস্তক সমূহে লিপিবদ্ধ থাকে সে পুস্তকগুলিকে বিচার কালে বেদ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অধিকন্তু এই পুস্তকগুলি হইতেই অধিকাংশ স্থলে সাধারণ লোকে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে—তাহাদের নিকট উহাই বেদ। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, মধ্ব প্রভৃতি দার্শনিক এই পুস্তকগুলির প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে বৈদিক শব্দগুলিকে নিত্য, বিকারহীন এবং অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে। এই শব্দ ধ্বনি নহে—তাহা হইতে পৃথক্; এবং বর্ণও নহে। ইহারই নাম স্ফোটবাদ। শব্দও যরূপ নিত্য, বৈদিক শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য। অন্য কোন দর্শনে এই মত স্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু কঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন এবং প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নামে বেদের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহারা বেদ প্রণয়ন করেন নাই। মীমাংসা-দর্শনে বেদসম্বন্ধে এইরূপ মত দেখা যায়। উত্তরমীমাংসায় বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হইলেও, বোধ হয় স্ফোটবাদ স্বীকৃত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮।২৯ সূত্রের ভাষ্যে এই মত উল্লেখ করিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি স্ফোট-বাদ বিরুদ্ধ বর্ণবাদের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনীর গুরু) এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত উভয়ই প্রায় এক মতাবলম্বী। কেবল তাঁহাদের বিরোধ এই যে, শব্দ বলিতে উত্তরমীমাংসা বর্ণ বুঝেন, এবং পূর্ব্ব-মীমাংসা স্ফোট বুঝেন।

সাংখ্য দর্শনে, বেদকে অনিত্য বলা হইয়াছে—"ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।" যথা—"স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।" কিন্তু সাংখ্য মতে বেদ অপৌরুষেয় এবং স্বতঃপ্রমাণ। অপৌরুষেয় হইলেই যে নিত্য হইবে তাহা নহে; যেমন, অঙ্কুরাদির অপৌরুষেয়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু তাহা নিত্য নহে। বেদশব্দ সকল যথাবিধি উচ্চারিত হইলেই ফল উৎপাদন করে। উচ্চারণকর্ত্তার অর্থবোধ থাকুক বা না থাকুক, বৈদিক মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলেই যথোক্ত ফল প্রসব করিবে। সেই জন্য সাংখ্য বলেন "নিজ-শক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্।" নিত্য না হইলেও বেদ নিজের শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারাই স্বতঃপ্রমাণ। সাংখ্যদর্শন মতে—"আপ্তো-পদেশঃ শব্দঃ।" ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষ-শূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবগত বিষয়ের উপদেশকে শব্দ বলে। লোক-

ব্যবহারে আমরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি, সেই সকল শব্দের অর্থবোধ যে প্রকারে হয়, বৈদিক শব্দ সকলেরও অর্থবোধ সেই প্রকারে হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে লৌকিক ও বৈদিক শব্দে সাংখ্য মতে কোন প্রভেদ নাই। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় বেদের এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। সাংখ্য বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও বেদের স্বতঃপ্রামাণতা স্বীকার করায় বেদের গৌরবের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

পাতঞ্জল দর্শনে বেদ সম্বন্ধে কোন বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলা হইয়াছে। যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত। সুতরাং সাংখ্যমত ও যোগমত একই বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। পাতঞ্জলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার সহিত বেদের কি সম্বন্ধ তাহা বলা হয় নাই।

বৈশেষিক দর্শনে সুস্পষ্টভাবে বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলা হইয়াছে এবং ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

ন্যায় দর্শনের মত প্রায় সাংখ্য দর্শনের মত। বেদকে আপ্তোপদেশ বলিয়া ন্যায় দর্শনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপিচ, ন্যায়মতে শব্দ অনিত্য কিন্তু অবিকারী। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও বেদ ও ঈশ্বরে কি সম্বন্ধ তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী দর্শনসকলের মধ্যে কেবল মাত্র বৈশেষিক দর্শন এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

'নানা মুনির নানা মত'—অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ এ বিষয়েও তাই। দর্শনসমূহে বেদ সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত আছে সত্য, কিন্তু বেদকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হন নাই। সাংখ্যাদি নাস্তিক দর্শনও এ বিষয়ে বেদান্তাদির সহিত একমত। কি কারণে বেদকে এই উচ্চ স্থান দেওয়া হইল তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য

বিষয় নহে। সঙ্ক্ষেপে এই বলিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, কর্ম্মফল, দেবতা প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষোপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা হয় না। অনুমানের দ্বারা কেবলমাত্র এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব যে অসম্ভব নয়, ইহাই প্রমাণ করিতে পারা যায়। এই সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব যাঁহারা সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্যই এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ। সেই জন্য ন্যায় ও সাঙ্খ্য দর্শনে বেদকে আপ্তোপদেশ বলা হইয়াছে। বৈশেষিক আর একটু অগ্রসর হইয়া আপ্তের জ্ঞানকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণাদিতেও এই ভাবটীই প্রচারিত হইয়াছে। উপনিষদেও কথিত আছে "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" অবশ্য ইহাই বেদান্ত মত; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে এই মত পরিস্ফুট হয় নাই।

এক ও বহু

(শ্রী—)

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ, বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যে প্রেমে জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক হইতে বহুর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, বহুর নিকট হইতে এক আবার সেই প্রেমই ফিরিয়া পাইতে চাহে। ইহারই নাম সৃষ্টিবিলসন, ইহাই ভগবত-লীলা। সুখ, দুঃখ, বাধা, বৈচিত্র্য, ছোট, বড় সকল প্রকার দ্বন্দ্ব ও পার্থক্যজ্ঞানের ভিতর দিয়া বহুকে আবার সেই প্রেমের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে হইবে—এককে পাইবার জন্য। তাই বলি সে কোন্ শুভমুহূর্ত্তে, কোন্ শুভ অবসরে বিধাতার মনে আচম্বিতে বহু হইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল, লীলাবিকাশের সে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণ; অনন্ত আজ

সান্ত হইল, পূর্ণ আজ অংশে অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল, নিরাতঙ্ক নিষ্কম্প ধর্ত্তিকালোক আজ সহস্র চূর্ণ রশ্মিতে বিচ্ছুরিত, বিভগ্ন ও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সৃষ্টিরহস্যের প্রথম অঙ্ক উদ্‌ঘাটিত হইল।

তাহার পর যুগ যুগ ধরিয়া সকল বৈচিত্র্য সেই আদি একত্বের অভিমুখেই ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—কার্য্যকারণবাদ তাহার সাক্ষী। জ্ঞানীর জ্ঞান, দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানে সকলই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সেই একত্ব জ্ঞানকেই ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় চলিয়াছে। যে যে পরিমাণে সেই অখণ্ডৈকত্বের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার জীবনের সাফল্যও সেই পরিমাণে হইয়াছে। কেহ বা রুদ্রের বাম মুখ দর্শনে ত্রস্ত হইয়াছে—কেহ বা সত্য, শিব, ও সুন্দরের পরম রমণীয় দক্ষিণ মুখের দর্শনে জীবন ধন্য জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু ভাবুকের কাছে যাহা ভাব-পদার্থবিশেষ, সাহিত্যিক কবির যাহা কল্পনা মাত্র, দার্শনিকের যাহা বিচার্য্য, একমাত্র জ্ঞানীই তাহাদের সকল সাধনার সম্মিলনক্ষেত্রে, সকল আংশিক প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক সত্যের ক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধে আপেক্ষিকের সীমানার বহির্ভূত প্রদেশে সেই এক অবিভাজ্য, অখণ্ড সত্যের দর্শন লাভ করিয়াছেন। যাহারা অংশকে, বহুকে, বৈচিত্র্যকেই শ্রেষ্ঠতম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে অথবা তাহাদেরই মধ্যে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে একটি বিধিতিসূত্র আবিষ্কার করিয়াই নিরস্ত হইয়াছে, তাহারা জ্ঞানীর বোধিলব্ধ অখণ্ড সত্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। যাহারা পরিবর্ত্তনকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানে তাহারা আদৌ বিবর্ত্তনের প্রয়াসী নহে, এবং নহে বলিয়াই এক ও বহুর রহস্য তাহাদের নিকট অবিদিত। বহুত্বের একত্বে সমাধান তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণই করিয়াছেন এবং করিতেছেন—সেই তত্ত্ববুদ্ধির সাধককেই শাস্ত্রে "পরা-বিদ্যা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতীতের ইতিহাসে ভারতবর্ষ এই পরাবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল। অথচ তাই বলিয়া "অপরা"কেও অবমাননা করিয়া স্থানভ্রষ্ট করিতে চাহে নাই—তাহারাও শাস্ত্রে "বেদিতব্য" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা এই পরাবিদ্যার আলোকে, সাহিত্য, দর্শন, ও

ধর্ম্মসম্বন্ধে এই স্থানে একটু চিন্তা করিব। সংসারে প্রধানতঃ তিন প্রকার মানসিক-শক্তি-বিশিষ্ট লোক আমরা দেখিতে পাই। প্রথম, যাঁহারা এই সংসারকে লইয়াই বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত —যাঁহারা "যেন তেন প্রকারেণ" ইহাকেই পরম সত্য বলিয়া স্থির ধরিয়া লইয়াছেন। আমাদের দেশীয় সাহিত্যের একটা খুব বিশাল অংশ এই শ্রেণীর লোকেরই লীলাপ্রাঙ্গণ। সাহিত্য ও ধর্ম্ম এই দুইটি জিনিষ এক না হইলেও, যে সাহিত্য উচ্চ নীতি ও ধর্ম্মভাবকে উপেক্ষা করিয়া, হাস্যাস্পদ করিয়া, নর-নারীর অনুরাগ প্রভৃতিতেই নিবদ্ধ থাকিয়া সেই সকলকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্য বলিয়া ধার্য্য করে এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে যাহা প্রতিভা, সেই "নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি"কেই যথার্থ দর্শন ও সত্যপ্রাতিভ বা True vision বলিয়া প্রচার করে তাহা ধর্ম্মভাব ও তদুপলব্ধি সহায়ে জীবনগঠনের চেষ্টা যে কি পদার্থ তাহা আদৌ বুঝিতে সক্ষম হয় না। সেইরূপ মতের সাহিত্যকে "সাহিত্যিক যথেচ্ছবাদ" নাম দেওয়া যাইতে পারে; ইহার দর্শনও সেই বহুত্ববাদ বা Pluralism. সাহিত্য যেখানে আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া, ধর্ম্মের রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করিবার বাসনায় লোলজিহ্ব হইয়া উঠে ধর্ম্ম তখনই তাহাকে উন্মত্ত সারমেয় বোধে শৃঙ্খলিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করে, অন্যথা সমাজে প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বিশেষভাবে যুক্তিশক্তিসম্পন্ন, চিন্তাশীল; তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সম্পৎ এই চিন্তা। ইঁহাদের কেহ কেহ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক; জগৎ হইতে জগদতীত পদার্থ যে কিছু আছে তাহা ইঁহারা দর্শনে ও বিজ্ঞানে স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার কোনও কোনও স্থলে, সংসারের বহু উর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইলেও ইঁহাদের খরদৃষ্টি নিম্নে সংসারের প্রলোভন—নাম, যশ, প্রভৃতি বৈচিত্র্যের মাধুরীমূর্ত্তিনিচয়ের দিকেই নিবদ্ধ। য়ুরোপের দার্শনিকগণের অনেককেই আমরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি—যদিও ইহারা সকলে নাম, যশ প্রভৃতির জন্য দার্শনিক এরূপ বলিলে ইঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কিন্তু ইঁহাদের দর্শনে বৈচিত্র্য প্রায় সকল স্থলেই এতই

মনোরম যে তাহা কোনরূপেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহচর হইতে পারে না বলা যাইতে পারে ; দর্শন বলিতে য়ুরোপ যাহা বুঝে অর্থাৎ বুদ্ধিগত ব্যাপ্তির জ্ঞান বা Generalised knowledge, ইহা মাত্র তাহাই। উচ্চ আধ্যাত্মিকতাকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শন অতীন্দ্রিয়বাদ বা ধার্ম্মিকত্ব— Mysticism and Religion নাম দিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে। বিচারের ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেও উপলব্ধির ব্রহ্মকে অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক অবজ্ঞা করিয়াছেন। ফরাসী বার্গস প্রচারিত দর্শন তাহা স্বীকার করিলেও সর্ব্বত্র তাহার সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা আমরা পরে দেখিব।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক যাঁহারা, তাঁহারা যথার্থই 'ধার্ম্মিক' পদবাচ্য। তাঁহারা বৈচিত্র্যের প্রলোভনকে অপার বিড়ম্বনা বোধে ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকল বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি, সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সেই একেরই উপলব্ধিকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন। সকল চিন্তাশীল সমাজে, জীবনের সকল বিভাগ ইঁহাদের উচ্চ জীবনের আলোকে সমুজ্জ্বল হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করে। ধর্ম্ম যেখানে শিথিল, সাহিত্য ও দর্শনও সেখানে তদ্রূপ। কারণ, উহারা জীবনকেই প্রতিফলিত করে। আবার যেখানে ধর্ম্মের উচ্চ উপলব্ধি বর্ত্তমান, সাহিত্য ও দর্শন সেখানে তাহাদেরই প্রসাদ বহনে নিযুক্ত। ধর্ম্মই আদর্শের সংস্থাপক। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান শুধু পথের কথাই বলিয়া দেয়। যাহারা সেই ধর্ম্মজীবনলাভের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া "সাহিত্যিকের ধর্ম্ম", "দার্শনিকের ধর্ম্ম", "বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম" প্রভৃতি উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহারা সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে নাস্তিক মতাবলম্বী।

দর্শনের দিক হইতে সত্যের একাত্মকতা যেরূপ, বিচার করা যায়, সাহিত্যের দিক দিয়া ঠিক সেরূপে হয় না। কারণ, সাহিত্যের মালমসলা 'বহুর' নিকট হইতেই লওয়া। কিন্তু সাহিত্য উচ্চভাব শিক্ষা দিয়া মানবমনকে একত্বের দিকে পরিচালিত করিতে সমর্থ। দুইটি ভাবের আধিপত্য সকল দেশের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম Realistic বা বাস্তববাদী সাহিত্যিক —ইঁহাদের অনেকেই উচ্চ

নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বে বিশ্বাস রাখেন নাই। তাঁহাদের এই নগ্ন বাস্তবতা য়ুরোপের কোন কোন দেশে যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেরই বিদিত। আবার, এই বাস্তবতাকে পরিহার করিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে উচ্চ আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী আপন প্রভুত্বের উদ্ধারসাধন করিয়া বিকাশের পথ দেখিয়া লইয়াছে, তাহাও সেই একের সহায়ে—যাহাকে ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বর অথবা Absolute যেরূপ অভিরুচি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার নাম Transcendental movement in literature. আর একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সাহিত্যের সেই Realism ও Idealismই কখনও বা classicism, কখনও Romanticism, কখনও Impressionism, কখনও storm and stress movement-রূপ আকার ধারণ করিয়াছে। এই দুইটির কোন একটি সাহিত্যের শেষ কথা নহে। কারণ, যে রাগাত্মিকা বা মনোরঞ্জিনী প্রবৃত্তির সাহায্যে সাহিত্য গঠিত হয়, তাহা মানব-মনের অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত—সমগ্রত্ব লইয়া নহে। কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রবৃত্তিও মানবকে অনেক দূরে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া তাহাও অবহেলার বস্তু নহে, এবং তাহা লইয়াই সাহিত্যিক আর্টের ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত কতই না বাদানুবাদ চলিতেছে।

আবার দর্শনের দিক হইতে আমরা কখনও একত্বের জ্ঞান বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে দেখি—কখনও বা বহুত্ব ও বৈচিত্র্যই অনুভূতির 'এক'কে বিলুপ্ত করিতে প্রয়াসী দেখি। য়ুরোপখণ্ডেই ডেমক্রিটাস ও এপিকিউরাসের বহুত্ববাদ ক্রমে প্লেটোর আদর্শবাদে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, নূতন ধারার দর্শনে হিউম ও কান্তের ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার-দর্শন আসিয়া হেগেলের আদর্শবাদে পরিসমাপ্ত। তেমনি এখনও কোন কোন স্থলে বহুত্ববাদ আসিয়া হেগেলের একত্ববোধ পর্য্যায় বা unity of categoriesকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে চাহিতেছে। আবার

নূতনভাবে একত্বের আদর্শোপলব্ধির তত্ত্বও ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছে।

এখন মোটামুটী বলা যাইতে পারে যে, দর্শনেও ইহসর্ব্বস্ববাদ (Materialism) এবং ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ (Idealism) এই দুইয়েরই নানা আকারে পুনঃ পুনঃ অভিনয় চলিয়াছে। ইহাদের কোনটিই দর্শনের শেষ কথা হইতে পারে নাই। কারণ, সাহিত্যের সীমার ন্যায় দর্শনের সীমাও নির্দ্দিষ্ট। কেবলমাত্র যুক্তিশক্তির ব্যবহারে যখন যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, দর্শন তখন তাহাকেই বড় করিয়া দেখে—সম্পূর্ণ সমাধান আনিয়া দিতে পারে না। অতএব ইহা বেশ পরিস্ফুট যে, ধর্ম্মের প্রভাব ব্যতিরেকে সাহিত্য ও দর্শন উভয়েই স্ব স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান আর তাহাদের আয়ত্তীভূত থাকে না। Realism ও Pluralismএর করাল ছায়া যখন মানবসাধারণের উপর ঘনান্ধকার বিস্তার করে, বৈচিত্র্যই যেন তাহার নিকট একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়া উঠে। বৈচিত্র্যের যাহা স্বরূপ—আমরা সাধারণভাবে যাহাকে 'এক' আখ্যা দিয়াছি—তাহা আর তখন প্রিয় নহে, পূজ্য নহে—তাহা কেবল কৌতুহল উদ্রেক করে মাত্র—'স্বরূপ-বিশ্রান্তির' দিকে মানবমনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। এই বাস্তব ও বহুত্ববাদ অনেক সময়ে খুব উচ্চ আদর্শের ছদ্মবেশে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে—কখনও আমরা উহাকে বুঝিতে পারি, কখনও বা পারি না। না পারার কারণ—সকল সময়ে আমাদের মনে উচ্চজীবনের আদর্শ বর্ত্তমান থাকে না, যাহার তুলনায় আমরা বিসম্বাদী মতসকলের বিচার করিতে পারি। ভারতবর্ষ সেই উপলব্ধির এককেই পরিস্ফুট আকারে দেখিতে চাহিয়াছে - কল্পনার এককে নহে, দর্শনের এককে নহে, বিজ্ঞানের এককেও নহে।

য়ুরোপীয় দর্শনের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে, একত্বোপলব্ধির নূতন দর্শনের ভিতরেও তাহার সেই বৈচিত্র্যকে একত্বের সহিত একই আসনে উপস্থাপিত করিবার উদ্যম। অতএব

যে সত্য পূর্ণ ও সমরস তাহাকে সে চাহে না, ইহাই বলিতে হয়। উচ্চ উপলব্ধিপূর্ণ জীবনের অভাবই ইহার কারণ। হেগেলের দর্শনের পশ্চাতে আশানুরূপ উচ্চ জীবন ছিল না, আবার এখনকার ফরাসী মনীষী বার্গসঁর দর্শনে পূর্ব্ব যুগের স্বীকৃত বিতর্কবুদ্ধি বা Intellectualism সত্যের পথপ্রদর্শক বলিয়া অস্বীকৃত হইলেও উচ্চতম বোধি বা Intuition তাহার যথার্থ প্রাপ্য হইতে বাঞ্চত হইতেছে—সেই একই কারণ বশতঃ। বার্গসঁ তাঁহার Creative Evolution নামক গ্রন্থে (২৩১ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন,—"The more we succeed in making ourselves conscious of our progress in pure duration, the more we feel the different parts of our being enter into each other and one whole personality concentrate itself in a point." ইহাকে সেই অখণ্ড জ্ঞানের কথা, অপরোক্ষানুভূতির সমর্থন বলা হয়। আবার অন্যত্র (২৩৬ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়াছেন, "Life in its entirety regarded as a creative evolution, transcends finality, if we understand by finality the realisation of an idea conceived or conceavable in advance." এই কথাগুলি তিনি হেগেল ও তচ্ছিষ্য গ্রীণ ও কেয়ার্ডের মতের বিরুদ্ধেই গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহারা সত্যের পূর্ব্বস্বীকৃত রূপকে, অখণ্ডানুভূতিকে স্বীকার করিয়াছেন—বার্গসঁ তাহা করিতে চাহেন নাই। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দিক হইতে যে স্থির সত্যকে জানা হইল, creative evolutionএর পরিণামের স্রোতে পড়িয়া সে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। সত্য প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তাহাকেই আমরা জানিতেছি—অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান কি ইহাই? আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণ কিন্তু ইহার বিচার অন্যরূপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই জগতেরই সর্ব্বদা পরিণাম সিদ্ধ—মনের দ্বারা এই পরিণাম বুঝা যায়। আত্মানুভূতি স্বসংবেদ্য; উহা মনের ধর্ম্ম নহে। Intuitive knowledge পরিণাম জ্ঞান নহে—

এ উভয় আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিসদৃশ। বার্গসঁর দর্শন যাহাকে সত্যলাভের পথে বিঘ্ন মনে করিল, প্রকারান্তরে আবার তাহাকেই সে স্বীকার করিল। . . .

এইরূপে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ William James একদিকে যেমন Vicious Intellectualism বা সত্যলাভসম্বন্ধে দুষ্ট বিতর্ক বুদ্ধিকে ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন, আবার অন্যদিকে সেই বিতর্কবুদ্ধির কবলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার Pragmatism পুস্তকের সার সঙ্কলন করিলে ইহাই দাঁড়ায়ঃ— বহুকে ছাড়িয়া ঐ অশরীরী একত্বের অনুসন্ধানে ছুটিও না, অথবা যদি সেইরূপ করাই তোমার জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব কর, তবে তাহা করিতে পার ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার সে ভাবুকতার সত্য তোমারই থাক। জগতে পরিদৃষ্ট বিভিন্নতার সমন্বয় সে ভাবের একত্বোপলব্ধিতে হইতে পারে না।। হয়ত এমন এক দিন আসিবে যখন আমরা ঐ ঐক্যের ভাবকে সর্বোচ্চ মত বলিয়া গ্রহণ করিব। কিন্তু আপাততঃ এই মুহূর্তে তাহা সম্ভবই নয়। ঐ দেখ নানা বিজ্ঞান কত রকমে কত সত্য আবিষ্কার করিতেছে, আর এতদ্ব্যতীত আমরা আমাদের চারিদিকে কত বাদবিসম্বাদ, কত অন্যায়, কত পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি। এ সকলের প্রতিবিধান যে আমাদেরই করিতে হইবে, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ—বীরের মত যুদ্ধ কর, অ-'বৈজ্ঞানিক' হইও না। বিচিত্রতাকে স্বীকার কর, বরণ কর, তবেই সংসারে তোমার মঙ্গল হইবে—(Pragmatism, পৃষ্ঠা ৭৫, ৭৬, ১৫৮, ১৬., ৩০০)। Jamesএর প্রচারিত Pragmatism, যাহা স্বাতন্ত্র্য ও সুবিধাবাদ অথবা দার্শনিকের ভাষায় 'পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ', স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক করমর্দ্দন করিয়াই ক্ষান্ত।' জীবনে তাহা যে কার্য্যকরী হইতে পারে, স্বামিজী তাহা "চোখে আঙুল দিয়া" দেখাইয়া দিলেও ইনি সেটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না -(Pragmatism—The one and the

many)। সেটা নাকি বড়ই ভাবগত এবং—বোধ হয় অনাবশ্যকরূপে—বড়ই আধ্যাত্মিক (It is emotional and spiritual altogether)। Jamesএর উক্তিতে আমরা তাঁহার মার্কিণী ভাবেরই পরিচয় নাই। যে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমেরিকায় জীবন অতিবাহিত হয়, Jamesএর তত্ত্ব তাহারই নিদর্শন। জগতে চিন্তাসমন্বয়ের মন্দিরে Pragmatismএর একটি স্থান আছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত দর্শন বলিয়া নহে। দর্শনের ভিতর যে একটা সম্পূর্ণ ভাবের কথা আমরা শুনিতে চাই, প্রকৃত, আত্মা, ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কতকটা সম্যক্ ধারণার দাবী আমরা দর্শনের নিকট স্থাপিত করি, James এর মতবাদে তাহার অভাব। তিনি সর্ব্বসমস্যসীভূত একটা সত্যের মূর্ত্তি দেন নাই। সেই জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবারিত মনোবৃত্তির পরিচালনা স্বীকারে অপর দার্শনিকদিগের তুলনায় তিনি উদার ও বিচারপরায়ণ বলিয়া সকলের প্রণম্য হইলেও মানবের মনোবিকাশের শেষ ধারাটির উপরে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। Pluralismই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্তে দাঁড়াইয়াছে। সত্য তাঁহার কাছেও নিয়ত প্রবহমান-রূপেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে।

উপরে যে দুইটি মত আমরা সমালোচনা করিলাম, তাহা হইতেই য়ুরোপের সাধারণ মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। যাহারা কেবল চিন্তার রাজ্যেই বৈচিত্র্যসমন্বয়ের কথা বুঝে, ধ্যানের সহায়ে অতীন্দ্রিয়োপলব্ধির পূর্ণবিকাশে যে সমন্বয়—যেখানে সকল বাহ্য-ভাবাত্যয়ে এক পূর্ণজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, 'প্রকৃতির আপূরণে' সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম-দৃষ্টির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানব যে অবস্থায় আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ পর্য্যন্ত স্বীকার করে, তাহা এখনও য়ুরোপের দার্শনিক জ্ঞান ও সহজ জ্ঞানের নিকট প্রহেলিকা মাত্র। এইরূপে সেই সহজ জ্ঞানের বাস্তববাদ এবং দার্শনিক বহুত্ববাদ বুদ্ধিবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত পরিচালনে পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বিত করিতেছে। তবে বার্গসঁর Intuition মতবাদ এবং

অধ্যাপক অয়কেনের 'Activism মত পাশ্চত্যে দর্শনকে একটা নূতন আলোকের সম্মুখীন করিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তন্ত্রশাস্ত্রপারদর্শী বিচারপতি উডরফের একটি কথা এই সূত্রে সহজেই মনে উদয় হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"The latest tendency in modern western philosophy is to rest upon Intuition as it was formerly the tendency to glorify dialectic. Intuition has, however, to be led into higher and higher possibilities by means of Sadhana." বহুর বন্ধনকে ভুলিতে হইলে, মায়া পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইলে এই সাধনারই শরণ লওয়া জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রাচ্য ভূভাগে সেই সাধনার পূর্ব্বাভাস আমরা পাইতেছি—পাশ্চাত্যেও কি তাহার প্রতিরূপ আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব না? যে দিন সে জ্ঞান আসিবে সকল স্থলেই দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ সে দিন আর থাকিবে না। য়ুরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় সাধনার বিকাশের দিন ইহা একবার ঘটিয়াছিল। আজ বিশ্বব্যাপী ভারতীয় দর্শনের আলোচনার ভিতর দিয়া মধ্যযুগের সেই ধর্ম্মভাব কি য়ুরোপ আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইবে না? আমাদের বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দ য়ুরোপে সেই নূতন ভাবের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছেন—কালে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইতে চলিল।

আবার সাধারণ সহজ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে সেখানেও কি আমরা বিশ্বসৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য মানবমাত্রেরই মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই না? ভাবুক কবিগণ বিচিত্রতার মোহে মুগ্ধ, কিন্তু দৃষ্টি আছে সেই একের উপর। সকল অসম্পূর্ণতার, সকল অভাব অভিযোগের সম্পূরণ হইবে সেই ঐকত্বের ভিতর। সর্ব্বসাধারণ যাহার দিকে চাহিয়া ভাবে, কবি সে ভাব কথায় প্রকাশ করিয়া বলেন—"On the earth a broken round, in the heaven a perfect orb." (Browning)। এই পূর্ণত্বের আদর্শ মানবের অন্তর্নিহিত আত্মজ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিত। ভাষার সাহায্যে

সে সেই একককে কখনও স্বারাজ্য, কখনও সালোক্য, কখনও সান্নিধ্য, কখনও সাযুজ্য প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিলেও ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে এমন একটি অবস্থার কার্য্যে অন্বেষণ ও ভাবে আরাধনা করিতেছে, যাহা তাহাকে ইহবৈচিত্রের পথ হইতে দূরে মুক্তির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আহ্বান করিবে। কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট যে, বৈচিত্র্যবিমূঢ় মানব, 'সাহিত্যিক' মানব, দার্শনিক' মানব, একবারে সকল বৈচিত্র্য ঘুচাইতে চাহে না। এই জন্য সকল সময়ে তাহার মুক্তির কল্পনা বৈচিত্র্যের বর্ণখেলা বিবর্জ্জিত নহে। হয়ত সে জীবনে কাহাকেও বড় আপনার বলিয়া বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহার মুক্তির ক্ষেত্রে সে ঠিক তাহাকেই নিকটে রাখিতে চায়। হয়ত বা জীবনে সে কোন বিশিষ্টভাবের সুখশয্যায় আসীন থাকিয়া মোহন স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে সেই স্বপ্নকে তাহার মুক্তির রাজ্যে সত্য করিয়া দেখিতে চায়, তাহার নিকট তাহাই পরমাশান্তি, ধ্রুব সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসংস্থ অদ্বৈতবাদী যিনি, তিনি বলিবেন, প্রাগুক্ত লোকগুলি মুক্তির নামে এখনও সোণার স্বপন দেখিতেছে। সত্য যখন এক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ-প্রাপ্তিই যখন মুক্তি, এ বৈচিত্র্য তখন কোথায়? ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবের মুক্তি নহে, অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক সুখের পরিকল্পনে তাহার স্বর্গ-লাভ হইতে পারে—মুক্তি সে নয়, মোক্ষ সে নয়। জ্ঞানী বলিতেছেন, "ইহ চেদবেদীতথ সত্যমস্তি, নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" আর বলিতেছেন "নেতি নেতি", "নেদং যদিদমুপাসতে," "য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যুমাপ্নোতি"—ইহাকে, ব্রহ্মকে নানা ভাবিয়া সংহারের পথে, মৃত্যুর পথে ধাবিত হইও না।

বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার অনুশীলনে, জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে উন্নতশীর্ষ. পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের অনুবর্ত্তন-প্রয়াসী প্রাচ্যের দল আজ একত্ব ও নানাত্বের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের নূতন নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে উন্মুখ। সেই সকল নূতন খণ্ড ধর্ম্ম আজ অনেককে নানারূপে বিপথে লইয়া

যাইতেছে। সাহিত্য আজ তাহার জীবনের প্রতিকৃতিকেই বড় বলিতে চাহিতেছে। জীবন-প্রহেলিকার সমাধান কোথায়, তাহার সন্ধান সাহিত্যে আজকাল বড় একটা মেলে না। দর্শনও তদ্রূপ কোনরূপে কায়ক্লেশে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিলেও তাহাকে কেবল ভাবগত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। একমাত্র সত্যলাভের জন্য অগ্রসর কেবল সেই আধ্যাত্মিক। দার্শনিক, সাহিত্যিক তাঁহাদের ভাবের বিরোধী হইলেও কি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে না। জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল বেদনা কি কেবল এক দীর্ঘশ্বাসেই ফুরাইয়া যাইতে চায়? পেলব প্রেমের গানেই কি সকল ব্যথা নিঃশেষ হইয়া যায়? নিবিড় করিয়া সুখ বলিয়া দুঃখকে আলিঙ্গন করিলে কি হৃদয় সকল বাধাবিমুক্ত হইয়া যায়? সত্যের উচ্চতম রূপ কি, তাহা দেখিবার বা বুঝিবার কি আর কোন ইচ্ছাই হয় না?

সাহিত্য, দর্শন, বহুত্ববাদ, বাস্তববাদ যে যতটা উচ্চ ভাবের ও উচ্চ চিন্তার সাহায্যে মানবকে আদর্শের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, আসুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম্মের আহ্বান, উচ্চ জীবনের আহ্বানকে আর শ্রুতিগোচর না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। ভারতের ও জগতের জীবনে নূতন যুগধর্ম্মের মূর্ত্ত আকার আজ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। ব্যক্তিকে যদি আমরা স্বীকার না করি, তাঁহার দিব্যদর্শনকে, তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টিকে, তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর মহত্তম সাধনাকে আর অবহেলা করিলে চলিবে না। এই যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে, আজ দূর নিকট হইয়াছে, 'পর' বলিয়া যাহাকে ত্যাগ করা হইত সেও আজ 'ঘরের' হইয়াছে, দান আজ উচ্চের হাত ধরিয়াছে, বহির্জগতে 'বহু'কে আজ নানাপ্রকারে 'এক' হইতে দেখা গিয়াছে; অন্তরের মধ্যে উপলব্ধির দিব্য আলোকে সকল বৈচিত্র্য, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈশিষ্ট্যকে আত্মজ্ঞানের বিরাট যজ্ঞে তাহাদের স্বস্বরূপে, একে, অদ্বৈতে পর্য্যবসিত দেখিতে পাওয়া যাইবে না কি?

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস

গ্রীক দর্শন। । এরিস্টটল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল)

ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া বিরূপানুমান (Inference by opposition) কাহাকে বলে ও কিরূপে সাধিত হয়, সে কথা অল্প বিস্তর উল্লেখ করিয়াছি। বিরূপানুমান ছাড়া আবর্ত্তন (conversion) ও ব্যাবর্ত্তন (obversion) প্রণালী অবলম্বনে অমিশ্র নিরপেক্ষানুমান সম্ভব হয়, সেই কথাই অতঃপর আলোচিত হইবে।

"কোন মানুষ অমর নহে" এই বাক্য হইতে "কোন অমর মানুষ নহে" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এস্থলে প্রথম বাক্য অর্থাৎ পুরোগাবয়ব ও পরবাক্য অর্থাৎ অনুগাবয়ব সমগুণ ও সমপরিমাণ-বিশিষ্ট। কিন্তু, এই অনুমানপ্রণালী দ্বারা পুরোগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ যথাক্রমে অনুগাবয়বের বিধেয় ও উদ্দেশ্য পদ হইয়াছে। উপরোক্ত উদাহরণে পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণ এবং সমপরিমাণবিশিষ্ট, কিন্তু কোন কোন স্থলে আবর্ত্তনপ্রণালী অবলম্বনে দেখা যায়, পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণবিশিষ্ট হইলেও সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে। "সকল মানুষ মর" এই বাক্য হইতে "সকল মরই মানুষ" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক; যেহেতু মানুষ ছাড়া অনেক পদার্থই মরণধর্ম্মশীল। "সকল মানুষ মর" এই বাক্যকে আবর্ত্তিত করিয়া "কোন কোন মর প্রাণী মানুষ" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সৎ সিদ্ধান্ত। যে আবর্ত্তনে পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণ ও সমপরিমাণবিশিষ্ট সেটীকে সমাবর্ত্তন বা simple conversion বলে, ও যেটীতে পুরোগাবয়ব ও অনুগাবয়ব সমগুণবিশিষ্ট কিন্তু সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে, সেটীকে পরাবর্ত্তন অর্থাৎ conversion by limitation বলে।

"সকল মানুষ মর" ইহা হইতে "সকল মর মানুষ", এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বলিয়াই "আ" বাক্যকে সমাবর্ত্তিত করা যায় না,—"আ" বাক্যের পরাবর্ত্তনই সম্ভব।

"কোন মানুষ অমর নহে", এই বাক্য হইতে "কোন অমর মানুষ নহে" এটা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত। কোন অমরই মানুষ নহে সুতরাং কোন কোন অমরও যে মানুষ নহে, সেটা সহজবোধ্য। অতএব দেখা গেল "এ" বাক্যের সমাবর্ত্তন ও পরাবর্ত্তন উভয়ই সম্ভব।

"কোন কোন মানুষ ধনী" ইহা হইতে "কোন কোন ধনী মানুষ" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু "সকল ধনীই মানুষ" এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। যেহেতু মনুষ্যেতর পদার্থ যক্ষ বা দেবতাদি ধনী হইতে পারে। সুতরাং দেখা গেল, "ই" বাক্যের সমাবর্ত্তনই সম্ভব, পরাবর্ত্তন সম্ভব নহে।

"কোন কোন প্রাণী চিন্তাশীল নহে" এই বাক্য হইতে "কোন কোন চিন্তাশীল প্রাণী নহে" বা "কোন চিন্তাশীলই প্রাণী নহে" এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক যেহেতু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রাণসম্পন্ন। সুতরাং "ও" বাক্যের আবর্ত্তন আদৌ সম্ভব নহে। চিত্রের সাহায্যে এই সকল সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায় (গত আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধন দ্রষ্টব্য)।

"সকল মানুষ মর" এই বাক্য হইতে "কোন মানুষ অমর নহে" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এই স্থলে অনুগাবয়বের বিধেয় পদ পুরোগাবয়বের বিধেয় পদের বিরুদ্ধ। এই প্রণালীকে, ব্যাবর্ত্তন বা obversion বলে। উপরোক্ত উদাহরণ হইতে আরও দেখা যায় যে, পুরোগাবয়ব অন্বয়ী বাক্য হইলে অনুগাবয়ব ব্যতিরেকী হইবে এবং ব্যতিরেকী হইলে অন্বয়ী হইবে।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, "আ" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "এ" বাক্য, "ই" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "ও" বাক্য, "এ" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "আ" বাক্য, এবং "ও" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনে "ই" বাক্য পাওয়া যায়।

অমিশ্র নিরপেক্ষানুমান প্রণালী ব্যতীত মিশ্র নিরপেক্ষানুমান বলে আমরা একটী বাক্য হইতে অপর বাক্য পাইয়া থাকি।

কোন স্থলে ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আবর্ত্তন, কোথাও বা আবর্ত্তন-পূর্ব্বক ব্যাবর্ত্তন প্রণালী অবলম্বিত হয়। ইহাকে নিষেধাবর্ত্তন বলে (conversion by negation।

সকল মানুষ মর
কোন অমর মানুষ নহে—(ব্যাবর্ত্তন)
কোন মানুষ অমর নহে—(আবর্ত্তন)

"আ", "এ" এবং "ও" বাক্যের ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আবর্ত্তন বা নিষেধা-বর্ত্তন সম্ভব—"ই" বাক্যের তাহা সম্ভব নয়, যেহেতু "ই" বাক্যকে ব্যাবর্ত্তন করিলে "ও" বাক্য সিদ্ধ হয় এবং "ও" বাক্যের আবর্ত্তন হইতে পারে না। আবার দেখা যায়—

সকল মানুষ মর
∴ কোন কোন মর মানুষ (আবর্ত্তন)
∴ কোন কোন মর অমানুষ নহে (ব্যাবর্ত্তন)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, "ও" বাক্যের আবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং "ও" বাক্যের আবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্যাবর্ত্তন বা নিষেধাবর্ত্তন সম্ভব নহে; আ, ই এবং "এ" বাক্যের সম্ভব।

আবার দেখা যায়, "সকল মানুষ মর" এই বাক্য হইতে "সকল অমর অমানুষ" এইরূপ সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক নয়। এস্থলে পুরোগাব-য়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ অনুগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের বিরুদ্ধ। এই প্রকার সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হওয়া যায়, দেখা যাউক।

সকল মানুষ মর
কোন মানুষ অমর নহে—(ব্যাবর্ত্তন)
কোন অমর মানুষ নহে—(আবর্ত্তন)
সকল অমর অমানুষ—(ব্যাবর্ত্তন)

এই মিশ্র নিরপেক্ষানুমানকে conversion by contraposition

বা বিরুদ্ধাবর্ত্তন বলে। ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে, "ই" বাক্যের বিরুদ্ধাবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণ, "ই" বাক্য ব্যাবর্ত্তিত হইলে "ও" বাক্যে পরিণত হয় এবং "ও" বাক্যের আবর্ত্তন হয় না।

নিষেধাবর্ত্তন ও বিরুদ্ধাবর্ত্তন ছাড়া আর এক প্রকার মিশ্র নিরপেক্ষানুমান আছে, যাহাতে অনুগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ পুরোগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ হইতে ভিন্ন গুণবিশিষ্ট। এই প্রণালী অবলম্বনে "কোন মানুষ অমর নহে" এই বাক্য হইতে "কোন কোন অমানুষ অমর" বাক্য প্রাপ্ত হই। দেখা যাউক, কি উপায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়:—

কোন মানুষ অমর নহে
কোন অমর মানুষ নহে—(আবর্ত্তন)
∴ সকল অমর অমানুষ (ব্যাবর্ত্তন)
∴ কোন কোন অমানুষ অমর—(আবর্ত্তন

এই অনুমানপ্রণালীকে অন্তরাবর্ত্তন বা Inversion বলে।

এই প্রকারে আবর্ত্তন ও ব্যাবর্ত্তনপ্রণালী অবলম্বনে কোন একটী বাক্য হইতে নানা অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাবর্ত্তিত বাক্যটী "ও" হইলে "ও" বাক্যের আর আবর্ত্তন সম্ভব হয় না।

এই স্থলে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এরিষ্টটল নিরপেক্ষানুমান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন নাই। তবে তিনি যে নিয়ম স্থির করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান ন্যায়শাস্ত্রে নিরপেক্ষানুমানের মূলভিত্তি।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্বন্ধ লইয়াই যাবতীয় বাক্য ব্যবহৃত হয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই বিধেয় পদটা উদ্দেশ্য পদের জাতি বা ব্যাবর্ত্তক গুণ বা ধর্ম্ম বা উপলক্ষণ। এই সম্বন্ধ নিরূপণ দুই প্রকারে হইতে পারে ব্যাপ্তিনিরূপণ প্রণালী

অবলম্বনে (Inductive method) বা সাপেক্ষ অনুমান প্রণালী অবলম্বনে (Deductive method)।

বিধেয় পদটী যদি উদ্দেশ্য পদের সংজ্ঞাবাচক অথবা সার গুণবাচক শব্দ হয়, তবে বিধেয় পদটী উদ্দেশ্য পদের সহিত আবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু যদি বিধেয় পদটী জাতিবাচক বা উপলক্ষণ হয় তাহা হইলে উক্ত প্রকারে আবর্ত্তিত হইতে পারে না।

"মানুষ হয় প্রাণী" এই স্থলে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের জাতি। সুতরাং "প্রাণী হয় মানুষ" এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। "মানুষ হয় চিন্তাশীল জীব'—চিন্তাশীল জীব এইটী এস্থলে উদ্দেশ্যের বিধেয়ক এবং উদ্দেশ্যের সংজ্ঞাবাচক সুতরাং "চিন্তাশীল জীব হয় মানুষ" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তসঙ্গত।

এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাপারটী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা দ্বারা যে পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহা কোন্ জাতির অন্তর্গত এবং তাহার ব্যাবর্ত্তক গুণ কি—এই দুইটী বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। পরন্তু সেই জাতি ও ব্যাবর্ত্তক গুণ প্রত্যেকটীই মানুষ বলিতে যাহা বুঝি তাহা হইতে ব্যাপক এবং প্রত্যেকটী পৃথক ভাবে ব্যাপক হইলেও উভয়ের সংযোগে "মানুষ" ছাড়া ব্যাপকতর কিছু বুঝায় না।

এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাপারটী যথাযথ সম্পন্ন করাই সত্য নির্ণয়ের সোপান। সক্রেটীস ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান যে, প্লেটো তাহারই উপর সোপান' নির্ম্মাণের উপায় ও প্রণালী নিরূপণ করিয়া যান, এবং এরিষ্টটল সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হন। উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যায়, কোন একটী পদার্থের সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই পদার্থটী কোন্ জাতির অন্তর্গত সেটী প্রথমেই স্থির করিতে হইবে এবং সেই জাতির অন্তর্গত অপর জাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ কোথায় এবং সেই পদার্থটীকে কোন অপর জাতি বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে সেটীও বিবেচ্য। অর্থাৎ পরজাতিকে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে

সার গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে সেই সব জাতিকে বিভাগ করিয়া অপর জাতিতে উপনীত হইতে হইবে।

কোন বস্তুর সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম মনে রাখিতে হইবে, নিরুক্ত বাক্যের সাহায্যে আমরা কখনও যেন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না করি। অর্থাৎ 'সৎ কি' এ প্রশ্ন করিলে 'যাহা অসৎ নয় তাহাই সৎ' এইরূপে সংজ্ঞা প্রদান বিধেয় নহে। দ্বিতীয়তঃ, যেটার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছি প্রকারান্তরে সেই কথাই ধরিয়া লওয়া দোষযুক্ত। তৃতীয়তঃ, কোন পদার্থকে তৎব্যাপী পদার্থের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা বা তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক। যথা—যদি কেহ প্রশ্ন করে, মানুষ কাহাকে বলে এবং তদুত্তরে কেহ যদি কেহ বলেন 'রাম মানুষ' তাহা হইলে সেটী ন্যায়সঙ্গত হয় না।

সাপেক্ষানুমান সম্বন্ধে প্লেটো যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এরিষ্টটল তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করেন। একটী উদাহরণ লইয়া সে কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হন। যথা—

মর অমর

পদযুক্ত পদহীন

প্লেটো জীবকে মরজীব ও অমরজীব দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াই ধরিয়া লন যে, 'মানুষ মর জীব'। তাহার পর মর জীবকে আবার পদযুক্ত ও পদহীন দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াই স্থির করেন, মানুষ পদবিশিষ্ট মর জীব। এরিষ্টটল এই "ধরিয়া লওয়া" ব্যাপারটীতে বিশেষ আপত্তি করেন। তিনি বলেন 'মানুষ মর জীব' এ কথা, অনুমানবলে সিদ্ধ করিতে হইবে। এরিষ্টটল আরও বলেন, অনুমানপ্রণালী বলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত দুষ্ট। বিশুদ্ধ অনুমানে ইহরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইবে—

মানুষ হয় মর।

সক্রেটীস হয় মানুষ।

'সুতরাং সক্রেটীস হয় মর।

অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদের যেটা বিধেয়ক, সেই উদ্দেশ্য পদের অন্তর্গত যাবৎ পদার্থেরও সেই বিধেয়ক হইবে।

এই স্থলে একটু স্থির হইয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক, প্লেটোর ধরিয়া লওয়া ব্যাপারটী কি? সকলেই জানেন, নিগমনমূলক যুক্তি বা সার্পেক্ষানুমান (Deductive method) প্রণালীতে দুইটী অবয়ব থাকে, এবং একটী হেতু থাকে।

মানুষ মর—এটী সাধ্যাবয়ব (major remise)

যদু মানুষ—এটী পক্ষাবয়ব (minor premise)

যদু মর—এটী নিগমন (conclusion)

যেহেতু মানুষ মাত্রেই মর এবং মানুষ যদুকে ব্যাপিয়া আছে, সেই হেতু যদু মর। সুতরাং হেতু (middle term) বলিতে মানুষকেই বুঝাইতেছে। এই দৃষ্টান্তটী বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, একটী ব্যাপ্যক বাক্য হইতে একটী ব্যাপ্য বাক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং এই প্রণালীর সর্ব্ব মূলে এমন একটী ব্যাপক বাক্য থাকা চাই, যেটীকে আর ব্যাপকতর পদার্থের অন্তর্গত করা যাইতে পারে না। তবেই সেটী মূল পদার্থ হইবে, নতুবা অনবস্থা দোষ উপস্থিত হইবে। প্লেটো যখন পদার্থের শ্রেণীবিভাগকার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং এরিষ্টটল যেখানে প্লেটোর দোষ দর্শন করেন, বাস্তবিক পক্ষে সেটী প্লেটোর দোষ নহে। কারণ এই ধরিয়া লওয়া ব্যাপারটী যে ন্যায়সঙ্গত, সেটী এরিষ্টটলও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে কোন্‌খানে স্বীকার করিতে হইবে, সেইটীই বিবেচ্য।

উপরোক্ত উদাহরণে মানুষকে মরণধর্ম্মশীল বলিয়া ধরা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, কোন দার্শনিক এ পর্য্যন্ত 'মানুষ মর' এই সিদ্ধান্ত নিগমনমূলক যুক্তিপ্রভাবে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? রাম, শ্যাম, যদু, হরি, সক্রেটীস, প্লেটো সকলেই মরিয়াছে বলিয়া কে বলিল মানুষ মাত্রেই মর? যদি কেহ অস্বীকার করে, এমন কোন তার্কিক নাই

যে যুক্তি দ্বারা তার আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে।

আমরা আগামীবারে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর আলোচনায় অগ্রসর হইব।

(ক্রমশঃ)

ব্রজ-ভ্রমণ।

(ব্রহ্মচারী প্রভাস)

পর দিবস প্রত্যুষে অন্যান্য যাত্রিগণের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে শ্রীশ্রীরাল গ্রামে সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও শ্রীশ্রীবলদেব দর্শন করিয়া বসতীগ্রামে আসিলাম—এই গ্রামে মহারাজ বৃষভানু কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। বসতীগ্রামের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মুখরাই গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীমতী রাধিকার মাতামহী বাস করিতেন। ইহার ১ মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। বসতীগ্রাম ও রাধাকুণ্ডের মধ্যপথে "কদমখণ্ডি" অর্থাৎ কদম বন ও লগমোহন কুণ্ড দর্শন করিয়াছিলাম। এই বন কদম ফুলের সৌরভে আমোদিত করিয়া যাত্রীদিগকে বহুদূর হইতেই আকৃষ্ট করে। শ্রীরাধাকুণ্ডে বেলা প্রায় ১১টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়া মণিপুর কুঞ্জে আশ্রয় লইলাম। বর্ষণা গ্রাম হইতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড প্রায় মাইল। আজ এই স্থানেই রাত্রিবাস করিতে হইবে।

বৃন্দাবন হইতে মথুরার মধ্য দিয়া একটি পাকা রাস্তা রাধাকুণ্ডে আসিয়াছে। সমস্ত দিন ঘোড়ার গাড়ি ও এক্কায় করিয়া যাত্রী আসিয়া এই গ্রামটিকে ছোট খাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরে পরিণত করিয়াছে। ইহার রাস্তাগুলি পাথর দিয়া বাঁধান; রাস্তার ধারে সারি সারি বিপণি-

শ্রেণী, ঔষধালয়, ডাক্তারখানা, পোষ্ট আফিস ইত্যাদি। গ্রামটি নানা দেশ হইতে আগত বিচিত্র বেশভূষাধারী যাত্রিগণে সর্ব্বদাই মুখরিত। বৃন্দাবনের সমস্ত দেব দেবী এখানেও বিরাজিত আছেন। সহরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। উভয় কুণ্ডই পরস্পর সংলগ্ন। স্বনামধন্য লালাবাবু বিস্তর অর্থব্যয়ে এই কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করাইয়া পাথর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। কুণ্ডদ্বয়ের চারিদিকেই ঘাট স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কুণ্ডদ্বয়ের উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ :—পূর্ব্বে এই স্থানকে "অরিট্ট খেয়র" বলিত। কংসের অনুচর অরিষ্টাসুর বা বৃষাসুর (বৃষের আকার ছিল বলিয়া) এই স্থানে বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ উহাকে নিধন করিয়া অতি মনোরম, নানা ফলপুষ্পে শোভিত—উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ এই বাগানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা ললিতাদি আট জন সখির সঙ্গে তাঁহার বাগানে সূর্য্যপূজা করিবার জন্য ফুল তুলিতেছেন। স্নানান্তে মুক্তকুন্তলা অপরূপ শোভাময়ী বালিকাকে অনেকক্ষণ দেখিলেন তাহার পর রহস্য করিবার জন্য সহসা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "তাইত বলি—রোজ রোজ আমার বাগানে লতা পাতা ছিঁড়িয়া কে ফুল তুলিয়া লইয়া যায়! আজ চোর ধরিয়াছি—কিছুতেই ছাড়িব না।" বালিকা ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গেল এবং বলিল "তুমি বৃষ বধ করিয়া গোহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ—আমাদের ছুঁইয়া সূর্য্যপূজার ব্যাঘাত করিও না।" তাহাদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া গোহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। অনেক চিন্তার পর রাধিকা বলিলেন "যদি সর্ব্বতীর্থজলে স্নান করিতে পার তবেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সেই স্থানেই বংশী দ্বারা এক কুণ্ড খুঁড়িয়া তীর্থসকলকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বান মাত্রেই তীর্থসকল আসিয়া কুণ্ডটিকে পূর্ণ করিয়া দিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া কল্পিত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া রাধিকারও ঐরকম একটি কুণ্ড করিতে ইচ্ছা হইল—তখন সব সখি

মিলিয়া কৃষ্ণের কুণ্ডের পার্শ্বেই নিজ নিজ কঙ্কণ দ্বারা কুণ্ড খনন করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর কুণ্ড খোঁড়া হইল কিন্তু জল যে আসে না! বালিকাদের স্বভাবসরল মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে লজ্জিতা দেখিয়া বলিলেন যে, শ্যামকুণ্ডের জল লইয়া এই কুণ্ড পূর্ণ করিলেই হইবে। তাঁহার বাক্যে সকলেই সম্মত হইয়া কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যভাগে খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলেন; তখন শ্যামকুণ্ডের জল আসিয়া রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করিল। এই সংযোগস্থল এখনও দেখা যায়। কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই সংযোগ সাধিত হইয়াছিল; সেই জন্য এই তিথিতে নানা দেশের বহু যাত্রী এই স্থানে আগমন করেন ও গভীর রাত্রে এই উভয় কুণ্ডে স্নান করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করেন। শ্যামকুণ্ড হইতে রাধাকুণ্ডের শোভা ও বিস্তার বেশী। কুণ্ডদ্বয়ের চারিদিকে অনেক রকমের বড় বড় গাছ আছে, তাহারা পরিশ্রান্ত পর্য্যটককে শীতল ছায়া দান করে। শত শত যাত্রী ইহাদের তলায় শুইয়া বসিয়া ধ্যান ধারণায় কাল কাটাইয়া দেয়।

আমরা যে মণিপুরী কুঞ্জে আশ্রয় লইয়াছিলাম—উহা রাধাকুণ্ডের ধারেই। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর আমরা সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যভাগে রত্নবেদীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলাম। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলাম। রাধাকুণ্ডে রাজা রায় বনমালী রায় বাহাদুরের একটি বাড়ী আছে। চৌরাশীক্রোশ ব্রজ ভ্রমণকারীদের তিনি প্রতি বৎসরই পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের ভবনে ভোজন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা ৩টা। আরও ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় ৪টার সময় রাধাকুণ্ডের তীর্থগুলি দর্শন করিতে বাহির হইয়া নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম:—

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের উপবেশন স্থল—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রাধাকুণ্ডে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের বৈঠক,

শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্দির, হনুমান মন্দির, মণিপুর পুরাতন কুঞ্জে রাসবিহারীর মন্দির, কুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির, ঝুলন তলা, শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্থান, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুরের ভজন কুটীর। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ফুল-সমাজ—ইনি এই স্থানে ভজন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। এখানে বৈষ্ণব বাবাজীগণ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন স্থান, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও গোবিন্দ ঘাট, শ্রীশ্রীগদাধরচৈতন্য মন্দির, নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর, মণিপুর বড় কুঞ্জে শ্রীশ্রীগোবিন্দজী, ব্যাসঘেরা, মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর ভজন কুটীর, গোপকুয়া, অষ্টসখি কুঞ্জ, বনখণ্ডি, তমাল তলা, শ্যামকুণ্ডের মধ্যদেশে শ্রীশ্রীব্রজনাভ কুণ্ড, শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্যামকুণ্ডের নিকটে ললিতাকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের পশ্চিমে মল্লহার কুণ্ড—শ্রীমতী রাধিকা ইহার তীরে বসিয়া সূর্য্য পূজা করিবার জন্য মালা গাঁথিতেন। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীশ্রীমহিমেশ্বর নামে অতি প্রাচীন মহাদেব বিরাজিত আছেন, ইহা ছাড়া এখানে আরও অনেক কুঞ্জ ও মন্দিরাদি আছে। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিবার সময় পাণ্ডারা সবগুলিই যাত্রীদের অতি আগ্রহের সহিত দেখাইয়া থাকে। তীর্থ ও কুণ্ডগুলি দর্শন করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ভোর হইলে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া গিরি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলাম। এই পাহাড়টি প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৩।১৪ মাইল পথ চলিতে হয়। রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় ১½ মাইল রাস্তা আসিলে কুসুম সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম "কৃষ্ণ সরোবর"। এই সরোবরের তীরে কুসুমকানন। শ্রীমতী রাধিকা এই কুসুমকানন হইতে কুসুম চয়ন করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন। সরোবরের চারিধারেই পাথর বাঁধান ঘাট। ঘাটের উপর দুই একটি মন্দিরও দেখিতে পাওয়া

যায়। স্থানটি অতি নির্জ্জন—তপস্যা করিবার উপযুক্ত। সরোবর-পরিক্রমাকালে দুইটি বালক-তাপসকে দেখিলাম। আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে তাঁহারা এই স্থানে প্রায় ১ বৎসর হইতে আছেন ও পরম সুখেই আছেন।

কুসুম সরোবরের নিকটেই নারদ কুণ্ড। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা দেখিতে অভিলাষ করিয়া এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

গিরি গোবর্দ্ধন—কুসুম সরোবর হইতে আরও ১½ মাইল পথ আসিলে গোবর্দ্ধনে পৌঁছান যায়। পর্ব্বতটিকে দূর হইতে একটি গাভীর ন্যায় দেখায়। প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত পাহাড়টির কতক অংশ নানাবিধ লতাগুল্মতরুরাজিবেষ্টিত কতক অংশ শুধু বড় বড় কাল পাথরে আবৃত—একটি তৃণ পর্য্যন্ত নাই। এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত গোবিন্দসদৃশ পূজ্য, এই জন্য ইহার উপরে কেহই উঠিতে পায় না।

শ্রীভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাকালে নন্দ প্রভৃতি গোপসকল সুবৃষ্টি হইয়া উত্তমরূপ শস্যাদি জন্মায়, এই কামনায় বৎসরান্তে একবার দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিতেন। এইরূপ পূজার সময় আগত হওয়ায় গোপবৃন্দ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহাতে বাধা প্রদান করিয়া পূজা করিতে নিষেধ করেন; এবং ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে এই গিরিকেই পূজা করিয়া অভীষ্টলাভ করিতে উপদেশ দিলেন। মহারাজ নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সম্মত হইয়া গোবর্দ্ধনেরই পূজা করিলেন। নিজ পূজা ও সম্মান বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইন্দ্রদেব অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘসকলকে প্রবল বেগে বারি বর্ষণ করিয়া ব্রজমণ্ডল ডুবাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। মেঘ সকল অবিরল ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল। অশনিপাত ও শীলাবৃষ্টিতে ব্রজমণ্ডলে প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। ব্রজবাসী ও অন্যান্য জীবকুলের কষ্টের সীমা রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের কষ্ট দেখিয়া এই পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া ব্রজবাসিগণকে

নিজ নিজ গোধন লইয়া পর্ব্বতগর্ভে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সাত দিন মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল, ব্রজবাসিগণের কোন বিপদই হইল না। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন ও তাঁহার নিকটে আসিয়া নানাবিধ স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। বারিবর্ষণ বন্ধ ও আকাশ নির্ম্মল হইলে গোপবৃন্দ গোধন লইয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদবধি গোবর্দ্ধনের পূজা দ্বারা সকল অভীষ্ট সাধিত হইতে লাগিল।

গোবর্দ্ধনের নিকটেই ভরতপুর-রাজবংশের অনেকগুলি সমাজ-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতের স্বর্গকামনায় এই সকল মন্দিরে চিতাভস্ম রক্ষিত হইত। ভরতপুর রাজার ধর্ম্মশালা ও বাগান-বাটীও ইহার নিকটে আছে। পর্ব্বত যাত্রিগণ পরিক্রমাকালে ইহার আশে পাশে ছোট ছোট পাথরের ঘর তৈয়ার করিতে লাগিল—বালক বালিকাদের খেলাঘরের ন্যায় এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিল যে, তাহাদের মৃত আত্মীয় বন্ধুগণের যাহাতে পরজন্মে উত্তম গৃহাদি লাভ হয়, এই কামনায় তাহারা এইরূপ করিতেছে। কারণ, গোবর্দ্ধনে যে যাহা কামনা করে তিনি তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিলাম যে অধিকাংশ যাত্রীই দু-চার খানি পাথরের দ্বারা দু-তিনটি করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিল।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমাকালীন নিম্নলিখিত স্থানগুলি পাওয়া যায়ঃ—উদ্ধবমন্দির, স্বর্ণসিংহাসন, বিহারকুণ্ড, মানসগঙ্গা—গোপবৃন্দ যখন গোবর্দ্ধনের পূজা করিতেছিল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে মানসে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ব্রজবাসীদের সহিত স্নান করিয়াছিলেন। শোনা যায় যে, এই গঙ্গায় স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জ্জিত হয়। মানস-গঙ্গা একটি বৃহৎ সরোবর। ইহার ধারে শ্রীশ্রীহরিদেবজীর অতি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান—মানসগঙ্গার উত্তর ধারে চক্রেশ্বর মহা-দেবের মন্দির। ব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীমহাদেব চারি নামে বিখ্যাত হইয়া

পূজিত হইতেছেন, যথা:—শ্রীবৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভুতেশ্বর, মানসগঙ্গায় চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর ও কাম্যবনে কামেশ্বর। গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা করিয়া পুনরায় পরিক্রমায় নির্গত হইতে হয়। চাকলেশ্বর মহাদেবের নিকট সনাতন গোস্বামীর ভজন-স্থানও বিদ্যমান। গোস্বামিজী এই স্থানে ভজন করিতেন। একদিন তিনি মশা ও "কোঙরী" নামক এক প্রকার ছোট ছোট পোকার উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে মনস্থ করিলেন। সনাতনের মনের ভাব অন্তর্যামী ভগবান্ মহাদেব জানিতে পারিয়া তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে আজ হইতে এখানে মশক ও কোঙরীর উপদ্রব আর থাকিবে না। তদবধি এখানে মশক ও কোঙরীর উপদ্রব নাই। এক্ষণে এই স্থানে অনেক বাবাজী সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া আমরা পথে গোবর্দ্ধন গ্রাম, ঋণমোচন, পাপমোচন, চন্দ্র সরোবর, শ্রীবলদেবজী, শৃঙ্গারমন্দির, অন্নকূট গ্রাম বলরামের হস্তচিহ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে আসিলাম। এই সরোবর দেবরাজ ইন্দ্র গোবিন্দের প্রীতি কামনায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের তীরেই শ্রীগোপাল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন। পুরী গোস্বামী গোপালকে চিনিতে পারেন নাই, পরে স্বপ্নে সেই বালকরূপী গোপালকে চিনিতে পারিয়া এবং গোপালের মূর্ত্তি যে মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়া কুণ্ডের উত্তর তীরে আছে ইহাও জানিতে পারিয়া পরদিন উহা উত্তোলন করেন এবং সেই কুণ্ডের জলে অভিষেক করিয়া মহা সমারোহে অন্নকূট উৎসব করেন। গোবিন্দকুণ্ড হইতে পুছারি গ্রামে আসিতে হয়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে গাভীর আকার কল্পনা করা হয়। এই গ্রাম গোবর্দ্ধনের পুচ্ছের নিকট বলিয়া ইহাকে "পুছরীলোঠা" বলা হয়। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সাত বৎসর বয়সের পদচিহ্ন স্থান, গোবর্দ্ধন ধারণের স্থান, গোবিন্দ দাস গোস্বামীর সমাধি, হরিজী কুণ্ড, শ্রীনাথ মন্দির, যতীপুরা বা মুখারবিন্দ দর্শন করিলাম—এই স্থানে গোবর্দ্ধনের মুখ। এই

কারণ যাত্রিগণ এই স্থানে দুধ ও ভোজ্য দ্রব্য ভোগ দিয়া থাকেন। নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ এইখানেই গিরির পূজা করিয়াছিলেন। এখানে গোকুলীয়া গোস্বামীদের শ্রীশ্রীগোপালদেব বিগ্রহ স্থাপিত আছে, তথায় অন্নকূট উপলক্ষে বহু যাত্রিসমাগম হয় ও উক্ত উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যতীপুরা বা মুখারবিন্দ হইতে দানঘাটিতে আসিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপীদের নিকট হইতে দান লইয়াছিলেন। এইখানেই গোবর্দ্ধন পরিক্রমার শেষ হইল। আমরা বেলা ৫টার সময় গোবর্দ্ধনে মানসগঙ্গায় ফিরিয়া আসিলাম।

গোবর্দ্ধন হইতে অতি প্রত্যুষে আমরা লাঠাবন (অপর নাম, দীগ) অভিমুখে রওনা হইলাম। পূর্ব্বে বনযাত্রা লাঠাবন হইয়া যাইত না—সোজা মেঠোপথেই কাম্যবনে যাইত। ভূতপূর্ব্ব ভরতপুররাজ ব্রজবাসীদের প্রভূত অর্থদানে বশীভূত করিয়া যাত্রা তাঁহার রাজ্যমধ্য দিয়া লইয়া যান। গোবর্দ্ধন হইতে দীগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা। পথে গোলালকুণ্ড, বেহেজ গ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও শ্রীবলদেব দর্শন করিয়া ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় দীগে পৌঁছিয়া মহারাজার একটি উদ্যানে গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম। উদ্যানের পূর্ব্বদিকে কৃষ্ণকুণ্ড নামে এক বৃহৎ সরোবরে আছে। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর স্নান করিয়া মাধুকরী লইয়া আসিলাম। এই রাজ্যে গরীব দুঃখী যাত্রিগণ এত বেশী সদাব্রত পায় যে অন্য কোনও বনে এত পায় না। পরিক্রমাকালে ভরতপুররাজ স্বয়ং মুক্তহস্তে সদাব্রত বিলাইয়া থাকেন।

বেলা প্রায় ৪টার সময় নগর ও ইহার বিখ্যাত দুর্গ দেখিতে যাইলাম। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে এই দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মহারাজ বদন সিংহ এই সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগল ও মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে জাঠ জাতিকে রক্ষা করেন। এখনও দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও ইহার মধ্যস্থিত ভগ্ন রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী দৃঢ় ও সুন্দর, এবং চারিদিক গভীর পরিখাবেষ্টিত।

দুর্গের স্তম্ভ ও প্রাচীরাদি যে এক সময়ে মনোহর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে চিত্রবিচিত্র ছিল, তাহা এই ভগ্ন অবস্থায় দেখিলেও বেশ বুঝা যায়। এই দুর্গ ইংরাজ জেনারেল ফ্রেসার কর্ত্তৃক একমাস অবরুদ্ধ থাকিয়া আত্মসমর্পণ করে। অবরুদ্ধ অবস্থায় দুর্গগাত্রে যে সকল গোলা লাগিয়াছিল তাহার চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান।

নগরটি চতুর্দ্দিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত—সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইহার "বন বন" অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদ সৌন্দর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে বিখ্যাত। ইংরাজ কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইলে দুর্গ ও সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। নগরের অধিবাসীরা অধিকাংশ "জাঠ"। জাঠগণ বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্ত হইলেও রণদুর্ম্মদ ও বলিষ্ঠ। এখানে একপ্রকার সুন্দর চামর দেখিলাম। ইহা চামরীর পুচ্ছে প্রস্তুত না হইয়া হাতির দাঁতে অথবা চন্দন কাঠের ঝুরি দ্বারা প্রস্তুত হয়। জাঠরমণীগণই ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবং ইহার অধিবাসিগণ সৌখিন ও গীতবাদ্যপ্রিয়।

আমরা যখন এই নগরে প্রবেশ করি, তখন বাবাজীগণ আমাদের অগ্রে অগ্রে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছিলে। সেই উচ্চ কোলাহল ও সংকীর্ত্তনের স্বরে আকৃষ্ট হইয়াই হউক অথবা পূর্ব্ব হইতে আমাদের আগমন জানিতে পারিয়াই হউক—নগরের অধিবাসী স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা—কাতারে কাতারে রাজ পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। ইহাদের সরল আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে না পারিলেও, তাহারা কীর্ত্তনের সুর ও উদ্দাম নৃত্য বেশ উপভোগ করিতেছে। নগর ভ্রমণকালীন আমার একটি যুবকের সহিত খুব আলাপ হইয়াছিল—ইনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের দেশের আচার ব্যবহার, দুর্গ ও সহরের ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিধ তথ্য জানাইতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে গীতবাদ্যের কথা উঠিলে ইনি আমাদের রাত্রে ভোজন করিতে ও গীতবাদ্য শুনিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি

আমার সহিত এত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরে ব্রজভ্রমণ সময়ে অন্যান্য জাঠযুবকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরকে অল্পকালের মধ্যে আপন করিয়া লওয়া ইঁহাদের খুবই স্বাভাবিক—এত সরলতা অন্যত্র দুর্লভ। যাহা হউক রাত্র ১০ টা পর্য্যন্ত গান বাজনা হইল—গানগুলির অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক—ভাষা ভাঙ্গা ব্রজবুলী। অতঃপর পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সরকার)

লভিয়া জনম বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালীর এই দেশে,
সংসার ছাড়ি কত দেশে তুমি ভ্রমিলে গো যোগীবেশে;
পরহিতব্রতে সারাটী জীবন দেহ মন প্রাণ ঢালি,
ধর্ম্মের সার-মহিমা প্রচার করিয়া গেলে গো চলি;
জ্ঞানের আলোক বিতরি ধরায় নাশিলে মোহ-তিমির,
ফললাভ আশে কর নাই কিছু হে মহাকর্ম্মবীর।

লঙ্ঘি জলধি গেলে যবে তুমি আমেরিকা মহাদেশে,
চিকাগো সহরে, উদার সৌম্য পরিব্রাজক বেশে,
বিশ্ব-ধর্ম্ম-সভায় তোমারে লইল সাদরে বরি,
হিন্দুর মান রাখিলে গো তুমি ধরম ব্যাখ্যা করি;
জনতা-বিপুল সভায় করিলে দুইটী কথায় স্থির,
হিন্দুধর্ম্মে তুলিলে উচ্চে সবার ধর্ম্মবীর।

গুরু উপদেশে লোকহিতকর কত্ই না কার্জ করিলে,
'গরীবের সেবা' মহাব্রত সেটা তুমিই মানবে শেখালে ;
ছিলে যোগী তবু স্বদেশের তরে নিজ দেহ পাত করেছ,
নিষ্কাম হয়ে করিতে কর্ম্ম তুমিই মোদের বলেছ ;
শিখায়েছ তুমি রাখিতে জীবনে ত্যাগের আদর্শ স্থির
নরপতি হ'তে পারিতে গো তবু হইলে কর্ম্মবীর।

পরের ধর্ম্ম ঘৃণার নয়নে দেখ নাই তুমি কভু,
যবন খ্রীষ্টানে আদরেতে সবে বক্ষে লয়েছ প্রভু ;
অতুল ঐশ্বর্য্য কত নরনারী তোমার চরণে সঁপেছে—
ফেলি দূরে সব চলে গেছ তুমি, তারা পিছু পিছু ছুটেছে,
দেবতার কাজে এসেছিলে হেথা—ছাড়িয়া এ দেহনীড়
দেবতার মাঝে গেলে চলি পুনঃ তুমি গো ধর্ম্মবীর।

মথুরা অঞ্চলে জলপ্লাবন।

আমরা বৃন্দাবন হইতে ২৮শে নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখান পাইয়াছি। তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, মথুরা অঞ্চলে কি ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছে। আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট সহস্র সহস্র বিপন্ন নরনারীগণের দুঃখ মোচনে সাহায্যার্থ আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে যিনি যাহা পাঠাইতে চান তাহা ম্যানেজার, উদ্বোধন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

"* * আলোয়ারের যে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে তাহার জল আলোয়ারের গুড়গাঁও জেলার অনেক স্থল, ভরতপুরের কয়েকটী গ্রাম এবং মথুরা জেলার বহু গ্রাম নষ্ট করিয়া এখনও প্রবাহিত হইতেছে। এই জলে মথুরা জেলায় বড় বড় পঞ্চাশটী এবং ছোট ছোট আরও

গ্রামের এই সময়কার শস্য—জোয়ারি, সোয়ার, বাজরা, তুলো এবং বহু প্রকার কড়াই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জল অদ্যাবধি কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক গলা এই ভাবে বর্ত্তমান। শস্য'ত নষ্ট হইয়াছেই, তাছাড়া আবার উহারা জলে পচায় বাষ্প দূষিত হইয়া যে অতি ভয়ঙ্কর রকমের ম্যালেরিয়া হইতেছে, তাহা এই সত্য ঘটনাটী হইতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। যেখানে একটু উঁচু জমি জলের উপরে জাগিয়া আছে, তাহাতে মূলো কিম্বা অন্য কোন শাক সব্জী দিবার জন্য কৃষক গ্রাম হইতে এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল লইয়া গেল, এবং বৈকালে অভুক্ত অবস্থায় জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইল। পরে তাহার স্ত্রী খাওয়াইবার জন্য যখন ডাকিল, তখন সাড়া না পাইয়া লেপ তুলিয়া দেখে তাহার স্বামী মরিয়া রহিয়াছে!

যা তা খাইয়া রক্তামাশয়, পেটের অসুখ প্রভৃতি এখনই সুরু হইয়াছে, পরে কলেরাও আরম্ভ হইতে পারে। কারণ, নীচু জমিতে যে সব কুয়া ছিল সেগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যে গ্রামের সমুদয় কুয়া জলের মধ্যে সেখানকার লোকদের ঐ পচা জল খাইয়াই বাঁচিতে হইবে বা মরিতে হইবে। শেষোক্তটাই হইতেছে। যে গ্রাম অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে সে গ্রামের মাটীর ঘরগুলির দেয়াল প্রায় মাসাবধি জলে ডুবিয়া থাকায় গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। লোকেরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া গাছের তলায় অথবা ফাঁকা জায়গায় শুইতেছে, সে জন্য ব্রন্‌কাইটিস্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হইতেছে। বালকবালিকারাই ইহাতে বেশী মারা যাইতেছে। গ্রামের চারিদিকে জল দাঁড়ানয় গ্রামটী স্যাঁতসেঁতে হইয়াছে—একে বন্যাভার, তদুপর ঐরূপ স্থানে শোয়ায় সহজেই রোগগ্রস্ত হইতেছে। শীত অত্যধিক পড়িয়াছে এবং ক্রমশঃই বাড়িতেছে। গ্রামসমূহের চারিদিকে জল দাঁড়াইয়া থাকায় ঠাণ্ডা বৃন্দাবন হইতেও অধিক। মথুরা জেলার প্লাবিত জমির পরিমাণ সোজা ভাবে ৩০ মাইল, কিন্তু জল নীচু জমি হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাওয়ায় প্রায় ৬০ মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন যাইবার রাস্তায় প্রায় ৭৫ হাত চওড়া নালা কাটিয়া সরকার বাহাদুর জল নিকাশের পথ করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে অবিরত প্রচণ্ড বেগে প্রায় এক মাস যাবৎ জল যাইতেছে। আমরা এক বুক জল ভাঙ্গিয়া গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, উহার কিছু পরে প্রায় এক ফারলং রাস্তার উপর দিয়া ৮ ইঞ্চ উঁচু হইয়া জল যাইতেছে, তাহার পর গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত রাস্তার উপর আর জল নাই কিন্তু দুই ধারে আছে। গোবর্দ্ধনের পরেই আবার রাধাকুণ্ডের রাস্তায় প্রায় ২০ হাত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও অত্যন্ত বেগে জল বাহির হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় সব জলে জলময়। মোটর উপর মথুরা প্রভৃতি জেলায় নিতান্ত দুর্দ্দিন উপস্থিত। মথুরায় একটী সেবাসমিতি দেখিলাম—মাত্র দুটী লোক কাজ করিতেছে। তাহারা কিছু কিছু কাপড় কিনিয়া কতক লোককে দিতেছে। কলিকাতার মাড়োয়ারীরা পঞ্চাশটী পুরাণো কোট পাঠাইয়াছিল, তাহার কয়েকটী নিতান্ত দুঃস্থ এবং পীড়িতদের দিয়াছে। সামান্য কিছু কুইনাইন-ট্যাবলেট ও যৎসামান্য কবিরাজী ঔষধ লইয়া ১০দিন যাবৎ তাহারা কায করিতেছে।

প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম অল্পে অল্পে কাজ হইতে পারে, এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহা বিরাট ব্যাপার। বিস্তর অর্থ ও লোকবল দরকার। যে ঔষধগুলি আমি পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছি, তাহা ছাড়া আরও ঔষধ যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রথমে centre হইতে ঔষধ লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জল ভাঙ্গিয়া যাইয়া ঔষধ দিয়া আসিতে হইবে, পরে লোকেরা জানিতে পারিলে centreএ আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইবে। দেখিলাম চাষীরা অর-গায় জল ভাঙ্গি। কোথায় একটু উঁচু জমী আছে তাহাতে কিছু রোপণ করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির প্রাণরক্ষার জন্য লাঙ্গল দিতে যাইতেছে। বর্ষাণায় centre করিলে লালাবাবুর ষ্টেটের Asst. Supdt. যে কয়টী ঘোড়ার দরকার তাহা দিবেন। ইহা ব্যতীত থাকিবার স্থান এবং দুই এক জনের আহারের

ব্যবস্থা এবং একজন চাকরও দিতে পারেন। তিনি যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে রাজি আছেন। সে জন্য আমি কল্য বর্ষাণায় কিছু ঔষধাদি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

কি কি ভাবের সাহায্য চাই :—

(১) শস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং পরবর্ত্তী শস্য হইবার উপায় না থাকায় যত দিন না নূতন ফসল উঠে ততদিন আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(২) গৃহহীন লোকদের জন্য বাঁশের সাহায্যে চালা ঘর করিয়া দিতে হইবে।

(৩) রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্য চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৪) যাহাদের পরিবার বা গায়ে দিবার কিছুই একরূপ নাই, তাহাদের জন্য গজি থান কিনিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতে হইবে। পুরাতন বস্ত্রাদি পাইলেও উত্তম হইবে।

(৫) গ্রামের লোকেরা যাহাতে জল গরম করিয়া উহাতে কর্পূর অথবা শুঁট পিঁপুলাদি দিয়া খায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কোন কোন গ্রামের আল কাটিয়া দিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহাতে অন্য দিক দিয়া জল না প্রবেশ করে তজ্জন্য স্থান বিশেষে বাঁধ দিতে হইবে।

মথুরায় একটী সেবাসমিতি ছাড়া আর কেহই এখনও ইহাদের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই। আমরা রাধাকুণ্ডে কাজ সুরু করিয়াছি। গোবর্দ্ধনের Govt. Dampier Hospital এক মানুষ ভোর জলের নীচে; তাঁহারা Hospitalটীর জিনিষ পত্র গোবর্দ্ধনের একটী ধর্ম্মশালায় লইয়া আসিয়াছেন। একটী হিন্দুস্থানী ডাক্তার তাহার chargeএ আছেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটী বাঙ্গালী ডাক্তারও ২৯শে নবেম্বর হইতে কাজ সুরু করিবেন বলিলেন। দিন দিন মৃত্যুসংখ্যা খুব বাড়িতেছে। একৈক মাড়োয়ারী কলিকাতার সেবাসমিতিকে ৪০০০্ টাকা দিয়াছেন আরও বিস্তর অর্থ ও লোকের প্রয়োজন। * *

সংবাদ ও মন্তব্য।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্‌ বিবেকানন্দ স্বামীজির ষট্‌পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষে "দরিদ্রনারায়ণ"গণের সেবা আগামী ২০শে মাঘ, সন ১৩২৪, ইংরাজি ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খৃঃ. রবিবার. বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

আগামী মাঘ মাসে, ইংরাজি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) 'কুম্ভমেলার' অধিবেশন হইবে। এই বিরাট মেলায় দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসী সমবেত হইবে। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে তথায় গঙ্গাতীরে একটী সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। নিরাশ্রয় দরিদ্র-নারায়ণগণ পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আশ্রমে আনিয়া ঔষধ-পথ্যাদির দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করা, বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিগণ পথহারা হইয়া স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সময়োপযোগী সাহায্য করাই উক্ত সেবাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য। এই শুভ অনুষ্ঠানটীর সাহায্যকল্পে যিনি যাহা সাহায্য করিতে চান —অর্থ হউক, ঔষধপথ্যাদি হউক—তাহা ব্রহ্মচারী পঞ্চানন, সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মঠ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্ত দরিদ্র ফণ্ডের বিগত জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত হিসাব।

জমা—

পূর্ব্বের হিসাবের জের ৬৲, জনৈক মহিলা, হাতিয়াবাগান, কলি-

কাতা—১০্, এম মুখার্জ্জি,ক্যাম্প পঙ্গু, ঝঁরাইকেল—১্, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, মেসার্স এস, ফ্রেগুস্ এণ্ড কোং, কলিকাতা ৩্ - মোট ২০্ টাকা।

খরচ—

উক্ত শ্রীষ্টান ভদ্রপরিবারকে ১্ শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ১্, জনৈক খ্রীষ্টান ভদ্রলোককে ১্, বাগবাজারের লেবু বাগানের দরিদ্র পরিবারকে ২্, শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ১্, জনৈকা মহিলা, উজ্যানি গ্রাম ফরিদপুর ৫্, নিকাসি পাড়াস্থ দরিদ্র পরিবারকে ২্, শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ২্ জনৈকা দরিদ্রা রমণীকে ২্, শ্রীসীতানাথ ভট্ট ১্, দরিদ্র ছাত্রকে মাসিক সাহায্য ৩্ টাকা।
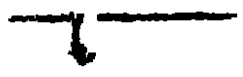
শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নভেম্বর মাসের আমরা যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের ১৪ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ৪০ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ৭ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, এক জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছে ও ১৬ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৫৫০ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫৫৪ জন নূতন এবং ১৯৯৬ জন পুরাতন।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৮১॥ এককালীন দান ৪্ এবং পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিয়া ১৷৶০—মোট ১২৩৸৶০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় ৩০৫৷৶৫, বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে ব্যয় ২৫৫/১০।